বাণী বসু

উপন্যাস পঞ্চক

সূচিপত্র

কল্পান্ত
৯

তিন ভরির বিছে
৫৯

কর্কটক্রান্তি
৯৭

দেবী, উইমেন'স্ লিব ও নেপো
১২৭

ঘুম
১৭৩

বাণী বসু

উপন্যাস পঞ্চক

পাবলিক লাইব্রেরী
স্থাপিত-১৮৯৭
খুলনা

কল্পান্ত

পাবলিক

বুল্টু বলল—'মা, তুমি তাহলে সত্যিই যাচ্ছ না।'

—'না রে!' শর্মিলার চোখ নিচু।

ঊর্মি বুল্টুকে চোখের ইশারা করল। বুল্টু একটু আহত। কিন্তু চুপ করে গেল।

শর্মিলা হঠাৎ একবার মুখ তুললেন, কী যেন বলবার জন্য মুখটা অল্প একটু খুলেছিলেন। চুপ করে গেলেন আবার।

তাপসকান্তি বুঝতে পেরেছিলেন শর্মিলা কী বলতে গিয়ে চুপ করে গেল।

'আমি এয়ারপোর্টে গেলে কি তোদের যাওয়া আটকাতে পারব?' কিংবা 'যাবিই যখন দু ঘণ্টা আগে পরেতে কী তফাত হবে?'—এই জাতীয় কিছু। তাপসকান্তি বুঝতে পেরেছিলেন কারণ তিনি জানেন। জানেন শর্মিলার তীব্র অসন্তোষ, রাগ, জিদ, কিছুতেই মেনে নিতে না পারা। এ নিয়ে দুজনের মধ্যে কথা যে না হয়েছে তা তো নয়!

তাপস নিজেও যে আশাহত নয়, তাঁর ভেতরটাও যে গুমরোচ্ছে না এ কথা সত্যি নয়। কিন্তু তা নিয়ে এই শেষ মুহূর্তে কোনও সিন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর একটা ডিগনিটি আছে। উপরন্তু তিনি পুরুষ। পুরুষ হবার অনন্য অহঙ্কারে তিনি সব রকম ভাবাবেগের বহিঃপ্রকাশ রুদ্ধ করতে দায়বদ্ধ না? কী করতে পারেন? ছেলে, বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলে, বিবাহিত, এখনও অবশ্য পিতা নয়, সে যাই হোক, হতে পারে, যে কোনও মুহূর্তেই হতে পারে, সে যদি মনে করে যে ভিন দেশে গেলে তার উন্নতি, তার পুরুষার্থ-লাভ, এবং তার এই মনে করার পেছনে যদি তার স্ত্রীরও ব্যগ্র সমর্থন থাকে তাহলে সে উন্মত্ত অ্যাম্‌বিশান তরঙ্গ রোধিবে কে? কেউ পারে না। তাঁর বেলাও কি কেউ পেরেছিল? মা ছিলেন, ঠাকুমা ছিলেন, জমি-জমা বিষয়-সম্পত্তি ছিল। গ্রাম-সুবাদে আত্মীয়-বন্ধুদের নিষেধ, সমালোচনা এ সবও ছিল। কিন্তু প্রথম কলকাতায় হোস্টেলে বাস করতে এসে সেই যে দুই বিধবার আঁচল-ছাড়া হলেন, শহরের স্বাদ পেলেন, আর কি কখনও ফিরে যেতে পেরেছেন? মোটামুটি চাকরি, তার চেয়েও বড় চাকরি, তার চেয়েও বড় চাকরি, এই সব ছেড়ে ফিরে যাওয়া সম্ভব ছিল? সেই ঘটনা-বিহীন, চলাচল-বিহীন শ্যাওলা-পড়া ডোবার মতো নিস্তরঙ্গ বদ্ধতায় যার নাম দেশ?

তাঁরা। অর্থাৎ তিনি ও শর্মিলা তো তবু দুজন। একজন পুরুষ, একজন নারী। তাঁর মা-ঠাকুমা ছিলেন আদ্যন্ত দুই নারী। তাঁদের রক্ষা করার নৈতিক দায়িত্ব, মানবিক দায়িত্ব তো একমাত্র সন্তান, একমাত্র বর্তমান পুং হিসেবে তাঁরই ছিল? তাঁর তো সে সব অস্বীকার করতে দ্বিতীয়বার চিন্তা করতে হয়নি? তাঁর ভেতরের যুক্তি ছিল তিনি

যখন ছোট ছিলেন কে মা-ঠাকুমাকে রক্ষা করেছিল। তাঁরা নিজেরাই তো বাগান জমা-দেওয়া, পুকুর জমা দেওয়া, চাষ-বাসের তদারকি, গোয়াল-সাঁজাল-রাখাল-বাগাল সবই সামলেছেন। তিনিই বরং বারো বছর বয়স থেকে স্কুল-বোর্ডিং-এ পড়ে কলেজ হোস্টেলে মানুষ, কিচ্ছু জানতেন না। কোনওদিনও না। এত বছর যাঁদের পুরুষ ছাড়া চলে গেল, আজই বা তাঁদের সব কিছু অচল হয়ে যাবে কেন, ছেলে সাবালক হয়েছে বলে?

—বয়সটাও তো বাড়ছে রে ধন? তখন তোর মা ছিল সমর্থ, জোয়ান মেয়ে-মানুষ। এখন আমার চোখের ঠাহর গেছে, তোর মারও আর সে দিন নেই। আছে?

—আমি কি আসি না। আসব না! সবই তো করব। খালি দিনের পর দিন এখানে থাকতে পারব না। চাকরি আমি নিয়ে নিয়েছি। ছাড়তে পারব না।

—তোর কীসের অভাব রে পাগলা। তোর বাপ-পিতেমো যা রেখে গেছে আগলে-বাগলে আছি। তুই শুধু হক বুঝে নিবি।

দেশের জীবন তা যত সচ্ছলই হোক, পুকুরের মাছ, বাগানের ফল-ফুলুরি, চাষের সবজির সোয়াদ যতই মধুরাৎ মধুরম্ হোক সেখানে নিষ্ক্রিয় হয়ে আগলে-বাগলে রাখা হকের হিসেব কষতে বসে থাকা যে একজন এম.এসসি ডিগ্রিঅলা নওজোয়ানের পক্ষে অসম্ভব, প্রায় হাস্যকর এ কথা তিনি মা ঠাকুমাকে বোঝাতে পারেননি।

সে দিনের সাতগেছে আর কলকাতার মধ্যে যা তফাত, আজকের কলকাতা আর বস্টনের মধ্যেও হয়তো সেই-ই তফাত। হয়তো কেন, তাই-ই! তিনি সেখানে না গেলেও, সরেজমিন তদন্ত করে না আসলেও জানেন না এমন তো নয়। বুল্টুরও এক কেস, তাঁর-ই মতো অবিকল। উচ্চশিক্ষার্থে স্কলারশিপ জোগাড় করে চলে গেল। কোর্স শেষ করে চাকরি, তারাই গ্রিন কার্ড করে দিল। ফিরে এসে বিয়ে করল। যাবার সময়ে বলে গিয়েছিল অবশ্যই ফিরে আসবে। এখন এই নিস্তরঙ্গ ডোবার বদ্ধতায় ফেরাটা অবাস্তব, অসম্ভব, হাস্যকর মনে হচ্ছে।

—আমি কি আসব না? আসি না? যথাসম্ভব সবই করব মা, যে কোনও দরকারে দু-চার দিনের মধ্যে এসে পড়ব। প্রতি মাসে অন্তত দুবার তো ফোন করবই...

শর্মিলা আর বুল্টুর মধ্যে এই ধরনের তর্কবিতর্ক তিনি শুনেছেন। শুনে মজা লেগেছিল, অদ্ভুত লেগেছিল। একই ঘটনা একই পরিস্থিতি জীবনের বৃত্তে কেমন ঘুরে ঘুরে আসে? খালি তাঁর বেলায় মা ছিলেন নীরব। অভিমানে। বেশি কথা বলার অভ্যেসও ছিল না। ঠাকুমার জোরালো ব্যক্তিত্বের ছায়ায় ছায়াময়ী। কিন্তু এ মা তো সে মা নয়। বুল্টুর মা একালিনী, ডিগ্রি-ধারিণী, চাকুরিজীবিনী। তিনি তো কারুর ছায়া মানবার পাত্রী নন। তিনি, আলোকপ্রাপ্তা। আলোকিত। চাঁদ-টাঁদ নয়, জ্যোতিষ্ক, আলফা সেন্টরি।

করুক, তর্ক করুক, চেঁচামেচি করুক। করুক যত পারে। শেষ পর্যন্ত খোলা মুখ বুজে নিতে হয়। উদ্যত, শান দেওয়া কথাদের ছোঁড়বার আগেই সংবৃত করে নিতে হয়। শিখুক। শিখুক। তিনি শেখাতে পারেননি। কেউ কাউকে শেখাতে পারে না।

নিজে নিজে ঠেকে ঠেকে ঘা খেয়ে খেয়ে শিখুক।

বুল্টু বলল—বাবা, তুমি যাচ্ছ তো? না তুমিও... ছেলে হলে হবে কী। তার দু চোখে সজল বর্ষার পূর্বাভাস। বর্ষা নামবে না। কিন্তু ভেতরে বর্ষা আছে। একমাত্র, আদরের পুতুল সন্তান যে! মা-বাবার উজাড় করে দেওয়া ভালবাসা, মনোযোগ, সতর্ক প্রশ্রয় এই সবের উপাদানে গঠিত শরীর-মন। ও এখনও জানে না ওকেও দিতে হয়, ওরও দেওয়ার আছে। কিংবা, বলা উচিত ও জানে না ও দিচ্ছে না। ও ভাবছে আমি মা-বাবার পছন্দ করে দেওয়া মেয়ে বিয়ে করেছি। মা-বাবার দেওয়া আদর গ্রহণ করেছি। মা-বাবার পছন্দ করে-দেওয়া কেরিয়ার গড়েছি। দরকার না হলেও ডলার পাঠিয়েছি। পাঠাচ্ছি, পাঠাব। সুবিধে হলেই মা-বাবাকে নিয়ে যাব—এগুলোই তো দেওয়া! ও দেওয়ার সংজ্ঞা জানে না। এখনও। পরে নিজের সন্তানের বেলায় যখন আবারও এই একই পরিস্থিতি জীবনচক্রে ঘুরে আসবে, তখন হয়তো খানিকটা বুঝবে, তবে মার্কিনদেশে-মানুষ-হওয়া সন্তানের মা-বাবা এ সব জানে। অনেক আগেই সাবধান হয়, সন্তানকে অতটা দেয়ও না। সব কেনা-কৌটোর মাপে মাপ। কাজেই ও হয়তো দেওয়ার সংজ্ঞা কোনওদিনই বুঝতে পারবে না। তাছাড়া এ নিয়ে ছেলেকে কোনও দোষারোপও করছেন না তিনি। এই জিনিস অনিবার্য। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ঘটে যাচ্ছে। এই দুঃখ, এই বিরহ, এই যাতনা। এই বিচ্ছেদ। এর কোনও সমাধান নেই। সংসার-জীবনের এই পূর্ব-শর্ত। তিনি করেছিলেন, তাঁর ছেলে করবে, তার ছেলে করবে, তার ছেলে...তার ছেলে...।

ঊর্মি তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। তিনি কি উত্তর দ্যান সে জানতে কাতর। তার মনের মধ্যে ছোট্ট একটু কমপ্লেক্স কাজ করছে—মা-বাবা ভাবছেন না তো বুল্টুর এই সিদ্ধান্তের মধ্যে তার হাত আছে। সে-ই এভাবে সন্তানকে মা-বাবা থেকে পৃথক করে দিচ্ছে! এ কথা যদি ভাবেন, ভুল ভাববেন না আবার একটু ভুল ভাবাও হবে। সে আমেরিকা নামে স্বর্গে যেতে ভীষণ আগ্রহী ছিল। এখন বছর দুই থেকে এসেও তার সে তৃষা মেটেনি।

বুল্টুকে সিদ্ধান্ত নিতে সে সাহায্য করেছে। কিন্তু উদ্যোগটা তার নয়। সে তাই শ্বশুরের দিকে কাতর চোখে তাকিয়ে আছে।

তাপসকান্তি হেসে বললেন—অফ কোর্স। যাব বই কী!

মুহূর্তে মেঘ কেটে গিয়ে রোদ ঝলমল করে উঠল।

ঠাকুমা বললেন—যাবি যদি তো এই বেলা বেরিয়ে পড়। দুগ্গা শ্রীহরি!

মা আস্তে করে বললেন—এসো। এসো বাবা।

শর্মিলা বললেন—ঊর্মি তোরা বড্ড দেরি করছিস। রাস্তায় কোথায় জ্যাম কোথায় গণ্ডগোল কেউ বলতে পারে? সময় হাতে রাখা ভাল।

একটা স্যুটকেস বাঁ হাতে আরেকটা ডান হাতে তুলে ধরে বুল্টু মার দিকে চোখ ফেরাল—মা।

শর্মিলা একটু এগিয়ে দাঁড়ালেন। খুব শান্ত গলায় বললেন—আয় বুল্টু, আয় বাবা।

—মা, তুমি রাগ করে নেই তো?

শর্মিলা অকম্প্র গলায় বললেন—না।

এই প্রশ্ন করার কী মানে? মা তুমি রাগ করে নেই তো? কোনও মা বলতে পারে ছেলের বিদায় মুহূর্তে যে সে রাগ করে আছে? তুই জানিস না বুল্টু? আমাকে দিয়ে কবুল করিয়ে নিলেই কি আমার সব সত্যিকারের অনুভূতিগুলো বরবাদ হয়ে যাবে? প্রশ্ন করলে একশো বার বলব—না। তাতে কী প্রমাণ হল? তা ছাড়া রাগ? রাগ কতটুকু? আর কিছু নেই? দুঃখ নেই! যে দুঃখের প্রকৃতি এত জটিল যে হাজার বিশ্লেষণেও তার সবটা ধরা পড়ে না! আমি কি রাগ করে এয়ারপোর্টে যেতে চাইছি না! আমার দুঃখ নেই? তীব্র বিরহবোধ নেই? নেই অসীম শূন্যতা? যদি শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলাতে না পারি? পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি লম্বা, উত্তর-পঞ্চাশ এক শান্ত সুস্থ সপ্রতিভ চেহারার মহিলা সর্বসমক্ষে কাঁদতে কাঁদতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলছেন—এ দৃশ্য কি খুব সুন্দর হবে? না এ দৃশ্য পেছনে ফেলে তুই শান্তিতে যেতে পারবি।

ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে বুল্টু।

—মা! উর্মি শাড়ি খসখস করতে করতে মৃদু ফরাসি সৌরভ ছড়িয়ে শর্মিলাকে জড়িয়ে ধরল।

এই মেয়েটিকে মায়ের অধিক স্নেহ দিয়েছেন শর্মিলা। বরাবর মেয়ের ঝোঁক ছিল। সুন্দর সুন্দর ফ্রক পরাবেন, নির্বাধ বিমুক্ত মানুষ হিসেবে বড় করবেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার আগ্রহও ছিল খুব। আর তাপসকান্তির তো কথাই নেই। ভীষণ শখ ছিল একটা মেয়ের। কিন্তু হয়নি। উর্মিকে যখন দেখলেন, হাইস্কুলে পড়া মেয়ের মতো দেখতে অথচ এম.এ. শেষ করে লাইব্রেরিয়ানশিপের ডিপ্লোমা কোর্স করছে। শর্মিলার মনে হয়েছিল অবিকল তাঁর স্বপ্নে দেখা মেয়েটা। কেন এরকম মনে হয়েছিল তিনি আজও জানেন না। কারণ তাঁর সঙ্গে উর্মির চেহারার কোনও মিল নেই। তিনি যদি একটা সারস কি পেলিকান হন তো উর্মি একটা সেপাই বুলবুলি। কিংবা একটা চন্দনা।

আসলে শর্মিলার কতকগুলো বহুদিনলালিত ধারণা এবং নিজস্ব সংস্কার আছে। নিজে ফর্সা হলেও তাঁর চিরকাল কালোর দিকে ঝোঁক। অল্পবয়সে যখন-তখন শুনতেন সর্বদোষ হরে গোরা। অমনি শর্মিলা বেঁঝে উঠতেন—কী কী দোষ আমার? শুনি?

ঠাকুমা বলতেন—এই, ধর, যেমন তুই খেঁদি।

ঠাকুর্দা বলতেন—যেমন ধর তুই তাল-ঢ্যাঙা।

বাবা বলতেন—যেমন ধর তোর গায়ে ষণ্ডামার্ক জোর।

সবগুলোই সত্যি। শর্মিলাকে সবাই ক্ষ্যাপাত। আদর করে।

তারপর বিয়ের বয়স হলে বিজ্ঞাপনের খসড়া করা হল—পাত্রী প্রকৃত গৌরবর্ণা।

পাত্রপক্ষ থেকে সে-সব বিজ্ঞাপনের উত্তর আসত। এক পার্টি লিখেছিল—প্রকৃত গৌরবর্ণা সবাই লিখিয়া থাকে। মহাশয়, আপনার কন্যা প্রকৃতই গৌরবর্ণা কি?

বাড়িতে সবাই হেসে আকুল। একটা পারিবারিক ঠাট্টাই দাঁড়িয়ে গেল বাড়িতে।—প্রকৃতই গৌরবর্ণা কি? প্রকৃতই প্রকৃত প্রকৃত গৌরবর্ণা কি? দাদা

বলল—অত কষ্ট করবার দরকার কী? বরঞ্চ প্রকৃত টু দা পাওয়ার ইনফিনিটি করে দেওয়া হোক।

শর্মিলা কিন্তু এ সবে যোগ দিতে পারতেন না। তাঁর মনে হত তিনি ফর্সা বলে দুর্ভাবনার ভারটা ছিল না, তাই সকলে ঠাট্টা-ইয়ার্কিতে মাততে পারছে। কিন্তু যদি কালো হতেন? সারা বাংলার সমস্ত পাত্র ও পাত্রপক্ষ যদি গৌরবর্ণা খোঁজে তাহলে কালো মেয়েরা যাবে কোথায়? বেশ মজা তো। দেশের মাটির রং কালো, পাত্রগুলো কালো ভুষকুমড়ো, কিন্তু বউ খোঁজবার বেলায় সব্বাই খুঁজবে ফর্সা। কালো মুখে, শামলা মুখে ভারী শ্রী দেখতেন তিনি। ইচ্ছে ছিল কুটকুটে কালো, তথাকথিত কুচ্ছিৎ একটা মেয়ে হবে। তারপর তাকে কী করে মানুষ করে তুলতে হয়, স্বাধীনচেতা, স্বাবলম্বী, বিদ্রোহিণী করে তুলতে হয়, কতজন তাকে চায় বা না চায় তিনি দেখাবেন, দেখবেন। তা হল তাঁরই মতো ফ্যাকফেকে শাদা একটা হাবলা ছেলে।

মেয়ে দেখাদেখি করে ছেলের বিয়ে দেবারও তাঁর বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না। নিজেও দেখে-শুনে করেছিলেন, ছেলের বেলাতেও তা-ইই চাইতেন। কিন্তু ওই যে। একটা হাবলা ছেলে। তোমরা যেমন পছন্দ করে দেবে আমি তাই করব। উর্মিকে দেখলেন বউদির বাপের বাড়ির একটা বিয়েতে গিয়ে। মাঝারি দৈর্ঘ্য, বেশ স্কিপিং করা লকলকে চেহারা। ধারালো অথচ মায়াবী মুখ। আর কুটকুটে না হলেও কালো। আবার সাহস দেখো মেয়ের। বিয়ে-বাড়িতে পড়েছে একটা বকের পাখার মতো শাদা সিল্ক। হাত-গলা খালি। একটা মোটা কেশীতে ভারী অবহেলায় একটা জুঁইয়ের মালা জড়ানো।

বউদিকে বললেন—কে গো মেয়েটি!

বউদি বলল—ও তো উর্মি। আমার দাদার মেয়ের বন্ধু। পাগলি একটা। বাকি পরিচয় জেনে নিয়ে বললেন—বুল্টুর সঙ্গে হয় না!

—বুল্টুর সঙ্গে? বুল্টুর সঙ্গে? বলো কী। সে তো ওর চোদ্দ পুরুষের সৌভাগ্য।

শর্মিলা গম্ভীর হয়ে বললেন—সৌভাগ্য হবে কি না, হলেও কার হবে এক্ষুনি আমার জানা নেই। একটা ফটো দিও তো জোগাড় করে!

ছেলেকে ফটো পাঠিয়ে লিখলেন—'মেয়েটি কিন্তু কালো। তুই ঠিক কর একে বিয়ে করবি কি না।'

ফেরত-ডাকেই বুল্টুর সম্মতি এল। ছেলেকেও তো তিনিই মানুষ করেছিলেন।

তা সেই উর্মি যখন ঘরে এল, তিনি তাকে মেয়ের অধিক আদর ভালবাসা দিতে পেরেছিলেন। মেয়ের অধিক এই জন্যে যে, মেয়ের বেলায় শাসনটাও থাকে, বউয়ের বেলায় সেটা ছিল না।

উর্মিকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে ঘুরে তার পছন্দসই আসবাব, শাড়ি, গহনা সব কিনলেন। এই কেনাকাটার অবসরেই দুজনে হেভি ভাব জমে গেল। জিনিস পছন্দ করতে ঘেমে নেয়ে যাচ্ছে দুজনে।

এই লালটা নে উর্মি, লাল সিল্ক, চমৎকার রংটা, ষাঁড় বলি দিলে ঠিক এই রঙের রক্ত বেরোবে বুঝলি?

শাশুড়ির কথা শুনে উর্মি প্রথমটা হেসে খুন। তারপরে চোখ কপালে তুলে বলে—আমি লাল? তুমি পাগল হয়েছ?

—কেন? পাগল কেন? আমি একটুও পাগল নই, তবে তুই একটা আস্ত ছাগলি। উর্মি খিলখিলিয়ে বলে—কেন? ছাগলি কেন?

গলা নামিয়ে শর্মিলা বলেন—কালো-কালো কমপ্লেক্স থাকাটা ছাগলের লক্ষণ।

উর্মিও গলা চড়িয়ে বলে—কমপ্লেক্স না মা! স্রেফ স্বার্থ! টিকেয় আগুন দেখাবে যে?

—লজ্জা করে না এই পরের রুচির বাজে কথাগুলো বলতে?—শর্মিলা ঝাঁঝিয়ে ওঠেন।

—রবীন্দ্রনাথের ক্যামেলিয়া পড়েছিস? সাঁওতাল মেয়েদের লাল হলুদ শাড়ি পরে মাথায় ঝুড়ি, খোঁপায় শিমুলফুল, দিগন্ত দিয়ে চলে যেতে দেখেছিস. তা-ও তো তুই অত কালো না।

উর্মি খালি হাসে, কিছু বলে না। ইতিমধ্যে দোকানদার বলে—আপনার মেয়ে কিন্তু ঠিকই বলেছে মাসিমা। লালটা ঠিক...

—কে মেয়ে? এই মেয়েটা আমার মেয়ে তো নয়।

—মেয়ে নয়?—দোকানি অবাক—তবে?

—বউমা। তা-ও এখনও বিয়েটা হয়নি।

অবাক দোকানির কাউন্টার থেকে গরদ রঙের ওপর ছোট ছোট লাল ছাপ শাড়ি কিনে দুজনে বেরিয়ে আসেন।

—লোকটাকে তুমি বিলক্ষণ ভড়কে দিয়েছ—উর্মি বলে।

—বলছিস!—শর্মিলা হাসেন।

কোথায় খেতে ঢোকা হবে সে নিয়েও দুজনে তর্কাতর্কি হয়। শর্মিলা বলেন।

—মুল্যা রুজ।

উর্মি বলে—এক কাপ চায়ের দাম জানো? পয়সা খুব শস্তা, না? সে টানতে টানতে শর্মিলাকে অন্য কোনও কম পশ্ খাবার জায়গায় নিয়ে গিয়ে বসায়।

রুমাল বার করে দুজনে ঘাম মুছতে মুছতে পরস্পরের দিকে তাকায়। উর্মি বলে—আমাকে অত খাতির করতে হবে না।

—খাতির কোথায় দেখলি?

—ওই যে পশ্ রেস্তোরাঁয় টেস্তোরাঁয় নিয়ে যেতে চাইছ।

শর্মিলা গম্ভীর মুখে বলেন—তা, এখন থেকেই বেড়াল-চাপা দেব বলছিস?

—কী চাপা? কী বললে ওটা?

—বেড়াল-চাপা। আগেকার দিনে কোনও এক শাশুড়ি বউকে ঝুড়ি চাপা দিয়ে তার ওপরে বসে ছিল। ছেলে এসে জিজ্ঞেস করল—ও কী মা? ঝুড়ির ওপর বসে কেন? মা বলল—একটা বেড়াল বড্ড বিরক্ত করছিল তাই ঝুড়ি চাপা দিয়ে রেখেছি বাবা!

হাসতে হাসতে উর্মির সমস্ত মুখে লাল আভা ছড়িয়ে যাচ্ছে। শর্মিলা সেদিকে

চেয়ে মনে মনে অবাক হয়ে ভাবেন কেন লোকে বলে কালোরা বেগনি হয়ে যায়? পরিষ্কার লাল রক্ত ছুটে এসেছে মেয়েটার মুখে। লালই তো।

তিনি বলেন—ওরে উর্মি তুই যে কিছুতেই হবু শাশুড়িকে খুশি করতে লালটা কিনলি না এতে একটু স্বস্তি পেলুম।

উর্মি চোখ বড়-বড় করে বলে—আমায় পরীক্ষা করছিলে? ক্যামেলিয়া-টিয়া সব স্রেফ ভড়কি?

—না, ভড়কি নয়। পরীক্ষাও করিনি। কথাটা হল তুই লাল পরতে ভালবাসিস না। সেটাতে স্টিক করে রইলি। আমিও তোকে তোর আসল রঙে দেখতে পেলুম। এখন শাশুড়ির কাছে নুয়ে পড়বি আমি কী বাধ্য মেয়ে দেখো বোঝাতে। আর ভবিষ্যতে পার্সন্যালিটি ক্ল্যাশ হলে পেছন থেকে ছুরি মারবি, সেটা তুই করবি না বোধহয়।

উর্মি বলল—মা আমার ভয় করছে। পেছন থেকে ছুরি-টুরি কী সব বলছ?

শর্মিলা বলেন—না রে! তুই অত দেখিসনি। জানিস না—শাশুড়ি বউ রিলেশনশিপে একটা প্রাথমিক ভড়কি দেওয়ার ব্যাপার থাকে, বিশেষত বউয়ের দিক থেকে। খোসামুদেপনা। পরে সেটাই বদলে যায়। তুই যে নিজের পছন্দটা নির্ভীকভাবে বলতে পারলি, রাখতে পারলি এটা সুস্থতার লক্ষণ। নইলে, আমি সত্যিই মনে করি কালো রঙে লাল, মানে ওই লালটা দুর্দান্ত দেখায়।

উর্মি বলে—আমার মা নেই। কোন ছোটতে মারা গেছে। তাই তোমাকে অসংকোচে মা ডেকেছি। মায়ের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হয় তা-ও জানি না। শাশুড়ির সঙ্গে—তো নয়ই। বাড়িতে তিনটে গুণ্ডা গুণ্ডা দাদা, বাবাটাও কম গুণ্ডা নয়। আমি কিন্তু একটু গেছো-টাইপ। যা ইচ্ছে তাই করি। তবে ঠগ, জোচ্চোর, খোসামুদে এ সব নই এখনও। যা ভাবি সোজাসুজি বলি, যা করব মনে করব তা সোজাসুজি করি।

যে মেয়ে এ কথা বলেছিল, সে কি আজ বদলে গেছে? উর্মিকে জড়িয়ে ধরে শর্মিলা ভাবলেন। এই মা বলে এসে আদর-কাড়ানো এ কি ভড়কি? উর্মিকে তো তিনি খুব বেশিদিন কাছে পাননি। বিয়ের পর বছর দেড়েক লেগেছিল ওর ভিসা পেতে। বুল্টু চলে গেল, উর্মি রইল। ওর বাবা বড় ছেলের বিয়েটাও উর্মির সঙ্গে সঙ্গেই দিয়েছিলেন। তাই বাবা-দাদাদের দেখাশোনার জন্য খুব একটা বেশিদিন গিয়ে থাকতে হত না ওকে। সেই সময়টা শর্মিলার বড় আনন্দে কেটেছে। কত দিন, যেন যুগ-যুগান্ত পার হয়ে একজন বন্ধু পেলেন। স্ব-লিঙ্গের সখ্য এবং সঙ্গের জন্য যেমন ছেলেদের, তেমন মেয়েদেরও একটা গভীর প্রয়োজন থাকে। তৃষ্ণা থাকে। পুরুষরা ছুটে যায় নির্ভেজাল পুং আড্ডায়, সে তাসের আড্ডাই হোক, মদের ঠেকই হোক। বা নেহাত চায়ের কাপ সামনে নিয়ে তুমুল টেবিলই হোক। মেয়েরাও ঠিক তেমনি তৃষিত থাকে নিখাদ নারীসঙ্গের জন্য। শর্মিলাদের মতো নারীদের একটা মুশকিল হল তাঁরা খুব একটা মেয়েলি নারীদের সঙ্গে তৃপ্তি পান না। শর্মিলার অফিসে কি মেয়ে সহকর্মী নেই? আছে। কম হলেও আছে। তাদেরও মধ্যে খুব অল্প দু-একজনের সঙ্গে শর্মিলার

একটু জমে। পুরনো বন্ধুদের বেশির ভাগই গৃহিণী-ঘরণী। তাদের সঙ্গে ছ মাসে ন মাসে, মাঝে মাঝে আড্ডা। তখন শর্মিলা নিছক মেয়েলি আড্ডার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করে নেন। কিন্তু নিজের বাড়িতে একটি আলোকিত মেয়ের সঙ্গ তাঁকে ওই দেড় বছর নতুন জীবন দিয়েছিল। যখন চলে গেল মেনে নিয়েছিলেন এই জন্যে যে বুল্টু তার কন্ট্র্যাক্ট ফুরিয়ে গেলেই ফিরে আসবে কথা দিয়েছিল। কথা রাখল না।

শর্মিলা জানেন না কার জন্য তাঁর বেশি কষ্ট হবে। বুল্টু না উর্মি। বুল্টুকে ছেড়েছেন কোন কালে। তাপসকান্তি নিজে বরাবর হোস্টেলে মানুষ। চেয়েছিলেন বুল্টুও তাই হোক। এক ছেলে, এক সন্তান বলে কোনও হেল-দোল নেই। তাঁর মত হোস্টেলে বড় হলে ছেলে-মেয়েরা স্বাবলম্বী হয়, সাহসী হয়, মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা বেশি গড়ে ওঠে। শর্মিলা অবশ্য প্রাণপণে বাধা দিয়েছেন। তাঁর মত সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি মনে করেন বাবা-মার সঙ্গ না পাওয়া মানে একটা মস্ত বড় ক্ষতি। বাবা-মা'র দিক থেকে তো বটেই, ছেলে-মেয়ের দিক থেকেও বটে। স্বাধীনতা আর স্বাবলম্বনই সব নয়। আরও কিছু আছে। স্নেহ-মমতা। আদর শাসন এই সবের প্রয়োজন জীবনে আরও বেশি। হোস্টেলে হয়তো যান্ত্রিক মানুষ তৈরি হবে, খুব উপযোগী। কোনও কিছুতেই টাল খায় না এমন ব্যক্তিত্ব। কিন্তু মা-বাবার বা পরিবারের আবহে তৈরি ছেলেমেয়ে হবে আরও মানবিক, জীবনের আসল আনন্দটাই হল সম্পর্ক। বাবা-কাকা-মাসি-পিসি-ভাই-বোন-আত্মীয়-পরিজন-প্রতিবেশী। সেই সম্পর্ক স্থাপনের কৃৎ কৌশল, আপনজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার আনন্দ এ সব না পেলে আর বাঁচা কেন? বিশেষত মা-বাবা। বুল্টু সতেরো বছর বয়েসের পর থেকে হস্টেলে হস্টেলে থাকতে বাধ্য হয়েছে। অর্থাৎ ঠিক সাবালক হবার সময়টায়। তারপর তো বিদেশেই চলে গেল। খানিকটা অভ্যেস হয়ে গেছে। কিন্তু মেয়ে, যদি ঠিকঠাক হয়, তা হলে বাড়িতে তার উপস্থিতি একটা আলাদা জিনিস। রস। উর্মি তাঁদের উষরজীবনে রসসঞ্চার করেছিল। তার হাসি, তার উচ্ছল কথাবার্তা, এটা খাব না ওটা খাব, তার জিন্স্-টপ, সালোয়ার কামিজ, নানা রঙের শাড়ি নানা রঙের ফুলকারির কাজ যেন জীবনে। আলাদা করে তাকে কিছু করতে হয়নি, শুধু উপস্থিতি দিয়েই, উপস্থিতির আনুষঙ্গিক দিয়েই জীবনটা ভরে তুলেছিল। প্রথম যাবার সময়ে পই-পই করে সাবধান করে দিয়েছিলেন—উর্মি, আর যাই করিস না, ইন্ডিয়ান বা মার্কিন বকচ্ছপ হয়ে ফিরিস না বাপু। মাথাটা ঠিক জায়গায় রাখিস।

—কেন? তোমার কি মনে হয় আমি আ-দেখলা? উর্মি তো কোনও কথা পাতে পড়তে দেবে না। ঠিক কিছু না কিছু বলবেই।

—মনে কিছু হয় না। কিন্তু আমি বেশ কিছু লোককে এখান থেকে কঠোর প্রতিজ্ঞা করে যেতে দেখেছি। কিছুতেই নাকি তারা ভুলবে না। কিন্তু ভুলে যায় সবাই।

উর্মি বলেছিল—তা যদি বলো মা, ভোলবার মতোই তো দেশটা। ছবি-টবি যা দেখি মনে হয় পৃথিবীতে যদি স্বর্গ কোথাও থাকে তবে তাহা এইখানে, এইখানে, এইখানে। তবে—উর্মি তাঁর গলা জড়িয়ে বলেছিল—এখানে যে একজন স্বর্গাদপি

গরীয়সী রইল আমার জন্যে। শর্মিলার মুখে ঘাড়ে খোলাচুলের উড়ন গুছির সুড়সুড়ি দিয়ে আপাদমস্তক শিউরে দিয়ে সে বলে উঠেছিল—

আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে—এই বাংলায়।

—না বাবা। শঙ্খচিল শালিখের বেশে এসো না। এলে মানুষী হয়েই এসো। শর্মিলা ঝংকার দিয়ে উঠেছিলেন।

ভুলে গেল। সেদিন গিয়েছিল চুড়িদার-কামিজ পরা এক মা-অন্ত প্রাণ তরুণী, গিয়েছিল লাফাতে লাফাতে। চঞ্চল চোখে বার বার পেছনে তাকাতে তাকাতে।

আজ চলে গেল শাড়ি-খসখস, সৌরভ-ভর-ভর যুবতী। কেমন শান্ত, পরিমিত, মিতবাক। কত সংকোচ, জড়তা। গেল সকাল, এল সন্ধ্যা। এত রহস্য, এত না বলা কথার গর্ভবতী নীরবতা ভাল লাগেনি শর্মিলার। ভাল লাগে না। অথচ প্রতি মাসে দুটো করে চিঠি লিখত। তাতে তো এই পরিবর্তন টের পাননি তিনি। এ সব পরিবর্তন কি একদিনে হঠাৎ হয়? হয় ধীরে ধীরে। এই মন্থরগতি বদলে-যাওয়া না চিঠিতে, না টেলিফোনে কিছুতেই টের পাননি তিনি।

যাকগে ও সব। চিন্তা করে কী হবে? শর্মিলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। কিছুই করার নেই। গান-বাজনা কেন কে জানে বিষ লাগছে। তিনি বইয়ের র‍্যাক থেকে না দেখে-শুনেই যে কোনও একটা বই টেনে নিলেন। কিছুটা পড়ে বন্ধ করে দিলেন। মাথায় কিছু ঢুকছে না, শুধুই পাতা উল্টে যাচ্ছিলেন। আশ্চর্য! এ রকম অস্থির লাগলে চলবে কী করে? তাঁর সুখ শান্তি যে এত ঠুনকো তা তো আগে জানা ছিল না। ঘরের দেয়ালে বুল্টুর নানা বয়সের ছবি এক ফ্রেমের মধ্যে বাঁধানো। উলঙ্গ আঙুল চোষা শৈশব থেকে, স্কুল পোশাকের মধ্যে ভরা বাল্য, ক্রিকেট-কৈশোর পার হয়ে প্রত্যয়ী যৌবন পর্যন্ত। ছবিগুলো দেখতে দেখতে শর্মিলা বুঝতে পারলেন ছেলের সঙ্গে সঙ্গে মায়েরাও কিন্তু বেড়ে ওঠে। যার ফলে, মাতৃ-নির্ভর অশেষ আনন্দদায়ী শিশুটি যখন নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নিতে চাওয়া, নিতে পারা যুবক হয়ে যায় মায়েরা সেটা স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারে, অবাক লাগে না। অন্য আত্মীয়রা, যাঁরা অনেকদিন দেখেননি তাকে, হয়তো এসে আকাশ থেকে পড়েন। আরে এত বড় হয়ে গেছিস! শর্মিলা বুঝতে পারলেন ছেলের কৈশোরের পর যৌবন পর্যন্ত সময়টা তাঁর কাছে একটা শূন্যস্থান। তিনি পূর্ণ করতে পারেননি। সংযোগ ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এই সময়টা তিনি ছেলের সঙ্গে বেড়ে উঠতে পারেননি। তাঁর ভেতরে কিশোর বুল্টু, র‍্যাগিংয়ের ভয়ে কাতর অথচ প্রচণ্ড আই আই টি-উৎসুক বুল্টু চিরস্থির হয়ে আছে। তার চেয়ে বড় বুল্টুকে তিনি তেমন চেনেন না, ভালও বাসেন না। বুল্টু বলতেই সদ্য ফুলফ্যান্ট, সদ্য গোঁফ-দাড়ি, ঈষৎ তোতলা ওই কিশোর। তাকেই তিনি এখনও বুল্টু বলে ডাকেন, চিঠি লেখেন, বকাঝকা করেন। মান-অভিমান রাগ-অনুরাগ সব ওই ছেলেটার সঙ্গে। এটা তিনি এতদিন বুঝতে পারেননি। আজ এক তীব্র তারপর গভীর নৈঃশব্দ্যের, বিষাদের সামনাসামনি হয়ে এই সত্য অনুভূত হল। অথচ তিনি বিশ্লেষণের চেষ্টা করেননি। জীবনের গভীরতম সত্যগুলো সম্ভবত এইভাবেই অনুভূত হয়।

শর্মিলা গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তাপসকান্তির আসার প্রতীক্ষা করতে করতে, অবসন্ন হয়ে কেমন একটা শূন্যভার ঘুম। বেল বাজছে মনে হল অনেকক্ষণ। তিনি ধড়ফড় করে উঠে বসলেন। নীচে গিয়ে দরজা খুলে দিয়ে তাপসকান্তির আকার এবং তার পেছনে রাস্তার চেহারা দেখে বুঝতে পারলেন রাত নিশুতি।

ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে করতে তাপসকান্তি বললেন—ঘুমিয়ে পড়েছিলে? আশ্চর্য! তার গলায় চাপা বিরক্তি এবং বিস্ময়।

রাত্তির আড়াইটে বাজছে। ঘুমিয়ে পড়ে তিনি কী এমন অপরাধ করেছেন শর্মিলা বুঝতে পারলেন না। সিঁড়ি উঠতে উঠতে জিজ্ঞেস করলেন—এত দেরি?

—প্লেন তো কারুর ফরমাশ মতো চলবে না! ফ্লাইট ডিলেইড হওয়া তো রোজকার ব্যাপার! সবাই জানে!

উত্তরের মধ্যে বিরক্তি আর গোপন নেই।

শর্মিলা এতক্ষণ ঘুমোচ্ছিলেন নিজেদের ঘরে। এখন রান্নাঘরে গিয়ে এক গ্লাস দুধ গরম করে তাপসকান্তিকে পৌঁছে দিয়ে চলে গেলেন উল্টো দিকের ঘরে। এটা বুল্টু-উর্মির ঘর। উর্মি আর তাঁর পছন্দ করা আসবাব দিয়ে সাজানো। উর্মি যখন এখানে বুল্টু-বিহীন ছিল শর্মিলা প্রায়ই এ ঘরে তার সঙ্গে শুতেন। এমনিতে উর্মি একলা শুতে অভ্যস্ত। ভয়-টয়ের ব্যাপার নয়। কিন্তু অনেক সময়ে দুজনে নানারকম গল্প করতে করতে কত রাত হয়ে গেছে টের পেতেন না। অন্ধকার ঘরে দু-চারটে হাই তোলার পর শর্মিলা যদি বলতেন—উঃ কত রাত করিয়ে দিলি, কাল অফিস নেই? এ বার যাই!

উর্মি হাত বাড়িয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বলত—রাত হয়ে গেছে আজ এখানেই শোও না বাবা! রোজ রোজ বরের কাছে নাই গেলে।

শর্মিলার উদ্যত চড়ের নাগালের বাইরে চলে যেত সে গড়িয়ে গড়িয়ে। বলত—খালি নাক ডাকে তো বাবা, ওই বাঘের গর্জনের মধ্যে ঘুমোও কী করে?

অন্ধকারে দুজনের হাসির শব্দ শোনা যেত। শর্মিলা বলতেন—তুই কি আড়ি পেতে বাঘের গর্জন শুনিস?

—আড়ি পাততে হবে কেন? উর্মি উঠে ভেজানো দরজাটা খুলে দিত, অমনি তাপসকান্তির নাসিকাগর্জন শোনা যেত!—শুনলে? উর্মি পাশে শুয়ে পড়ে আঁকড়ে থাকত শর্মিলাকে।

এখন শর্মিলা দৃঢ় পায়ে সেই ঘরের দিকেই গেলেন। যদিও ও ঘরে যাওয়া মানেই স্মৃতির কাছে ফিরে যাওয়া এবং সেটাতে তাঁর মোটেই সায় নেই। কিন্তু যেতে হচ্ছে।

তাপসকান্তির অভ্যেস শোবার আগে এক গ্লাস দুধ খাওয়া। কিন্তু আজ অনেক সকাল সকাল তথাকথিত রাতের খাওয়া সারা হয়েছে। সাড়ে সাতটা। এয়ারপোর্টে যাবেন বলে। এখন, বেশ খিদে টের পাচ্ছেন। কিন্তু একটু ছোটখাটো খাবারের কথা যে বলবেন, শর্মিলা তার অপেক্ষাও করল না। দুধটা একটু একটু করে খেতে খেতে তিনি দেখলেন বিছানায় শর্মিলার শোয়ার দাগ। চাদর একটু কুঁচকে আছে। বালিশটায় মাথা রাখার অল্প গর্ত। তাহলে শর্মিলা এখানেই শুয়েছিল। এখন তিনি আসাতে ও

ঘরে উঠে গেল। ভাল ভাল। এমনটাই আশা করা উচিত ছিল। কোপনস্বভাব মহিলারা এ ভাবেই কাজ-কর্ম করে থাকেন। এয়ারপোর্টে তো গেলই না। একটা জিজ্ঞাসাবাদ পর্যন্ত না। কেমন গেল, দেরির কারণ যান্ত্রিক গোলযোগ কি না, শেষটায় কী বলল। ব্যগ্র মাতৃসুলভ কৌতূহলের কোনও লক্ষণই নেই। মাতৃত্বের চেয়ে আমিত্ব বড়। আমার কথা শুনল না, আমার কথা ভাবল না, আমি...আমার...আমি...আমার...।

শার্ট প্যান্ট হ্যাঙারে টাঙিয়ে, হাত পা ধুয়ে এসে পায়জামা পাঞ্জাবি গলিয়ে নিয়ে তাপসকান্তি শুয়ে পড়লেন।

চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলে অন্ধকার বাড়িতে ঢুকলেন তাপসকান্তি। আশ্চর্য! আজও তাঁর আগে বাড়ি ফেরেনি শর্মিলা। তাঁদের বাড়িতে সারা দিনের লোকজাতীয় কিছু নেই। পাওয়া যায় না বিশ্বাসী লোক। বুল্টু যখন ছোট ছিল, তখন ছিল। বুল্টু হস্টেলে চলে যাবার পর থেকে আর রাখেননি। রাখবার খুব একটা দরকারও হয়নি। প্রধান রাস্তার থেকে দূরে বাড়িটা। কাছেই সি আই টি মার্কেট। ধুলো ময়লা অপেক্ষাকৃত কম। অগোছালো করবার মানুষও নেই। সকালের দিকে একটি লোক এসে খুঁটিয়ে ঘরদোর পরিষ্কার করে বাসন-টাসন মেজে দিয়ে যায়। তিনি বহুদিন থেকে হস্টেলে মানুষ। নিজের জামাকাপড় নিজে কাচবার, গোছাবার অভ্যেস। শর্মিলা একটু আয়েসি হলেও নিজের ব্যক্তিগত কাজগুলো নিজেই করে নিতে পারে। রান্না-টান্নার হাঙ্গামা কম। তাঁরা দুজনেই অফিস-ক্যান্টিনে দুপুরের খাওয়া সারেন। রাত্রের রান্নাতেও তিনি ইচ্ছে করলেই শর্মিলাকে সাহায্য করতে পারেন। দরকার হয় না বলে করেন না। আর বাকি রইল, ব্রেকফাস্ট আর বিকেলের চা। এই দুটোই আসল সমস্যা। ব্রেকফাস্টটা তবু শর্মিলা অভ্যস্ত হাতে চটপট করে নেয়। সে সময়ে কাজের লোকটি থাকে, জটিল কিছু করতে হলে তার সাহায্যও নেওয়া চলে। কিন্তু বিকেলবেলায় এই অফিস থেকে ফিরে চা করাটাতে দুজনেরই অদ্ভুত আলসেমি। অথচ বাড়ির চা একটু না খেলেও নয়।

কদিনই শর্মিলা সন্ধে পার করে বাড়ি ঢুকছে। তাপসকান্তি বাড়ি ফেরার পর তাঁর নিত্যকৃত্য করলেন যেমন রোজ করেন, তখনও শর্মিলার দেখা নেই। আজ এক কাপ মাত্র চা করলেন রাগে। নিজে হাতে চা করে খাওয়ায় তেমন মজা নেই। তা ছাড়া অভ্যেসটা চলে গেছে বলে হয়ও না ঠিক। একটু তেতো হয়ে গেছে, অথচ চিনি নেবার উপায় নেই। ব্লাড শুগার। খাবার-টেবিলে খবরের কাগজটা খুলে মুখ বিকৃত করে চাটা পান করতে থাকলেন তিনি। হয়ে গেলে, যত ধীরগতিতেই খাওয়া যাক, এক সময়ে তো শেষ হবেই, রাগে কাপ-প্লেট ডিনার টেবিলের ওপরেই ফেলে রাখলেন। কাগজটা এলোমেলো হয়ে আছে—থাক।

টি ভি-টা চালিয়ে দিলেন। কেবলে একটা দুর্ধর্ষ মারপিটের ছবি আসছে। কালো মোটা হামদামুখোটা জেতে না ফর্সা বোকাটা জেতে দেখবার জন্যে একটা আলগা কৌতূহল নিয়ে বসে থাকলেন তিনি। ছবিটা প্রায় শেষ, হামদামুখোটাই জিতল দেখে তিনি বেশ অবাক, এমন সময়ে বেল বাজল।

শর্মিলা ঘরের দিকে চলে যাচ্ছেন। তাপসকান্তি রাগত গলায় বললেন—ব্যাপারখানা কী?

—কীসের ব্যাপার? দরজার নবটা ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে গেছেন শর্মিলা।

—ব্যাপারখানা কী? দ্বিতীয়বার একই প্রশ্ন করে এবার শর্মিলার মুখের দিকে তাকালেন তাপসকান্তি। চোখ থমথম করছে।

—এই বয়সে নিশ্চয়ই নতুন করে প্রেম করছি না—নব ঘুরিয়ে টয়লেটে ঢুকে গেলেন শর্মিলা।

বেরোলেন ঘণ্টাখানেক পরে। রান্নাঘরে একবার ঢুকেই বেরিয়ে এলেন, বললেন,—খিচুড়ি বসিয়ে দিচ্ছি।

—আমাকে জিজ্ঞেস করবার দরকার কী?

—জিজ্ঞেস করছি না। এটা স্টেটমেন্ট। জাস্ট বলা।

একটু পরেই প্রেশার কুকারের হুইসল এবং তার সঙ্গে খিচুড়ির গন্ধটা ছড়িয়ে পড়তে থাকল।

খিচুড়ি তাপসকান্তি ভালই বাসেন। কিন্তু সময়টা গরমকাল। রাত্রে হালকা কিন্তু একটু ভাল-মন্দর আশা থাকে। তা ছাড়াও তাঁর ব্লাড শুগার, রাত্রে ভাত চলে না। দিনের বেলাও অফিসে বেশিরভাগ দিনই রুটি নেন।

খিচুড়ির মধ্যে আলু, পটল, ঝিঙে, পেঁপে। দরাজ হাতে মাখন ছড়াচ্ছেন শর্মিলা। অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছেন তাপসকান্তি। বেশ লোভনীয় চেহারার ওমলেট পাতে তুলে দিলেন। বোতলের চাটনি ঢালতে যাচ্ছেন। তিনি হাত তুলে বললেন—থাক।

সঙ্গে সঙ্গে প্যাঁচ ঘুরিয়ে শিশির মুখ বন্ধ করে খেতে বসে গেলেন শর্মিলা। প্লেটে ঢালা খিচুড়িটার দিকে আঙুল দেখিয়ে তাপসকান্তি বললেন, এটা আমি খাব?

—সকালে তো রুটি খাও, রোজই তো রাতে রুটিই হচ্ছে। একদিন খেলে কিছু হবে না।

—শারীরিক অসুবিধেগুলোও তাহলে তোমার মর্জি মেনে চলবে?'

—টোস্ট করে দিচ্ছি—শর্মিলা উঠে দাঁড়ালেন।

—নাঃ, অনেক কষ্ট করেছ, বাড়ি পর্যন্ত ফিরেছ, আর কষ্ট করবার দরকার নেই।

—অনেকক্ষণ থেকে এই খোঁটাটা শুনতে হচ্ছে। তোমরা ইচ্ছে মতো রাত করে ফিরতে পারো, আমরা করলেই মহাভারত অশুদ্ধ?—রুক্ষ গলা শর্মিলার।

—আমরা তোমরাটা কে?

—কে নয় কারা। আমরা তোমরা মানে আমরা এবং তোমরা। বাস।

শর্মিলা চামচ দিয়ে ঘেঁটে ঘেঁটে খিচুড়ি ঠাণ্ডা করছেন। এক চামচ মুখে তুলে বললেন—আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে, খাচ্ছি।

কোনওক্রমে খাওয়া শেষ করে তাপসকান্তি উঠে পড়লেন। খাওয়ার মেজাজ নেই। শর্মিলা তাকালেন না। এক মনে খেয়ে যাচ্ছেন। কিছু এসে যায় না তাঁর আরেকজন না খেলে।

মুখ ধুয়ে তাপসকান্তি আবার টি ভি-টা চালিয়ে দিয়ে বসলেন। দেখছেন না কিছুই।

শুনছেনও না। দৃশ্য আর শব্দ খালি একটা আবরণ। এই আবরণের আড়ালে ভোজনান্তিক সিগারেটটি হাতে নিয়ে তিনি ভাবছেন। যা ভাবছেন তা কেউ ইচ্ছে করে, মৌজ করে ভাবে না, ঘটনার চাপে তা আপনা থেকে মনের মধ্যে ভাসিত হয়।

বিয়েটা একটু দেরিতেই করেছিলেন তিনি। ভয়ে। স্রেফ ভয়ে। ঠাকুমা এবং মা প্রতি মাসে একটা করে তাঁদের পরিচিত পুঁটুবালা গোছের পাত্রী জোগাড় করছিলেন। ঠাকুমাই উদ্যোগী। মায়ের ছিল নীরব সমর্থন। তাঁদের ধারণা এই পুঁটুবালার টানে তিনি দেশে ফিরে যাবেন। যদি কলকাতা বা অন্যত্র তিনি চাকরিও করেন, পুঁটুবালা থাকবে দেশে, তিনি সপ্তাহান্তে ব্যাগভর্তি করে শহুরে জিনিসপত্তর নিয়ে পুকুরের মাছ, দুধের সর, গাছের নারকোল খেতে তিন নারীর সংসারে যাবেন। এই ধরনের যাওয়া-আসা অনেকেই করত। ঠাকুমা তাদের দৃষ্টান্ত তুলে ধরতেন। তাপসকান্তির মনে একটা অপরাধবোধ কাজ করত। এই দুই মহিলাকে তিনি আর কত ঠকাবেন? কত আশাহত করবেন?

ঠাকুমা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন—ওরে আমরা কি বোকা বলে অতই বোকা? ভাবছিস তোর জন্যে মুখ্যু বউ আনব? না রে না, একটা পাশ, দুটো পাশ পজজন্ত মেয়ে হাতে রয়েছে, তবে হ্যাঁ গেরস্থ মেয়ে, বারমুখো নয়। শহরেও মানিয়ে নেবে, দেশেও।'

এমনতরো ম্যাজিশিয়ান মেয়ে কোথায় পেলেন ঠাকুমা কে জানে। কিন্তু তাপসকান্তি ঠাকুমার মৃত্যু না হওয়া অবধি বিয়ের কথা ভাবেননি। শর্মিল তাঁর সহকর্মিণী। পরিচয় ছিল আগেই। পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ছিল। কিন্তু বিয়ের প্রস্তাবটা তিনি করেছিলেন ঠাকুমা মারা যাবার পরই।

—আমি কিন্তু চাকরি ছাড়ব না— শর্মিলা বলেছিলেন।

—আমি কি একবারও সেটা দাবি করেছি?

কী কী শর্ত আছে আপনার সেগুলো জানা দরকার—বলতে বলতে শর্মিলা হাসছিলেন। কিন্তু তারপর গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন—আসলে আমারই কতকগুলো শর্ত আছে, আপনারও থাকাটাই স্বাভাবিক?

—আমার কোনও শর্ত-ফর্ত নেই—

—আছে ঠিকই। জানেন না। আমার শর্তগুলো বলছি—বলব?

—বলুন।

—প্রথমটা আগেই বলেছি। চাকরি ছাড়ছি না। আবার ইচ্ছে হলে ছাড়তেও পারি। দ্বিতীয়—আমার স্বাধীনতায় হাত দেওয়া চলবে না।

—স্বাধীনতার অর্থ?

—খারাপ কিছু না। বিয়ে মানেই একটা কী রকম হাতে পায়ে বেড়ি পড়ে না? হাতে দিলাম মাকু, ভ্যাঁ করো তো বাপু?—ওই ভ্যাঁ বললেই ভ্যাঁ ওই জাতীয় জিনিস থাকছে না।

—ব্যাপারটা মোটামুটি বুঝেছি। কিন্তু ঠিক ডিফাইন করতে পারলেন না।

—না। পারিনি। ঠিকই। আপনার দিক থেকেও এই স্বাধীনতা থাকছে।

—আমি ওসব গ্রাহ্য করি না। কোনও শর্ত-টর্ত দরকার নেই।

—গ্রাহ্য করেন না এই জন্যে যে স্বাধীনতাটা পেয়েই থাকেন। ইচ্ছে মতো চলতে কেউ বাধা দেয় না আপনাদের।

—আর কী শর্ত আপনার?

—আবার কী? স্বাধীনতা ইনক্লুডস এভরিথিং। তবে হ্যাঁ, দুজনেই চাকরি করি। দুজনেই দশটা পাঁচটা। সুতরাং বাড়ির ভেতরেও একটা ডিভিশন অফ লেবর থাকবে।

—অল রাইট। তাতে আমার কোনও অসুবিধে নেই। আমি খুবই স্বাবলম্বী।

তা তাপসকান্তি মনে করেন, আজও পর্যন্ত এই শর্তগুলোর খেলাপ তিনি করেননি। পুরুষ বলে কিছু বাড়তি সুবিধে দাবিও করেননি। তবে হ্যাঁ, ধীরে ধীরে ঘর ও বাহির দুটি অন্ত আলাদা হয়ে গেছে। ঘর সামলানোর কাজের ভীমভাগ শর্মিলাই করেছেন। তিনি বাইরের কাজ। চুক্তি অনুযায়ীই চলেছেন। তিনি পা দুটো সামনের দিকে যথাসম্ভব ছড়িয়ে দিয়ে সিগারেটে সুখটান দিতে থাকলেন। সিগারেট খাওয়া শর্মিলা পছন্দ করেন না। ডাক্তারেরও বারণ, কিন্তু তিনি খাবেন, দ্বিতীয় এবং তৃতীয়। ধোঁয়ায় ঘর ভরে যাবে। ভরিয়ে দেবেন। এটা তাঁর ব্যক্তি-স্বাধীনতা। এটাতে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। করলে তিনি বিবাহ-পূর্ব শর্তগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। খুব শান্তভাবে।

শর্মিলার নাক ক্রমশ কুঁচকে যাচ্ছে। ফোঁ ফোঁ করে কয়েকটা জোর নিশ্বাস ছাড়লেন। দেখাচ্ছেন কত কষ্ট হচ্ছে। আহা দম বন্ধ হয়ে আসছে বেচারা মহিলার। মিনি বাসে এই কৌশলটা প্রায়ই ব্যবহার করে থাকেন এই মহিলা। বিরক্তিতে নাক কুঁচকোনো। শব্দ করে প্রশ্বাস নেওয়া। এ সবেও যদি না হয় তাহলে মুখ খোলেন।

—আমার কষ্ট হচ্ছে, কাইন্ডলি সিগারেটটা ফেলবেন?

বেশির ভাগ লোকই জোরে দু-একটা টান মেরে ফেলেই দ্যায়। দু-একজন আছে তে-এঁটে তেরিয়া মতো। রুখে ওঠে।

—জানালার ধারে বসে স্মোক করছি, আপনার অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।

বাস, আর যায় কোথা! গোটাগুটি একটি নৈতিক বক্তৃতা ঝেড়ে দেয় মহিলা। নো স্মোকিং লেখা থাকা সত্ত্বেও, নিচু ভিড় বাসে স্মোক করা। সিভিক সেন্স নেই। অন্য দেশ হলে জেল হত। ভারতে, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে সবই সম্ভব। ভদ্র শিক্ষিত লোকেরাও অভদ্র। অশিক্ষিতর মতো আচরণ করে।

তেরিয়া লোকগুলো এতে আরও তেরিয়া হয়ে যায়। সবই তো জানে। জেনেশুনেই করে, ওরা কি নো স্মোকিং পড়তে পারে না। না সিভিক সেন্স-টেনসের কথা জানে না! সব জানে। যে জেগে ঘুমোয় তাকে জাগানোর চেষ্টা বৃথা—সেটা এই মহিলা বোঝে না।

—স্পিচ ঝাড়ছেন কেন? আমার খুশি আমি স্মোক করব।

শর্মিলা তখন লালচে মুখে বলেন—আপনি স্মোক করতে পারেন। আমাকে তো জোর করে স্মোক করাতে পারেন না? পারেন!

—মানে?

—মানে আপনার ধোঁয়া আমার ফুসফুসেও ঢুকছে। ক্যানসারটা আমারও হতে পারে। আপনার মতো কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকের দোষে।

এই সময়ে পেছনে বসা তাপসকান্তি আপসের ভঙ্গিতে বলতেন—আহা, ভদ্রমহিলার কষ্ট হচ্ছে, ফেলেই দিন না মশাই সিগারেটটা। এত করে বলছেন,...এতে অনেক সময়েই কাজ হত।

এখন তাপসকান্তি ওই তে-এঁটে তেরিয়া লোক। তাঁকে গ্রীষ্মের রাত্তিরে খিচুড়ি খাওয়ানো হয়েছে, তিনিও সিগারেট খাবেন।

শর্মিলা শব্দ করে এঁটো বাসনগুলো তুলছেন। সাধারণত এ কাজটা তিনি করেন। শর্মিলার রান্না, পরিবেশন। তাঁর ভাগে পরের অংশ। তবে দুজনের সামান্য খাওয়ার অবশেষ, উচ্ছিষ্ট প্লেট-বাটি, বেশির ভাগই শর্মিলা চটপট তুলে নেন। তাঁর অপেক্ষা করেন না। কোনও কোনও দিন, বেশি ক্লান্ত থাকলে, ডাক দেন—'একটু তোলো না বাবা এগুলো। তিনিও সানন্দে উঠে যান। সাহায্য করেন।

আজ তিনি পা ছড়িয়ে বসে। উঠবেন না। যদিও জানেন শর্মিলা দেরি করে ফিরেছে। এসেই রান্না চাপিয়েছে তা যত সংক্ষিপ্তই হোক। একটুও বিশ্রাম পায়নি। কিন্তু দেরি করে ফিরলই বা কেন? আর খিচুড়িই বা খাওয়াল কেন?

টেবিল মুছছেন শর্মিলা। অনাবশ্যক জোরে জোরে, তাড়াতাড়ি। রান্নাঘরে গেলেন। একটু পরে বেরিয়ে এলেন। হাতে এক গ্লাস দুধ। ঘরে ঢুকলেন, বেরিয়ে এলেন। বুল্টুর ঘরে ঢুকে যাচ্ছেন। বাঃ। দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। সশব্দে। বাড়িতে আর কে আছে রে বাবা, তাপসকান্তি ছাড়া? তাহলে তাঁরই প্রবেশ-নিষেধ, তাঁর থেকেই সুরক্ষা সশব্দে ঘোষিত হল? চমৎকার!

দুধটা খেলেন না তাপসকান্তি। খিচুড়ি, ডিম ইত্যাদির পর দুধ চলে না। এটা শর্মিলার জানার কথা। সে গ্রাহ্য করছে না তাঁর সুখ-অসুখ। দুধটা পড়ে থেকে আজ দই হোক।

একলা শয্যায় শুয়ে কিছুক্ষণ ছটফট করলেন তিনি। নিষ্ফল ক্রোধে, জ্বালায়। তারপর অনিবার্যভাবে ঘুম আসতে লাগল, দারুণ গ্রীষ্মে এক একটা বৃষ্টির ঝাপটার মতো। এবং তার সঙ্গে আসতে লাগল কত সংলাপ। এলোমেলো, তাল পাকিয়ে যাওয়া মাখা সন্দেশের মতো।

—ও ধন, ওটুকু ফেলে রাখলি কেন? ঘরে তৈরি রাবড়ি, খাবি না?

—খেলাম তো, কত খাব? তোমরা কি আমায় মারতে চাও? এই এত মাছ-টাছ তারপরে আবার রাবড়ি?

মাংস ডিমের পরে রাবড়ি বিষ। কক্ষনো খাবি না। কিন্তু মাছ খেয়ে খেলে কিছু হয় না রে।

—হ্যাঁ গো আজ কী করব? ছানার একটা নতুন প্রিপারেশন শিখেছি, করব না কি?

—এত জ্বর নিয়ে এসেছিস খোকন? বলবি তো? ঠাকুমা নেই বলে কি আমি

তোকে দুখানা রুটি করে দিতে পারতুম না?

তাপসকান্তি ঘুমিয়ে পড়লেন। কপালে কার যেন হাতের স্পর্শ আশা করতে করতে।

শর্মিলার ঘরে পরিস্থিতিটা একটু অন্যরকম। হা-ক্লান্ত থাকা সত্ত্বেও শর্মিলা ঘুমোতে পারছেন না। শরীরে মাথায় যেন আগুন জ্বলছে। এক সময়ে তিনি আর তাপসকান্তি একই অফিসে ছিলেন। বিয়ের পর সৌভাগ্যবশত তাপস অন্যত্র বেশি ভাল চাকরি নিয়ে চলে যান। ভাল এম এস-সি ডিগ্রি ছিল। খাটিয়ে ছিলেন, পেয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু পুরনো অফিসের নিয়ম কানুনটা কনভেনশনগুলো যে জানেন না তা তো নয়। প্রথম যেদিন দেরি হল সেটা ছিল ডিভিশন্যাল ম্যানেজার পি. চ্যাটার্জির ফেয়ারওয়েল। সভায় বক্তৃতা আর শেষ হতেই চায় না। হতেই চায় না। আর মাইক্রোফোন হাতে পেলে প্রত্যেকটি বক্তাই একেকটি সুরেন বাঁড়ুজ্যে, বিপিন পাল হয়ে উঠছে। সেই মারাথন বক্তৃতার পর খাওয়া-দাওয়া, যার পুরো ভারই শর্মিলার ওপর। রাত্তির করে ফিরলেন, কোনও জিজ্ঞাসাবাদ নয়। চুপচাপ। যেন হিমগিরি। দ্বিতীয় রাত্তির গেছে অতি ভয়ংকর। তাঁরই বয়সী সহকর্মিণী শুক্লার অফিসেই স্ট্রোক হল। অজ্ঞান হয়ে গেল। প্রথমে অফিসেই ডাক্তার এসে দেখল। তারপর অ্যাম্বুলেন্স, তাঁরা ক'জন ভর্তির জন্য হাসপাতালে হাসপাতালে ঘুরছেন। একটার পর একটা। অবশেষে একটা নার্সিংহোমেই রাখা হল। রাত করে ফিরলেন, এসে রান্নাবান্না, খেতে দেওয়া। মানুষটি একদম চুপ। একটি কথাও না। আজ তৃতীয় দিন পি জি-তে ইনটেনসিভে নিয়ে আসা হল শুক্লাকে। ডাক্তারদের মতামত নিয়ে আলোচনা চলল নিজেদের মধ্যে। দেরি। এসে দেখলেন চায়ের কাপ টেবিলে বসানো। শুকিয়ে খড়খড় করছে। সেরামিকসের এই সব বাসন বেশিক্ষণ তলানি চা-টা সুদ্ধু ফেলে রাখলে দাগ হয়ে যায়। তারপর দেখলেন তাঁর জন্য এক কাপ চা ফ্লাস্কে থাকার কথা। সেটা নেই। অর্থাৎ নিজে করে খাও। আজ জিজ্ঞাসাবাদ হল। যেন পুলিশি কায়দায়। মিলিটারি মেজাজে। কেন রে বাবা? স্বাভাবিকভাবে জিজ্ঞেস করলেই তো হয়। তিনিও অবশ্য নিজে থেকে বলেননি। বলা যেত। কিন্তু বাড়িতে ঢুকেই সামনের সোফায় পা ছড়িয়ে বসা ওই হাবিলদারি মূর্তি দেখে বলতে ইচ্ছে করেনি। তিনি দেরি করছেন দেখে সামান্য একটু রান্নাও তো করে নিতে পারত! এমন তো কতই হয়েছে। বরাবর হস্টেলে। একলা ঘর নিয়ে থেকেছে। তা ছাড়া গাঁয়ের বামুন তো আদতে। রান্নাটান্না আসে ভাল। বুল্টু-উর্মি থাকতেও কত দিন শখ করে এটা সেটা রান্না করেছে। মর্জি হলে করব, না হলে করব না, তুমি মরো গে যাও—এ কেমন অ্যাটিচ্যুড রে বাবা?

তিনি ঘুমোতে পারলেন না। এত অনাদর, এত অবহেলা, এত মেজাজ কেন? আগে তো ছিল না? এই প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর হিসেবে যেসব কথা তাঁর মনে আসতে লাগল তাতে তাঁর ঘুম উবে গেল একেবারে। কদিন ধরেই টেনশন চলছে। এত খাটুনি। ঘোরাঘুরি, উদ্বেগ মন খারাপ সব মিলিয়ে স্নায়ুগুলোর অবস্থা খুব

শোচনীয়। এ রকম হলে তিনি কিছুতেই ঘুমোতে পারেন না। বার দুই উঠে ঘাড়ে কপালে জল দিয়ে এলেন। মাথার মধ্যে ভাবনার ঘুরপাক থামাতে চেষ্টা করলেন। পারলেন না। গো-হারান হেরে গেলেন। ভোরের পাখি ডাকতে আরম্ভ করলে মাথার ওপর বালিশ চাপা দিয়ে উপুড় হয়ে রইলেন। তারপর ঘুম থেকে ওঠাটা যখন অত্যন্ত জরুরি, আর দেরি করা যায় না, ঠিক তখনই নিপাট ঘুম ঘুমিয়ে পড়লেন।

সাড়ে নটায় বেরোনো। চার্টার্ড বাস অপেক্ষা করবে ফুলবাগানের মোড়ে। আর অপেক্ষা করা যায় না। টোস্টার থেকে এক এক পিস রুটি লাফিয়ে ওঠে আর তাপসকান্তি তাদের খপ খপ করে ধরে চিজ মাখিয়ে ফেলেন। ডিমটা একটু তাড়াতাড়ি নামানো হয়ে গেছে, খোসা ছাড়াতে গিয়ে খাবলা খাবলা মতো হয়ে গেল। ওদিকে কফির জল শোঁ শোঁ করছে। ভ্যালা জ্বালা। ব্রেকফাস্ট, টিফিন এই জাতীয় জিনিস নিজে করে খেয়ে সুখ নেই। ওদিকে আবার শশাও কাটতে হবে। শশা-কাটার? শশা-কাটার? তুমি কোথায় গেলে? খোঁজ খোঁজ এই তো।

সব গুছিয়ে নিয়ে খেতে বসলেন। ঘড়ির কাঁটা টকটক এগিয়ে যাচ্ছে। সোয়া নটা হল। বুল্টু-উর্মির ঘর এখনও বন্ধ। এদিকে জানলা-ফানলাও নেই যে উঁকি মেরে দেখবেন। রান্নাঘরটা এলোমেলো রইল, টালিতে শশার ছাল, কফির দাগ, সিঙ্কে ডিমের খোলা। কী করা যাবে? তবে টেবিলটা ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার করে দিলেন তাপসকান্তি। কাজের লোকটি এই সময়ে এল।

—আজ এত দেরি কেন?—কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন তাপসকান্তি।

—ও বাড়িতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। ছোট ছেলের বিয়ে লেগেছে তো।

—কারুর বাড়ি বিয়ে হলে আমাদের বাড়ির কাজ কর্মগুলো বন্ধ থাকবে নাকি? নটার পরে এলে আর ঢুকতে পেতে?

গৃহিণীসুলভ বকাবকি যথেষ্ট হয়ে গেছে ভেবে তাপসকান্তি বেরিয়ে গেলেন, যাবার ঠিক আগে, দরজাটা টানবার আগের মুহূর্তে মুখ বাড়িয়ে বললেন—'তোমার মা এখনও ওঠেননি...'

'একটু দেখো', বা 'ওঠাও', এই জাতীয় কিছু কথা সামলে নিলেন তিনি সহজাত সতর্কতায়। তিনি কেন দেখেননি, তিনি কেন ওঠাননি এ প্রশ্নটা উঠে পড়তে পারে তা হলে। তার কী উত্তর দেবেন?'

অসুখ-বিসুখ কিছু করল না কি? দরজাটা বন্ধ করবার দরকারটা কী ছিল? শুদ্ধু রাগ? রাগ দেখানো? এখন বন্ধ ঘরের মধ্যে কিছু হলে তো দরজা ভাঙতে হবে। এ কী অবিবেচনা। তার পরেই মনে হল এরকম তো ছিল না শর্মিলা? রাগি, জেদি, নিজের ধারণা থেকে এক চুল নড়ানো শক্ত। বিনা তর্কে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী গোছের মনোভাব। কিন্তু খুব প্র্যাকটিক্যাল। মেথডিক্যাল। অর্গানাইজড যাকে বলে। তা ছাড়াও খুব খোলামেলা আমুদে স্বভাবের। মেয়েলিপনা কম। তবে দায়িত্বশীল সব ব্যাপারেই, এটুকু সার্টিফিকেট শর্মিলাকে দিতেই হয়। তিনি নিজে বরং একটু চাপা

প্রকৃতির। একটু রাগ পুষে রাখা স্বভাব। জেদ-টেদ নেই। এবং অভিমান আছে। একটু। ফট করে রাগেন না, উত্তেজিত হন না শর্মিলার মতো, কিন্তু যখন রাগেন তখন সে একটা ভয়ানক ব্যাপার। নিজের সম্পর্কে এত কথা অবশ্য তিনি জানতেন না। ব্লাড শুগার এবং আরও নানা অসুবিধে দেখা দেওয়ার পর এক সহকর্মীর পরামর্শে একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলেন। শর্মিলারও নানা গণ্ডগোল চলছিল। ডাক্তারবাবুটি হাজার রকমের প্রশ্ন করলেন—নোনতা পছন্দ করেন, না মিষ্টি পছন্দ করেন। শীতে বেশি কষ্ট পান, না গরমে! সবার শেষে জিজ্ঞেস করলেন—মেজাজ কী রকম? এটা নিজে বলবেন না, লাইফ পার্টনারকে বলতে দিন।

তাপসকান্তি বললেন, বলুন—

ডাক্তার বললেন—কী রকম মেজাজ আপনার স্ত্রীর? চট করে রেগে যান? না—

—হ্যাঁ হ্যাঁ রাগি বড্ড। জেদি।

উনিও রাগি—শর্মিলা পাশ থেকে বলে উঠলেন। শুধু রাগি নয় সেই রাগ দিনের পর দিন পুষে রাখতে পারেন। সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে বার্স্ট করতে পারেন।

—আর উনি নিজের পছন্দ বা ধারণার একটু এদিক ওদিক হলে চেঁচামেচি করবেন। মানতে চাইবেন না জগতে অন্য ধারণা অন্য পছন্দের লোকও আছে।

দিস ইজ নট ফেয়ার,—শর্মিলা বলেছিল,—আমার কতকগুলো স্ট্রং লাইকস অ্যান্ড ডিসলাইকস আছে ঠিকই, কিন্তু আমি সেগুলো ওভারকাম করবার চেষ্টা করি...

—ঠিক আছে ঠিক আছে—ডাক্তারবাবু হাত তুলে থামিয়ে দিয়েছিলেন দুজনকে। শর্মিলার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—ইউ রি-অ্যাক্ট কুইকলি? ঠিক?

শর্মিলা ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

এবার তাপসকান্তির দিকে তাকিয়ে উনি বললেন—ইউ রি-অ্যাক্ট, বাট লেটার, মাচ লেটার? অল রাইট?

ভেবে-চিন্তে তাপসকান্তিকেও সায় দিতেই হল।

এই সূত্রেই পরস্পরের এবং নিজের মেজাজ সম্পর্কে একটা ভাল বিশ্লেষণ দরকার হয়েছিল। বিশ্লেষণটা মনে গেঁথে আছে।

দুপুর বারোটা নাগাদ আর থাকতে পারলেন না তাপসকান্তি। শর্মিলার অফিসে ফোন করলেন: শর্মিলা মুখার্জি আছেন?

উত্তর হল—আজ আসেননি।

আরও এক ঘণ্টা কাটিল। বাড়িতে ফোন করলেন। টিং টিং টিং টিং করে বেজেই যেতে লাগল ফোনটা। কেউ ধরছে না।

চায়না। মানে ওই কাজের লোকটি...ও নিশ্চয় দরজায় ঘা দিয়েছিল। যদি শর্মিলা দরজা খুলে দিয়ে থাকে, অল্পস্বল্প শরীর খারাপ হয়ে থাকে, তার একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হয়েছে। আর বেশি হলে...বেশি হলে কি তাঁকে ফোন করত না? অজ্ঞান হয়ে থাকলে তলার ফ্ল্যাট? ওপরের ফ্ল্যাট? কেউ না কেউ নিশ্চয় এসে তাঁকে অফিসে ফোন করত: ফোনের পাশেই একটা নোটবুকে প্রথমেই তাঁদের উভয়ের অফিসের নম্বর সর্বাগ্রে বড় বড় করে লেখা আছে।

তা হলে কিছু নয়। বাকি সময়টা আস্তে আস্তে ফাইলে মগ্ন হয়ে গেলেন তাপসকান্তি। আর দু বছর পরই অবসর। নিজের কাজে কোনও খুঁত রেখে যেতে চান না তিনি।

এক তলার ঘর। সামনে ঢাকা বারান্দা, একটা ছোট্ট টয়লেট। তার পাশে একটা মিনি রান্নাঘর। শুদ্ধু একটা স্টোভ রাখবার জায়গা, বাঁ পাশে মিনি সিঙ্ক, ডান পাশে দেয়ালের ওপর তাক। এক তলা, এটাই সবচেয়ে অসুবিধে। তবে বাড়িটা ছোট্ট একটু বাগানের ভেতর। উঁচু প্লিনথ। রাস্তার উটকো লোকে মুখ বাড়াবে এমন সম্ভাবনা কম। তবে চোর-ছ্যাঁচড় হলে তাকে কি আটকানো যাবে? যাক গে, ওসব ভেবে লাভ নেই। ভিক্ষের চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া। এর চেয়ে বেশি ক্ষমতায় কুলোবে না তাঁর। সেলামি নেই, ভদ্র পাড়া। কাছেই পাতাল রেলের স্টেশন। একজনের শোয়ার মতো সরু তক্তাপোষ কিনে নিয়েছেন। উলটো দিকে একটা সোফা কাম বেড। ঢাকা বারান্দায় তিনটে বেতের চেয়ার একটা বেতের টেবিল, দুটো মোড়া। ভদ্রমহিলা বলে বিবেচনা করে বাড়িঅলা একটা ত্রিপলের পর্দার ব্যবস্থা করেছেন। গুটিয়ে ওপরে তুলে রাখা থাকে। বৃষ্টির হাত থেকেও রক্ষা। আব্রুও হল। আবার ইচ্ছে হলে বসে হাওয়া খাও। অভ্যাগত কেউ এলে গল্প গাছা করো। খাওয়াটাও এখানেই সারেন। সত্যিই! কত অল্প জায়গা লাগে মানুষের। সাড়ে তিন হাত। কিছু বই আনতে হবে, কিন্তু কী ভাবে আনাবেন? আপাতত অফিস লাইব্রেরি থেকে ধার করা যাক। তারপর দেখা যাবে।

ফ্যান চালিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লেন শর্মিলা। আর কিছুদিনের মধ্যেই জানাজানি হয়ে যাবে। এ ঠিকানাটা এবং বাড়িঅলার ফোন নম্বরটা অন্তত অফিসে তো জানিয়ে রাখতেই হবে। দাদা-বউদিকে এখনও জানাননি। গুছিয়ে বসার আগে অনর্থক উপদেশ জটিলতাই বাড়াবে শুধু। একজন বিবাহিতা মহিলার পক্ষে একলা ঘর পাওয়া যে এইরকম দুরূহ তিনি জানতেন না।

—আপনি তো ম্যারেড দেখছি। হাজব্যান্ড? ছেলে-মেয়ে?

—আমার হাঁড়ির খবর জেনে আপনার কী হবে? ভাড়া দেবেন কি না বলুন। না হলে চলে যাচ্ছি।

—তাই যান ম্যাডাম। মানে ব্যাকগ্রাউন্ড না জেনে ভাড়াটে রাখাটা...কিংবা—

—কিছু মনে করবেন না, আপনার হাজব্যান্ড কি বাইরে কোথাও...?

শর্মিলা কড়া গলায় বললেন—আমি স্বামী-পরিত্যক্তা।

যেন একটা ধাক্কা খেয়ে চমকে উঠলেন ভদ্রলোক—কত দিন?

—এই সম্প্রতি...

—সে কী? এই বয়সে...

—কেন শাহবানু কেস পড়েননি, সে ভদ্রমহিলার আরও অনেক বয়স...

—ভেরি স্যাড। ইস্যু...টিসু...

—আছে, স্টেটসে থাকে। আর কিছু?

—না কিছু মনে করবেন না, একা মহিলাই হন ভদ্রলোকই হন একটু জিজ্ঞাসাবাদ...

—করুন জিজ্ঞাসাবাদ। তবে আমার বয়সের ভদ্রলোকরা ঘরে মেয়েছেলে আনলেও আমার বয়সের মেয়েরা ব্যাটাছেলে আনে না।

ভদ্রলোক একেবারে ধড়মড় করে উঠলেন।

—ঢাকঢাক গুড়গুড় করে কী লাভ?—শর্মিলা তীব্র চোখে চেয়ে বললেন।

—আপনার জিজ্ঞাসার আসল উত্তরটা সোজাসুজি দিয়ে দিলুম।

এ ভদ্রলোকও তাঁকে বাড়ি ভাড়া দ্যাননি।

অবশেষে দালাল ধরে, বেশ কিছু গ্যাট-গচ্চা দিয়ে এই বাসা। তিনি জানতেন না তাঁর প্রকৃত বাসা বাঁধা হবে, জীবনের এই পর্বে, এইভাবে।

যে ক'দিন বাসা পাওয়া যায়নি, কী দুঃসহ যে লেগেছে, কী ভয়ানক সময় যে কেটেছে, একমাত্র তিনিই জানেন। যে গৃহের প্রতিটি কোণ, প্রতিটি আসবাব, ছবি, অলংকার, বাসন, ব্যবস্থা তাঁর হাতে গড়া, সেই গৃহে তিনি পরবাসী। যত তাড়াতাড়ি পারেন বেরিয়ে যান। যত দেরিতে পারেন ফেরেন, কিন্তু সেই ঘরে সেই শয্যাতেই তো শোওয়া যার ওপর তাঁর দাবি রূঢ়ভাবে অস্বীকৃত হয়েছে। প্রতি মুহূর্তে কাঁটা ফুটেছে। তীব্র অপমানের কাঁটা।

সমস্ত অতীত জীবনটা চোখের সামনে ছবির মতো ভাসছে। দুজনের জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট। উদয়াস্ত পরিশ্রম করে সেই ঘর বাঁধা। একটি একটি করে জিনিস। তবে কাঁকুড়গাছির ওই তিনতলা বাড়ি, প্রত্যেক তলে একটা করে পনেরোশো স্কোয়ার ফুটের ফ্ল্যাট, তাঁদের নিজেদের বসবাসেরটা দোতলায়, যথেষ্ট সুন্দর লাক্সারি ফ্ল্যাট—এদেশের জমিজমা পুকুর বাস্তু এসব বিক্রির টাকা হাতে না এলে হত না। এর সঙ্গে মিলল ওই ভদ্রলোকের সবে-হাতে-আসা প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা। এক কোম্পানি ছেড়ে আরেকটাতে যোগ দিতে যাচ্ছেন তো। নীচে ওপরের দুটো ফ্ল্যাট বিক্রি করে সব লগ্নি করা, দেশের সব কিছু বিক্রি করার পরামর্শটা তিনিই দিয়েছিলেন। শাশুড়ির মৃত্যুর পর সবটাই নয়ছয় হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। তখন কাঁকুড়গাছিতে জমির দাম কম ছিল। তারপর ওপর নীচের ফ্ল্যাট করে বিক্রি করে টাকা জোগাড় করার প্ল্যানও শর্মিলারই। নীচেরটা আগেই হয়ে গিয়েছিল, শুধু চালাই আর ইটের কাজ হয়েছে, এমন অবস্থায় সেটাকে বিক্রি করা হল, তাই দিয়ে উঠল তিনতলার ফ্ল্যাট। তাকেও ওইরকম সম্পূর্ণ না করেই ছেড়ে দেওয়া হল, দোতলার ফ্ল্যাট মনোহর সাজে সজ্জিত হল। বাকি টাকা লগ্নি। ততদিনে নিজেদের মিলিত আয় যথেষ্ট। একমাত্র সন্তানকে ইচ্ছেমতো মানুষ করতে কোনও অসুবিধে হয়নি। আর তারও তো বাপ মায়ের টাকা খুব একটা কাজে লাগল না।

এই বাড়ি যে শুধুই ওই ভদ্রলোকের নামে হল, এসবে তিনি এত সাবধান, এত প্র্যাকটিক্যাল চরিত্রের মানুষ হয়েও কিছু মনে করেননি। অন্যরকম সম্ভাবনাও তাঁর মনে উদয় হয়নি। তিনি বাড়ির প্ল্যান, বাড়ি সাজানো, টাকা সংক্রান্ত পরামর্শ দিয়েই খালাস। উকিলবাড়ি তিনি যাননি। দলিল-পত্র চোখ মেলে দেখেনওনি। এখন শর্মিলা

বুঝতে পারছেন সমস্তটার ভেতরে ভেতরে ওই ভদ্রলোকের কারসাজি ছিল। তিনি না ভাবলেও তাপসকান্তি মুখুজ্জে সব রকম সম্ভাবনার কথা ভেবেছিলেন। ইনকাম-ট্যাক্সের গণ্ডগোলের ভয়ে তারপর তাঁদের আলাদা অ্যাকাউন্ট হল, কিন্তু যে কোনও প্রয়োজনে নিজের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলা তাঁরই অসাবধান অভ্যেস। যেখানে যত উপহার, বাড়িতে কোনও বিশেষ দিনে অতিথি-নিমন্ত্রণ এগুলোতে তিনি দু হাতে খরচ করেছেন। বেড়াতে-টেড়াতে গেলেও জিনিস কিনেছেন অজস্র। তারপর বুল্টুর বিয়ে? কে আবার হাত পাতে? বিল মিটিয়েছে বাবা। কিন্তু অন্য সব? কী আছে তাঁর? কত সামান্য? এই বাড়ি ভাড়া, তার অ্যাডভান্স, দালালি মেটানো, এই কয়েকটা অত্যাবশ্যক ফার্নিচার বেসা, বাসন-কোশন, বিছানা, বালিশ, পর্দা, স্টোভ—এ সবেতেই তো প্রায় সব সঞ্চয় নিঃশেষ। মাস মাইনেটুকু ভরসা। কোন নেই। ফোন-বিলাস, ট্যাক্সি-বিলাস এ সবই সংযত করতে হবে। এ বয়সে কি আর নতুন করে বাসা বাঁধা যায়?

জানালা দিয়ে বাইরের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে আছেন শর্মিলা। অপরিচিত রাত। চেনা দিন চেনা রাতও এখন তাঁর কাছে অচেনা হয়ে গেছে। এদের সঙ্গেও খাপ খাওয়াতে সময় লাগবে। আদৌ পারবেন কি না কে জানে। তবে জীবনে কোনওদিন হার মানেননি। চেষ্টা করার অভ্যাস কোনওদিন চলে যাবে না। চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। একমাত্র অসুবিধে তিনি ওই লোকটির মতো একালখেঁড়ে নন। পাঁচজনের সঙ্গে হইচই করতে ভালবাসেন। এমন কি নতুন বিয়ের পর বারবার শাশুড়িকে আনানোর কথাও তিনি বলেছিলেন।

—মা শহরের হাওয়ায় নিশ্বাস নিতে পারবে না।

—আহা এনেই দেখো না। একবার অন্তত বলো।

—তোমার সঙ্গে মা খাপ খাইয়ে নিতে পারবে না।

—কেন?

—এয়োস্ত্রী মেয়ে-মানুষ বাড়িতে চটি পরে, রান্নাঘরে সুদ্ধু চটি পরে ঢোকে, হাহা করে ব্যাটাছেলের মতো হাসে, এসব দেখলে মা ভিরমি খাবে।

দুজনেই সে সময়ে খুব হেসেছিলেন। মায়ের ভাষা ঠিকমতো উদ্ধৃত করতে পেরে মায়ের ছেলের কী আনন্দ!

তা ছাড়াও অসবর্ণ বিয়ে বলে শাশুড়ির দুঃখ ছিল। সাতগেছেতে গিয়ে তিনি বুঝেছিলেন মানুষটি ভেতরে ভেতরে দুঃখে জীর্ণ হয়ে যাচ্ছেন। তবে এ দুঃখ, এই জীর্ণ হয়ে যাওয়া এ-ও যেন অভ্যাস, প্রাকৃতিক ব্যাপার, যেন বহতা নদীর মধ্যে আস্তে আস্তে চড়া পড়ে যাচ্ছে, বা একটা ঘন পাতা-অলা গাছ ধীরে ধীরে পাতা হারাচ্ছে, হলুদ হয়ে যাচ্ছে। শাশুড়ি তাঁর হেঁসেলে ঢুকতে দিতেন না শর্মিলাকে। কিন্তু যত্ন করে অনেক কিছু রান্না করে খাওয়াতেন। খুব সমীহ করতেন। শর্মিলার দিকে চেয়ে চেয়ে তাঁর যেন বিস্ময়ে চোখে পলক পড়ত না।

—মা তুমি কটা পাশ দিয়েছ?

—গ্র্যাজুয়েট, মা। বেশি তো নয়।

—বেশি নয়? বলছ কী? কী করে চাকরি করো? ব্যাটাছেলেদের কাজ তো! স-ব বুঝতে পারো?

—ব্যাটাছেলেদের কাজ বলে আবার আলাদা কিছু আছে না কি মা? আপনি চলুন না একবার আমাদের বাসায়। দেখবেন কেমন করে কী করি।

—না মা আমার এইই ভাল। সোয়াস্তিতে আছি।

কক্ষনো শর্মিলাকে বউমা বলে ডাকেননি তিনি। মা। সবসময়ে মা। খুব ভাল লাগত। মিষ্টি লাগত। তবে এখন মনে হয় পুত্রবধূ বলে কোনওদিনই মেনে নিতে পারেননি তাঁকে। অন্য যে কোনও মেয়েকে যেমন মা ডাকতেন, তাঁকেও তেমনি। এই মাকে এবং তার আগে ঠাকুমাকে জীবনে কোনওদিন পাত্তা দেননি তাপসকান্তি মুখুজ্জে। অথচ পা ঠুকে ঠুকে গর্জন করে বললেন—'আমার মা তো তোমার কাছে ফানি ওল্ড উওম্যান ছিলেন। সেইভাবেই দেখেছ। কোনওদিন গিয়ে সেবা করেছ?

—ফানি ওল্ড উওম্যান? কোথা থেকে এই কথাগুলো পেল লোকটা? তিনি কি মেমসায়েব? কোপেনহেগেন থেকে আসছেন? বাংলার গ্রামের বৃদ্ধারা কেমন হন তিনি জানতেন না? সেবা? শাশুড়ি-মা তাঁর হাতে জীবনে জল খাননি। শেষ মাস দেড়েক যে বিছানায় শুয়ে পড়েছিলেন, সেটা এমন কিছু অসুখও না।

—'শরীর ভাল যাইতেছে না।' 'উঠিতে ইচ্ছা করে না—' এমন পোস্টকার্ড তাঁরা দুটো পেয়েছিলেন। এবং তাতে মায়ের ছেলে নয়, পুত্রবধূই উদ্যোগ করে সাতগেছে যায়, দেখে আসে। মেমারি থেকে একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তার নিয়ে যায়, দেখাশোনা, রাঁধাবাড়া করবার জন্যে ব্রাহ্মণী ঠিক করে আসে। তারপর অবশ্য প্রতি সপ্তাহে ছেলেই গেছে। ছেলের কোলে মাথা রেখেই বেচারি মারা যেতে পেরেছিলেন। সেই তো ভাল। ছেলের বদলে, ছেলের বউয়ের কোলে মাথা রেখে মারা গেলে কি বেশি ভাল হত? বেশি সোয়াস্তি পেতেন?

—আর কী বলল? নিজের বাড়িই সব। নিজের দাদা-বউদি, নিজের ভাইপো নিজের ভাইঝি।

—একশোবার সব হবে। জীবনের পঁচিশটা বছর যাদের কোলে, যে পরিবেশে তিল তিল করে বড় হয়ে উঠেছি এক কলমের আঁচড়ে সে সব মুছে ফেলতে হবে? তিনি তো পদবিটাও পাল্টাতে চাননি। দুটোই রাখতে চেয়েছিলেন। লোকটা বলেছিল—'শর্মিলা ঘোষ মুখার্জি শুনে কিন্তু লোকে তোমাকেও খ্যাপাবে, আমাকে খ্যাপাবে।' তিনি মেনে নিয়েছিলেন। ঠিক আছে বাবা। পুরুষমানুষের ইগো, একটু থাক। যে কোনও মানুষেরই অহং-এ এক একটা কেন্দ্রীয় গুরুত্বের জায়গা থাকে। থাক, ওটুকু থাক।

আর ওর আত্মীয়স্বজন ছিলটা কে? মামার বাড়ির গুষ্টি বর্ধমানের শ্রীরামপুর। জ্ঞাতিরা পাজির পা ঝাড়া। শাশুড়ির কাছেই গল্প শুনেছেন তিনি বিধবা হলে তাঁদের জমিজমা-সম্পত্তি সব গ্রাস করবার জন্যে কী ভীষণ পেছনে লেগেছিল। তাঁর শাশুড়ি অর্থাৎ তাপসকান্তি মুখুজ্জের ঠাকুমার মতো শক্ত লোক না থাকলে কী হত বলা যায় না। তা হলে? বন্ধু-বান্ধব? অফিসের সহকর্মীরা দুজনেরই বন্ধু। তারাও তো উদ্যোগ

করে বিয়েটা দিল। আর ওর কলেজ-টলেজের বন্ধুবান্ধব? তারা কেমন করে কখন কোথায় কেন খসে গেছে তিনি জানেন না। তিনি মানুষজন ভালবাসেন। কখনও কাউকে ফেরাননি। একজন বন্ধু সেই অমূল্য হাজরা না কী যাকে তিনি অমূল্য নিধি বলে উল্লেখ করতেন সে অবশ্য একটু অসভ্যতাই করেছিল।

—আরে আরে তাপস, তোর বউ তোর থেকে লম্বা না কি রে? পাশাপাশি দাঁড়া তো দেখি! ওঃ ম্যাডামের পায়ে জুতো? জুতো তাহলে এবার থেকে উনিই পরবেন?

—কী রে তাপস? গাঁটছড়াটা এখনও খুললি না? বউয়ের আঁচলের সঙ্গে বাঁধা হয়ে গেলি যে রে জন্মের মতো?

এই ধরনের ঠেস-দেওয়া রুচিহীন কথাবার্তা আর ধ্যানধারণার বাহক বলে একমাত্র অমূল্যকেই তিনি একটু ঢিলের বদলে পাটকেল মেরেছেন। যাদের ধারণা বন্ধুর বউ মানেই একটা আগাগোড়া নরম তুলতুলে লজ্জাবতী লতার মতো নুয়ে নুয়ে পড়া আদিরসাত্মক ইয়ার্কির পাত্র, তাদের তাঁর কাছে একটু ঘা খেতেই হবে। সোজা সমর্থ অ-মেয়েলি শর্মিলাকে তো জেনেশুনে, বছর তিনেক মেলামেশার পরই বিবাহ করা হয়েছিল।

যাক গে এ সবই ছেঁদো তুচ্ছ দাম্পত্য কলহ। এই সব কথার পিঠে কথা, রাগের উত্তরে রাগ এ সবের খুব একটা গুরুত্ব নেই। যদিও তাঁদের এত দিনের জীবনে কোনওদিনও এসব কথা ওঠেনি বলে তিনি খুবই শকড হয়ে ছিলেন। তবু, তবু, এসব অগ্রাহ্য করে কিছুদিন মন কষাকষির পর আবার স্বাভাবিক দাম্পত্যে ফিরে যাওয়া খুব একটা শক্ত ছিল না। কিন্তু সেই ভয়ানক মূর্তি, টেপা ঠোঁট, লাল চোখ বিভীষিকার মতো তাঁকে তাড়া করে ফিরছে।

—এটা আমার বাড়ি, এখানে আমি যাকে যা বলব তাকে তা শুনতে হবে। মেজাজ দেখাতে আমিও জানি। শখের টেবিল-ল্যাম্পটা আছড়ে পড়ে চুরমার হয়ে গেল।

...না পোষায় চলে যেতে পারো, যেখানে খুশি, আই ডোন্ট কেয়ার। প্রত্যেকটি কথা এক একটি বোমা। স্প্লিন্টারগুলো তাঁর অন্তরাত্মার মধ্যে ঢুকে গেছে।

শর্মিলা বেরিয়ে এসেছেন সুতরাং। তক্ষুনি আসতেন। কিন্তু তখন থরথর করে কাঁপছেন। কোথায়ই বা যাবেন। দাদা-বউদির কাছে ওইভাবে যাওয়া। ওই সময়ে! অসম্ভব। আত্মসম্মানবোধেরও নানান স্তর আছে। স্বামীর কাছে বিতাড়িত হয়ে একজন মধ্যবয়সী মহিলা দাদা-বউদির দরজায় গিয়ে কড়া নাড়ছেন রাত দশটায়! এ হয় না। তিনি ঢুকে গিয়েছিলেন বুল্টুর ঘরে। যতদিন এই বাসা পাননি, সে ঘরেই আবদ্ধ রেখেছেন নিজেকে। জল ছাড়া বাড়ির আর কিছু স্পর্শ করেননি। যদিও রান্নাঘরের যাবতীয় বাসন, চা-পাতা, দুধ, চিনি, মশলাপাতি, তেল ঘি সবই তাঁর। তাঁরই টাকায় কেনা। যদিও খাবার টেবিল, বসবার সোফা সেট, কার্পেট সবই সেই অর্থে তাঁর। তা ছাড়া শুধু টাকাই তো সব নয়। ওই বাড়ির প্রতিটি ইঞ্চি তো তাঁরই প্ল্যান করা। কোথায় মোজেইক, কোথায় আর্চ, কোথায় বক্স গ্রিল, গাছের টব, ফুলের টব, দেয়ালের রং, দরজার কাঠ, জানলার কাচ, সব, সব। তিনি না থাকলে ওই বাড়ি কেন, কোনও বাড়িই হত কি না ঘোর সন্দেহ। সাতগেছের জ্ঞাতিদের গর্ভে চলে যেত সব। নিশ্চিন্ত

স্যাঙ্ক-ব্যালান্স, ছেলের মুখাপেক্ষী না হবার সামর্থ্য কিছুই হত না, কিছুই না। কোনও ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না শর্মিলা। কিন্তু নিঘুম শয্যায় ছটফট করতে করতে কাকে যেন খালি প্রার্থনা জানাতে লাগলেন: বিপদে আমি না যেন করি ভয়।

এবং ভোরের দিকে ছেঁড়া-ছেঁড়া ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্নের মতো ঢুঁ মেরে যেতে লাগল সন্দেহ। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক তাহলে কিছুই নেই। অন্তত তাঁদের মধ্যে ছিল না! সম্পর্ক শুধু যৌনধর্মের! জীবনধর্মের! এখন দুজনেরই যৌবন চলে গেছে। পুরুষদের বেলা ও সব অবশ্য ধর্তব্য নয়। মেয়েদের বেলা এগুলো ভীষণ জরুরি। বিগতযৌবনা-স্ত্রীকে একত্রিশ বছর ঘর করবার পরও ছুঁড়ে ফেলে দিতে এদের এক মিনিটও ভাবতে লাগে না।

আচ্ছা, সেভাবে দেখতে চাইলে বিগতযৌবন স্বামীকেই কি স্ত্রীদের খুব ভাল লাগে? তাপসকান্তির মাথার সামনের দিকটা চুল কমতে কমতে প্রায় টাক এখন। পেছন দিকে ঝুঁটির মতো চুল। ডিসগাস্টিং। আগেও ভুঁড়ি ছিল। তবে ভুঁড়িটা ছিল আঁটসাঁট, এখন আলগা থলথলে হয়ে গেছে। জেলি-ফিশের মতো। শার্ট-প্যান্ট পরা থাকলে অতটা বোঝা যায় না। শীতকাল পরলেই আবার কায়দা করে স্যুট পরা হয়। কিন্তু, সবার কাছে ঢাকা থাকলেও তো স্ত্রীর চোখে ধুলো দেওয়া যায় না! তা ছাড়া পাওয়ার বাড়তে বাড়তে এখন চশমার এমন হাল যে তার পেছনে চোখ দুটো যেন টলগুলির মধ্যে ফোঁটার মতো দেখায়। রিডিক্যুলাস। পাগুলোও যত দিন যাচ্ছে কেমন ছিনে-পড়া হয়ে যাচ্ছে। আর মুদ্রাদোষ? আগে তো কথায় কথায় খুঁক খুঁক শব্দ করার একটা অভ্যেস ছিল। প্রায় হাতাহাতি করে সেটা সারানো গেছে। কিন্তু এখন হয়েছে যখন-তখন এক নাক টিপে আর এক নাক দিয়ে জোরে জোরে শ্বাস নেওয়া শ্বাস ছাড়া। মাঝে মাঝেই আবার কিছুর মধ্যে কিছু না, নিজের ঠোঁটটাকে একেবারে উল্টে ফেলবে। একগাদা লোক, কিংবা কোনও একজন অতিথির সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছে হঠাৎ তলার ঠোঁটটা উল্টে ফেলল। ভেতরের লাল ছিট ছিট শাদাটে থলথলে চামড়া বার হয়ে ঠিক যেন একটা ভূত। তারপর কাঁচা-পাকা গোঁফ দাড়ি। তাকেই ছেঁটে ছুঁটে দিব্যি ফ্যাশনেবল বানানো যায়। তা করবে না। শনি-রবিবার নো ক্ষৌরি। গালকে বিশ্রাম দিচ্ছি। খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ বেরিয়ে কী শ্রীই হয়! আর অতিথি তো শনি-রবিবারই আসবে? সবার সামনে একটা হতভাগা চেহারা নিয়ে বেরোতে ভালও লাগে!

তাঁর সামনের টেবিলেই বসে জয়ন্তী। বলল—'শর্মিলাদি চেহারাটা এরকম দেখাচ্ছে কেন?

—কী রকম?

—শুকনো শুকনো। কেমন যেন।

—রাতে ঘুম হয়নি একদম।

—তাই? কেন?

—কী করে জানব বলো।

—নিশ্চয় ছেলের কথা ভাবছিলে। না?

জয়ন্তীর বড় ছেলে বিয়ে করার কয়েক মাস পরেই আলাদা হয়ে গেছে। সে নিয়ে জয়ন্তীর কান্নাকাটির শেষ নেই। এখন আবার ছোট ছেলেকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছে। ও ভাবতে ভালবাসে শর্মিলারও এক কেস। ছেলে বস্টনে আছে তো কী? ওসব বাহানা। আসলে বউ এসেই ফুসমন্তর দিয়েছে। ছেলেও বস্টন আঁকড়ে ধরেছে। মুশকিল হচ্ছে, শর্মিলা একদিন এদের কাছে খুব গৌরব করে বলে ফেলেছিলেন—আমার ছেলে থাকতে চাইলেও, বউ চাইবে না। কনট্র্যাক্ট রিনিউ করতে দেবে না বুল্টুকে।

সেই বড় মুখ ছোট হয়ে গেল। কিন্তু শর্মিলার যে এখনও বিশ্বাস সেটা আলাদা হবার তাগিদে নয়, স্রেফ উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং কাজকর্ম-জীবনধারণের অজস্র সুবিধের লোভে!—সেই বিশ্বাসে এরা সূক্ষ্মভাবে ঘা দিয়ে যায়।

তিনি বললেন—হবেও বা!

সারাদিন ধরে কাজের ফাঁকে ফাঁকে বুল্টু-উর্মি ঘুরে ঘুরে আসতে লাগল। রাগ, অভিমান, কষ্ট হিজিবিজি কাটছে মনের ভেতর। হয়তো মুখের ওপরও। নয়তো ক্যানটিনে অতগুলো জুনিয়র ছেলে—রূপম, স্বরাজ, দেবকী, স্বপন সব্বাই বলবে কেন—শর্মিলাদি, শরীর খারাপ নাকি?

—কই না।

—কী রকম চুপচাপ, গম্ভীর, অ্যাবস্ট্রাক্টেড লাগছে।

শর্মিলা অনেক কষ্টে হেসে বললেন—কী জানি। সব দিনই কি সমান যায়। ওরা দুমদাম করে তাঁর টেবিলে এসে বসল, সেখানেই খাবার নিল। গল্প গাছা জুড়ে দিল নিজেদের মধ্যে।

এই জুনিয়র ছেলেমেয়েদের প্রতি একটা দুর্বলতা আছে শর্মিলার। যদিও অফিসের আবহাওয়ায় কেউ সন্তানের বয়সী বলেই তার প্রতি বাৎসল্য বোধের তেমন সুযোগ নেই। এখানে সবাই ভাই বোন দাদা দিদি, তবু হয়তো বাৎসল্যই। তা ছাড়া এরা জয়ন্তী ইত্যাদির মতো ভোঁতা নয়। একবারই মাত্র জিজ্ঞেস করেছিল—চুপচাপ, গম্ভীর লাগছে কেন? দ্বিতীয়বার কোনও প্রশ্ন করেনি। বুঝতে পেরেছে হয়তো যে কোনও কারণেই হোক শর্মিলাদির মন খারাপ। নিজেদের সাহচর্য দিয়ে মেজাজটা ঠিক করে দিতে চাইছে। ওদের প্রাণশক্তির স্পর্শ লেগে অন্যসময়ে তিনি কতবার চাঙ্গা হয়েছেনও, আজ ওসব কাজে লাগল না। তিনি অবশ্য জোর করে একটা হাসি ঠোঁটে টাঙিয়ে রাখলেন।

—বালগেরিয়ার গোল দুটো কেমন দেখলেন শর্মিলাদি?

চমকে উঠলেন শর্মিলা। একেবারে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন।

বললেন—হ্যাঁ, ভাল।

—'শুধু ভাল?' স্বরাজ বলল।

—যাই বলিস এদের লেজেন্ড তৈরি করার ক্ষমতা নেই। কৌশল আছে, দুর্দান্ত রিফ্লেক্স—সবই। কিন্তু ম্যাজিক? সে ওই গুরুর পেছন পেছন চলে গেছে রে!—স্বপন টেবিল চাপড়ে বলল।

—বাজে কথা বলিসনি। আসলে আমরা মজ্জায় মজ্জায় হিরো-ওয়রশিপার। একটা হিরো না হলে সুখ পাই না, বলুন শর্মিলাদি। আপনি এই রকম হিরোওয়রশিপ সাপোর্ট করেন?—রূপম বলল।

শর্মিলা ফিকে হেসে বললেন—আমার সাপোর্টে কী আসে যায়।

অন্য সময়ে এদের সঙ্গে সমান পাল্লা দিয়ে ফুটবল-ক্রিকেট-টেনিস নিয়ে আড্ডা মেরেছেন। আড্ডা মেরেছেন ফিল্ম নিয়ে। আজ পারছেন না।

—উঠছি। আমার হয়ে গেছে—শর্মিলা উঠে গেলেন।

ফোন বাজছে। ফোন বাজছে। হ্যাঁচোড় পাঁচোড় করে গিয়ে ফোন ধরলেন তাপসকান্তি।

—বাবা? আমি বুল্টু বলছি। কেমন আছ? আমরা ভাল আছি দুজনেই।

—ভাল আছি।

—মাকে দাও?

—ইয়ে মানে মা এখানে নেই।

—নেই মানে? মামার কাছে গেছে?

—তাই।—মিথ্যে কথা বলা অভ্যেস নেই একদম। যে শব্দ মুখে এল সেটাকেই ক্ষীণভাবে বেরোতে দিলেন তাপসকান্তি।

—বারে, আমরা দু-একদিনের মধ্যেই ফোন করব, মা জানে না? এই সময়ে বাপের বাড়ি গেল?—ঊর্মির গলা—কত কথা আছে।

গলা ঝেড়ে দুবার কেশে তাপসকান্তি বললেন—তোমাদের বিল উঠছে আমি ছাড়ছি।

অপেক্ষা করলেন না। ফোন কেটে দিলেন। এই কেটে দেওয়াটা ধ্বক করে লাগল তাঁর বুকে। ছেলে সুদূর বস্টন থেকে ফোন করছে, যেন কে কাকে করছে। সেই আনন্দ, ঔৎসুক্য, ব্যগ্রতা কিছু অনুভব করছেন না। সেটা শুধু আরও অস্বস্তিকর প্রশ্ন শোনবার ভয়ে বা মিথ্যা বলার ভয়ে নয়। বুল্টুর সঙ্গে যেন তাঁর আগের জন্মে সম্পর্ক ছিল, এ জন্মে সেটা ফিকে হয়ে এসেছে। কেন তিনি জানেন না। নিজের এই আবেগহীনতায় কেমন ভয় পেলেন তাপস। অনুভূতিহীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়।

পেছিয়ে এসে সোফায় এসে বসলেন। ভোর। জানলার বাইরে ভোর হচ্ছে। তার মানে আরও একটা দিন। অফিস যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে কতটুকুই বা সময় লাগবে?

তিনি আপাতত শোবার ঘরে ফিরে গেলেন। বিছানাটা ঝাড়লেন। দুধের গ্লাসটা নিয়ে আস্তে আস্তে রান্নাঘরে ঢুকলেন। এই ঘরটারই সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা। প্ল্যাটফর্মের ওপরটা তেল প্যাচ প্যাচ করছে, হলুদ-ছোপ খয়েরি রং ধরেছে। সিঙ্কটা কালচে মেরে গেছে। চায়না যথেচ্ছ ফাঁকি মারছে। কিন্তু তাঁর ক্ষমতা নেই এসব যথাযথ করবার। একদিন দুদিন রান্না করে নেওয়া এক জিনিস। আর এই তাক-ফাক মোছা, গোছানো আরেক। দিনের পর দিন এসব করার মতো তালেবর তিনি নন।

কিন্তু এই প্যাচপেচে চেহারা, এই চাপা বাসি গন্ধ এ সহ্য করাও কঠিন। ঘুম থেকে উঠেই যে এক কাপ চা করে খান, সেটাও আজ করতে ইচ্ছে হল না। গা বমি-বমি করছে।

মুখ-টুখ ধুয়ে আবার বসবার ঘরে সোফায় নিজেকে ছেড়ে দিলেন। কাগজ এল, নিলেন। দুধ এল, নিলেন। চায়না ঠাকরুন একটু সকাল সকালই ঢুকলেন। বাসন মাজছেন।

তাপসকান্তি গলাটা হেঁড়ে করে বললেন—রান্নাঘর ভাল করে সাবান-ফাবান দিয়ে পরিষ্কার করবে আজকে।

—মা ফিরবে নাকি আজ?—অর্থাৎ মা ফিরলে ভয়ে করবে, নইলে...

—আজ ফিরুক আর কাল ফিরুক পরিষ্কার চাই। আমাকে পরোটা আর আলু চচ্চড়ি করে দাও। চা দেবে দু কাপ। আমি চান করতে যাচ্ছি।

এত গম্ভীর গলায় বললেন যাতে চায়না গাঁই গুঁই না করে।

চায়না একবার মুখ বাড়িয়ে বলল—'আলু চচ্চড়ি?' সে জানে বাবু আলু খায় না।

—হ্যাঁ আলু-চচ্চড়ি।—তাপসকান্তি চানে ঢুকে গেলেন।

খেতে বসে কোনওটাই ভাল লাগল না। সবচেয়ে খারাপ হল চা। তিনি বললেন—আমি বসছি। সব সাফ করে নাও। আর কাল থেকে এমনি সময়েই আসবে।

ঝাঁটা চালাতে চালাতে চায়না ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল—'মা কবে আসবে বাবু?'

—কেন?—কাগজটা সামনে ধরে তিনি বললেন।

—'না, তাই জিজ্ঞেস করছিলুম'—চায়না ঢোঁক গিলে বলল। একটু পরে বলল—'দশটা টাকা হবে বাবু?'

—'কেন?'

—'র‍্যাশনটা তুলতুম। কম পড়ছে টাকা।'

পার্সটা বার করে দশ টাকার একটা নোট ছুঁড়ে দিলেন তাপসকান্তি। মনে হল ছুঁড়ে দেওয়াটা ঠিক হল না। তারপর মনে হল—হু কেয়ার্স?

চায়না চলে যাবার পর ঘড়িটা একবার দেখলেন, তারপর ফোনের দিকে এগিয়ে গেলেন।

রিং হচ্ছে। কেউ ধরছে না। ন'টা বাজছে। এখন সব বাড়িতেই খুব তাড়া থাকে। ধরেছে, ধরেছে।

—হ্যালো—বিরাট দরাজ গলা

—আমি তাপস বলছি। শ্যামলদা নাকি?

—আরে, অ্যাত্ত সকালে? হঠাৎ?

—খবরাখবর নেব না বলছেন তা হলে?

—আরে তাই কখনও বলতে পারি?—শ্যামলেন্দু ঘোষ জানেন বেলগাছিয়া থেকে কাঁকুড়গাছি বেশ খানিকটা দূর। সুতরাং সেই আন্দাজ জোরে কথা কইছেন। কানের পর্দা ফেটে যাবে মনে হচ্ছে।

—খুকির কী খবর? শ্যামলেন্দু জিজ্ঞেস করছেন।

—ভাল।

—ছেলের জন্যে মন খারাপ না তো?

—না। আপনারা সব ঠিকঠাক আছেন তো?

—আর ভাই আমাদের থাকা না থাকা। করলার রস, চিনি ছাড়া চা, দু বেলা ছানা, এক কাপ ভাত...লাইফ হেল হয়ে গেল।—শ্যালকেরও তাঁরই মতো ব্লাড শুগার।

—আচ্ছা রাখি—ফোনটা নামিয়ে রাখলেন তাপসকান্তি।

তাহলে শর্মিলা ওখানে যায়নি। এমন কোনও নিকট-আত্মীয় আর নেই যার বাড়ি সে গিয়ে উঠতে পারে, থাকতে পারে। বন্ধু-বান্ধবী? প্রচুর। কিন্তু কখনও কারুর বাড়ি তো থাকেনি। তাদের কাছে খোঁজ নিতে যাওয়া মানে পুরো এক মাস ফোনের সঙ্গে লেপ্টে থাকা। সব্বার ফোন নিশ্চয়ই নেই, থাকলেও নম্বর পাওয়া যাবে এমন কোনও আশ্বাসও নেই।

সারাদিন ধরে ঘুরে ফিরে একটা বেড়ালের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। ঘাপটি মেরে সে বসে থাকে। সামনে দিয়ে ঘুরে যায়। কোণে গিয়ে হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙে। বেড়ালটা হল একটা প্রশ্ন। মহিলা গেল কোথায়?

সারাজীবন তিনি মহিলাকে মেনে নিয়েছেন। কথাটা এভাবে বললে খারাপ শোনায়। কারণ বছর তিনেক ধরে সাধারণ বাঙালি মেয়ের চেয়ে অনেক লম্বা, ভীষণ ফর্সা, মোমবাতি-মোমবাতি চেহারার ওই মানুষীটি, সহকর্মীদের সঙ্গে তার উদ্দাম তর্ক, জোরালো আলাপ-আলোচনা এবং যখন-তখন হাসিতে ফেটে পড়ার চমৎকার স্বভাব দিয়ে তাঁকে টেনেছিল। তাপস তো তখনই, সহজাত বোধে জানতেন এ মেয়ে হুজ্জুতে, তার্কিক, বহির্মুখী...। তিনি নিজে ঘরকুনো। হই-চই হট্টগোল চোখের ওপর রেখে একটু দূর থেকে নিরীক্ষণ এবং বিশ্লেষণ করতে ভালবাসেন। তাতে কী হল? আকর্ষণ হল গিয়ে আকর্ষণ। পরে দেখেছেন মেয়েটি কর্মপটুতায়, বুদ্ধি-বৃত্তিতে খানিকটা তাঁর ঠাকুমার মতো। ঠাকুমাও তো দেশের বিষয়-সম্পত্তি একা হাতে সামলে ছেলে মানুষ করা, নাতি মানুষ করা—এসব অসাধারণ দক্ষতায় করেছেন। কিন্তু শর্মিলা ঠাকুমার মতো এক জায়গায় বদ্ধ হয়ে থাকবার পাত্রীই নয়। সে যেন একটা নদী—নিজেকে ছড়িয়েই যাচ্ছে। ছড়িয়েই যাচ্ছে, কখন কোথায় বাঁক নেবে বলা মুশকিল। বাঁক যখন নেবে তখন বাধাও মানবে না। একগুঁয়ে। তাঁর কলেজ-জীবনের বন্ধু অমূলা বলেছিল—'তোর বউয়ের ফটাস-ফটাস চটি, চটাস-চটাস কথা।' উর্মিকে সত্যি কথা বলতে কি তাঁর পছন্দ হয়নি। তিনি নিজে মোটামুটি ফর্সা, তাঁর বউ দারুণ জমকালো ফর্সা, তাঁর ছেলে ফর্সা। শর্মিলার চোখ ঝলসানো রংই তাঁকে টেনে ছিল কি না বলা শক্ত। যাই হোক, পুত্রবধূ কেন হবে অমন নিখাদ কালো? তিনি শর্মিলার জেদ যথেষ্ট জানেন। তাই ঠিক এ ভাবে কথাগুলো বলেননি। কিন্তু গাঁইগুঁই করেছেন। তারপর বলেছেন,

—বুল্টু তো দেখল না!

—ছবি পাঠিয়ে দিয়েছি তো! অপছন্দ হলে হবে না।

বুল্টু মায়ের পছন্দের ওপর কথা বলবে না তিনি জানতেন। শর্মিলা কি উর্মিকে বুল্টুর ওপর চাপিয়ে দিল না?

এখন অবশ্য সে ঘরের মানুষ হয়ে গেছে। তার সঙ্গে মিশেছেন। তাকে ভালবেসেছেন। সে জন্য নয়। শর্মিলার কর্তৃত্ব করার অভ্যাস, তার জেদের উদাহরণ হল উর্মিকে নির্বাচন। জীবনের সব ব্যাপারেই ভেবে দেখতে গেলে শর্মিলা নিজের পছন্দ, নিজের জেদ বজায় রেখে গেছে। প্রথমেই শর্ত করে নিয়েছিল—স্বাধীনতা চাই। তা এভাবে স্বাধীনতা নেওয়া মানে যে অপরকে পরাধীন করাও, এ কথা ওই মহিলা কখনও ভাবেনি।

তিনি বলেছিলেন—শোবার ঘরটা সবচেয়ে বড় হবে।

হেসেই উড়িয়ে দিল।—তা হলে তো তুমি সবসময়ে শুয়েই থাকবে। বড় হলঘর হবে। বুঝলে? একদিকে খাওয়া, আরেক দিকে বসা।

—ওইরকমই আজকাল ফ্যাশন হয়েছে বটে। তবে খাওয়া আর বাইরের লোক বসা একই জায়গায় হলে প্রাইভেসি থাকে না।

—সে ক্ষেত্রে একটা পার্টিশন থাকবে। সুন্দর পার্টিশন।

—দক্ষিণ চেপে সারি সারি তিনটে ঘর তুলে দাও।

এবার তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিল শর্মিলা কথাটা।

—ব্যারাক নাকি? মিলিটারি ব্যারাক? দুটো বড় বড় ঘরের মাঝখানে একটা আট ফুট মতো প্যাসেজ থাকবে। সেই প্যাসেজে ঘরের দরজা ওপন করবে, বুঝলে? হল থেকে দেখা যাবে না। এই হল আসল প্রাইভেসি। ওই প্যাসেজের শেষে ব্যালকনি। কেউ যেতে চাইলে তাকে শোবার ঘরের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে না।

—অত বড় বাড়িতে মোটে দুটো ঘর? কেউ এলে? কোথায় থাকবে? গেস্টরুম বলে কিছু থাকবে না?

—আরে বাবা, গেস্ট তো আর অনন্তকাল থাকবে না, কেউ এলে হয় আমরা, নয় বুল্টু হল-এ শোবে। দেখো কোনও অসুবিধেই হবে না।

বাড়ি তৈরি হয়ে যেতে দারুণ ভাল লেগেছিল। অসুবিধেও কোনও দিন হয়নি। গেস্ট কই? দু পক্ষেরই আত্মীয়-স্বজন কম। বন্ধু-বান্ধব বেশি। তারা কেউ হঠাৎ থেকে গেলে কোনও সমস্যাই হয়নি। হলটা আলোয় ভাসে। বারান্দা দিয়ে দক্ষিণের হাওয়া আসে অবাধ। শোবার ঘর দুটোই দক্ষিণ খোলা, বিরাট বিরাট ঘর। আসবাব রেখে-টেখেও জায়গা খালি পড়ে থাকে। বুল্টুর বিয়ের রিসেপশন হল এই হল-এ। কোনও অসুবিধেই হয়নি। নীচের ফ্ল্যাটের হলটা খাওয়া-দাওয়ার জন্য নেওয়ার কথা তিনি বলেছিলেন। শর্মিলা বলল—দরকার নেই। বুফে হবে। হল-ময় চেয়ার ছড়িয়ে রাখব। বউ কোথাও বসবে না, ঘুরে বেড়াবে। আর দুদিন করব। একদিন আত্মীয়স্বজন। আরেক দিন বন্ধু-বান্ধব। স্ট্রিক্টলি। তা নয়তো গন্ধগাছা আপ্যায়ন কিছুই ভালভাবে হয় না। এল, ছড়োহুড়ি করে খেল, আর চলে গেল—একদম বাজে ব্যাপারটা। রদ্দি।

ভালই হয়েছিল। কিন্তু যেটা লক্ষণীয় সেটা হল এই নিজের বুদ্ধির বড়াই। কর্তৃত্ব।

ছেলেকে তিনি নরেন্দ্রপুরে হস্টেলে রাখতে চেয়েছিলে।

—না। বাবা-মার কাছে শৈশব-বাল্য না কাটলে জীবনের একটা দিকই অচেনা থেকে যাবে।

হল তো? আঁচলের গিঁট ছাড়িয়ে সে গেল তো চলে শেষ পর্যন্ত।

যাদবপুরেও চান্স পেয়েছিল বুল্টু। শর্মিলার সেটাই ইচ্ছে ছিল। বুল্টুর আর তাঁর দুজনেরই ঝোঁক আই. আই. টি। বুল্টু কি মুখে বলতে সাহস পেয়েছিল না কি? তাঁকে জানিয়েছিল। শর্মিলা কি আর বুঝতে পারেনি? ঠিকই বুঝেছিল, তবু ছাড়বে না। যাদবপুরে গেলে বাড়িতে থাকবে, মায়ের কাছে থাকবে, মায়ের শিশু তৈরি করার সুবিধে হবে।

একটা, একটামাত্র সিদ্ধান্ত জীবনে তিনি নিতে পেরেছেন। তা-ও সে সিদ্ধান্ত পুরোপুরি তাঁর নিজের নয়। ছেলেরও। ঘটনাচক্রে ছেলেরটা তাঁর সঙ্গে মিলে গিয়েছিল এই পর্যন্ত।

দিনের পর দিন রাত করে বাড়ি ফিরছে। ছেলে যাওয়ার পর থেকে। গুম হয়ে আছে। কথা-বার্তা ক্রমশই কমছে। অথচ বাইরের লোক এলেই দিব্যি হাসি। গল্পগাছা। রাগটা বাড়তে বাড়তে ফেটে পড়ার অবস্থায় যে এসে গিয়েছিল সেটা কি তাপসকান্তির দোষ! সিগারেটের পর সিগারেট ফুঁকে যাচ্ছিলেন। রাত্রে খিচুড়ি খেতে পারেন, রবিবার দুপুর একমাত্র যে দুপুরে বাড়িতে ভাত খান, সে দিন মিষ্টি দেওয়া রাঁধাকপি, আলুভাজা, মাছের কোর্মা এ সব খেতে পারেন, আর সিগারেট ফুঁকলেই দোষ? দুমদাম করে এসে সিগারেটটা মুখ থেকে ছিনিয়ে নিল? এমন জোরে যে হাতের গাবদা বালার মুখটা রীতিমতো লাগল এসে গালে। ছড়ে গেল। কী পেয়েছে? তিনি কি রাস্তার লোক? মিনিবাসের লোক? একটা ছেলে-ছোকরা?

তিনি লাফিয়ে উঠে চমৎকার টেবল-ল্যাম্পটা আছড়ে ভেঙে ছিলেন। লাল শেডটা হাত দিয়ে দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছিলেন, নতুন করে সিগারেট ধরিয়ে কার্পেটের ওপর সেটা চেপে ধরেছিলেন, চিৎকার করেছিলেন, জবাবে শুনেছিলেন তাঁর নিষ্ঠুর প্রকৃতির কথা, নষ্ট করেই না কি তাঁর আনন্দ, গড়তে পারেন না, মুরোদ নেই, ভাঙতে পারেন, শর্মিলাকেই না কি ভাঙতে চান, ছেলের আমেরিকাবাসী হবার পেছনে তাঁর মদত। তিনি তখন পা ঠুকেছেন, গর্জন করেছেন, বাড়ি তাঁর, তিনি শর্মিলাকে বেরিয়ে যেতে বলেছেন। কে না জানে তিনি শান্ত মানুষ, কিন্তু রাগলে জ্ঞান থাকে না। একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। দু তিন দিন বাড়িতে খেল না, টেবিলে বসল না। বুল্টুর ঘরে নিজেকে বন্দি রাখল। ভেবেছিলেন আর ক'দিন গেলেই রাগ পড়ে যাবে। কিন্তু মহিলা আট দিনের মাথায় উধাও হয়ে গেল? তিনি কল্পনাও করেননি সে দাদার কাছেও নেই। এখন অবশ্য ভেবে দেখছেন, যে রকম ডেঁটো স্বভাব তাতে করে দাদার বাড়ি যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। যাক গে অবলা তো আর নয়। লেঠেল টাইপের মেয়ে। মানে মহিলা। সাতখানা পুরুষের মহড়া নিতে পারে দরকার হলে। আর তাঁর অসুবিধে গোড়ায় গোড়ায় একটু হচ্ছে। চালিয়ে নেবেন। ঘুরে আসুক কটা দিন। মনে হচ্ছে কলকাতার বাইরে কোথাও চলে গেছে। শান্তিনিকেতন কি ঘাটশিলা।

দিঘাও হতে পারে। এইসব টুকটাক যেতে ভালবাসে। পা তো লম্বা লম্বা। যখন তখন কোথাও না কোথাও গিয়েই আছে।

—পরশু দিঘা যাচ্ছি, বুঝলে?

—বুঝলুম। মানে পুরোপুরি বুঝলুম না।

—আমি, শুক্লা, জয়ন্তী আর পূর্ণা...জাস্ট চারদিন। ফিফথ ডেতে ফিরে আসছি। তুমি যাবে নাকি? তা হলে পূর্ণার হাজব্যান্ডও যায়।

—পা-গল? আমার ছুটি নিলে চলে?

—জানি এ কথাই বলবে।

—শুনছ? এই উইক-এন্ডটা শান্তিনিকেতনে কাটিয়ে আসি।

—এই গরমে? বড্ড জলকষ্ট যে!

—হোক গে। বৈশাখ হে, মৌনী তাপসের রুদ্ররূপ সেটাও তো দেখার জিনিস।

—অগত্যা।

—অগত্যা? বড্ড আয়েসি হয়ে যাচ্ছ। আরাম হারাম হ্যায়। জানো তো? ক্রমশই দেখবে জড়ভরত জরদগব হয়ে যাচ্ছ।

—চললাম। এখুনি ট্রেন ধরতে হবে।

—সে কী? কী ব্যাপার?

—দারুণ একটা সুযোগ এসে গেছে। জয়ন্তীর ননদ সুচন্দ্রা ভূগোলের লেকচারার জানো ত? ওরা এক্সকারশনে যাচ্ছে চাম্বা। কে একজন লাস্ট মোমেন্টে যেতে পারছে না। আমি সেখানে ঢুকে যাচ্ছি।

—সে তো অনেক দূর। এরকম ক' মিনিটের নোটিশে...

—আরে আমার শীতের জিনিস তো সব গোছানোই থাকে। পাঁজা করে তুলে নিলেই হল। ন'দশ দিনের প্রোগ্রাম। সাবধানে থেকো...

—ছুটি?

—আরে গোলি মারো। ছুটি নিয়ে মাথা ঘামাক অফসররা। আমি স্রেফ অসুস্থ হয়ে পড়েছি হঠাৎ...

বেরিয়ে গেল। পায়ে চাকা লাগানো আছে, গড়গড় করে গড়িয়ে গেলেই হল।

ক'দিন পর বাড়ি ফিরে লেটার-বক্সে একটা চিঠি পড়েছে দেখতে পেলেন তাপসকান্তি। এয়ার মেল। খামের ওপর মিস্টার অ্যান্ড মিসেস টি. কে. মুখার্জি। বুল্টুর হাতের লেখা নয় অর্থাৎ ঊর্মি লিখেছে। বুল্টু হলে মিস্টার অ্যান্ড মিসেস টি. কে. মুখার্জি লিখত না। এভাবে তাপসকান্তি আর শর্মিলাকে ব্র্যাকেট করা যায় না। সে মহিলা মিসেস মুখার্জি হলেও হতে পারেন। কিন্তু মিসেস টি. কে. মুখার্জি কখনওই নন। যাই হোক, এটা একটা ঘটনা। চিঠি লিখেছে ঊর্মি, তাঁর নাম যখন রয়েছে, তাঁকে লিখেছে। এবার এই প্রথম চিঠি এল। ফোনেতেই খবরাখবর দেওয়া-নেওয়া হয়ে যায়। পরস্পরের গলার স্বর শোনা যায়। চিঠি লেখার তাগিদটা কমে গেছে। বুল্টু তো একেবারেই লেখে না।

বিকেলের চায়ের ব্যাপারটা আজকাল তুলে দিয়েছেন তাপসকান্তি। অফিস

থেকেই খেয়ে আসেন। জুতো খুলে তাঁর প্রিয় সোফায় বসলেন। সাবধানে খুললেন খামটা। ফিনফিনে কাগজে ফিনফিনে লেখা। এ তো বুল্টুর।

বাবা,

তুমি তো জানোই আমার বরাবরই রিসার্চ-বেজড্ কাজের ওপর ঝোঁক। একটা দারুণ সুযোগ পেয়েছি—আ'য়্যাম সুইচিং ওভার টু টিচিং অ্যান্ড রিসার্চ। ক্যালটেকে জয়েন করছি। একটা সত্তর মিলিয়ন ডলারের প্রজেক্টে থাকব। ভাবতে পারছ তোমার বুল্টু ফিফ্‌থ জেনারেশন কমপিউটারে তার কন্ট্রিবিউশন রাখছে?

...বাবা, তুমি ফিজিক্সের মাস্টার্স করে চিরকাল মার্কেনটাইল ফার্মের কেনাবেচার তদারকি করে গেলে। নিজের কাজ করার কোনও সুযোগই পেলে না। তোমার দুঃখ আমি বুঝি। তোমার ছেলে কিন্তু সেন্ট পার্সেন্ট নিজের পছন্দমতো কাজ করার সুবর্ণ সুযোগ পাচ্ছে। তাই তোমাকেই আগে জানালাম। একই সঙ্গে মা-ও জানছে তাই মাকে এবার আলাদা করে চিঠি দিলাম না। আমি দারুণ একসাইটেড। গর্বিতও বোধ করছি। তোমরাও নিশ্চয় আমার ফিলিং শেয়ার করবে...ভাল কথা হোয়াটস মা আপ টু? সেদিন ফোনে পেলাম না। আমি কিন্তু কথা রেখেছি। কনট্র্যাক্ট রিনিউ করিনি। এই জবটার কথা চেপে ছিলাম। পাচ্ছি কি না পাচ্ছি নিশ্চিত ছিলাম না তো? দেশে গিয়েছিলাম চাকরি ছেড়ে। একেবারে ঝাড়া-হাত-পা হয়ে। বস্টনেও রিসার্চ-উইংএ ছিলাম বটে কিন্তু সে শুধুই মেনটেনান্স। বাবা, মালটিন্যাশন্যালের চাকরি ছেড়ে টিচিং-এ গিয়ে আমার কোনও আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে না। সম্মান তো বাড়ছে বলেই মনে করি। অ্যাসোসিয়েট প্রোফেসর, আমার বন্ধুরা বলছে আমি নাকি লগনচাঁদা ছেলে। উর্মির পয়কেও সাধুবাদ দিচ্ছে অনেকে।

বুল্টু ক্যালটেকের জবের কথা তাঁর কাছে চেপে গিয়েছিলে? নিশ্চিত ছিল না বলে? অদ্ভুত: মন্ত্রগুপ্তি? মা বাবার কাছে? তা হলে যা বলে গেল সেটা তো একরকম মিথ্যে কথাই! মিথ্যে আচরণ! পারল বুল্টু এটা করতে? তাপসকান্তির হঠাৎ মনে পড়ে গেল তিনিও একবার এমন করেছিলেন। চাকরি ছিল না, অনেকদিন ছাত্র পড়িয়ে খরচ চালিয়ে ছিলেন। ঠাকুমা তখন দেশে ফিরে যাবার জন্যে মিনতি করছেন। পাছে ঠাকুমা তাঁর বেকারির সুযোগে আরও শক্ত হয়ে ওঠেন, পাছে তাঁর মিনতি কাকুতি-মিনতির স্তরে চলে যায় তাই তিনিও ব্যাপারটা চেপে গিয়েছিলেন। বুল্টুও কি তাই করল? চাকরি ছেড়ে এসেছে জানলে বাবা-মা বিশেষত মা যদি খুব জোরাজুরি করে তা-ই বলেইনি। তাঁর বুকের মধ্যেটা কী রকম ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা লাগতে থাকল। যেন সেখানে কেউ এক চাঁই বরফ ঢুকিয়ে দিয়েছে। তাঁর পরিস্থিতি আর বুল্টুর পরিস্থিতি কি এক? তাঁর মা-ঠাকুমা আর বুল্টুর মা-বাবা কি এক? তাপসকান্তির মা-ঠাকুমা তাঁদের ছেলে-নাতির মনোজগতের কোনও খবরই রাখতেন না। তাঁদের ছিল পুরনো সংস্কার, নিজেদের ভিটে, বংশ, সম্পত্তির অকাটা মায়া। তার বাইরে যে একটা জগৎ আছে তাঁরা খবর রাখতেন না, রাখতে চাইতেন না। সেখানে কোনও বন্ধু-বান্ধব নেই, কথা বলা যায় এমন মানুষই নেই। তাঁর বিজ্ঞান-পড়া, দর্শন-পড়া, সাহিত্যের দরজায় কড়া-নাড়া মন কীভাবে সেখানে মানিয়ে নেবে? তিনি যে এত কষ্ট করে ফিজিক্সে

এম.এসসি করলেন সেটাই বা কোন কাজে লাগত আউশ-আমনের হিসেব কষতে? হঠাৎ তাঁর ভেতর থেকে কে বলে উঠল—এম.এসসি বিদ্যে সদাগরি আপিসের সেলস ম্যানেজমেন্টেই বা কী কাজে লেগেছে?

সত্যিই, ভেবে দেখতে গেলে সেভাবে কোনও কাজে লাগেনি। কাজে লেগেছে, বহু বই পড়ে আয়ত্ত ইংরেজি-বিদ্যা, কাজে লেগেছে অনেকগুলো পরীক্ষায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কিছু উত্তর যথাযথ লিখে আসার অভ্যাসের দরুন নিজের চিন্তা গুছিয়ে আনার ক্ষমতা, সাধারণভাবে সপ্রতিভতা, যুক্তিশীল মন, কনফিডেন্স। এগুলোর জন্যে যে কোনও বিষয় পড়লেই হত। ফিজিক্স পড়ার দরকার ছিল না। যে কথা বুল্টু তার চিঠিতে লিখেছে। কিন্তু কথাটা তা নয়। কথাটা হল সাতগেছে থেকে কলকাতার দূরত্ব কতটুকু? কলকাতায় নিজের পছন্দমতো কাজ করবার জন্যে কি তাঁকে মা-ঠাকুমাকে ত্যাগ করতে হয়েছিল? তিনি প্রতি মাসে যেতেন, দেখাশোনা করে আসতেন। শর্মিলাও গেছে। শেষের দিকে প্রতি মাসে যেতে পারতেন না। কিন্তু প্রায়ই যেতেন।

চিঠিটা টেবিলের ওপর অ্যাশ-ট্রে চাপা দিয়ে তাপসকান্তি কলঘরে গেলেন। চান-টান করে ন্যাতা ন্যাতা পায়জামা-পাঞ্জাবি চাপালেন। ভাল পরিষ্কার হয়নি। তাঁর অভ্যাস, মাড় দেওয়া ইস্ত্রি করা টাটকা জামা-কাপড় পরা। সেসব শুধু চায়নার দ্বারা হয় না, তাকে নির্দেশ দেওয়াটাও অন্তত চাই। সে কথা কি আর তাঁর মনে থাকে? খুব ইচ্ছে করছে এক কাপ চা খেতে। কিন্তু করতে ইচ্ছে করছে না। রাতের রান্নাপত্র তো করতে হবে? আচ্ছা টি ব্যাগ? টী ব্যাগ কিনলে তো হয়! অনেক হাঙ্গামা কমে যায়। কিন্তু এই রাতের রান্নাটা। বিশেষত রুটি-ফুটি তিনি করতে পারেন না। টোস্ট চালাচ্ছেন কদিন। ভালও লাগে না। অথচ উপায়ই বা কী?

তাপসকান্তি ঠিক করলেন তিনি এবার থেকে রাতে ভাত খাবেন। ভাতে ভাত। দিনের বেলায় অফিসে স্ট্রিক্ট ডায়াবিটিক ডায়েট। রাতে এক মুঠো ভাত। ব্যস মিটে গেল। হঠাৎ তাঁর মনে হল না, তিনি ঠিক ভাবেননি। মাইলের হিসেব করলেই সাতগেছে-কলকাতার দূরত্ব বোঝা যাবে না। সাতগেছেবাসী মা-ঠাকুমার সঙ্গে কলকাতাবাসী তাঁর দূরত্ব বস্টন-কলকাতার চেয়েও বেশি ছিল। ঠাকুমাদের বিশ্ব থেকে তিনি বহুদূরের বিশ্বে বাস করতেন। দুই বিশ্বের মধ্যেও কোনও যোগাযোগ ছিল না। তিনি যখন সাতগেছে যেতেন, দুই বিধবা কী করবেন ভেবে পেতেন না। ঠাকুমা হয়তো বললেন—অত দিনের তেঁতুল গাছটা পড়ে গেল রে ধন।

তিনি মুখ তুলে তাকিয়েছেন—চোখ দুটো ফাঁকা। —কিচ্ছু ধরতে পারছেন না। কোন তেঁতুল গাছ?

—তুই দেখিসনি? —ঠাকুমার চোখে ব্যথা—ওই তো রে, বাগানের দক্ষিণ কোণে, পেয়ারা গাছটার উলটো দিকে...

—ও হ্যাঁ হ্যাঁ...

—থাক তোকে আর ভাণ করতে হবে না, কিচ্ছু বুঝিসনি।

—আরে এতে না বোঝার কী আছে? ম্যাক্সওয়েলের থিয়োরি তো আর নয়। একটা তেঁতুল গাছ পড়ে গেছে এই তো?

—ওরে না না, একটা তেঁতুল গাছ নয়, তোর বুড়ো ঠাকুরদাদার হাতে পোঁতা তেঁতুলগাছ। যা থেকে আমাদের সম্বচ্ছরের তেঁতুল আসে। ও গাছ আমরা জমা দিই না।

—গেল কী করে?

—কে জানে, ইঁদুরে, পোকায় খেয়ে খেয়ে শেকড় আলগা করে দিয়েছিল বোধহয়। কালবোশেখ আসতে না আসতেই ধপাস করে পড়ে গেল।

মা এই সময়ে নিয়ে আসতেন তাঁর জলপানের কাঁসি। টাটকা ভাজা গরম গোল গোল মুড়ি ঘানিভাঙা সর্ষের তেল দিয়ে মাখা, তাতে ভেজানো ছোলা, আদার কুচি, চাকা চাকা করে কাটা বোম্বাই আম, নারকেল নাড়ু।

—ওকে ও সব তেঁতুল-টেঁতুলের কথা বলে কী হবে মামুই। ও বুঝবে না, তার চেয়ে দুটি খেয়ে নিক।

—চাটা ভাল করে করো বউমা।

—তোমরা খাবে না চা?

—আমরা? এখনও সন্ধে আহ্নিক কিছুই যে হয়নি ধন।

—আমারও তো হয়নি।

—ব্যাটাছেলের কিছুতে দোষ নেই।

এই কথাটা মা-ঠাকুমার মুখের বুলি ছিল। শুনলে শর্মিলা বড় রেগে যেত। বলত—বুঝি, মা অন্যরকম সংস্কারে, অন্য বিশ্বাসে মানুষ। একটা আলাদা পুরনো জগৎ। মায়ের কোনও দোষ নেই। তবু আমাদের রক্তও এমন হয়ে গেছে যে কথাটা শুনলেই রাগ ধরে।

তিনি বলতেন—তা হলেই দেখছ, কেউ সংস্কার কাটাতে পারে না, সে গ্রাম্য বিধবাই হোক আর শহুরে চাকরি-করা মেয়েই হোক।

—এটা কি সংস্কার? বিশ্বাস শুধু? এটা খোলা চোখে দেখা।

—তুমি নিজেই তো রক্তের কথা তুললে শর্মিলা।

—তা অবশ্য। মনের ভেতর কোথায় কী কেমন ভাবে বাসা বেঁধে আছে, তার হদিশ করা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কর্ম না।

তাপসকান্তি টেবিল থেকে চিঠিটা তুলে নিয়ে শোবার ঘরে চলে গেলেন। খাটের মাথার দিকে দুটো বালিশ পরপর দিয়ে তার ওপর আধশোয়া হয়ে চিঠিটা খুললেন আবার। আরও একটা কাগজ। উর্মি লিখেছে। মাকে। তা হলে? এটা কি তিনি পড়তে পারেন? এর আগে যত চিঠি ওদের এসেছে সবই দুজনে পড়েছেন, এক এয়ার লেটারেই আসুক আর দুই আলাদা কাগজেই আসুক। কিন্তু এখন? বর্তমান পরিস্থিতিতে? তিনি অনেক ভেবেও স্থির করতে পারলেন না। তারপর, অনেক পর একটা খামে পুরো চিঠিটাই ভরে, শর্মিলার অফিসের ঠিকানা লিখলেন। নিজেরি চিঠিটা বার করে নেওয়া উচিত কি না ভাবলেন বেশ কিছুক্ষণ। কিন্তু বুল্টু একটা জরুরি খবর দিয়েছে। তাঁকে সম্বোধন করে লিখলেও সেটা দুজনের প্রতিই উদ্দিষ্ট। উর্মি যদি ওটার কথা বলে থাকে তা হলে বুল্টুর চিঠিটাও দেবার কোনও দরকার হয়

না। কিন্তু উর্মি কী লিখেছে তিনি জানেন না। কী দরকার বাবা। ঠিকানা লিখে, আঠা দিয়ে সেঁটে সঙ্গে সঙ্গেই সেটা নিজের ব্রিফ কেসে তুলে রাখলেন, যাতে পোস্ট করতে ভুল না হয়।

সাড়ে নটা বাজল। তাপসকান্তি উঠে পড়লেন। প্রেশার কুকারের বাটিতে একসঙ্গে চাল ডাল আলু চাপিয়ে দিলেন কী মনে করে। দশটা নাগাদ খিচুড়িটাতে এক চামচ ঘি ঢেলে, বসলেন খাবার টেবিলে। বেশ খেতে হয়েছে। খিচুড়ি জিনিসটা তাঁর খুবই পছন্দ। তিনি টেবিলের কোণে রাখা চাটনির বোতল থেকে এক চামচ চাটনি ঢালবেন, আমের না তেঁতুলের কে জানে! কিন্তু খিচুড়ির সঙ্গে জমে ভাল। কদিন উপর্যুপরি টোস্টের পর মুখটা ছেড়ে গেল একেবারে। খেতে খেতে হঠাৎ পাথরের মতো জমে গেলেন তাপসকান্তি। এই খিচুড়ি উপলক্ষ্য করেই সেদিন শর্মিলার সঙ্গে তাঁর মন কষাকষি চরমে উঠেছিল। সেদিন খিচুড়িটা সম্ভবত আরও ভাল হয়েছিল। কিছু মশলাপাতি ফোড়ন টোড়ন ছিল যেগুলো তিনি জানেন না বা ভুলে গেছেন। অথচ...

—আপনি আজ সাউথের দিকে শর্মিলাদি!—রূপম জিজ্ঞেস করল।

—একটু কাজ আছে ভাই।

শর্মিলার মনে হল রূপম টালিগঞ্জ স্টেশনে নামবে। তিনি রাসবিহারী। আবার কৌতূহলে ওঁর সঙ্গে নেমে না পড়ে। তাঁর ভাবান্তর, মেজাজ খারাপ, এ সব ওরা বুঝতে পারছে। সবটাকেই একমাত্র ছেলের বিদেশ-বাস জনিত বলে ধরে নিয়েছে। নিক। শর্মিলা কেন কে জানে কাউকে এই দারুণ গুরুত্বপূর্ণ সংবাদটা দিতে পারেননি। ওপর-পড়া হয়ে দেবার তো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু তিনি বুঝতে পারছেন তাঁর ভেতরে একটা লজ্জা, শঙ্কা, অপমানবোধ তৈরি হয়েছে যা তাঁর ঋজু, অকপট স্বভাবের সঙ্গে মানায় না।

রূপম বলল—আপনি কোথায় যাবেন?

—বসন্ত রায় রোড।

—আরে ওর পাশেই পরাশর রোডে তো আমার মামার বাড়ি।

শর্মিলা মনে মনে বললেন—সর্বনাশ। আজ আর মামার বাড়ি যেতে চেয়ো না রূপম, লক্ষ্মীটি ভাই।

তিনি প্রসঙ্গ পালটাবার জন্যে শুক্লার কথা তুললেন।

—শুক্লার বাইপাসটা কবে নাগাদ হবে বলো তো?

—শুক্লাদি তো কিছুতেই রাজি হচ্ছে না। ডাক্তার বলছেন এখন ভাল আছেন। তবে ওটা না করলে...

—রাজি করাও।

—আরে শর্মিলাদি, আমরা কে? আসল তো সমরদা। সমরদারই তো উদ্যোগ নেওয়া উচিত। উনি কেমন মিইয়ে পড়ছেন। দুই ছেলের একজনও এখনও দাঁড়ায়নি, পড়ছে। মেয়ের বিয়ে বাকি। অফিস তো একটা সার্টেন পার্সেন্টেজ দেবে। বাকিটা...উনি ঘাবড়ে যাচ্ছেন।

শর্মিলা শুকনো গলায় বললেন—রূপম, এটা তো শুধু সমরবাবুর স্ত্রীর প্রাণ নয়। একটা উপার্জনশীল মানুষেরও প্রাণ। শুক্লার অন্য মূল্য ছেড়ে দিলেও সে তো প্রতি মাসে ছ সাত হাজার টাকা ঘরে আনছে।

রূপম চট করে শর্মিলার দিকে একবার সন্ধানী চোখে তাকাল। বলল—ঠিক। ঠিকই বলেছেন শর্মিলাদি। সমরদা বোধ হয় লাভক্ষতির হিসেবটা কষছেন এখন।

শর্মিলা ধীরে ধীরে বললেন—যুবতী শুক্লাকে তোমাদের দেখার কথা নয় রূপম। কী প্রাণবন্ত মেয়ে যে ছিল! ভীষণ অ্যাট্রাকটিভ, অ্যাপিলিং, ইউ নো হোয়াট আই মিন...। কত যে অ্যাডমায়ারার ছিল ওর। ও যখন সমর বিশ্বাসকে বিয়ে করল, আমায় কী বলেছিল জানো?

কী শর্মিলাদি—রূপম একটু কাছে ঘেঁষে বসল।

শর্মিলা বললেন—ও বলেছিল সবাই আমার রূপমুগ্ধ, একমাত্র সমর বিশ্বাসই গুণের কদর করে। তাই ও কনিষ্ঠ কেরানি হলেও ওকেই বিয়ে করব।

রূপম মুখ নিচু করে রইল।

শর্মিলা মুখে একটা করুণ বিদ্রূপের হাসি টেনে এনে বললেন—শুক্লার অ্যাসেসমেন্টে তাহলে ভুল ছিল। বলছ?

রূপম অস্বস্তিভরা চোখে চেয়ে বলল, না, না, শর্মিলাদি এভাবে সব কিছু সিমপ্লিফাই করা যায় না। দেখছি, আমি দেখছি কী করা যায়।

শর্মিলার স্টেশন এসে গেছে। তিনি নেমে গেলেন। মুহূর্তে রূপমকে নিয়ে ট্রেন দূরে চলে গেল। সেদিকে তাকিয়ে শর্মিলা মনে মনে বললেন—এটাই সত্য রূপম, স্বীকার করো বা না করো। দেহপট সনে শুধু নট নয় সবাই বিশেষ করে মেয়েরা সবই হারায়। নিশ্বাস ফেলে তিনি সিঁড়িতে উঠতে লাগলেন।

বাড়িঅলা ভদ্রলোক মাঝবয়সী। বাগানে বসে আছেন একটা ফোল্ডিং চেয়ার পেতে। উনি এটাকে লন বলেন। যদিও এলোমেলো বেড়ে-যাওয়া কিছু ঘাস, ঘাস ফুল আর এবড়ো খেবড়ো মাটি ছাড়া এই জায়গাটায় লনত্ব কিছু নেই।—'ম্যাডাম এসে গেছেন? বাঃ।'

শর্মিলা ফিকে হেসে, বারান্দার তালা খুললেন। ঘরের তালা খুলতেই আবছা অন্ধকারে দেয়ালে রাখা মাঝারি আয়নাটায় তাঁর মুখটা ধরা পড়ল। পাকা সেই ছোট চুল এখন সারাদিনের ঘামে-পরিশ্রমে লেপ্টিয়ে আছে। তাঁর ফরসা রঙে জায়গায় জায়গায় একটি ফিকে খয়েরি ভাব এসে গেছে। সবাই বলে ফরসা রং, কাঁচা পাকা চুলে তাঁকে দারুণ মানায়। তিনি জানেন রঙের সেই মোমবাতি পেলবতা। সেই দ্যুতি আর নেই। ম্যাটিমেটে সাদা রং। তাঁর নিজের অসহ্য লাগে নিজেকে দেখতে।

জানলা খুলে দিলেন শর্মিলা। চানঘরটা এত ছোট যে এপাশ ওপাশ ফিরতে দেয়ালে পা ঠেকে যায়। হাত-পা ধুয়ে, জামা-কাপড় বদলে, তিনি চা চাপালেন, এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে চার কাপই দিলেন। পুরো পট চা তৈরি হল। এবার তাঁকে ওই লনে যেতে হবে। গ্রীষ্মের দিনে ওইখানে বসে চা খেতে খুব ভাল লাগে। কিন্তু এই অবসরপ্রাপ্ত বিপত্নীক বাড়ি-অলা সারাদিন তাঁর শয্যাশায়ী মায়ের সেবা করে ক্লান্ত

হয়ে এ সময়টা এখানেই বসে থাকেন। শর্মিলা ইচ্ছে করলেই বারান্দায় বসে চাটা খেয়ে নিতে পারেন। কিন্তু কেমন বাধো-বাধো ঠেকে।

পট এবং মগসুদ্ধ ট্রেটা নিয়ে যেতেই ভদ্রলোক লাফিয়ে উঠলেন। আরে আরে কী করেন ম্যাডাম। এভাবে রোজ রোজ...

তিনিই দৌড়ে গিয়ে বারান্দা থেকে আরেকটা চেয়ার, বেতের হালকা টেবিল এ সব নিয়ে এলেন। রোজই উনি অপ্রস্তুত হন। রোজই চায়ের জন্যে অপেক্ষা করে থাকেন।

প্রথম চুমুকটা দিয়েই বললেন—আহ। আমার মিসেস এই রকম চা করত। লোকের হাতে মাছের ঝোল, স্টু, চা—এগুলো ঠিক উতরোয় না। বলুন।

শর্মিলা বললেন—ট্রেনিং দিতে হয় একটু। আপনি নিজে পারেন না? আরেকটু হলে বলে ফেলেছিলেন—আমার স্বামী খুব ভাল পারেন। কষ্টে সামলে নিলেন।

ভদ্রলোক বললেন—চা? করব আমি? জীবনে কখনও রান্নাঘরে ঢুকিনি ম্যাডাম। এখন লোকের ওপর নির্ভর। বিশ্বাসী-টিশ্বাসী সবই তবু...ওই...বুঝলেন তো...বিমর্ষ হয়ে যেতে লাগল ভদ্রলোকের গলা।

শর্মিলা বুঝলেন। স্ত্রী চলে গিয়ে ভদ্রলোকের ভোজনবিলাসটি একেবারে গেছে। তাঁকে তা হলে নিয়মিত চা সরবরাহ করতে হবে? নিজের স্বামীকেই কটা দিন সহকর্মিণীর অসুখের জন্য ব্যস্ত থাকায় চা দিতে পারেননি বলে নিজের বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। এখন কি পরের স্বামীকে চা খাইয়ে বাসা-বাড়িটি বজায় রাখতে হবে? ওই দশ ফুট বাই দশ ফুট?

অমন ভাল চাটা তেমন সময় নিয়ে, তারিয়ে তারিয়ে খেতে পারলেন না শর্মিলা। বাচ্চা ছেলের দুধ খাওয়ার মতো ফুঁ দিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি শেষ করলেন। ভদ্রলোকের তখন অনেক বাকি। শর্মিলা উঠতে উঠতে বললেন—'আমি উঠছি। দরকারি কাজ আছে। আপনার হয়ে গেলে কাইন্ডলি বাসনগুলো পৌঁছে দেবেন—আর চেয়ারটা আর টেবিলটা...

—নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই—একটু বেশি জোর দিয়েই বলে উঠলেন বিনোদবাবু নামে ওই ভদ্রলোক।

শর্মিলা ভেতরে চলে গেলেন।

তাঁকে যদি চা খাওয়াতে হয়, তো বিনোদ দত্ত বাসন তুলুন, চেয়ার তুলুন। টেবিল তুলুন।

যদিও সব পরিষ্কারই আছে তবু সব একবার ভাল করে ঝাড়লেন শর্মিলা। মেঝের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। না, এখন আবার উবু হয়ে ঘর মোছা তাঁর পোষাবে না। রাত্রের খাওয়ার জন্য হাতে-গড়া রুটি ক্যানটিন থেকে করিয়ে নিয়ে এসেছেন প্লাস্টিকের প্যাকেটে। খাবার সময় একবার ফুলিয়ে নিলেই হবে। মাছের হাঙ্গামা বাড়িতে করেন না। সকালে দুবেলার মতো চিকেন করা আছে। সকালে শুধু আলু-ঝোল খেয়ে গেছেন টোস্ট দিয়ে, এবেলা মাংসটা খাবেন। কাজেই গরম করা ছাড়া কাজ বিশেষ নেই। জামা কাপড় কেচে তারে মেলে দিলেন। কখন

এক সময়ে বিনোদবাবু চায়ের বাসন রেখে গেছেন, সেগুলো ধুয়ে তুললেন। স্যুটকেস থেকে পরের দিন পরবার শাড়ি-টাড়ি বার করে হ্যাঙারে টাঙিয়ে রাখলেন দেয়ালের পেরেকে। শশা কেটে রাখলেন। থলি থেকে ইনস্ট্যান্ট চাউয়ের প্যাকেট বের করলেন একটা। কালকে এটাই ব্রেকফাস্ট হবে।

তারপর যখন দেখলেন রাত বেশ ঘন হয়েছে, তারাগুলো চুমকি-ঝিকমিক করছে, তখন বারান্দার গ্রিলে তালা লাগিয়ে বারান্দায় চেয়ারে বসে রইলেন। ক'দিন আগে বুল্টু উর্মির চিঠি পেলেন। অফিসের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়েছেন তাপসকান্তি। বুল্টু ক্যালিফর্নিয়ায় যাচ্ছে। ওর মনোমতো কাজ পেয়েছে নাকি। ভাল। খুব ভাল। তিনি বোঝেন না। ভিন্ন মহাদেশেই যখন থাকবে তখন ম্যাসাচুসেটস আর ক্যালিফর্নিয়ায় কী-ই বা তফাত? তিনি চিঠিটা পড়েছেন অর্ধেক মন দিয়ে। উর্মি লিখেছে, মা, দ্যাখো না, দেখে দেখে এমন কাজ নিল যে আমাদের গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন দেখার পরিকল্পনাটা আর দু-এক বছরে হবে না মনে হচ্ছে। এদের এখানে অ্যাকাডেমিক লাইন ভীষণ কমপিটিটিভ। সব সময়ে আপ-টুডেট। সব সময়ে কাঁটা হয়ে থাকতে হয়। তোমার ছেলে বেছে বেছে সেটাই নিল। আমার ইন্টারেস্ট কী বলো তো? মহাদেশটা তার সমস্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সমেত দেখি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। তবে একটা জিনিস। আমাদের ঘোরার প্ল্যানটা যখন পেছিয়েই গেল, তোমরা এলে হবে। মা নেক্সট ইয়ারেই মনে হয় তোমাদের আনতে পারব। প্লিজ, পাসপোর্টগুলো রেডি করে রাখো। আমি আপাতত একটা ব্যাংকে কাজ করছি। ছাড়তে একটু অসুবিধে আছে। বুল্টু আগে একাই ক্যালিফর্নিয়া যাবে। আমি হয়তো মাস তিন চার পরে যাব। ফোনে তোমার গলা না শুনে সেদিন খুব বাজে লেগেছে। বাবাও এমন দুম করে লাইনটা কেটে দিল যে মনে হল আমাদের সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করতে চায় না। কোনও গেস্ট এসেছিল বোধহয়। তুমি কদিন মামার বাড়ি রইলে? এমনিতে তো অতো চ্যাঁ-ভ্যাঁ সইতে পারো না বলো। যাক ভালই করেছ। পথের কাঁটা দূর হয়ে গেছে এখন দুজনে খুব প্রেম করছ নিশ্চয়। বুল্টুর যেমন, আমারও তেমন একটা খবর আছে, একেবারে নিশ্চিত হয়ে জানাব। ভাল থেকো। শিগগিরই আবার ফোন করব। চিঠিও লিখব। ফোনের সময়ে থেকো কিন্তু। তোমার গলা জড়িয়ে পাঁচটা সাতটা চুমু খাচ্ছি—ইতি উর্মি।

এই চিঠিদ্বয় তাপসকান্তি নামে ভদ্রলোক নিশ্চয় পড়েছেন। পড়ে ভিন্ন খামে পুরে তাঁর অফিসের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। বাস। কর্তব্য চুকে গেল। শর্মিলা হিসেব করে দেখলেন আগামিকাল বা পরশু ওদের একটা ফোন আসতে পারে। করে ভোরবেলায়, তখন রেট কম। সে সময়ে তাঁর পক্ষে কাঁকুড়গাছির ফ্ল্যাটে উপস্থিত থাকা একেবারেই অসম্ভব। তাহলে? তাহলে আর কী। সেই ভদ্রলোক বুঝুক। একবার তো মামাবাড়ি গেছে বলে ভুজুংভাজুং দিয়েছে। এবার কী বলবে?

তাঁকে কালই এয়ারলেটার কিনে একটা চিঠি লিখে ফেলতে হবে। ঘুম আসবার আগে পর্যন্ত মনে মনে তিনি চিঠিটা লিখতে লাগলেন।

স্নেহের বুল্টু,

ক্যালটেকেই যাও, এম. আই. টিতেই যাও আর বার্কলিতেই যাও আমার মতো

মুখ্যু মহিলার কাছে সবই সমান। নিজে যাতে শান্তি পাও, সমৃদ্ধি হবে বলে মনে করো তাই কোরো। তাই কোরো। শুধু ঠিকানাবদলগুলো জানাতে ভুলো না। চিঠিগুলো পাঠাতে ভুলো না। আমাকে আর ফোনে পাবে না। আপাতত এই ঠিকানায় চিঠি দিয়ো। পরে, বদলালে আমি জানাব। স্নেহ জেনো।

স্নেহের উর্মি,

বুল্টুর চিঠিতেই যা বলার বলে দিলাম। নতুন করে তোমাকে আর কী বলব? তোমার বিশেষ খবরটা অনুমান করতে পারছি। অবশ্য অনুমান অভ্রান্ত না-ও হতে পারে। ভাল। খুব ভাল মুখুজ্জেদের নাতি-নাতনি বিশ্বমানব-বিশ্ব মানবী, মার্কিন নাগরিক। কত নতুন দুয়ার, নতুন দিগন্ত। দেশে বসে আমরা তার সৌভাগ্যের সবটা কল্পনাও করতে পারব না। আমার পাসপোর্ট রেডি আছে। ভিসাটাই যা আসা বাকি। আশীর্বাদ রইল।

খুব নীরস, রূঢ়, খানিকটা অভিমানী চিঠি হয়ে গেল। দূরে বসে রয়েছে। খুব কষ্ট হবে ওদের। এইভাবেই হয়তো হৃদয়ের বন্ধন একটু একটু করে কেটে যাবে। না, চিঠিটা একটু বদলাতে হবে। এখনও তো আর লিখে ফেলেননি। কিন্তু ওদের ভালবাসা হারাবার ভয়ে তাঁর সত্য অনুভূতি তিনি লুকোতে চান না।

মাঝ রাত্তিরে কী সব এলোমেলো গা ছমছম করা স্বপ্ন দেখে শর্মিলা ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলেন। উর্মি যেন এমপায়ার স্টেট বিল্ডিং-এর ওপর থেকে তাঁদের ডিভোর্সের ডিক্রি জারি করছে। স্বপ্নের এমপায়ার স্টেট বিল্ডিং অবশ্য ইউসিসের নতুন বাড়িটা। উর্মিও উর্মি নয়। তাঁদের পাড়াতেই ঈক্ষা বলে একটি অ্যাডভোকেট আছে, আবছা হলেও সেই মেয়েটি।

উঠে বসে শর্মিলা দেখলেন তিনি খুব ঘেমে গেছেন। পাশে জলের গ্লাসটা জানলার সরু গ্রিলে রাখা থাকে। তিনি জল খেলেন, বাথরুমে গেলেন। সত্যিই, বুল্টু-উর্মিই তাঁদের দুজনের জীবনে এই ভয়ানক অধৈর্য, বিচ্ছিন্নতা, ক্রোধ এনে দিল। দুজনেরই এই ফেটে পড়া, এর পেছনে কাজ করছে বুল্টুদের নিয়ে মানসিক যন্ত্রণা। একমাত্র সন্তান বাবা-মাকে বেশ ভাল জিনিসই দিল, বাঃ। ভদ্রলোকই বা কী! তিনিও চলে এলেন, সে-ও একটা খোঁজ খবর পর্যন্ত নিল না? তিনি কোথায় আছেন? কেমন করে আছেন? তিনিও অবশ্য নেননি! কিন্তু তিনি তো আর কারুকে বাড়ি থেকে বার করে দ্যাননি। তাঁর দায় কম।

দ্বিতীয়বার ঘুমোবার চেষ্টায় এপাশ ওপাশ করতে লাগলেন শর্মিলা। বুকের ভেতরটা পুড়ছে, পুড়ছে, এ যেন সীতার অগ্নিপরীক্ষার আগুন। কিন্তু এই আগুন থেকে তিনি অক্ষত বেরিয়ে আসতে পারবেন না। অবশেষে শেষ রাতে সেই আগুন দুচোখ দিয়ে বেরিয়ে এল। গরম অশ্রু জল হয়ে। শর্মিলা হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলেন। শিশুকালের পর জীবনে এই প্রথম। না, না, ঠাকুমা মারা যেতে খুব কেঁদেছিলেন। বড্ড প্রিয় ছিলেন ঠাকুমার। মা মারা যেতে, বাবা মারা যেতে, দাদা তাঁর চেয়ে বেশি ভেঙে পড়েছিল। তখন তিনি কত কী সামলেছেন। অভ্যাগতদের চা দেওয়া। খাবারের ব্যবস্থা করা, কোথায় মটর ডাল, কোথায় নিমপাতা, পুরোহিতের

সঙ্গে কথা-বার্তা বলা। তখন তাঁর বিয়ে সবে হয়েছে। দাদার হয়নি। মা-বাবা ছমাসের আড়াআড়ি মারা গেলেন। সবাই বলল সীতা-বিসর্জনের পর কী আর রামচন্দ্র থাকতে পারেন? হবেও বা। দাদা বেচারার তখন আপনজন বলতে কেউই নেই। তিনিই এক বছরের মাথায় দাদার বিয়ে দিলেন। চোখ মোছেন আর টাটকা চোখের জল আবার বেরিয়ে আসে। তা হলে এ হঠাৎ-রাগের মাথায় বলা কথা নয়। ওই লোক ভেবে-চিন্তে জেনে-শুনেই সব বলেছে, করেছে। নিজের সিদ্ধান্তে সে তা হলে অটল। তিনি যখন বেরিয়ে এসেছিলেন, তাঁরও কি আশা ছিল তাপসকান্তি তাঁকে খুঁজে পেতে ডেকে নেবেন তারপর পুষ্পক রথে চড়িয়ে...এই সেই জনস্থান মধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরি...ইত্যাদি বলতে বলতে বাড়ি নিয়ে যাবেন? তখন তো এই অপমানের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড থেকে বেরিয়ে আসা ছাড়া দ্বিতীয় কোনও উদ্দেশ্য, দ্বিতীয় কোনও ইচ্ছা ছিল না? সে ইচ্ছেটা পরে তা হলে ধীরে ধীরে তৈরি হয়েছে? সীতারা তা হলে এখনও আছে? অগ্নিপরীক্ষার পরও কটুভাষী মানুষদের বুকে ফিরে যেতে চায়? যে যেতে চায় সে যাক। শর্মিলা ঘোষ মুখার্জি যাবেন না। অবচেতনের ওপর তো তাঁর হাত নেই। কিন্তু সচেতন মনোভূমিতে তিনি আজও অনমনীয়, দৃঢ়। তাঁর সিদ্ধান্ত টলবে না। কষ্ট আছে, ব্যথা আছে। যন্ত্রণা দারুণ। তা তো তিনি অস্বীকার করছেন না। কষ্ট না থাকলে সিদ্ধান্তটারও তেমন বীরত্ব থাকত না। আছে বলেই তিনি বিশিষ্ট, তাঁর যন্ত্রণা বিশিষ্ট, তাঁর সিদ্ধান্ত বিশিষ্ট।

চিঠিটা পরদিন লিখেই ডাকে ফেললেন শর্মিলা। শত চেষ্টাতেও পাতা ভরাতে পারলেন না। ছোট, ঠোঁট-টেপা চিঠি হয়ে গেল। কী করবেন? সবই যেমন-যেমন ভেবেছিলেন কত কাল তেমনই লিখলেন। খালি 'তোমাদের যাত্রার পর আমার ঠিকানা অনিবার্য কারণে আলাদা হয়ে গেছে'—এই লাইনটা লিখেও কেটে দিলেন। আর ভাবতে পারছেন না। বুল্টু-উর্মি কচি শিশু নয়। যা ভাবে ভাবুক। বা কী ভাবে দেখা যাক।

জয়ন্তী টেবিলের ওপর কনুই দিয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে বলল—'শর্মিলাদি বসন্তরায়ে থাকছ কেন গো আজকাল?'

চমকে উঠে শর্মিলা বললেন—কে বলল?

—সে তুমি চিনবে না। গলা নিচু করে বলল—'আমাকেও বলবে না।

জয়ন্তী এমন বিশেষ কে যার জন্য ওকেও না বলার অভিমান? শর্মিলা বুঝতে পারলেন না।

বললেন—'ইচ্ছে হল, কদিন...

রূপম এগিয়ে আসছে দেখে তিনি ফাইলের মধ্যে ডুবে গেলেন। জয়ন্তীকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে। জয়ন্তী সোজা হয়ে দাঁড়াল। চোখে দুঃখ-দুঃখ ভাব। নিজের টেবিলে ফিরে যাচ্ছে। কিন্তু ওইখান থেকে সারাক্ষণ নজর রাখবে। এই প্রশ্ন ও সদুত্তর না পাওয়া পর্যন্ত করেই যাবে। করেই যাবে। এবং সঠিক উত্তরটা পাওয়ার পর বেশিদিন অপেক্ষা করবে না, সবাইকে ঠারেঠোরে, নানান উচ্চারিত, অর্ধোচ্চারিত কথায় অনুচ্চারিত হাবে-ভাবে জানিয়ে দেবে। শর্মিলা মনশ্চক্ষে দেখছেন সবাইকে।

অফিসের এই বড় হলঘরের সব টেবিলের সব্বাই একযোগে তাঁর দিকে ফিরে তাকিয়েছে। জোড়া জোড়া চোখ, কিউবগুলো থেকে অফিসাররা বেরিয়ে আসছে, সুইংডোর আধখোলা। সব হাঁ করে দাঁড়িয়ে। তাঁর একবার মনে হল সত্যিই তো জীবনে কোনও জিনিস নিয়ে লুকোছাপা করেননি। তাঁর জীবনটা খোলা পাতার মতো সবার কাছে। ভীষণ ইচ্ছে হল তিনি টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে ওঠেন। শুনুন কমরেড্স, তেসরা সেপ্টেম্বর ত্রিরানব্বুই সাল, রাত দশটা নাগাদ আমার স্বামী শ্রীলশ্রীযুক্ত তাপসকান্তি মুখোপাধ্যায় আমাকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করেন। এবং যেহেতু ওই বাড়ি, তাঁহারই অর্থে কেনা, তাঁহারই নামে দলিল, সেহেতু আমি তাহার দিন সাতেক পর বসন্ত রায় রোডের একটি বাড়ির একতলায় দশ ফুট বাই দশ ফুট একটি ঘরে বসবাস করিতেছি। আপনাদের কৌতূহলের নিরসন হইল? বাকি কয়েক মাসের জন্য যথেষ্ট মানসিক খাদ্য বা চাটনি পাইলেন?

রূপম বলল—শর্মিলাদি..

শর্মিলা চমকে মুখ তুললেন।—'শর্মিলাদি প্লিজ, অপবিত্র কৌতূহল মনে করবেন না। আপনাকে এক ভদ্রলোক কদিন ধরেই বার বার ফোন করছেন। নাম বলছেন না—আপনার ঠিকানাটা জানতে চান। কাঁকুড়গাছির ঠিকানা দিয়ে দিয়েছি, তাতেও সন্তুষ্ট হচ্ছেন না। স্বরাজ বলছে ওটা তাপসদার গলা। এখন...মানে আমরা আপনাকে...আপনাদের হেল্প করতে সবসময়ে প্রস্তুত। কী ব্যাপার বলুন তো!

—কী আবার ব্যাপার হবে? নীরস গলায় কথাটা বলে শর্মিলা আরেকটা ফাইল টেনে নিলেন।

—তাপসদার গলা নয়?

—হাউ ডু আই নো?

—কাঁকুড়গাছি ছাড়া অন্য কোথাও আপনাদের বাড়ি আছে? ইনকাম-ট্যাক্সের ফেরে পড়লেন না কি?

ঠোঁট উল্টোলেন শর্মিলা। হাতের একটা ভঙ্গি করলেন—বললেন—নিজের কাজ করো গে যাও রূপম। সেকশান-ইন-চার্জের সঙ্গে ইয়ার্কি মেরো না।

ঠাকুমা মৃত্যুর সময়ে অনবরত শূন্যে হাতড়াচ্ছিলেন। 'ধন...ধন কইরে ধন?' মা তাঁকে এগিয়ে দিচ্ছিলেন। তাপস মৃত্যুপথযাত্রিণীর দুহাতের আলিঙ্গনের মধ্যে বসে বারবার বলছিলেন 'এই তো আমি ঠাকুমা, এই তো ধন?

—তবুও 'ধন...ধন...কইরে? ঠাকুমা ফুকরে উঠছিলেন।

মা শেষবারের মতো বলেন—'ধন আপনার মুখে গঙ্গাজল দিচ্ছে মামুই!' গঙ্গাজল গড়িয়ে পড়ল, আলিঙ্গন শিথিল হয়ে গেল। ঠাকুমার অন্বেষণ শেষ হল।

খুব শক্ত ধাতের মহিলা ছিলেন। নাতিকে তিনিই মানুষ করেছিলেন। তার যখন সিদ্ধান্ত নেবার বয়স হয়নি, তখন সিদ্ধান্তগুলো তিনিই করে দিয়েছিলেন। মা নয়। মায়ের একটা দুর্বল ভালবাসা ছাড়া আর কিছু ছিল না। এখন তাপস বুঝতে পারছেন মৃত্যুপথযাত্রিণীর ওই শূন্য হাতড়ানোর প্রকৃত মানে। না থাকে, নেই নেই। কিন্তু আছে

অথচ তার ভাষা জানি না, মন বুঝি না—এ বড় ভয়ঙ্কর। যে ধনকে তিনি ছাড়লেন, লেখাপড়া শিখে বড় মানুষ হয়ে আসার জন্য সে মিউটেশনে মিউটেশনে অন্য জাতীয় প্রাণী হয়ে গেল, কিংবা এত দূর গ্রহে চলে গেল যেখানে রেডিও সিগন্যাল পৌঁছয় না। তাই ধন কই রে? ধন কই? ধন?

না, তিনি নিশ্চয়ই যাবেন। অবশ্যই যাবেন। সেই তাঁরা আর নেই। তাঁদের মালিকানাও আর নেই। সব হয়তো এত দিনে বদলেও গেছে। তবু সেই-ই তো ভূমি। সে-ই আকাশ। হয়তো সেই সব বৃক্ষও। সেই তেঁতুল গাছ যা ঝড়ে পড়ে যাওয়ায় ঠাকুমার বুকের জমিই উপড়ে গিয়েছিল। তার পাশে আর একটা যেন কী গাছ, বাদাম গাছ পুঁতেছিলেন ঠাকুমা। রূপকথার মতো করে বলেছিলেন—ওই তেঁতুল গাছ ছিল ভারী পয়মন্ত, তোদের মুখুজ্জে বংশের জান-প্রাণ, পুঁতেছিলেন তোর ঠাকুরদার বাবা। এ গাছ আমি পুঁতছি ধন। এ মুখুজ্জেবংশের ভবিষ্যৎ। তোরা, তোদের ছেলে মেয়েরা, তাদের ছেলেমেয়েরা যে-যেখানে যাক সব এখানে এই বাদাম গাছে থাকবে রে।

মেমারি স্টেশনে নেমে সাতগাছিয়ার বাস ধরলেন তাপসকান্তি। সারাক্ষণ মগ্ন হয়ে রইলেন শৈশব-স্মৃতিতে। জীবনের শেষ পর্বে ঘটমান বর্তমান একেবারে মিথ্যে হয়ে যেতে চাইছে। অনতি-অতীত, অতীত, যৌবনের সেই উৎসাহ, সেই জেদ, জ্ঞানস্পৃহা, উন্নতির আশঙ্কা সব এখন কেমন অবান্তর মনে হচ্ছে। পেয়েছিলেন। সবই তো মোটামুটি পেয়েই ছিলেন, ডিগ্রি, চাকরি, ক্রমাগত সম্মানবৃদ্ধি। চমৎকার নিজস্ব বাসস্থান, করিৎকর্মা স্ত্রী, কৃতী সন্তান, হাসি-মুখ-বাড়ির-মেয়ে হয়ে যাওয়া বউমা। সবই। তবুও কিছুই কাজে লাগল না। সব ধুলি, সব ছাই! এগুলো জরুরি হলেও জীবনের আসল জিনিস বোধহয় নয়। কী? কী সেই আসল জিনিস?...'দাদু আপনার স্টপ এসে গেছে, নামুন। কন্ডাক্টর তাঁকে জাগিয়ে দিল। ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তাপসকান্তি। ঠিক ঘুমিয়ে পড়েননি। আসলে একটা আচ্ছন্নভাব। কেমন বাধো-বাধো পায়ে খলবল করে নামলেন তাপসকান্তি। নামতে না-নামতেই মুরগিঠাসা বাসটা আবার ছেড়ে দিল। তিনি আরেকটু হলে হুড়মুড়িয়ে পড়ছিলেন। এখান থেকে তাঁদের বাস্তু বেশি দূরে নয়। শরতের বোদ্দুর ঠা-ঠা করছে, ছাতা মেললেন তিনি।

হাঁটছেন তো হাঁটছেনই। বাড়িটা ছিল ভাল ইঁটের একতলা। হলুদ রং। নতুন করে সারিয়ে-সুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কেনবার সময়ে অতুল শীল বলেছিলেন—বাড়ি আমি রাখব, কখনও যদি পায়ের ধুলো দেবার সুযোগ হয় এসে বসবেন। গাছের ডাব পেড়ে দেব, জিরোবেন, থাকতে ইচ্ছে হয়, দুদিন থাকবেন। দেখবেন, শুনবেন।

অনেকক্ষণ ভাদুরে রোদ্দুরে ঘোরার পর তিনি একজনকে জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা মুখুজ্জেদের ভদ্রাসন...ইয়ে মুখুজ্জেদের নয়—শীল...শীলেদের...কোথায় বলতে পারেন?

—শীল? শীলরা তো আর এখানে থাকে না...বুড়ো কর্তা মারা গেলেন, বড়টি কলকাতায় ব্যাংকের বড় কাজ করে, ছোটটি বোধহয় জার্মান টার্মানে আছে।

—তবে? এখন?

—এখন ও সব কিনে নিয়েছে রফিক উজ্জমান।

—রফিক? আনিসের ছেলে না কি?

—ছেলে নয়, নাতি।

—আচ্ছা?—গেলে একটু বসতে দেবে তো?

—আপনি?

—আমি তাপসকান্তি মুখুজ্জে, বিদ্যুন্মালিনী দেবীর নাতি।

—অ...তাই বলুন। লোকটির বিস্ময় আর শেষ হতেই চায় না।

—তা রফিকের বাড়ি যাবেন কেন? কাকাবাবু, আপনি আমারই বাড়ি চলুন না। আমি আপনাদের জ্ঞাতিবাড়িতে বিয়ে করেছি।

তাপসকান্তি বুড়োটে ভঙ্গিতে বললেন—বেশ বেশ। তবে আমি ওই রফিকের ওখানেই আগে একবার যাই। নিজেদের পুরনো ভিটে তো।

লোকটি তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। যেতে যেতে খুব গর্বের সঙ্গে বলল—সে সরকারি চাকরি করে, রাইটার্সে পিওন। তেজারতি কারবার ওদিকে। এদিকে জমি-জমা। সে-ও একতলা তুলেছে। তার স্ত্রী তাপসকান্তির এক রকম ভাইঝি হল।

রফিক কিনেছে? আনিসের নাতি? অদ্ভুত! আনিস ছিল তাঁদের মুনিষ, ঠাকুমার ডান হাত, ওর সাহায্যেই ঠাকুমা তাঁর সম্পত্তি রক্ষা করতে পেরেছিলেন।

ভাল ভাল, যে সম্পত্তি একদিন চাকর হয়ে রক্ষা করেছিল, তার মালিকানা এখন আনিসের, যদি সে বেঁচে থাকে, নইলে তার নাতির, তারই বংশের। সোশ্যাল জাস্টিস এক ধরনের। কোথায় যেন এমন একটা ঘটনার কথা পড়েছিলেন...তাপসকান্তি অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারলেন না।

—রফিক রফিক—তাঁর ভাইঝি জামাই ডাকছে।

এই তাঁর বাস্তু! একই জায়গায় ছিল অথচ তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। আসলে আপাদমস্তক ঘুঁটেয় ঢাকা। চারদিন থেকে টাটকা গোবরের গন্ধ বেরোচ্ছে। গরুর হাম্বারবও শোনা যাচ্ছে।

খড়ের কুচো মাখা হাতে একটি বউ বেরিয়ে এল। গাছ কোমর বাঁধা। খানিকটা খুলে নিয়ে ঘোমটা দেবার চেষ্টা করছে।

—ও মেঘনা বিবি, ইনি তোমাদের বাড়ি এসেছেন, তোমার শ্বশুরের পুরনো মনিব গো!

তাপসকান্তির অস্বস্তি হতে লাগল এমন কথায়। মেঘনা বিবি ঠোঁটের একটা কীরকম ভঙ্গি করে ওধারে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর কোমরে লুঙ্গি আঁটতে আঁটতে কালো একটা মহিষের মতো রফিক বেরিয়ে এল।

—কে আমার বাপের মুনিব? দেখি!

—মনিব-টনিব কিছু নয়, রফিক। আমি তাপসদা। মানে মিন্টুদা—।

—আই ব্বাপ। রফিক হঠাৎ দৌড়ে এসে তাপসকান্তি জড়িয়ে ধরল।

—চলুন চলুন। কত বড় চাকরি করেন দাদা। আপনি বর্ধমানে ম্যাট্রিকে জল পানি পেলেন যে বছর সে বছর আমি হয়েছি। খালি বাপের কাছে মায়ের কাছে আপনার

বাড়ির মায়ের, ঠাউমার কাছে শুনতাম কী পাশ দিচ্ছেন। কত্ত গুলান। হায় আল্লা-আরে এ মেঘনা, মিন্টুদাদাকে বসতে তো দিবি?

একটা শীতলপাটি বিছিয়ে দিল মেঘনা। ডাবের জল এনে দিল। মুখটা কেটে এনেছে সুন্দর করে। কথা দিয়েছিলেন শীলবাবু। সে কথা রাখল মেঘনা বিবি।

ডাবে দোষ নাই মিন্টুদা...

ডাবে মুখ লাগালেন তাপসকান্তি। বড় তেষ্টা পেয়েছিল। দাওয়া ঘর দোর সব বেশ পরিচ্ছন্ন, খালি ওই ঘুঁটে গোবরের গন্ধটা।

—তুমি কি ডেয়ারি করেছ না কি রফিক?

হাঃ হাঃ হাঃ—রফিক হেসেই খুন। তা যা বলেন মিন্টুদা ডায়েরিই বটে। ষোলোখানা গরু। আপাতত।

—জমি-জমা সব?

—বেচে দিয়েছি। পেছনের বাগানটা আছে।

—আছে?

—হ্যাঁ, ওই বাগানের ফল পাকড় খেয়েই তো বেঁচে আছি। আর এই গরুগুলান। মিন্টুদা আপনি কি ওই খোকা মুখুজ্জের বাড়ি লাঞ্চো করবেন নাকি?

—কে খোকা মুখুজ্জে? ও ওই জামাই? কই, না সেসব কথা কিছু তো হয়নি। আমি এখুনি চলে যাব।

—সে কী দুপুর হল, না খেয়ে দেয়ে—যাবেন কোথায়?

—এখানে কাঁচা ফলারের জোগাড় করে দিই? মেঘনা বিবি বলল।

—অসুবিধে না হলে দিতে পারো।

খেতে কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু চারদিকের পরিবেশ গন্ধ সব মিলিয়ে ঠিক রান্নাখাবার খেতে কেমন প্রবৃত্তি আসছে না।

মেঘনা যত্ন করে এনে দিল, চিনি দিয়ে ঘন করা দুধ। চিঁড়ে, মুড়ি, মুড়কি, চারখানা চাঁপা রঙের কলা। ঘরের তৈরি ক্ষীরের ছাঁচ। বলল শুকনো খান, কিছু দোষ হবে না।

—রান্না খেতেও কোনও দোষ হত না বউমা। তবে এত বেলায় তোমাদের বিরক্ত করতে চাই না।...

রফিক দাঁড়িয়েছিল, বলল—ইস্ আগে বললে ব্যবস্থা হয়ে যেত। খাওয়া-দাওয়া সেরে শীতলপাটির ওপর একটু জিরিয়ে নিলেন তাপসকান্তি। চারদিক চেয়ে চেয়ে দেখছেন। এবারে যেন একটু একটু চিনতে পরছেন সব। ওই বিদ্যুৎমালিনী দেবীর ঘর পশ্চিম দিকে একটেরে। একটা তক্তপোষ ছিল পোল্লায়। তিন থাক ইঁট দিয়ে উঁচু করা। তার তলায় আলু থাকত বালির ওপর। উঠোনের ওদিকে রান্নাঘর। কালো ঝুল হয়ে গিয়েছিল। এখান থেকে তিনি তার ভেতরের চেহারা দেখতে পাচ্ছেন না। মায়ের ঘরটা মাঝখানে। মায়ের ঘরে একটা অদ্ভুত ঘুরন্ত আলনা ছিল। তার এপাশে যেখানে এখন তিনি শুয়ে আছেন এই দাওয়ার কোলেই ছিল তাঁর ঘর। ঘরটা তালা বন্ধ। এরা তার মধ্যে কী রেখেছে। কেনই বা তালাবন্ধ কিছুই বুঝতে পারলেন না তিনি।

একটু রোদটা পড়লে নিজে নিজেই উঠে তিনি উঠোনের দরজা দিয়ে পেছনের

বাগানে গেলেন। গোয়াল হয়েছে একদিকে। লম্বা টানা। ডান দিকে তেঁতুল গাছ উপড়ে পড়ার জায়গাটা চিনতে পারলেন না। বাদামগাছটাও দেখতে পেলেন না। সে জায়গাটায় জমি বেশ চৌরস করে একটা কিচেন গার্ডেন। লঙ্কা ফলে রয়েছে। বেগুন, ঢেঁড়স,...আরও অনেক দূরে গিয়ে বাদামগাছটা কিন্তু দেখতে পেলেন তিনি। বিরাট গাছ। চারদিকে প্রচুর পাতা। গাছপালা ডাল মেলে দাঁড়িয়ে আছে। এভাবে সরে গেল কী করে গাছটা! সেই গাছ, সন্দেহ নেই। পাশে তেঁতুলগাছের খোবলানো গর্তটা ঠাকুমা বলেছিলেন এই গাছে ঠাকুমার পর থেকে মুখুজ্জে বংশের যে-যেখানে আছে সব্বাই থাকবে। যতদূরেই যাক। আহা একটা টানা পোড়েনের ফলেই গাছটা কি সরে গেছে? আকর্ষণ-বিকর্ষণ বিকর্ষণ-আকর্ষণ...এই ভাবে কখনও কাছে আসা কখনও দূরে যাওয়া এই করতে করতে দূরে আরও দূরে চলে গেছে বাদামগাছ। শেষ পর্যন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মহা বিস্ফোরণ তত্ত্বই তো কাজ করবে। সব জ্যোতিষ্ক, সব গ্যালাক্সি পরস্পরের থেকে ক্রমেই দূরে আরও দূরে সরে যাবে। এত ধীরে যে বোঝা যাবে না। খালি স্পেকট্রাম বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, লালটা ডান দিকে সরে সরে গেছে অমোঘভাবে। রেড শিফ্‌ট্।

অনেক নিষেধ সত্ত্বেও তাপসকান্তি সন্ধে সন্ধে বেরিয়ে পড়লেন। বেশ ধকলের জানি। মেমারিতে কোথাও থেকে গেলে হত। কিন্তু কোথায় কাকে খুঁজবেন? প্রায় শেষ ট্রেনে হাওড়ায় এলেন, দশ টাকা বেশি কবুল করে কাঁকুড়গাছি এলেন। মনে হল দূরত্বটা বেড়ে গেছে। যাবেই।

ক'দিন পর অফিসের শেষে তিনি তাঁর পুরনো বন্ধু অজিতের খোঁজে সল্ট লেকে গেলেন। ঠিকানাটা খুঁজতে খুঁজতে মনে হল কত কাছে ছিল, অথচ কত দূরে। অবশেষে যখন খুঁজে পেলেন, যে উত্তর দিল এবং দরজা খুলে দিল সে কস্মিনকালেও অজিত নয়।

তাপসকান্তি বললেন—অজিত সাহা বলে এক ভদ্রলোক...

—আপনি ভুল করছেন, এখানে অজিত সাহা বলে কোনও ভদ্রলোক ছিলেন না।

—কত নম্বর ট্যাংক মনে আছে আপনার?

—দু নম্বর।

—ভুল করছেন।

—তাই হবে। ঠিকানাটা পষ্টাপষ্টি লেখা। অথচ তিনি ভুল করছেন। তার মানে যখন লিখেছিলেন তখনই ভুল লিখেছিলেন। কোনওদিন তো এসে মিলিয়ে নেওয়া হয়নি। অজিতও ঠিকানা দিয়েছে, তিনিও রেখে দিয়েছেন। বাস মিটে গেল। আজ বোধহয় পনেরো কুড়ি বছর পরে...। আর কি খুঁজে পাওয়া যায়?

অজিত সাহা ছিল তাঁর কলেজ জীবনের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অতি ব্রিলিয়ান্ট ছেলে। মাঝে কানাডায় ছিল অনেক দিন। সেখান থেকে চিঠিও দিয়েছে। তবে কি আবার কানাডা কি অন্য কোথাও চলে গেছে? কিন্তু ওই ভদ্রলোক বললেন—অজিত সাহা বলে কেউ, কোনওদিন ওখানে ছিল না...। অদ্ভুত!

কিন্তু এক অভিযানের নেশায় পেয়ে বসেছে এখন তাঁকে। কে কত দূরে চলে

গেছে, যেতে পারে তিনি দেখবেন। পরের দিন অফিস ফেরত তিনি গেলেন অমূল্য নিয়োগীর বাড়ি। চক্রবেড়ে। একখানা চারতলা ঢ্যাঙা বাড়ি উঠে গেছে অমূল্যর জমিতে. বেল বাজালেন একতলার ফ্ল্যাটের। অল্পবয়সী একটি মেয়ে খুলে দিল।

—অমূল্যবাবু আছেন?

—কে রে?—ভেতর থেকে একটা মহিলা গলার আওয়াজ।

—এক ভদ্রলোক অমূল্যবাবুকে খুঁজছেন।

মহিলা সামনে এগিয়ে এলেন—অমূল্য নিয়োগী এ বাড়ি বিক্রি করে চলে গেছেন।

—সে কী? কোথায়?

—তা তো বলতে পারব না। তবে এখানেও তো ফ্ল্যাট নিলেন না। যতদূর জানি টাকা নিয়ে চলে গেছেন। বোধহয় উত্তর চব্বিশ পরগনার দিকে কোথাও। ঠিক জানি না।

অমূল্য বাড়ি বেচে অন্যত্র চলে গেল! একবার বলে গেল না? বলে যাবার প্রয়োজন বোধ করল না? এত দূরত্ব? এত অমেয় দূরত্ব দুজনের মধ্যে? ক্রমেই আরও সরে যাচ্ছেন, আরও সরে যাচ্ছেন? এভাবে তো সম্পর্কগুলো শুরু হয়নি? তখন মা না হলে শিশুর চলে না, স্ত্রী না হলে স্বামীর চলে না, বন্ধু না হলে বন্ধুর চলে না...এবং উল্টোটা। তাহলে সেই ঘনীভূত দলা পাকানো জীবন কোন প্রাকৃতিক নিয়মে এভাবে ক্রমেই পরস্পরের থেকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে? দূরে চলে যাচ্ছে, আরও দূরে, আরও দূরে?

ফোন বেজে যাচ্ছে। যাক। এখন ভোরবেলা। সাড়ে পাঁচটার মতো হবে। নিশ্চয় বুল্টু। এবং উর্মি। অন্য গ্রহ থেকে রেডিও সিগন্যাল। থাক। বেজে যাক। বড় আলস্য আজ। তাপসকান্তি আর উঠতে পারেন না। তিনি পাশ ফিরে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দূরে চলে যেতে লাগলেন। আরও দূরে।

কোনও গ্রহের সঙ্গে কোনও অ্যাস্টারয়েডের সংঘর্ষ হলে যে বিপুল ভূমিকম্পে জলোচ্ছ্বাসে গ্রহের জীবনধারায় প্রলয় ঘনায় তখন সবচেয়ে আগে যায় ডাইনোসরেরা। মহাকায় প্রাণী সব। বিরাট বিরাট দেহ নিয়ে লুটিয়ে পড়ে। ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। দুই ব্যক্তিত্বের প্রবল সংঘাতে আগে গেল শর্মিলার চিত্তলোকের ডাইনোসরেরা। বিশাল অহমিকা, বিপুল জেদ, অনন্য অহংকার। শর্মিলা হঠাৎ ফাইল বন্ধ করলেন, ডট পেন রেখে দিলেন পেন হোল্ডারে। তাঁর ভেতরে অসংখ্য শব্দজয়ী সারভাইভ্যাল অফ দ্য ফিটেস্ট-এর লড়াইয়ে বিজয়ী পিঁপড়েরা সারি সারি বেরিয়ে এসেছে, যেখান থেকে যা পাওয়া যায় সেইসব অমৃতকণা, স্নেহকণা, প্রেমকণা, কৃপাকণা, মুখে করে। নিয়ে চলেছে হৃদয় নন্দন বনে।

—কী হল, এরই মধ্যে চললেন?

—শর্মিলাদি...

শর্মিলা জবাব দিলেন না। একবার মনে হল ফোন করে খোঁজ নেন তাপসকান্তির অফিসে। তারপর সে চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিলেন। এমন নয় যে তাপস খুলে না দিলে তিনি ঢুকতে পারবেন না। তাঁর ব্যাগে কাঁকুড়গাছির ফ্ল্যাটের ডুপ্লিকেট চাবিটা রয়েই

গেছে। ভীষণ একটা তাড়া ভেতরের। এক্ষুনি এক্ষুনি ওই বাড়ির মেহগনি পালিশ দরজা, তার পঁয়ত্রিশবাই পনেরো হলঘর, ঢুকতেই দক্ষিণের বারান্দা থেকে হু-হু হাওয়া, ফ্রিজের মাথায় পেপার ম্যাশের ব্রঞ্জ রং বুদ্ধমূর্তি—এসব দেখতে না পেলে তিনি...তাঁর নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে যাবে। এক্ষুনি ওই সামনের চুল পাতলা, পেছনে কাঁচা পাকা ঝুঁটিমতো আধাফর্সা, হাই-পাওয়ার চশমা-পরা মুখ, তার আলগা চর্বিবহুল পেট, ছিনে পড়া পা, পাজামার প্রান্তে বেরিয়ে থাকা সাদা সাদা ছোট্ট ছোট্ট, শরীরের তুলনায় বড্ড ছোট্ট ছোট্ট, পা এসব তাঁকে দেখতে হবে। চিন্তার সময় নেই। র‍্যাশন্যালাইজ করতে তিনি পারছেন না। তাঁর ভেতরের পিঁপড়েরা ছুটছে। ছোট ছোট মুখে কৃপাকণা, স্নেহকণা, প্রেমকণা। ডাইনোসরেরা সপরিবারে মরে গেছে।

অনেক দিন পর ট্যাক্সি নিলেন। ট্যাক্সি ছুটছে যেন মহাকাশযান। ভেতরে ওজনহীন শর্মিলা ঘোষ মুখার্জি কখনও উল্টে যাচ্ছেন, নীচের দিকে মাথা ওপরে পা কখনও কাত হয়ে পড়ছেন, কখনও আবার স্বাভাবিক, সোজা।

ফিফটি পার্সেন্ট। হ্যাঁ পঁয়তাল্লিশ টাকা। মাইনাস এক। ঠিক আছে।

দুড়দুড় করে ওপরে উঠলেন শর্মিলা। চাবি ঘুরোলেন। দরজা খুললেন। বন্ধ করলেন। এ কী। চারদিকে এত ধুলো। চায়না আসে না? কত দিন? অদ্ভুত মানুষ তো। কোনও একটা ব্যবস্থা তো করে নেবে। চায়না হোক, ডায়না হোক। সোফা কৌচ কার্পেট ফ্রিজ ডিনার-টেবল সব কিছুর ওপর পুরু ধুলোর আস্তরণ। রান্নাঘরে গিয়ে চক্ষু চড়ক গাছ। বেশ কদিনের ফ্যান সিঙ্কের ওপর শুকিয়ে খড়মড় করছে। রান্নার প্ল্যাটফর্মে শসার খোসা, আলুর খোসা, পেঁয়াজের খোসা,, বেশ ভালভাবে জমে আছে, তেল কালিতে কাদা প্যাচপ্যাচ করছে সব। গুচ্ছের বাসন জমানো সিঙ্কে। বাড়ির চটি পরে এসে শর্মিলা ভিমের গুঁড়ো ছড়াতে লাগলেন সব কিছুর ওপর। বেশ অকৃপণভাবে। সমস্ত ঝুল হয়ে রয়েছে। বিশ্রী গন্ধ। কোণ থেকে ঝাড়নটা নিলেন, টিভি-র পেছন থেকে পালকের ঝাড়ুটা নিলেন। ধাঁই ধাঁই করে পিঠতে লাগলেন সব। সোফা-কৌচ। চেয়ারের গদি। অমনি চতুর্দিকে ধুলো ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এলোমেলো। কোনও নিয়ম মানল না। কোন কণাটা কোথায় যাবে তার কোনও গাণিতিক হিসেব অসম্ভব করে তুলে ধুলোরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। প্রাণপণে ঝাড়ন দিয়ে তাদের হাতের তলায় আনতে চেষ্টা করেন শর্মিলা। আর তারা ফসকে ফসকে যায়। স্থাবরতা থেকে বিশৃঙ্খলায়। সংহতি থেকে সংঘাতে।

খাবার টেবিল সাবান দিয়ে মুছলেন। টিভি। চেয়ার এসব মুছলেন। বাসন কোসনগুলো মেজে তুললেন। আভন পরিষ্কার করতে প্রাণ বেরিয়ে গেল। রান্নার প্ল্যাটফর্মের এবং রান্নাঘরের মেঝের সেই কালি আর চিট বোধাই গেল এক দিনে উঠবে না। যথাসম্ভব পরিষ্কার করে এগজস্টটা চালিয়ে দিলেন, সব খোসা জড়ো করে ওয়েস্ট বিনে ফেললেন। মানুষটা কি এতদিনে খালি ভাত, ডিম, আর আলুসেদ্ধ খেয়েই আছে? সর্বনাশ! আসুক চায়না, তাকে দেখাচ্ছি মজা।

হলটা পরিষ্কার করতে করতে ছটা বেজে গেল। এতক্ষণে তাপসকান্তির আসার সময় হয়ে গেছে। যে কোনও মুহূর্তেই আসতে পারেন। যাক, যত কষ্টই হোক, এখন

তবু চেনা যাচ্ছে তাপসকান্তি আর শর্মিলার এই বাড়ি-ঘর। বুলটুর ঘরে তালা? দু ঘরেই নিশ্চয়। হা-ক্লান্ত শর্মিলা জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছেন। তাপসকান্তি আসা পর্যন্ত বসবার ঘরে সোফাতেই তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে। আপাতত যাওয়া যাক ব্যালকনির দিকে। বাইরের হাওয়া দরকার একটু। চলেই যাচ্ছিলেন, দেখলেন তাপসকান্তির ঘরের দরজা সামান্য ফাঁক। এ কী! তালা দেয়নি? আশ্চর্য লোক তো! দরজাটা খুলে ফেলেন তিনি। আর তারপরেই দেখলেন।

কোনও এক তুবারক্ষেত্রের নীচে চাপা-পড়া বহু কোটি বছর আগেকার ডাইনোসরের ফসিল। কোথা থেকে রেডিও সিগন্যাল আসছে বিপ্ বিপ্ ক্রিং ক্রিং কিরিরিং... বেজেই যাচ্ছে যন্ত্রটা। কিন্তু শর্মিলা স্থাণু হয়ে গেছেন।

সে এক পৃথিবী ছিল নীল সবুজে মেশামেশি। তার পুব-পশ্চিম দিগন্ত থেকে প্রতিদিন পালা করে দুবার টন-টন সোনা ঝরে পড়ত। অহঙ্কারী গ্রীবা উদ্ধত করে বিশাল বিশাল মাংসল উরু দু পাশে মেলে ঘুরে বেড়াত ডাইনোসরেরা। কত প্রজাতির ডাইনোসর!

মহাজাগতিক বস্তুপিণ্ডের সঙ্গে সংঘর্ষে তারা নিঃশেষ হয়ে গেল। এখন হয়তো কোনও পাললিক শিলাস্তরের ভাঁজে ভাঁজে খুঁজলে পেলেও পাওয়া যেতে পারে এক আধখানা এক তৃতীয়াংশ, এক চতুর্থাংশ কিংবা আরও ভগ্নেরও ভগ্নাংশে সেই সব মহাশরীরের মহাফসিল। শুধুই ফসিল।

পত্রিকা শারদীয় ১৯৯৪ (১৪০১)

তিন ভরির বিছে

বাণী বসু

উপন্যাস পঞ্চক

হেমচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরী
স্থাপিত-১৮৯৭
খুলনা

তক্তপোষের বিছানায় কাল শেষ রাত্তিরে জগা এসে শুয়েছে। ছোট মেয়ে শিবুকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে, ছেঁড়া লেপের ভাল অংশটুকু নিজের আর দুগ্‌গার গায়ের ওপর চাপা দিয়ে...যথারীতি। ঘুমচোখে প্রথমটা দুগ্‌গা বুঝতে পারেনি। সারাদিনমান ভূতগত খাটুনি, বিছানায় পড়লেই তলিয়ে যাওয়া। শিবু মনে করে কাছিয়ে আসা মানুষটার পিঠে দিয়েছে দুই থাবড়া। দূর হ পোড়ারমুখী, সরে শো। তারপরেই তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে দেয় এ কর্কশ হাত, কাঁকরোল-হেন এ পিঠের চামড়া তো শিবুর হতে পারে না।—তবে রে ঢ্যামনা—সে উঠে বসে জাগন্ত দুটো কর্নিকের মতো চাটা-চ্যাপটা হাত দিয়ে গায়ের জোরে দিয়েছে দুমদুমিয়ে। তারপর জগাকে ডিঙিয়ে, শিবুকে ডিঙিয়ে শীতশেষের শেষ রাত্তিরে মাটির কনকনে মেঝেতে ফাটা পায়ে ল্যান্ড করেছে।

—এই কে? কে খুলে দিয়েছিস দরোজা।

লক্ষ্মী, সরস্বতী ভয়ে চুপ।

ওরা জানে না ওদের জগা-বাবার এইরকম শেষ রাত্তিরের জৈব ক্ষুধারই নির্বিচার ফসল ওরা। কিংবা হয়তো ওদের অন্তরাত্মা জানে। তাই শেষ রাত্তিরে আগড়ে ঠুক-ঠুক শব্দ হলেই তারা রক্তের কল্লোলে জেগে যায়, প্রবল পিতৃভক্তিতে ফিসফিসিয়ে ডেকে ওঠে-বাবা, বাবা, এলে?

—হ্যাঁ. দরোজাটা খুলে দে একটু।

ব্যাস চিচিং ফাঁক হয়ে যায়।

দুগগা রাগে রোষে ঘেন্নায় ফুঁসতে থাকে। জগা বেগতিক দেখে মাথা অব্দি চাপা দেয় লেপটা, তারপরেই ঝাঁ করে সরিয়ে ফেলে—দূর শালা, মুতের গন্ধ!

—দূর হয়ে যাও। মুতের গন্ধ! দূর হয়ে যাও আমার ঘর থেকে, পাতার ঝাঁটাগাছটা তক্তপোষের তলা থেকে টেনে বার করতে থাকে সে। তুলতে গিয়ে বাধা পায়। লক্ষ্মী হাত চেপে ধরেছে।

—আহা, ছাড় না মা।

—'বাপ-সোহাগী।' মেয়ের দিকে জ্বলজ্বলন্ত চোখে তাকায় দুগ্‌গা, 'তবু যদি সোমবচ্ছরে একবারও মেয়ে বলে তত্ত্ব নিত। ঝাঁটাগাছটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে সে লক্ষ্মী সরস্বতীর পাশে ঠেসেঠুসে একটু জায়গা করে নিয়ে শুয়ে পড়ে। শরীর বইছে না। রাতের কতটুকুই বা আর বাকি আছে। এখুনি চাঁদ নিবে যাবে, তারা নিবে যাবে, পাতলা পাতলা দুধ-ফাটাফাটা ভোরের আলো ফুটে উঠবে। ফ্যাকফেকে রাস্তার আলোর তলা দিয়ে বড় বউদিদের পুরনো ঝাল-ঝাল রঙের কম্বকুটে চাদরটা গায়ে

জড়িয়ে তিন মেয়ের হাত ধরে বেরিয়ে পড়তে হবে দুগ্‌গাকে। পাহাড়ের চুড়োর মতো বুক দুটো ফুঁসতে থাকবে চলার তালে তালে, ঝুটো পাথরের নাকছাবি চোখা নাকের ডান পাশে ঠিকরোবে, হাতখোঁপাটা হঠাৎ সড়াত্‌ করে খুলে পড়ে পাছার তাল তাল ঝুড়িভরা কাঁচা মাংস ছুঁয়ে খেলবে। শক্ত, মিটোল, কুচকুচে কালো হাত দুটো মেলে নিপুণ প্যাঁচে ঝপাত করে খোলা চুল আবার খোঁপাবন্দি করে ফেলবে দুগ্‌গা।

ঘুম-ভাঙা চোখে লক্ষ্মী সরস্বতী সবিস্ময়ে সভয়ে এই সময়ে দেখে তাদের মাকে। কী সুন্দর মা! কী ভয়ংকর সুন্দর। লক্ষ্মী চোখ সরিয়ে নেয় একটু দেখেই, কেমন অস্বোয়াস্তি লাগে তার। শিরশিরিয়ে ওঠে গা। চুলের রঙে গায়ের রঙে মিশে গেছে মার। সিঁথির দুপাশে চুলগুলো ঘন কোঁকড়া, চওড়া কপালে একটা যেন কাঁচা রক্তের ফোঁটা। ঠোঁটের কষে কালকের বাসি পানের ছোপ। নাকের পাটা কাঁপছে। রাক্কুসি না কি রে বাবা! দুই বোনের তাদের অনেক সময়েই গোপন আলোচনা হয়। মা রাক্কুসি না হোক ডাইনি তো নিশ্চয়ই। বাবা তো যত বার আসে তত বার বলে। সেই ছোট্ট থেকে শুনে আসছে তারা। মন্তর-তন্তর তুক তাক কি কম জানে নাকি!

শিবুর সেবার ন্যাবা হল! রাস্তার আক কল থেকে ভাঁড়-ভাঁড় আকের রস নিয়েসে চোখ বড় বড় করে তাতে মন্তর পড়ত মা। শিবু তো দেখতে দেখতে সেরে গেল। অথচ লক্ষ্মী যাদের বাড়িতে কাজ করে সে বাড়ির বড় দাদার হল। রোগ এমন ঘোর হল যে হাসপাতালে পাঠাতে হল।

চল চল তাড়াতাড়ি চল—দুগ্‌গা তাড়া দেয়—এখন সাত বাড়ির ছত্তিশ কাজ। একটু দেরি হলে মজুমদার বাড়ির রান্না-মাসি এমনি মুক করবে। দুগ্‌গার হাতের তেলোর ঠিক তলায় শিবুর মাথাটা। পরম নির্ভয়ে নির্ভরে মায়ের ময়লা সবুজ ডুরের ভাঁজে নিজেকে সঁপে দিয়েছে বেচারি। এক ঠোনা খেল। মায়ের পায়ে-পায়ে চলছিল। জড়ামড়ি করে আরেকটু হলেই ধুপুস। পিঠে গুমগুম করে দুটো কিল মেরে দুগ্‌গা দাঁতে দাঁত কষে বলল, মর না, মরতে পারিস না। মডুনি কোথাকার!

সরু গলায় তারস্বরে চিৎকার করছে শিবু। চিৎকার করতে করতেই আলমারিঅলা কুণ্ডুদের বাড়ি লক্ষ্মী সরস্বতীকে ছেড়ে সাদা-গাড়ি অলা কোর্টের সাহেব হাসপাতালের বড় ডাক্তার মজুমদারের বাড়ি ঢুকল দুগ্‌গা। ওরা দু'বোনে কুণ্ডুদের বাসনগুলো চার হাতে মেজে তুলতে দুগ্‌গার মজুমদার বাড়ির বাসন মাজা রান্নাঘরে ধোয়ার কাজ হয়ে যাবে। চা-রুটি খেয়ে এবার সবাই মিলে ঢুকবে ফেলাটে। হাতে হাতে বাসনমাজা, ঘর ঝাড়া-মোছা, কাপড়-কাচা চলবে এগারোটা পর্যন্ত। বিধবা মাস্টারনির বাড়িতে কালকের বাসি ভাত গরম করে দেবে। সঙ্গে কিছু তরকারিপাতি। ব্যস, শান্তি।

সরু একটা নেই-আঁকড়া বাঁশির প্যাঁ-মার্কা চিৎকার নিয়ে শিবু তার মায়ের পেছন পেছন মজুমদার বাড়ি ঢুকল।

দরজা খুলে রেখে রান্না-মাসি ঘ্যাঁটর ঘ্যাঁটর করে টিউকল থেকে খাবার জল তুলছে।

প্যাঁ-পোঁ পেছনে নিয়ে দুগ্‌গা গিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল। এত বাড়ির রান্নাঘরের ভোল পালটে গেল, মজুমদার বাড়ির সেই পাতা উনুন, কালো চালি, খসকা মেঝে, আর

কাঁচা কয়লার আঠা-কালো পোড়ার গাঁদি আর পালটাল না। জড়ো-করা বাসনের পাঁজা উঠোনের কলের তলায় এনে নামাল দুগ্‌গা। দু একবার চোখ ওপরে নীচে করেই নির্ভুল গুনে ফেলল একখানা বগি থালা বেশি আছে। বাটিও তার মানে খান তিনেক, গেলাস একখানা। অতিথ্‌ এয়েছিল।

—হ্যাঁ গো দুগ্‌গা, বাচ্চা মেয়েটা তখন থেকে কাঁদছে তোমার কানে যায় না।

বুড়ো মা উঠে এসেছেন। কোমর একটু ভাঙা আর চুলগুলি শনের নুড়ি, নইলে বুড়ো মা দিব্যি শক্ত-সাব্যস্ত খটখটে জোয়ান। কত বয়স কে জানে, আশি নব্বুই তো নিশ্চয় হবে।

—কী করব বলো ঠাকুমা সাত সক্কালে লজেন কোথায় পাব।

বেমালুম মিছে কথা চালিয়ে দিল দুগ্‌গা। করবেটা কী? বাত দিক, সামলাবে?

বুড়ো মা খুরখুর করে ঘরে ঢুকে গেলেন। একটু পরে বেরিয়ে এসে দুটো চিনির বাতাসা নিয়ে শিবুকে সাধতে থাকলেন।

—ও খুকি, নিয়ে যা বাতাসা কটা।

শিবু তার ছোট্ট হাতের পাতা পেতে এগিয়ে যাচ্ছে আড়চোখে দেখতে পেল দুগ্‌গা।

—এ ছি ছি ছি, দুগ্‌গা, তোর মেয়ের যে হাত ভর্তি নোংরা!

—ছাই নিয়ে ঘাঁটছিল যে ঠাকুমা, ছাইয়েতে আর চোকের জলে...

—ছিছি...ছেলেপুলে পেটে ধরিস যে কেন তোরা। হাত ধুয়ে আয়, হাত ধুয়ে আয় বলছি। তবু ডাঁড়িয়ে রইলি...

বুড়ো মা একেবারে অবাধ্যতা দেখতে পারেন না। এক ধমক দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে শিবু আবার প্যাঁ-অ্যাঁ।

বিরক্ত হয়ে বুড়ো মা বললেন—তুমিই নিয়ে যাও বাছা, তোমার এ ছিঁচকাঁদুনি মেয়েকে আমি বাগাতে পারব না।

দুগ্‌গা হাত ধুয়ে, কাপড়ে হাত মুছে হাত পাতলে বাতাসা দুটো আলগোছে ফেলে দিলেন বুড়ো মা।

সে-ও তো গেরস্থর মেয়ে, গেরস্থর বউ-ই ছিল, বাতাসা মেয়ের মুখে গুঁজে দিতে দিতে ভাবল দুগ্‌গা। এমন নোংরা কাপড়ে আলগোছে বাতাসা ভিক্ষে নেবার পাত্তর সে মোটেই ছিল না। টিনের চাল দেওয়া ঘর, তার ওপর রোদের টণ্ডটঙানি বিষ্টির ফরফরানি কী! শানের মেঝে। পেছনে মিষ্টি জলের কুয়ো। রোয়াক। রান্নাঘরে ধোয়া মাজা বাসন, তোলা উনুন। কুলুঙ্গিতে লক্ষ্মী জনার্দন, সাবান দিয়ে কাচা বেলাউজ, কাপড়, সন্ধেবেলা গা ধুয়ে সে সব পরে চুল বেঁধে সিঁদুর দেওয়া, সবই ছিল। তিন ভরির বিছে হার গলায় দিয়ে বিয়ে হল। কথাই ছিল মার সঙ্গে পরের বোন জয়ার বিয়ে ঠিক হলে দিয়ে আসবে। মেয়ে যদি মারটা না দেখবে, বোন যদি বোনেরটা না দেখবে তো কে দেখবে! সেই হার দিয়ে আসা তক্‌ জগন্নাথ, তার বর তার সঙ্গে ঝগড়া করছে। শুধু ঝগড়া করলেও একরকম, মেরে পাট করে দিতে লাগল শেষটায়, অবশেষে এক দিন দুটো মেয়ে সুদ্ধু তাকে ঘরের বার করে দিলে। আবার এমন

সেয়ানা যে খোকাটাকে রেখে দিলে। দিশেহারা দুগ্‌গা সেদিন লজ্জায় বাপের বাড়ি গিয়ে দাঁড়াতে পারেনি। ছোট মেয়ের বিয়ে দিয়েই বিধবা মা চক্ষু বুজেছে, তিনটে ভাই পরস্পরে ভাব ভালবাসা নেই, সেই ভাই-ভাজের কাছে গিয়ে কোন মুখে দাঁড়াবে। জগদীশপুর কোনা থেকে হাঁটতে হাঁটতে বামুনগাছি। সই গঙ্গা ডেকে বস্তিতে তার বাড়ি ঠাঁই না দিলে দুগ্‌গাকে মেয়েদের নিয়ে রেল লাইনে মাথা দিতে হত। মজুমদার বাড়ি, কুণ্ডু বাড়ির কাজও ওই গঙ্গাই করে দেয়।

দূর থেকে বাড়িটা দেখিয়ে বলে—ওই বাড়ি, ওই খিড়কি দরজা, ওদের লোক দরকার। আমার নাম করবি না। বুড়ো মার কাছে গিয়ে কেঁদে পড়, হয়ে যাবে।

দুই মেয়ের হাত ধরে সত্যিই দুগ্‌গা এই উঠোনে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। রান্নামাসি বললে—ও কী গো বউ, একেবারে বাচ্চা-কাচ্চা কোলে কাঁখে করে এয়েচ যে।

বুড়ো মা বললেন, কাজ করবে ঠিক আছে, কিন্তু ছুট বলতে ছেড়ে দিলে হবে না, তা বলে দিচ্ছি!

—আমি বড় আতান্তরে পড়েছি মা, আপনি যদি দয়া করে রাখেন ঠকবেন না, ছেড়ে কোথাও যাব না আপনাকে কথা দিচ্ছি।

—আর বউ, একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে আসবে।

তখন দুগ্‌গার রবারের চটি ছিঁড়ে খসে পড়েছে পা থেকে। শাড়িভর্তি রাস্তার ধুলো। সে চোখ মুছে বলে—বড্ড গরিব মা, সোয়ামির কাজ চলে গেছে। কী করি বলুন! সত্যি কথা বলতে তখন সে মরমে মরে যাচ্ছে।

বুড়ো মা ওই অত কিপটে মানুষ কিন্তু একখানা শক্তপোক্ত রংচটা ছাপা শাড়ি তখুনি এনে দিয়েছিলেন।

তা এক বস্তরে যে দুটো শিশু নিয়ে মাকে ঘরের বার করে দিয়েছিল তিন ভরি সোনার লালচে, সে এখন যখন-তখন এসে পড়ছে। এ ভাবেই শিবুর জন্ম দিয়ে গেল। এখন জোড়হস্ত হচ্ছে। শাউড়ি মরে গিয়ে তার ঘর এখন নি-মেয়ে। ঘর সামলে, ছেলে সামলে কারখানার কাজে শিফ্‌ট-ডিউটি করতে পরান বেরোচ্ছে আর কি। সংসারটি কেমন করে রাখত দুগ্‌গা! উদয়াস্ত ওই দুটো ঘর আর রোয়াকের পেছনে পড়ে থাকত সে। আজ তার শিশি-কৌটোর মতো ঘরে ইঁদুরে মাটি তুলে ডাঁই করছে। টাঙানো দড়ি থেকে ঝুলছে সাত ছেঁড়া তাপ্পি দেওয়া কাপড় জামা। মেয়েদের জামার পেছন পটিতে বোতাম নেই, মাথায় তেল নেই, গা দিয়ে খড়ি উঠছে, শিবু হিসি করলে কাঁথা-কানিতে সাবান গরম জল দেবার সঙ্গতি নেই, কোনও মতে রোদে দিয়ে তুলে রাখতে হয়। সারাদিনমান ঘরে আঁচ পড়ে না, সেই সন্ধেরাতে কুণ্ডু বাড়ির ফেলে দেওয়া রাংঝাল করা জনতায় ভেজাল কেরোসিন পুরে একটু সেদ্ধ ভাত ফুটিয়ে নেওয়া। সারাদিনের মধ্যে ওই একবারই টটকা, নিজের বাড়ির জিনিস সদা-রান্না খাওয়া! কিন্তু তার নিজের সেই জগদীশপুরের ঘর দুয়োর যে-ই দেখত সে-ই বলত লক্ষ্মীমন্ত, পয়মন্ত। ঝকঝকে পরিষ্কার তো থাকত বটেই। বাসন মনে হত যেন এই দোকান থেকে কিনে এল। শাউড়ির পানের বাটা, পিকদান, সব কিছু থেকেই আলো ঠিকরোত। সকালে কয়লার তোলা উনুনে আঁচ দিয়ে দুবেলার রান্না করে

রাখত, জলে বসিয়ে রাখত সব। কোনও দিন খারাপ হয়নি। কোনও দিন কাউকে বাসি পচা খেতে হয়নি তার সংসারে। গুল, ঘুঁটে সব নিজে হাতে দিত। হপ্তায় দুদিন জামাকাপড় বিছানা বালিশের চাদর ওয়াড় সব সোডা দিয়ে ফুটিয়ে আচ্ছা করে কাচত। সেই তার নিজের গড়া লক্ষ্মীর সংসার থেকে তাকে ঘাড় ধরে বার করে দিলে! প্রথমটা সে এত অবাক হয়ে গেছিল যে ভেবেছিল ঘুমের ঘোরে কুস্বপন দেখছে। দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিয়েছিল—

—কী করছ। সন্দে হল। চারদিকে সব দেখবে যে!

—যা ডাইনি-মাগি আমি আবার বিয়ে করব, যদি হারটা নিয়ে সাতদিনের মধ্যে না ফিরিস।

জগন্নাথের মুখে তার প্রতি এই ভাষা, এই বাক্য এই ব্যবহার ছিল স্বপ্নেরও অগোচর। হঠাৎ আকাশ থেকে ভেঙে পড়া বাজ-বিজুলির মতো। কী গা-ছমছম করে উঠেছিল যে তখন! যেন দুগ্‌গা এতদিন সোয়ামির ঘর করেনি, সোয়ামির খোলসে কোনও দানোর ঘর করেছে। আঘাত অত অপ্রত্যাশিত ছিল বলেই সে রেল-লাইনে মাথা দিতে গিয়েছিল।

এখন সেই জগা এসে বলে সব ভুলে যা দুগ্‌গা। মা মরে গেছে। আমার ঘর খালি। কেউ বলবার নেই। চাই না আমার সোনার হার। তুই গেলেই আমার ঘর ভরবে।

—কেন? আবার বিয়ে করবার মুরোদ হল না?

—তোকে ছাড়া আমার কেমন...তোর মতন এমন কাউকে দেখলুম না এত দেখলুম...সত্যি বলচি, তোর গা ছুঁয়ে বলচি, তোর মতো এমন নেশা জমাতে আর কেউ পারে না। মাইরি...

জগাকে দেখে তখন আরও অভক্তি হয়েছিল দুগ্‌গার। যে লোকটা ভর সন্ধের মুকে তিন ছেলের মা নিজের সতী-সাবিত্তি বউকে ঠেলে বার করে দিতে পারে এই ভয়ংকর পৃথিবীতে, একটা মেয়েছেলের নিরাপত্তার কথা পর্যন্ত ভাবে না, সে এসেছে নেশা না জমার খেদ জানাতে? আর জগন্নাথ নয়, লোকটা জগা। সোয়ামি নয়, রাস্তার লোক একটা।

—দূর হ, দূর হ, মুখপোড়া—ভয়ংকর মুখ করে তেড়ে গিয়েছিল দুগ্‌গা। দূর হ আমার ঘর থেকে।

প্রথম বারের সেই গাল খেয়ে অবাক আকাশ-থেকে-পড়া, খোঁচা-খোঁচা-দাড়ি জগার মুখখানা এখনও চোখের সামনে দেখতে পায় দুগ্‌গা। মনের মধ্যে কেমন একটা টকটক চাটনি খাওয়ার সুখ হয়। যদি ভগমান দিন দ্যান তো সেই ওই জগদীশপুরের মতো ঘর দুয়োর আবার করবে, করে জগাকে দেখিয়ে দেবে, সংসারের সব মুখপোড়াকে দেখিয়ে দেবে...সে একটা একা মেয়েছেলে হতে পারে, কিন্তু সে পারে, সে-ও পারে।

ছাগল তাড়ানোর মতো মেয়েকটিকে তাড়াতে তাড়াতে বাড়ি ফিরছে দুগ্‌গা। পেটের কাছটা উঁচু হয়ে রয়েছে। কোঁচড়ের মধ্যে নানান বাড়ির ফেলে-দেওয়া আনাজ। দাগি আলু, আধপচা বেগুন, পালংশাকের শক্ত গোড়া, দেড়খানা রাঙালু,

মজা কুমড়ো, শেকড়-গজানো মুলো, ধসা বাঁধাকপি।

শিবু নাচতে নাচতে যাচ্ছে—মা। চচ্চড়ি করবি, ও মা চচ্চড়ি করবি, ও মা...চচ্চড়ি...ভুরু কুঁচকে শুনতে শুনতে খালি বাঁ হাতটায় কষে এক চড় কষায় দুগ্‌গা। আঁই আঁই আঁই—শিবুর কান্না শুরু হয়।

লক্ষ্মী সরস্বতী পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। মায়ের প্রতি একটা সম্ভ্রম, মার সম্পর্কে একটা বোবা ভয় তাদের। লক্ষ্মীর তেরো বছর হল, সরস্বতী এগারো। তারপরে খোকা আট, আর এই শিবু পাঁচ। দুগ্‌গা যেমন ঝাড়ালো, সতেজ, ভরন্ত, এততেও গতর মরছে না, তার ছেলেমেয়েগুলি কেউ তেমন নয়। লক্ষ্মীটা তবু মাথা ঝাড়া দিচ্ছে, কিন্তু সরস্বতীটা একেবারেই গুড়গুড়ে। সাতচড়ে মুখে রা নেই। চোখে বোবা ভয়ের দিষ্টি। ওপরের দুই মেয়ের রং একটু ফ্যাকাশে, মায়ের মা-কালী বল্ল তারা পায়নি। কিন্তু শিবুটি একেবারে রঙ্কেকালীর বাচ্চা। যেমন কালো, তেমনি কুচ্ছিত, যেন এক ধ্যাবড়া ময়লা, জঞ্জাল। ড্যাবরা চোখে সদাই জল, নাকে বারোমাস সর্দি। ফাটা গালে জল আর সর্দি মাখামাখি, আর গলায় এক বিতিকিচ্ছিরি প্যাঁ সুর। কিন্তু কেন কে জানে এই অবাঞ্ছিত এক রকমের রেপ-জাত কুচ্ছিত নোংরা সন্তানটির ওপর দুগ্‌গার সমধিক টান। শিবু তার দিদিদেরও আদুরে। বস্তুত দুগ্‌গা থেকে থেকেই মেয়েদের ঝংকার দেয়, দিদিদের আদরেই শিবু ওরকম বেয়াড়া বাঁদর তৈরি হচ্ছে।

কোঁচড়ের আঁস্তাকুড়গুলো ঝেড়ে রাস্তার পাশে ফেলে দিতে ইচ্ছে যায় দুগ্‌গার। চচ্চড়ি! হুঁ! চচ্চড়িই বটে। জগদীশপুরের দাস বাড়ির বউ দুগ্‌গার হাতের চচ্চড়ি খেতে পাড়ার মানুষ মুখিয়ে থাকত। শাউড়ি বলত—তেলটা কি একটু বেশি দিয়েচ বউমা!

তার সোয়ামি জগন্নাথ খাটা পেটা সকাল বিকেল পেরিয়ে সন্ধের ঝোঁকে গরম চচ্চড়ি দিয়ে ভাতের গরাস মুখে তুলতে তুলতে বলত—তেলের হিসেব করলে কি আর অমর্ত জোটে গো মা, মাছ-মাংস ফেলে দুগ্‌গামণির চচ্চড়ি খাও।

মজুমদার বাড়ির কালী মজুমদারের বেশ কিছুদিন নজর পড়েছিল দুগ্‌গার ওপর। কালী মজুমদার বিপত্নীক প্রৌঢ়। মাথার চুল কলপ করে কালো রাখে। কিন্তু হপ্তা গেলেই লাল হয়ে ওঠে ফাঁপানো চুলের গোড়া। বিতিকিচ্ছিরি। কানমে বিড়ি মুমে পান, ক্ষয়াটে খপ্পুরে, গালভাঙা লালচোখো, ধেনো-সর্দার কালী মুজমদারের পুরো নাম কালীকৃষ্ণ মজুমদার। কৃষ্ণটুকু কেউ আর মনে রাখেনি। কৃষ্ণর প্রতি সমীহ বশতই কিনা কে জানে। তবে কখনও সখনও কালী মজুমদারের এক গেলাসের ইয়ারেরা গিলের পাঞ্জাবি আর কোঁচা-লুট ধুতি পরে ভদ্দরলোক সেজে মজুমদার বাড়ির সদরের রাকে তাকে দেখতে না পেলে জিজ্ঞেস করে বটে—কালীকেষ্টবাবু আছেন?

—কী কেষ্ট? বাড়ির মেজ চাকর শ্যামাপদ জিজ্ঞেস করে কানে কাগজের পাকানো কাঠি দিয়ে সুড়সুড়ি দিতে দিতে—ধিনিকেষ্ট?

—কালীকেষ্ট। কালীকেষ্ট। কালীবাবু!

—অ আমাদের খাঁদুবাবু। তা তিনি থাকবেন না তো আর যাবে কোতায়! গাঁজার আড্ডা তো আজকাল বাইধরের ঘরেই বসচে কি না!

বাইধর হল গিয়ে মজুমদার বাড়ির সেজ চাকর। সেই বাইধরের ঘরে কালী ওরফে খাঁদুবাবুর আড্ডা। গাঁজার। সে কথা বাড়ির মেজ চাকর শ্যামাপদও ফলাও করে বাইরের লোককে বলছে। অর্থাৎ কি না শ্যামাপদর চাকরবাকর হয়েও যে পদ আছে, কালীবাবুর মনিবকুলের একজন হয়েও তার সিকির সিকি নেই।

কালী মজুমদার বুড়ো মার কোলের ছেলে। বুড়োকালের ছেলে। আদরে আদরে গোবর করা যাকে বলে তাই করে ছোট্ট থেকে ছেলেটির মাথা চিবিয়ে খেয়েছেন। ফলে বড় যাদু ব্যারিস্টার হল, মেজ হাঁদুর ডাক্তারি হাত যশ চারদিকে ছড়াল, কন্যা কাঁদু বড় ইস্কুলের হেড দিদিমণি হয়ে নাম কিনল, আরেক কন্যে মৃদু জজ-গিন্নি হয়ে দুঃস্থ মহিলাদের নিয়ে সমিতি করেছে, সেই সমিতি এখন বছর-বছর এগজিবিশন করে হাজার হাজার টাকার জিনিস বিকোচ্ছে, খালি খাঁদুরই তেমন হওয়ার মতো কিচ্ছু হল না।

পেশকারিতে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন যাদুবাবু। বাপের মতো বড়দাদা। বাঁহাতের উপায়ে পকেট ঝমঝম করত, এক জালিয়াতের বউকে ভাগিয়ে এনে কালীঘাটের সিঁদুর দিয়ে ঘরে তোলার পর নিজের মা-ও খাঁদুবাবুর মুখ দেখতেন না।

তবে জালিয়াতের বউটি যাকে বলে ফুটফুটে সুন্দরী। যে দেখত হাঁ করে চেয়ে থাকত। জালিয়াত জেলের মেয়াদ খেটে বেরোবামাত্র বউ আবার ভেগে বেরিয়ে যায়। খাঁদুবাবুকে মেরে ছাল চামড়া যে ছাড়িয়ে নেয়নি, এ মজুমদার বাড়ির চোদ্দোপুরুষের ভাগ্য। তবে শাসিয়ে যায় জেল-ফেরত জালিয়াত। কোনও দিন তার বউয়ের ত্রিসীমায় দেখলে ঠ্যাং খোঁড়া, চোখ কানা করে দেবে। বউটি থাকাকালীন মজুমদার বাড়িতে কালীর জলচল ছিল না। ঘরের কোণে স্টোভ পাম্প করে বউটি রান্নাবাড়ি করত। সে আবার খুব শুদ্ধিমতীও ছিল। সাত্ত্বিক প্রকৃতির। বোষ্টমের মেয়ে নাকি। মাছ-মাংস পেঁয়াজ ডিম খেত না ছুঁত না। কালীবাবু চোখ নাচিয়ে বলতেন মাছ মাংস না খেলে কী হবে, আমিষ রত্নাসুন্দরীর গতরে, নজরে, ঠমকে। তবে এ ঘটনা অনেক কাল আগের। কালী তখন যুবা। সে যে কখনও যুবা ছিল তা তাকে দেখলে প্রত্যয় হয় না। যেন মায়ের পেট থেকেই অমন খামচা-চুলো, খ্যাঁচা মুখো, কাঁকলাসের মতো বেরিয়েছে। যাই হোক রত্নাসুন্দরীর চ্যাপটার অনেকেই জানে না। দেয়ালে ঝুলছে যুগলের অয়েল পেন্টিং। রত্নাসুন্দরী নীল বেনারসী পরে, সীতেহার, কানপাশা, গোছা গোছা চুড়ি বালা, কণ্ঠী, রতনচূড়, কোমর-বিছে পরে কৌচে বসে আছে। কালীকেষ্ট দাঁড়িয়ে চুলে পমেটম মেখে টেরি কাটা। পাতলা পাঞ্জাবির ভেতর থেকে সামারকুল গেঞ্জির চালনিফুটো দেখা যাচ্ছে। কাঁধে পাকানো চাদর। পায়ে সাদা চামড়ার নাগরা। মুখ দেখলে এই কালী বলে বোঝা যায় না। কালী বলে ওই তার মরা বউ। ইয়ার বন্ধুদেরও ফাঁক পেলে সে ঘরে ঢুকিয়ে এই পেল্লাই অয়েল পেন্টিং দেখিয়েছে। মজুমদার বাড়িও মানসম্মানের খাতিরে কি ক্লান্তিবশত কে জানে এই রূপকথা মেনে নিয়েছে। মানতে মানতে এখন অসত্যটাই সত্য হয়ে গেছে। বুড়ো মা

নিজেই ছোট ছেলের কথা উঠলে দুঃখ করে বলেন—বউটা অমন অকালে মরে গিয়েই খাঁদু আমার না-সন্নিসি না-গৃহী, সমাজ সংসারের বার হয়ে রইল। আর হবে নাই বা কেন। বউ কি কম রূপের ছিল নাকি? সামনে দিয়ে চলে গেলে আলো হয়ে যেত কোঠা দালান। গুণই বা কী কম? কম সোয়েটার কম আসন বুনেচে? মাছমাংস খেত না, বাপের বাড়ির গৃহদেবতা নারায়ণ, বুড়ো মা ভক্তিভরে দুহাত জড়ো করে কপালে ঠেকাতেন, আচার বিচারে ভক্তিতে স্বয়ং লক্ষ্মীই কি দেবী সীতাই যেন এয়েছিলেন। কপালে সইল না।

এগুলো তিনি সাধারণত বলতেন রান্নামা, বাসনমাজার ঝি, ধোপানি, নাপতিনি এদের। পাড়া-প্রতিবেশিনীদেরও বলতেন কখনও সখনও। তবে মুশকিল হত যাদুবাবু, হাঁদুবাবুদের সংসারে। বুড়ো মার বাস নীচের তলায়, রান্নাবাড়ির লাগোয়া। যাদুবাবু পুরনো বাড়ির অংশ ভেঙে একেবারে আধুনিক দোতলা বানিয়ে নিয়েছেন। এদিকপানে আসার দরকারই হয় না। কিন্তু হাঁদুবাবু ডাক্তার ওই একই বাড়ির দোতলায় থাকেন। একতলায় উঠোনের এ দিকে তাঁর চেম্বার, তো উলটোদিকের দুখানা ঘরে খাঁদুর বসবাস। বুড়ো মার সংসারেই তাঁদের সবার খাওয়া-দাওয়া। হাঁদুবাবুর ছোট মেয়ে একবার তার মা-বাবাকে বলে—মা, কাকিমার গল্প করো না।

—কাকিমা আবার কে রে? জেঠিমাকে কাকিমা বলছিস?

—না, না। ছোটবউয়ের ছোটকাকিমা। ওই ঘরে যার ছবি রয়েছে। কী সুন্দর! কীসে মারা গেলেন মা? চিকিৎসা করেও বাঁচানো গেল না? জেঠুও পারলেন না?

ছোটমেয়েকে মিছিমিছি করে কতকগুলো কথা বলতে ডাক্তার-গিন্নির খুব খারাপ লেগেছিল। পরে তিনি স্বামীকে অভিযোগ জানান—ছোটবাবুর যা রকম সকম, ওকে তোমরা টাকাপয়সার ভাগ দিয়ে বাড়ির বার করে দিলে পার। ছি, ছি, একটা নাচউলি না কী! বিশ্বসুদ্ধু লোককে রটানো হচ্ছে না কি মরা বউ। মাথা কাটা যায় আমার।

জবাবে ডাক্তারবাবু বলেন—দ্যাখো বাপু সব পরিবারেই কিছু না কিছু কেচ্ছা কেলেঙ্কারি থাকে। তোমার ভাই কী করল? ডাইভোর্স করা ধিঙ্গি বিবি বিয়ে করেনি? পারিবারিক মানমর্যাদার কথা ভেবে অমন একটু মিথ্যে বলা কিছু দোষের নয়। ছেলেমানুষ এখন নুটু। জানবার বয়স হলেই জানতে পারবে। তা ছাড়া নিজের মায়ের পেটের ভাই। ফেলব কোথায়? লোকে ছি ছি করবে না?

কালীবাবুর আসল জোরের জায়গা এটাই। বিশাল দু মহলা মজুমদার বাড়ির এক-তৃতীয়াংশ একা তার প্রাপ্য। যাদুবাবু ভেঙে ভুঙে নিজের বাড়ি করতে গিয়ে একটা পুরো মহল, বাইরের মহল নিয়ে নিয়েছেন। সে দরুন বেশ কিছু টাকা তাঁর বাকি দুই ভাইকে দেয়। ভেতরে মহলটা তো সমান দুভাগ হবেই হবে। ডাক্তারবাবু কিছুতেই শুধু দোতলা নিয়ে থাকতে পারবেন না। নীচে তাঁর চেম্বার, ওয়েটিং রুম, ডিসপেনসারি...। সেক্ষেত্রে বাড়িটাকে ওপর-নীচ সুদ্ধু কেক-কাটার মতো করে কাটতে হবে। এমনিতে খাঁদুবাবু কতদিন যে দোতলার মুখ দেখেননি তার হিসেব নেই। কিন্তু কেকের খণ্ডের মতো বাড়ি পেলে তিনি সেটাকে ওমপ্রকাশ কালোয়ারের কাছে ঝেড়ে দেবেন। ওমপ্রকাশের সঙ্গে তাঁর অনেক দিন কথা হয়ে আছে।

কাকপক্ষীতে জানে না এমনই খাঁদুর মন্ত্রগুপ্তি। কিন্তু কথা হয়েই আছে। চার লাখ বেয়াল্লিশ হাজার দাম দিয়েছে ওমপ্রকাশ। খাঁদুবাবু ধরেই নিয়েছে রান্নামহলের দিকটায় যেখানে দুটো বড় উঠোন আছে ওখানটাই তাকে দিতে চাইবেন মেজদা। নীচে বুড়ো মার দুখানা ঘর, রান্না-ঘর দালান, কলঘর বাদে একতলায় কিছু নেই, শুধু দুটো উঠোন। ওপরেও স্বভাবতই তাই। ওমপ্রকাশের বাড়ি ভাঙতে সুবিধে, তৈরি করতে সুবিধে। আর উঠোন সে তো খোলা জমিই হল। খাঁদু পুরো পাঁচ লাখই চেয়েছে।

ওম বলেছে—তা কেন খাঁদুবাবু, পুরো টাকা কেন লিবে? তোমাকে একটা ফ্ল্যাট বানিয়ে দিব।

খাঁদুবাবু নিজের বাড়ির চৌহদ্দিতে, নিজের পাড়ার ত্রিসীমায় থাকতে চায় না। যদি বলো কেন তো তার অনেক কারণ আছে। মজুমদার বাড়ির এত দিনের সুনাম। ঐতিহ্য যাকে বলে। যার ঠ্যাকার খাঁদুবাবুরও নেহাত কম না। বাংলা খেতে খেতে খেতে খেতে খাঁদু একেবারে বেহেড হয়ে আবোল তাবোল বকতে আরম্ভ করলে দেশি লিকার শপ নামে শুঁড়িখানার মালিক হরেরাম যদি বলে ওঠে—যাও খাঁদু এবার ভালয় ভালয় বাড়ি যাও।

খাঁদুবাবু তখন টলতে টলতে একটা টিঙটিঙে আঙুল মেলে তেড়ে উঠে দাঁড়ায়—খ্বি বললি? তুই নাপ্‌তের ব্যাটা শুঁড়ি আমায় বাড়ি দেকাচ্ছিস? জানিস আমি কোন বাড়ির ছেলে? ইত্যাদি ইত্যাদি।

খাঁদুর টনটনে জ্ঞান যে এ চৌহদ্দিতে থাকলে তাকে একটু সামলে সুমলে থাকতে হবে। অথচ সে ক্রমশই বেসামাল হয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় কারণ, এ জায়গায় খাঁদু তার ইয়ার বক্সিদের আনতে পারে না, পারবেও না। তারা সব কেউ নামকরা মাতাল, কেউ গুণ্ডো বদমাশ, কেউ জোচ্চোর, খুনেও একটা আছে, বউ খুন করে পার পেয়ে গেছে, কিন্তু তার নিজের ছেলেপুলে বাপ মা পর্যন্ত জানে সে-ই খুনি। ভয়ে বাড়ি থেকে বার করে দিতে পারে না। কিন্তু ছেলেপুলেগুলি ব্যায়ামাগারে ভর্তি হয়েছে। কারাটে শিখছে জোর। এইসব প্রাণের মিতেরা খাঁদুর আহ্লা বন্ধুর বাড়ির ভেতরে ঢুকতে পায় না। হোলি টোলির দিনে ধবধবে শাদা ফাটা পাঞ্জাবি আর লুঙ্গির মতো করে শাদা ধুতি ডবল প্যাটে পরে আবির কাগ মেখে সব সন্ধেবেলা হোলি হ্যায় বলে বেরিয়ে পড়ে, কেত্তনও গায় খত্তাল বাজিয়ে, ঢোলক বাজিয়ে। তখন ভাল করে চেনা যায় না। বুড়ো মা কেত্তন শুনতে খুব ভালবাসেন, খিড়কির দোরের সামনের চাতালে এসে মাথায় কাপড় দিয়ে দাঁড়ান। কেত্তন গাইতে গাইতে ট্যাঁপা, বাবুয়া, ওমপ্রকাশ সব বুড়ো মার পায়ে ভক্তিভরে আবির দিয়ে যায়। কীর্তনের সুরে বুড়ো মা ওই সময়টুকুর জন্যে যেন অন্ধ হয়ে থাকেন। পরে সব চলে গেলে, উদ্দণ্ড হরি বোল হরি বোল ধ্বনি যখন বহু দূরের ব্যাপার হয়ে যায় তখন রান্না-মাকে বলেন—হ্যাঁ গা শিবানী, ট্যাঁপলা না? ঝাঁকড়া চুল, গলায় হার; আবিরে একবার লালমুখো বেকুন হয়ে রয়েচে, আমার পায়ে হাত দিল? বউ খুনেটা! রাম রাম! সাবান আন, সোডা আন, গঙ্গাজল আন।

শিবানী, রান্না-মা বেগতিক দেখে বলে, ট্যাঁপলা? তাই নাকি? আমি তো

কই...তেমন...তা মা আপনি কি গঙ্গাজল পায়ে দেবেন?

—রাম। রাম। বুড়ো মা উভয় সংকটের মধ্যে পড়ে যান।

—তুমি কী বলো মেয়ে।

—আমি বলি কী সাবান জল দিয়ে পা ধুয়ে দিই।

—কেন?—হঠাৎ বুড়ো মার মাথায় উপায় উদয় হয়, কেন? গঙ্গায় চান করতে নাবি না? তখন পা কি আকাশে রেখে নাবি গো মেয়ে? নমো করে নেবে। একটু স্মরণ করে, জোড়হস্ত হলেই মা আর অপরাধ নেবেন না। আনো তুমি গঙ্গাজল। রাম-রাম বউ-খুনেটার হাতের ছোঁয়াচ।

তা, যাদের হাতের ছোঁয়াচে গঙ্গাজল পায়ে ঠেকানোর পাপের ঝক্কি নিতে হয়, তেমন ইয়ারদের বুড়ো মা মজুমদার-বাড়ির চৌকাঠ পেরোতে দেবেন? শুনলে ভিরমি খাবেন না? শ্যামাপদ তাই সদাই পাহারায় থাকে। সদরের একপাশে যদি ডাক্তারবাবুর ডাক্তারখানা তো অন্য দিকে চাকর মহল। শ্যামাপদর খাতির-খয়রাত আলাদা। সে একটি গোটা ঘরের মালিক। ঘরে অবশ্য পুরনো দিনের সিন্দুক, সিন্দুকে রুপোর বাসনকোসন, বড় বড় ট্রাঙ্ক বাক্সে কাঁসা-পেতল, আসন, গালচে, শতরঞ্জি, ট্রে বিস্তর সাতপুরুষের জিনিস রয়েছে। সেগুলি আগলাতে বাগলাতেও তো হবে? শ্যামাপদ একাধারে চাকর-দারোয়ান। কেয়ার-টেকার হালের ভাষায়। চৌকাঠ ডিঙোতে গেলে শ্যামাপদ আটকে দেয়।

—কে হচ্ছেন আপনি? কাকে চাই?

—আমি রমণীরঞ্জনবাবু, কালীবাবুর কাছে যাব—রমণীরঞ্জন কোঁচা হাতে তুলে এগোতে চায়। এক বেঘত ধাক্কা দেওয়া জরিপাড় ধুতি। সিল্কের শার্ট। মিনে-করা সোনার বোতাম। চুলে বিস্তর ক্রিম ঢেলেছে। দাড়ি কামিয়ে আফটার-শেভ দিয়েছে যার সুগন্ধের ঝাঁঝে নাকি তাবৎ রমণীপুরুষ আলোর দিকে পোকার মতো ছুটে আসবে।

কিন্তু শ্যামাপদ ভোলে না।

—ট্যাপলাবাবু না? হুঁ। ঠিক চিনেছি। রঞ্জন-মঞ্জন বলছেন কেন? বেশ, বসুন—রোয়াক দেখিয়ে দেয় শ্যামাপদ।

মানে ওই রোয়াকই তোমার লক্ষ্মণের গণ্ডি। বোসো রাবণ। ওইখেনে বোসো। শ্যামাপদ যদি দেশে-দিগরে যায় তো আছে বাইধর। বাইধর একরকম কালীবাবুরই চাকর। কালীবাবু তাকে বিস্তর তোয়াজও করে।

এক ছিলিমে গাঁজা খাওয়া, এক সিঙাড়া ভাগ করে খাওয়া। ধেনোর পেসাদও দিতে যায়। কিন্তু বাইধর চরিত্রবান মানুষ। জিভ কেটে বলে—এ ছি ছি ছি, ধম্মের চাকর বাইধর আগে, পরে আপনার ছোটকত্তা। অমন কতাও মুখে আনবেননি। তা সেই বাইধরকে বুড়ো মা-ই বলে দিয়েছেন—খাঁদুর ভার তোকে দিলুম। দেখবি যেন উচ্ছন্নে না যায়। বেচাল দেখলেই রাশ টানবি।

বাইধরও ঠিক সেইভাবে চলে। গার্জেনি আর হুকুমবরদারির মধ্যে সে যে কী কায়দায় সামঞ্জস্য বিধান করে না দেখলে বিশ্বাস হবে না।

—ছোটবাবু, আপনার ধুতি-ফতুয়া রইল। দাড়ি কামিয়ে এসে পরবেন। দাঁত মাজতে ভুলবেন না ছোটবাবু। বেরাশ পেস্টো রইল।

বিছানাময় একবার গড়িয়ে নিয়ে মটকা মেরে থাকে খাঁদুবাবু। বাইধর ঘর থেকে একবার সরলে হয়। অমনি তিনি আড়াই লাফে কলঘরে গিয়ে কাজকম্মো সেরে আসবেন। রোজ রোজ দাঁত মাজতে কোনও শা—র ভাল লাগে? তারপর শাদা ফতুয়াটি সরিয়ে ছাইয়ের ওপর বেগনি আঁজি-আঁজিটা পরবেন। তাতে দেখাও খাপসুরত। অল্পবয়সী, জোয়ান রইস, আবার কিছু চলকে পড়লে দাগ-ফাগও তেমন বোঝা যায় না। কিন্তু বাইধর ঘর ঝাড়ছে তো ঝাড়ছেই। একখানা দেরাজ, একখানা টেবিল, তিনখানা চেয়ার, একটা তেপাই, একটা পালং সে আর ঝেড়েমুছে শেষ করতে পারছে না। তৃতীয়বার পালং ঝাড়তে এসে বাজখাঁই হাঁক দিল—উঠুন ছোটবাবু, কতখন দেয়ালা করবেন? চা ঠাণ্ডা জল হয়ে গেল কিন্তু।

খাঁদুবাবুকে এবার উঠতেই হয়। দেয়ালা অব্দি গড়িয়েছে, এর পর কী বলবে? যদি বলে 'রং-বাজি?' মজুমদার বাড়ির ছোটকত্তার ডিগনিটি থাকবে? তা ছাড়া জিভ পুড়োন চা কয়েক কাপ না হলে খাঁদুবাবুর খোয়ারি ভাঙতে চায় না। সত্যি-সত্যিই জল-চা দিতে পারে বাইধর। বুড়ো মার কাছে নালিশ করে কোনও লাভ নেই। বলবেন—হ্যাঁ র‍্যা খাঁদু পরীক্ষে তো দিয়েচিস এককালে। কটা ঘণ্টা দেয় পরীক্ষেওলারা? মন আচে? না ভুলেগুলে খেয়ে নিয়েচিস। একটা পনেরো মিনিট থাকতে ওয়ারনিং বেল, আরেকটা পাঁচ মিনিট থাকতে, তা তারপরও যদি তুই খাতা কলম নিয়ে রেডি না থাকিস সে কি কর্তিপক্ষের দোষ?

বাইধর এবং বুড়ো মা দু'জনে মিলে কর্তিপক্ষ। খাঁদুবাবু চল্লিশ পার হয়ে এখনও ফেলটুস ছাত্তর।

এইসব কারণে মজুমদার-বাড়ির ছায়ার নাগালের বাইরে একটি ফ্লিলাট, লাখ কয়েক টাকা, আর? আর একটি জুত-সই মেয়েমানুষ। এরই তালে আছে খাঁদুবাবু।

দুগ্‌গামণিকে তার খুব পছন্দ হয়ে যায়। রত্নাসুন্দরীর পর এরকমের 'ফিটসই' আর কাকেও দেখেনি খাঁদুবাবু।

যদি বল—এ তো কাঁচা কয়লার মতো কালো।

খাঁদুবাবু বলবে—কালো, ফিলাটের আলো। হাঁ করা পাতা উনুন ধরো। তার ভেতর এক চাঙড় কাঁচাকয়লা জ্বলছে, অনেকক্ষণ হাওয়া দেওয়ার পর ধকধক করে জ্বলছে, দেখেচিস। দমবন্ধকরা শুকনো ধোঁয়ার সুতো ছড়িয়েই যাচ্চে... আঘ্‌ঘান নিয়েচিস কখনও? যদি বলো ও যে ঢ্যাঙা দশাসই মারমুখো মেয়েমানুষ গো, কপালে টাকার মতো সিঁদুরের গোলা পরে, মাথায় যেন রক্ত মেখে থাকে।

—আর পায়ের আলতা বললিনি? পায়ের আলতা জোটে না। সেই আলতা-পাতা আমি এই খাঁদুবাবু দোব। পাতা টিপে টিপে মাকালীর পায়ে আলতা পরাব, দেখবি সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

—আবার বরফ না হয়ে যায়?

—বরফ? এ ধাতু আলাদা। তোরা চিনিস না, খাঁদু মজুমদার চেনে।

খাঁদুবাবুর বন্ধুদেরও দুগ্‌গামণিকে পছন্দ। বিশেষ করে বউ-খুনে ট্যাঁপলার।

আর একজনও আছে, দুগ্‌গামণির ওপর, তার পুরো ফেমিলির ওপর যার খুব নজর। দুগ্‌গামণি যায়। সে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে থাকে। দুগ্‌গামণি যাচ্ছে হিমালয়, তার মেয়েরা যাচ্ছে খাসি, জয়ন্তিয়া গারো পাটকোই। দুগ্‌গামণি যাচ্ছে ক্যাপিটাল এক্সপ্রেস তো তার ছানাপোনারা যাচ্ছে ব্যান্ডেল লোক্যাল, তারকেশ্বর লোক্যাল...। দুগ্‌গামণি যদি ধাড়ি হাতি খেদা ভেঙে ধ্বড় করে নেমে এসেছে, তো তার ছানাগুলি নেংটি ইঁদুরের পোনা। এটি হলেন আলমারি-অলা কুণ্ডুবাড়ির মেজবউ। মেজবউ খুব দূরদর্শী, তার ছেলে-পিলে পাঁচটি। মেজ-বউয়ের তাই সকাল থেকেই শরীর আইঢাই, গা যেন ঢোল, চোখ বুঝি কচলে কচলে ঢ্যালা বেরিয়ে গেলে তবে এই মুখপোড়া ঘুম যাবে। কেউ বোঝে না, আসলে বিইয়ে বিইয়ে মেজবউয়ের শরীরে রক্ত খুব কমে গেছে। ঢলানি, সাঁঝ-ঘুমুনি, সাত-বিউনি বিউটি-কুইন—এমনটাই নাম দিয়েছে তার হিংসুটে জায়েরা। দোষের মধ্যে মেজবউ খুব ফর্সা, এখন ফ্যাকাশে হয়ে আরও ফর্সা দেখায়, ফ্যাকাশেপনা ঢাকতে মেজবউ লিপস্টিক দিয়েই গালে, চোখের পাতায় একটু ঘষে প্রসাধন করে। মুখের গড়ন কাস্তের মতো, কিন্তু চোখদুটি বড় বড়, কালোজামের মতো চোখের তারা, চিবুকে লাল তিল, ঠোঁটজোড়াটিও ভরো-ভরো, মেজবউয়ের বর খুবই বউ-ন্যাওটা। ক্রিম, পাউডার, টিপ, কাজল, কাঁটা, ফিতে এ সব কিছু না কিছু না নিয়ে সে বাড়ি ফেরে না। কিন্তু টিপ-কাজলে আর বরের আদরে কি আর শরীর স্বাস্থ্যের খামতি ভরে?

শাশুড়ি ব্যাজার মুখে বাটি-ভর্তি দুধ বেড়ে দ্যান, সে হজম হলে তো। সাবুর পাইল দিলে আবার মেজবউয়ের ন্যাকার ওঠে। বর ভিটামিন কিনে কিনে, ভিটামিন কিনে কিনে জেরবার। কিন্তু, যার রক্ত দরকার শুধু ভিটামিনে তার কী করবে? মেজবউয়ের বর মনে করে ওষুধ-বিষুদের ব্যাপারে সে ষোলো আনার জায়গায় সতেরো আনা বোঝে। ব্যথা-বেদনা? তো খাও অ্যানালজেসিক, পেট খারাপ তো খাও অ্যাকোয়া টাইকটিস, শরীর ম্যাজম্যাজ তো খাও গুচ্ছের খানিক ভিটামিন। ডাক্তারে কী করবে? ডাক্তার আছে শুধু কাঁড়িখানিক টাকা নিতে। কাজেই মেজবউ ভিটামিন খায় আর হাই তোলে, হাই তোলে আর ভিটামিন খায়।

এরই মধ্যে তার মাথাটি সক্রিয়। হাতে বুনছে পশমের জামা, খটাখট, খচাখচ, সোজা, উল্টো, উল্টো সোজা, জোড়া, সামনে সুতো সোজা। মাথাতেও তেমনি অটোমেটিক অঙ্ক চলছে। এখন দুগ্‌গা, পরে লক্ষ্মী, তারপরে সরস্বতী, তদ্দিনে শিবু বড় হয়ে যাবে।

আসল কথা মেজবউয়ের লোক চাই, অথচ তার বর কিপটে। পাঁচজনের বাড়িতে নিজের লোকজন নিয়ে রাখলে পাঁচজনের চোখ টাটাবে, অথচ নিজের শরীরে ধকল নেবার আর ক্ষমতা নেই। কোনওক্রমে নিজেকে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা আর বরকে খুশি রাখা—এর বেশি আর তার সাধ্যে কুলোয় না। ছেলেপিলেগুলি এলের দড়ি বেলের দড়ি। মায়ের প্রাণ। ছমছম করে। একজন এমন লোক চাই, যে কাজকর্ম শিখিয়ে দিলে করতে পারবে, বেশি মাইনেকড়ি চাইবে না। পুরনো জামা-কাপড় দিলে

বর্তে যাবে। খেতে দিলে শুতে চাইবে না, একটু লাই দিলে মাথায় চড়বে না। মেজবউয়ের নজর লক্ষ্মীর দিকে। বেঁটেখাটো গাঁটাগোট্টা আছে মেয়েটা। মাথায় উকুন, চব্বিশ ঘণ্টা খসর খসর করে চুলকোচ্ছে। সে বার দুয়েক ওষুধ দিয়ে সাবান দিলেই ঠিক হয়ে যাবেখন, গায়ে-পায়ে পরিষ্কার, বয়সকালের নরম চকচকে চামড়া শত অযত্নে অভাবেও ফুটে বেরুচ্ছে।

মেজবউ মনে মনে ছবি দেখে লাইফবয় সাবান দিয়ে আপাদমস্তক চান করে তার বড় জায়ের মেয়ের পুরনো বেগনি ফ্রকখানা লক্ষ্মী পরেছে। পুরনো একটা ভাঙা চিরুনি তার আছে। ভালই চুল আঁচড়ানো চলে তাতে। নেয়ে ধুয়ে, পরিষ্কার জামা-প্যান্ট পরে, চুল আঁচড়ে, হাত পায়ের নখ কেটে, লক্ষ্মী তার কোলের ছেলে শাম্পুকে কোলে নিয়েছে, ছোট মেয়ে মাম্পির হাত ধরেছে, আর এক পাশে আছে টুনি তার ওপরের মেয়ে, তাকে হাত ধরতে হয় না, খুব শান্ত। এই তিনজনকে নিয়ে লক্ষ্মী রাস্তায় ওপারে চিলড্রেন্স পার্কে নিয়ে যাচ্ছে। লক্ষ্মী রাত দিনের, খাবে দাবে, বাচ্চাগুলোকে নিয়ে ঘুমোবে। আর সরস্বতী বড় দুই মেয়ের কাছাকাছি বয়স, বিকেলবেলা আসবে, রান্নাবাড়ি খেলবে, ফরমাস খাটবে 'এই পেন্সিল বেড়ে দে', 'এই জামার বোতাম বসিয়ে দে', 'এই রিবন গুটিয়ে রাখ'। জলখাবার খাবে, মেয়েদের পুরনো জামা ইজের পাবে। এতে বোধহয় তার বরের আপত্তি হবে না।

কত বয়স হবে লক্ষ্মীর? দেখায় দশ এগারো। এরা একটু ক্ষয়া খপ্পুরে হয়, কোন না চোদ্দ পনেরো হবে লক্ষ্মীর। বিয়েও এদের হয় তাড়াতাড়ি। লক্ষ্মীর বিয়ে হয়ে গেলে সরস্বতী। সরস্বতীর বিয়ে হয়ে গেলে শিবু। সর্দির ঝোল মাখানো ছিঁচকাঁদুনে শিবুর মধ্যে মেজবউ তার ভবিষ্যৎ কম্বাইন্ড হ্যান্ডের সম্ভাবনা দেখে। অর্থাৎ ভবিষ্যৎ সুখের। ইতিমধ্যে সে দুগ্‌গামণির ওপর শ্যেন-দৃষ্টি রেখেছে। মেজবউ শ্বশুরবাড়ির যৌথ সংসার থেকে একটু একটু করে ভেন্ন হচ্ছে। সব জায়েরাই হচ্ছে। কিন্তু মেজবউ হচ্ছে আস্তে-সুস্থে। কেননা তার ছেলেমেয়ের সংখ্যা বেশি, তার স্বাস্থ্য খারাপ, তার বর হাড় কঞ্জুষ। এখন দুগ্‌গামণির মতো একটি সা-জোয়ান পাহাড়ের প্রায় কাজের লোক পেলে সে নিশ্চিন্তে ভেন্ন হতে পারে। বাসনমাজা, কাপড়কাচা, রান্না করা, বাটনাবাটা, ঘর ঝাঁটপাট স-ব। এক, স্ত্রীলোকটি বড্ড নোংরা দেখতে, বিশ্বসুদ্ধু লোক জানে সে বাসনমাজা ঝি। তাকে দিয়ে রান্না করালে লোকে অর্থাৎ তার জায়েরা, শাশুড়ি সব বলবে কী। কুণ্ডুবাড়িতে সে পাহাড়প্রমাণ বাসন মাজে। সে সময়ে তাকে লক্ষ করে দেখেছে মেজবউ, দুগ্‌গামণির গায়ে পায়ে কোনও খোসপাঁচড়া দাদ-খুজলি নেই। চকচকে কালো চিতাবাঘের মতো চামড়া। কালো বলেই বোধহয় নোংরা লাগে। কলতলায়, ছাপা শাড়িটা হাঁটু পর্যন্ত তুলে বেশ সাপটে সুপটে নিয়ে বসে দুগ্‌গা। হাতের পেতলের চুড়ি নোয়া ঘুরিয়ে এঁটে নেয়। তারপর কৌটো থেকে ছাই বার করে নিয়ে ঢালতে থাকে। মিহি ছাইয়ের গুঁড়ো, কড়া ছাই, খোলামকুচি সব আলাদা আলাদা। সাবান দিয়ে স্টিলের বাসন ধুয়ে তোলে, খোলামকুচি দিয়ে লোহার কড়াই ঘষে মাজে, মিহি ছাইয়ের গুঁড়ো দিয়ে কাঁসা পেতল এমন করে শুকনো পরিষ্কার করে যে ঝকঝক চকচক করতে থাকে। যতক্ষণ হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাসন মাজে, মাথার

উঁচু চুড়ো খোঁপার ওপর থেকে কাপড় নড়ে না। খুব সভ্যভব্যও দুগ্‌গামণি। সিঁদুর জ্বলজ্বল করছে। টিপটি কখনও ধেবড়ে যেতে দেখেনি মেজবউ। তবে জামাকাপড় চাম নোংরা। সে এখন গরিব মানুষ, করবেটা কী! তা সে জন্যে মেজবউয়ের পুরনো জামাকাপড়, সাবান কি রেডি নেই!

দুগ্‌গামণি এবং তার ফেমিলি **অর্থাৎ মেয়েরা, মেজবউকে চুম্বকের মতো টেনে** রেখেছে।

দুগ্‌গামণি ভোর ছ'টায় বাসন মাজতে এসেছে, মেজবউ দাঁত ব্রাশ করতে করতে কলতলায় হাজির।

—ও বউ, ছাই দিয়ে বাসন শুকনো মাজো কেন?

—জেল্লা দেবে বউদি। তারপর ধুয়ে তুলব, দেখবে কলঙ্কা পড়বে না। গন্ধ থাকবে না। কাঁসা পেতলে আঁশ-গন্ধ যেতে চায় না। শুকনো ছাই, পাকা তেঁতুলের বাড়া।

—তাই বুঝি? তা বউ এমন আলাদা-আলাদা করে যে সব মাজো, তোমার পোষায়?

—ও মা, কথা শোনো বউদির। যে কাজের যা। এর মধ্যে পোষানো না পোষানোর কী আছে?

—না, তাই বলছিলুম আর কি।

পোষানো না-পোষানোর এই যে ঝি-পলিটিকস-এর এখনও কিছুই জানে না দুগ্‌গা। সে জানে মরি বাঁচি করে, মানুষের পায়ে পড়ে, যৎপরোনাস্তি নিচু হয়ে তাকে কতকগুলো কাজ জোগাড় করতে হয়েছে। যেমন করে বাড়িতে, জগদীশপুর কোনায় নিজের বাড়িতে সে কাজগুলো তুলত তেমনি করেই বাড়ি-বাড়ি সব করে। আলমারির ওপর, আলমারির তলার ময়লা ঝেঁটিয়ে বার করে, কোণ, দেয়ালের পাশ সব দু একদিন অন্তর সাবান ছড়িয়ে প্লাস্টিকের নুটি ঘষে পোক্কার করে দেয়। ঝুল কোথাও হলে সঙ্গে সঙ্গে তার ঝাঁটা মুখিয়ে ওঠে। জামা-কাপড় কাচবে তো ধবধবে করে কাচবে। ঘষছে তো ঘষছেই। সাবানের কেক দিয়ে ফাটা কলারের ময়লা, ব্লাউজের পিঠের ময়লা, পায়জামার পেছনের ময়লা সব সে নিঃশেষে তুলে ফেলে তবে ছাড়ে। শাড়ির তলার পাড়ে বেশি ময়লা জমে, সেটুকু তুলে ফেলে একবার দুবার পল্লা শাড়ি সে শাড়ি-পরুনিকে দেখায়...দেখুন বউদি, আপনার কাপড় একবারে ঝকঝকে হয়ে গেছে। আবার সাবান দোব? যত সাবান, কাপড়ের গায়ে তত জ্বলুনি তত জ্বলুনি, শেষ পর্যন্ত রং ফসকা, ভ্যাসকা হয়ে যাবে।

—ফেড করে যাবে বলছ?

—হ্যাঁ বউদি, ফেট করে যাবে, যদ্দিন বাঁচানো যায়। এমন সুন্দর তরমুজ রঙের কাপড়টা আপনার।

এ হেন বিবেচনা বিচক্ষণতা পেশাদারদের কি থাকে? থাকে না? তাই এই বামুনগাছি তেত্রিশ নং ওয়ার্ডের সব ফেমিলি দুগ্‌গা বলতে অজ্ঞান। দুগ্‌গার জন্যে পাগল।

—ও দুগ্‌গা, অ দুগ্‌গা মা, একবার সময় করে শুনে যাস দিকি।

—দুগ্‌গা। দুগ্‌গা রে। এখুনি একবার আয় না, কথা আছে।

—দুগ্‌গাদিদি গো। একটু শুনে যেয়ো না।

—বউ অ বউ, লক্ষ্মী সোনা বউ একটু এদিকটা মাড়িও, বিকেলের দিকে।

দুগ্‌গার জন্যে বউদের, গিন্নিদের সব লাল ঝরছে। আদর আবদার সোহাগ যেন ঝরে ঝরে পড়ছে। মুখের তলায় বাটি ধরলেই হয়। সোহাগগুলি ধরে-ভরে রাখা যেত।

সব্বার এই আদর এই উচ্ছ্বাসের মর্মকথাটি যে দুগ্‌গা বোঝে না তা নয়। এর মানে হল আমাদের বাসনটা আজকের মতো উদ্ধার করে দিয়ে যা দুগ্‌গা। কিংবা দুপুরের কাপড়কটা কাচবি, কত আর এই দু বালতি? কত নিবি ভেবে-চিন্তে গেরস্থর কথা ভেবে বল্ দুগ্‌গা। কিংবা মজুমদার বাড়ি যে ওই পাহাড়প্রামাণ বাসন ফেলে, পোড়া-বোড়া ছিষ্টি। তা দেয় কত? আমাদের বাবা গ্যাসের উনুন, পোড়া বলে জিনিস নেই। সব স্টিল, সব স্টিল। কাচের বাসন অনেক পড়ে বটে কিন্তু লোকজনের হাতে ও সব ছাড়ি না আমরা। মজুমদারদের সমান সমান দেব, খাটনি কম। দেখো ভেবে।

মর্মকথাগুলো জেনে-শুনেও কেমন একটা আহ্লাদ হয় দুগ্‌গামণির মনে। সে যেন দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়চুড়োয়, অভিমানে স্বগ্‌গে উঠে যাবার ধান্দা তার। কিন্তু তামাম পৃথিবীর লোক দু-হাত তুলে তাকে ডাকছে—আয় দুগ্‌গা, নেমে আয়, এখুনি স্বগ্‌গবাসিনী হোসনি। আমরা ভেসে যাব তাহলে। অ দুগ্‌গা, সোনার মেয়ে, সোনার বউ, কী চাও মা! গোছাখানিক টাটকা রুটি? দোবখনি। পঁড়িরুটির মাঝ? নিচ্চয় নিচ্চয়, আর কী চাই? মাছের তেল-পটকা, কণ্ঠা, ন্যাজা? পাবি, পেয়ে যাবি। সুগন্ধঅলা ফিনাইল! রোজ ঘর মুছিস আর নিজের দুর্গন্ধ ঘরটির কথা মনে করে মন কেমন করে? নিস খন, ভিটামিনের শিশি খালি আছে, তাইতে করে, কাল মনে করিয়ে দিস। কাপড় সব কেচে দিবি, একমুঠো গুঁড়ো সাবান চাস? পয়সা নিবি কি নিবি না? পয়সাও নিবি, এক দিন এক দিন একটু সাবান সোডাও চাস, ভেবে দেখি দুগ্‌গা তুই যখন চেয়েছিস পাবি, শুধু একটুখানি ভেবে নিইরে মা। নেবে আয় দুগ্‌গা নেবে আয়...

কাপড় কিনলে কাপড় দেবো (ফাটা চটা)
মাছ কাটলে মুড়ো দেবো (পচা ধসা)
হরিণঘাটার দুধ দেবো (দই জমা)
আর দেবো কী?
ড্রাম খানেক ময়লা কাপড় ভিজিয়ে রেখেছি।

কেমন একটা আহ্লাদে, দুগ্‌গার উঁচু মাথা আরও উঁচু হয়ে যায়। চুড়ো খোঁপার থেকে দু চার গুছি চুল বেরিয়ে এসে কালকেউটের মতো ফোঁস ফোঁস করতে থাকে। নাক আর বুক আকাশমুখো হয়ে যায়। তিন মেয়ে নিয়ে দুগ্‌গা পথ চলে—গমক, ঠমক, গমক, ঠমক, ঝনক, ঝনক, ঝনক। রাস্তার রোমিওরা ঝুলপি চুমড়ে বলে, হেলেন বিবি চললেন।

বস্তির অন্য বউ-ঝিরা অর্থাৎ বাসন-মাজুনি কাপড়-কাচুনি, ঘর-মুছুনি, ছেলে-ধরুনি, রান্না-করুনিরা বলে, ঠ্যাকার। ঠ্যাকারে পা পড়ছে না। গতর আর

কদ্দিন? এইভাবে লোক-মজানোর জন্যে অসাগর খাটলে, গতরে পোকা পড়ল বলে। তাখন? তাখন দেখা যাবে।

এদের দোষ দিয়ে বা হিংসুটে নাম দিয়ে কোনও লাভ নেই। কে সেই বর খেদানো, ভায়ে-তাড়ানো এক-কাপড়ে নিঃসহায়াকে বাঁচার পথ দেখিয়ে ছিল? এই বামুনগাছির বস্তির গঙ্গাই তো? চুরির দোষে তার কুণ্ডুবাড়ি থেকে, মজুমদার বাড়ি থেকে এক-কথায় চাকরি যায়। পেটকাপড়ে গঙ্গা রোজ দিনই কিছু-না-কিছু নিয়ে আসত। লোকে বলত গঙ্গার হাত-টান যেমন-তেমন হাত-টান নয়। ও এক মড়িপোড়া রোগ। কিছু না পেলে গঙ্গা মনিব বাড়ি থেকে কোঁচড় ভরে গু-গোবরও নিয়ে আসবে। তা একদিন বিস্কুট চুরি করতে গিয়ে বুড়ো মার কাছে ধরা পড়ে গেল। কুণ্ডু বাড়ির বড় বউও সাবানের গুঁড়োর প্যাকেট সুদ্ধ হাতখানা তার ধরে অবাক মানল—তাই বলি মা, নিত্য নিত্য সাবান কিনতে হচ্ছে, এই এক কিলো আনলুম তো তিনদিন যেতে না যেতে আর এক কিলো! এ যে পুকুর চুরি। ব্যস, গঙ্গার চাকরি গেল। তো সেই বাড়ি কি গঙ্গা দুগ্‌গাকে দূর থেকে দেখিয়ে দেয়নি, সাবধান করতে বলেনি কি—আমার নাম করবিনি। এমন আত্মবিলোপ, আত্মত্যাগ যেখানে সম্ভব হয়েছে সেখানে হিংসে-দ্বেষের কথাটা তোলা ঠিক না। ঠিক কী?

আসল ব্যাপার হল সব কর্মী পুরুষ-নারীরই একটা সংঘ থাকে। সংঘের থাকে একটা নিজস্ব কোড, নিজস্ব নীতি। সর্বসম্মতিক্রমে সেটি ঠিক হয়। সভা সমিতি করে এ সব হয় না, এদের বলে কনভেনশন, প্রথা।

—এ বেলা লেবুতে ছাইয়েতে ভিজুক, তবে তো! তেঁতুলের মুখ তো দেখতে দাও না মা, কী করব বলো।

—ও রে ও তেমন পোড়া নয়, একটু ঘষেই দেখ না।

—তোমার বাড়িই তো আর এক মাস্তর বাড়ি নয় মা। সব টেইমে টেইমে কাজ।

বাসনমাজুনিরা উপরন্তু বাসন মাজবে, ধোবে, কিন্তু মুছবে না। মুছতে হলে এক্সট্রা পয়সা চাই।

দুগ্‌গামণি গেরস্থ ঘরের ঝি, গেরস্থ ঘরের বউ। তার ধ্যানধারণা ভিন্নরকম। বাসন মাজা মানে যেমন ধোয়া, তেমন মোছাও। বাসন মাজার জায়গাটিও বেশ করে মিহি-কয়লা, কি সোডা, কি অন্য পাউডার যার বাড়ি যেমন জোটে, দিয়ে ঘষে ঘষে ঝকঝকে করে তুলতে হবে। এ সব একই কাজ। ভবল, তেডবল নয়।

বামুনগাছির বস্তির কাপড়কাচুনিরা প্রথমত কাপড় কাচতে চায়ই না। যদি বা চাইল, তো জিজ্ঞেস করবে—ক' বালতি?

তারপরে জিজ্ঞেস করবে—লাইলন, টেরিলিন, না সুতি? গেঞ্জি ব্লাউজ রুমাল ঝাড়ন, না বিছানার চাদর, বেড কভার, পর্দা?—এই সব বিষয় ক্লিয়ার করে নিয়ে তবে কাজে নামবে তারা, তবে মাইনে ঠিক হবে, জলখাবার ঠিক হবে। দুগ্‌গা সেখানে অবলীলায় বলে আসবে—বিছানার চাদর-পর্দা তো আর নিত্যি দেবেন না মা, রোজকার পরার জিনিসগুলোই তো কাচতে হবে? ও দুগ্‌গা ঠিক কুলিয়ে-গুছিয়ে করে নেবে, যা ধম্মে হয় তাই দেবেন মা।

বামুনগাছির বস্তিতে রান্নাকরুনি খুব কম। যে দু' চারজন আছে তারা একবেলার কাজ প্রেফার করে। সকাল আটটার সময়ে গিয়ে কুটনো-বাটনা ধোয়া-মাজা বাসনকোসন সব হাতের কাছে, দুহাতকে দশভুজা করে দু-ঘণ্টা দুটো উনুন একটা স্টোভে দু'বেলার সব রান্না হয়ে গেল। মায় রাতের রুটি পর্যন্ত, জলখাবারের লুচি পর্যন্ত। এরা আবার খাওয়া-পরার লোক নয়।

—আমরা বাড়ির আম্লাই খাই মা। আপনাদের বাড়ির আম্লার তেমন সোয়াদ লাগে না। মনে কিছু করবেন না।

—তা তুমি নিজেই তো রাঁধবে?

—হলে কী হবে? আপনাদের পছন্দমতো আঁধতে হবে তো। আতেল, আঝাল, পেঁয়াজ নেই, লসুন নেই। সাদা ফ্যাকফেকে, ও আমাদের পোষায় না। মনিবনি যতক্ষণ পারেন খাওয়া-পরাটা মানাবার জন্যে জোর করে যান। একটা সূক্ষ্ম টাগ-অব-ওয়ার এই নিয়ে চলতে থাকে। কারণ খাওয়া-পরা মানলে টাকাটা বেশ কম হয়। আর খাওয়া-পরা মানুক না মানুক হরে দরে ওটা দিতেই হয়।

এগারো সাড়ে এগারোটার সময়ে ধরো কাজ শেষ হল। মানুষটাকে জল খাবার তো দিতে হবে। গোছখানিক রুটি আলাদা মোটা লেচি করে রেডি রেখেছে রাঁধুনি। তার সঙ্গে, এত রাঁধল বাড়ল, তরকারিপাতি ডাল এ সব তো দিতেই হয়। তারপর যদি রাঁধুনি বলে চাটনিতে আর একটু মিষ্টি দেব কি না দেখুন তো মা! গিন্নি পান খাচ্ছেন, তিনি এক ধাবড়া চাটনি রাঁধুনির পাতেই ফেলে দেবেন না? ব্যস একবেলার খাওয়া ফিনিশ। দু' চার দিন যেতে যেতে রাঁধুনি বলবে—এ কাপড়টা আর আপনি কদ্দিন পরবেন মা। রং তো দেখছি একেবারে জ্বলে গেছে! সোনার অঙ্গে সোনা রঙের কাপড় না পরলে মানায়! গিন্নি ডগোমগো হয়ে লাল-নীল ডুরেটি পরিত্যাগ করবেন। রাঁধুনি একদিন ভালমানুষের মতো বলবে, কাঁথা করব নাতিটার জন্যে। একখানা কাপড় দিতে পারেন মা! মেয়ে বলছিল—না চাইবে না। আমি বলি কি আমার মা স্বয়ং দুর্গা মা-ই। তিনি কি কিছু মনে করতে পারেন? ব্যস লাল-নীল ডুরে রাঁধুনির আয়ত্তের মধ্যে এসে যায়। মনিবনি যে এ চালাকি একেবারেই বোঝেন না, তা নয়। কিন্তু ওই যে তিনি বিশ্বমাতৃকা, স্বয়ং দুর্গাই, এই বাক্যগুলির তিনি বশীভূত। কিছু করবার নেই।

দুগ্‌গা অবশ্য এখনও রান্নাকরুনির পদে উন্নীত হয়নি। তার কাপড়ের আঁচল শক্ত করে মুঠির মধ্যে ধরে-থাকা রক্ষেকালীর বাচ্চা শিবুটিকে দেখলে কারুরই আর সাহস হয় না দুগ্‌গাকে এ কাজে বহাল করতে। কিন্তু দুগ্‌গার কাপড়চোপড় ক্রমশই ফর্সা হয়ে উঠছে, চুলে স্পষ্টই তেল সাবান পড়ছে, গা-গতর আর খসকা নেই। বাসন মেজে হাতে পায়ে হাজাও তার পড়েনি। কাজের অন্তে দুগ্‌গা সব সময়ে মনিবনিকে বলে, আধপলা কি সিকিপলা তেল দেবেন মা? কেই বা না দেবে, অমন সুন্দর করে কাজ করার পর একটু চাইলে? তার ওপর দুগ্‌গার একটা ব্যক্তিত্ব আছে। তার লম্বাই চওড়াই মেলে উঁচু খোঁপার ওপর ঘোমটা সাপটে হাত পেতে সে এসে দাঁড়িয়েছে, কপালে সিঁদুরের ড্যালা, সিঁথি ভর্তি সিঁদুর, জ্বলন্ত এয়োতি, কে না দিয়ে পারবে? তা

সেই সিকি পলা তেলটুকুই হাতে পায়ে ঘষে নেয় দুগ্‌গা। তার হাত পা পরিষ্কার।

দুগ্‌গার এই ক্রম-বিবর্তন ময়লা-খসকা ঝুল থেকে তেল চুকচুকে, মাছি-পিছলোনো, ফর্সা ডুরে শাড়ি, গাছকোমরের ফাঁকে বাড়ির ট্রাঙ্কের চাবি ঝুলছে—এ আর কেউ তেমন সচেতন লক্ষে না দেখলেও মেজবৌ দেখে। কলতলায় দাঁত মাজতে মাজতে আড়ে দেখে, বারান্দার কোণ থেকে উঁকি মেরে দেখে, জানলা দিয়ে সোজাসুজি দেখে। দুগ্‌গা যে স্বভাব-পরিষ্কার, রান্নাটিও ভাল বোঝে এ ধারণা তার হয়েছে। দুগ্‌গা যে তার দুর্গতিনাশিনী স্বয়ং ভগবান কিংবা ষষ্ঠীঠাকরুণ তাকে মেজবৌর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন এ ধারণা তার ক্রমেই দূর হচ্ছে। দুর্গার আর নিজের মধ্যে একটা অদৃশ্য নিয়তির বাঁধন সে অনুভব করে। ওই যাচ্ছে তার ভবিষ্যৎ, জীবনদায়িনী, ভারবাহিনী সেই চণ্ডিকা যিনি একখানা আলু ভাজা কাটলে বিশখানা করে দেবেন, একটা মাছ ভাজলে দশটা ভেজে দেবেন, পাঁচটা লোক খেতে বললে দশটা লোকের ব্যবস্থা করে দেবেন অবহেলায়, অবলীলায়। নমো চণ্ডি, নমো চণ্ডি, নমো চণ্ডি।

জগা পড়েছে মহা আতান্তরে। সে জানত না বউ নামের একটা মেয়েছেলে না থাকা মানে কিচ্ছু না থাকা। ভোরবেলা ছটার ভোঁ বাজবার আগেই এক দিস্তে গরম রুটি আর সেই অমৃতোপম গরম চচ্চড়ি এক গেলাস কড়া চা দিয়ে সাবড়ে সে কারখানায় যেত। মাঝদুপুরে লাঞ্চের সময়ে এলুমিনিয়মের টিপিনকারিতে তার বুড়ি মা-ই হোক, বউ-ই হোক, কি বড় মেয়েই হোক ভাত তরকারি নিয়ে যেত। গুগলির ঝোল, ঝাল ঝাল করে রাঁধা ডিম, সর্ষেবাটা দিয়ে মাখা-মাখা ভিণ্ডি, কুমড়ো বেগুনের অম্বল, সবই তার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জুটত। সন্ধেবেলা লাল সাবান, এক বালতি গরম জল, ধোয়া গামছা সব কুয়োতলায় রেডি। চান করে জগার অভ্যেস ছিল এক গেলাস ধোঁয়া ওঠা, পোড়া-পোড়া গন্ধঅলা চা খেয়ে একটু গড়িয়ে নেবে।

তখন বাচ্চা-কাচ্চাগুলোকে মুরগি ছানার মতো সে ঘর থেকে তাড়িয়ে তুড়িয়ে নিয়ে পাশে ঠাকুমার ঘর-জাত করে দরজাটা টেনে দিত দুগ্‌গা। টিমটিম করে একটি পরিষ্কার কাচের টোপরের মধ্যে পরিষ্কার আলোর শিখা জ্বলত। ছোট ছেলেকে যেমন আদর করে ভুলিয়ে ভালিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে খাওয়ায় মা, ঠিক তেমনি করে ঘরে ভাত এনে তাকে খাওয়াত লক্ষ্মীর মা।

—দ্যাখো, চোখ চেয়ে দ্যাখো, কুচো চিংড়ি দিয়ে কুমড়ো দিয়ে কেমন রেঁধেছি!

—ভাতের মধ্যে আলু দিয়েছি গো! শুকনো লঙ্কা ভেজে পেঁয়াজ দিয়ে মেখেছি! ভাত খাও সে, নইলে আমার মাথা খাও।

ঘুম-চোখে গবগব করে বউয়ের হাতের গরাস খেতে খেতে জগন্নাথের মনে হত সে-ই বা কে। আর নবাব-বাদশাই বা কে?

হপ্তাভর সন্ধে সাতটা থেকে সেই নিপাট ঘুম, ভোর চারটেয় শরীর একেবারে তাজা, ঝরঝরে, তখন দাও না কত কাজ দেবে। কড়ে আঙুলের ডগা দিয়ে করে দেবে জগা। দাও না ওভারহেড ওয়েলডিং-এর কুচকটালে কাজ। তিন চারতলা সমান উঁচুতে উঠে যাবে জগা। ফাঁক ফোকর বুজিয়ে ফাসক্লাস জোড় দিতে জগার তখন

ফুর্তি হবে। ফুর্তির প্রাণ গড়ের মাঠ।

আবদুল, লতিফ, রামদীন, গণেশ সব বলবে—মাইরি জগা এত ফুর্তি তোর কোত্থেকে আসে বল দিকি? সাত সক্কালে টেনে এসেচিস বলেও তো কই মনে হচ্ছে না। টানলে অবিশ্যি আর ওভারহেডের কাজ করতে হত না।

জবাবে জগা বলবে, বাঁচতে গেলে ফুর্তি চাই রে গণেশ, ফুর্তি চাই।

সেই জগা এখন রাত থাকতে উঠে নিজের চান, ছেলের চান সারে। রুটি গড়ার মুরোদ তার নেই। অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িতে ভাত আলু কুমড়ো পটল সব এক সঙ্গে চাপিয়ে দেয়। সেদ্ধগুলো যে তুলে আলাদা করে মাখবে, তা তার দ্বারা হয় না। ফ্যান গালাও যাকে বলে ঝামেলি। কাজেই ভাতটা টিপে সেদ্ধ হয়ে গেছে বুঝলে, তার ভেতর একদলা নুন আর কাচা তেল ফেলে দেয় সে, তারপর কানাউঁচু কলাইয়ের থালায় ঢেলে বাপে ছেলেতে খেয়ে নেয়। এক থালায় খায় যাতে বেশি বাসন না হয়। তারপর হাঁড়ি, থালা, জলের গেলাস—কোনওমতে মেজে তুলে সে আট ন' বছরের ছেলেকে অর্ডার দেয়। ঘর ঝাঁট দিয়ে বিছানা তুলে খাবার জল তুলে ইস্কুল যাবি। ঘরে তালা লাগাতে ভুলিস না। ব্যস, জগা কারখানার রাস্তা ধরে। সারাদিন আর খাওয়ার আশা নেই। লাঞ্চ হলে বেরিয়ে মুড়ি মাখা, কোনও দিন আলুকাবলি, কোনও দিন চটপটি এইসব অখাদ্য কুখ্যাদ্য খেয়ে সে কারখানায় ঢোকে। বিকেল বেলা আর শরীর চলে না। দোকান থেকে চা আর লেড়ো বিস্কুট খেয়ে রুটি আর খোসাসুদ্ধ আলুর তরকারি কিনে ভাঁড় ঝুলিয়ে বাড়ি যায়। সন্ধে-সন্ধে খেয়ে নেয় বাপ-ব্যাটায়। ঘরময় আরশোলা ঘোরে, বিছানা যেন শুয়োরের নাড়িভুড়ি, তেষ্টার জলটুকুও সব সময় জোটে না। কলসি ঢনঢন করছে। ছেলে জল আনতে ভুলে গেছে। অতটুকু ছেলে কি অত পারে? মেয়ে হলে ঠিক পারত। পেরে যেত। ছেলে যেন ষাঁড়ের গোবর। না আছে এদিক না আছে ওদিক। রুটি-তরকারি খেয়ে জগা দুদণ্ড ঘুমোবে। জিরোবে। তা না—ব্যাবা, পড়া দেখিয়ে দে, পড়া দেখিয়ে দে না, ইস্কুলে দিদিমণি মারবে যে।

—দূর শালা হারামির বাচ্চা, নোংরাখেকো শুয়োরের ছাঁ। তোর আর ইস্কুলে যেয়ে কাজ নেই।

জগা একদিন বেধড়ক মার দেয় ছেলেকে।

—জল আনিসনি, ছাতি ফেটে যাচ্ছে। বিছানা করেছিস ওটা না কুকুর কুণ্ডলী। ঘোচাচ্ছি তোর বড়মানষি পড়া।

মাথায় খুন চেপে গেছে জগার।

ছেলে প্রথমটা তারস্বরে চিৎকার করছিল। ও বাবা গো, মেরে ফেললে গো, ও বাবা গো ও মা গো আর মেরো না, আর করব না। আর জল আনতে ভুল হবে না, আর পড়া দেখতে চাইব না।

তারপর ছেলেটা নেতিয়ে পড়ল। ইতিমধ্যে পাড়ার পাঁচজন এসে দাঁড়িয়েছে।

হারুকাকা বললে—ছেলেটাকে তাহলে মেরেই ফেললে জগা। সারা দিনমান খাওয়া নেই, নাওয়া নেই, জল টানছে আর বিছানা রোদে দিচ্ছে, ঘর ঝাঁট দিচ্ছে আর ধোয়া পাকলা করছে। তা সে সব করেই ইস্কুলে যাচ্ছে, মানুষ হবার চেষ্টা করছে

ওইটুকু ছেলে। ইস্কুলে যাই-ই দুপুর বেলা টিফিন দেয়। তাই কচি পেটটা একটুকু বাঁচে। তা তোমার সইছে না, কেমন। ছেলেটার অমন লক্ষ্মীমন্ত মা-টাকে মেয়েসুদ্ধ তাড়িয়ে ছেড়েচ। নাও এবার ছেলেটাকে খুন কর। আমরা সাক্ষী রইলুম।

—কোন শালা বলে ওর মাকে আমি তাড়িয়েছি—জগা তেড়ে ওঠে। সে মাগি নিজে তার নাগুর সঙ্গে বেরিয়ে গেছে...

—চোপ্। শাগ দিয়ে মাছ ঢেকো না জগা। ছি ছি ছি! সতী লক্ষ্মী ইস্ত্রির নামে কুচ্ছো করতে জিব খসে পড়ে না? ভগবান দেখছেন।

জগার চোপার এমনিতেই তেমন জোর ছিল না। এখন খোকার ওপর পাড়ার মাসি-পিসিরা যথেচ্ছ জল ঢেলে যাচ্ছে, তবু সে চার হাত পা ছড়িয়ে মরা আরশোলার মতো ছেত্তরে আছে দেখে তার পায়ের তলায় মাটি কাঁপতে থাকে।

—খোকা! অ খোকা! গামছা দিয়ে খোকার গায়ের জল মুছতে মুছতে সে ডাকে।

—কারও ঘরে তোলা উনুনে আঁচ আছে? হারুকাকা হাঁকে।

—কেন? কী হবে?

—একটা শুকনো লঙ্কা ফেলে দাও। উনুনটা এখানে এনে। ঝাঁঝে জ্ঞান হতে পারে।

—তার তোলা উনুনের কী দরকার?—বিমলা মাসি হাঁক পাড়ে—এই অমলি কাগজ জ্বাল দিকিনি, একটা নুড়োর মতো করে কাগজ জ্বাল।

অমলি কাগজ জ্বালে, বিভা লঙ্কা এনে তাতে ফেলে। বেশ কিছুক্ষণ পরে খোকা হিঁচ করে একটু হেঁচে ক্লান্ত স্বরে বলে—মা, মা, মা-র কাছে যাব।'

পাড়ার মেয়ে বউরা খোকাকে ধুইয়ে মুছিয়ে শুকনো জামা প্যান পরায়, কোথা থেকে এক বাটি হরলিক চলে আসে। বুভুক্ষুর মতো হরলিকটুকু খেয়ে নিয়ে খোকা এলিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। বিমলা মাসি বলে তোমরা ব্যাটা ছেলেরা ওকে একটু কোলে করো তো! আমার ঘরে দিয়ে আসবে। আমার নিমি, যতন, বিশে যদি চারটি খেতে পায় খোকাও পাবে।

সবাই চলে যায়, ব্যবস্থা নেয়। খালি জগা এক কোণে হাড়-হাবাতে গরুচোরের মতো বসে থাকে।

এই অবস্থা অসহ্য হওয়াতে জগা দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের চেষ্টা করে। গঙ্গাধর মিস্ত্রির ছোট মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, বড়র মুখে বসন্তের বড্ড দাগ থাকাতে কারুর পছন্দ হচ্ছিল না। এ দিকে আড়ে-দিঘে চমৎকার চেহারা, রংটাও ফসকা। জগা জুহুরি। রতন চেনে। অন্ধকারে কি আর বসন্তের দাগ দেখা যাবে? অমন ডবকা, কাজে-কম্মে ওস্তাদ মেয়ে। সে গঙ্গাধরের কাছে গিয়ে প্রস্তাব দিয়েছিল। মনে করেছিল গঙ্গাধর হাতে চাঁদ পাবে।—নগদ দশ হাজার হলেই আমার হবে—জগা নিজের ঘটকালি নিজেই করে। গঙ্গাধর কলের মিস্ত্রি। বিস্তর টাকা, কলে হাত ছোঁয়ালেই আশি-নব্বুই টাকা। কনট্র্যাক্টোর কাজের তো কথাই নেই।

কিন্তু জগা যা যা মনে করেছিল তার কিছুই হল না। গঙ্গাধর, ঠুকে ঠাকে পাইপ-টাইপ নিয়ে কী কাজ করছিল, বললে—বাসন্তী ধাড়ি মেয়ে, নিজেরটা নিজে

বুঝে নিবে। তার সঙ্গে কথা বলে দেখো, তবে ও সব দশ হাজার বারো হাজারের ভেলকিবাজি চাইলে এখানে সুবিধে হবে না। দোজ বরে পাঁচ ছেলের বাপ, ঘরে হাড়ির হাল আবার যতুকের টাকা! বলে সাধ গিয়েছে রাত বিরেতে/মলের আগায় চুটকি দিতে।

এতৎ সত্ত্বেও জগা গুটি গুটি বাসন্তীর কাছে যায়। গরজ বড়ই বালাই। জামাইকে ঠকাক। আপন মেয়েকে তো মিস্ত্রি ঠকাতে পারবে না। কিছু না কিছু বাসন্তীর সঙ্গে ঘরে আসবেই। দানের কাঁসা পেতল, কার্পেটের আসন, পিঁড়ি, ফুলশয্যের খাট বিছানা, বাসন্তীর কানে গলায় হাতে কিছু না হোক তিন চার ভরিও তো মিস্ত্রি দেবে।

কিন্তু বাসন্তীর কথা শুনে জগা আকাশ থেকে পড়ল। কুচো মাছ বেছে তুলছিল বাসন্তী। রান্নাঘর থেকে ডাল সম্বরের বাস ছেড়েছে। ভুরু কুঁচকে, শাড়ি সামলে, ডেঁও পিঁপড়ের মতো পেছন উঁচু করে মাছ জড়ো করতে করতে বলল—

—বলি ডাইভোস হয়েছে?

—কী বলছিস?

—ডাইভোস গো! কোর্টের কাগজে দুগ্‌গাবউদির সঙ্গে কাটান ছেঁড়ান হয়েছে?

—তার কী দরকার? তাকে তো আমি ত্যাগ দিয়েছি।

—তুমি আইন জানো? ডাইভোসের কাগজ ছাড়া যতই নাপিত-পুরুত করো, আর পড়শিকে মাংস ভাত খাওয়াও, আমাকে লোকে বেবুশ্যে বলবে, তোমাকে যে-কেউ নালিশ করে জেলে নিয়ে যাবে।

এমন কথা জগা জীবনেও শোনেনি। সে জানে না, বাসন্তী জানে? আটাশ বছর বয়স পর্যন্ত বিয়ে-না-হওয়া দাগী মুখ, যৈবন হেলা বাসন্তী, সে পর্যন্ত তাকে ফিরিয়ে দিলে?

—রান্নার সময়ে দিক কোরো না জগাদা, কুটকচালি রান্না, একটু ঝাল কমবেশি হলে বাবা আমার ঝুঁটি ধরে দেবে এখন।

ধমক মেরে বাসন্তী রান্নাচালায় সেঁদিয়ে গেল।

এর পরে লাইনের থেকে রাখনি আনা ছাড়া জগার উপায় কী! নগদ তিনশটি টাকা বাড়িউলিকে গুনে দিয়ে প্যাঁচার মতো গোলমুখো গোলচোকো এক বেঁটে বাঁটকুল আঙুরকে ঘরে এনে তুলল জগা। ব্যস আর যায় কোথায়! বস্তিসুদ্ধ সব বোষ্টমের বাচ্চা হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বয়কট। ধোপা-নাপিত, মুখ দেখাদেখি বন্ধ। যা করো বাপু বাইরে করো, গেরস্তর পাড়ায় গেরস্তর সংসারে তাই বলে লাইনের মাগি ঢোকাবে? বিমলা মাসি জগাকে দেখে সশব্দে থুতু ফেললে। হারুকাকা দেখলেই পেছন ফিরে যায়। অন্যরা আসে যায়, যেন জগা একটা জ্বলজ্যান্ত মানুষ নেই কো কোথাও। আর সেই লাইনের আঙুর? যেমনি রূপের ধুচুনি। বোধহয় খদ্দের জুটছিল না। তাই বাড়িউলি বেড়াল পার করেছে। আবার গুণের বাহার কী। বলে আমি প্যাঁজ-রসুন-লঙ্কা দিয়ে কষে পাঁটা রাঁধতে পারি, ধেনোর সঙ্গে জমবে। ওসব ডালভাত চচ্চড়ি-সড়সড়ি আমায় দিয়ে হবেনেকো।

কদিন সত্যিই ঠেসে মদ মাংস খেল জগা। তারপর আঙুর তার ট্রাঙ্কের চাবি ভেঙে

ঘটিসুদ্ধ পাঁচশ টাকা, মায় কুলুঙ্গির লক্ষ্মীর ঝাঁপির পাঁচটা মায়ের কোনকালের রুপোর টাকা, দুগ্‌গামণির রুপোর গোট, টিসুর শাড়ি, খোকার মাদুলি সবসুদ্ধ নিয়ে হাপিস হয়ে গেল। শত খোঁজ করেও জগা তার হদিস করতে পারল না।

বাড়িউলি বললে—আমি তো তাকে তোমাকেই হাওলাত দিয়েছি জগন্নাথবাবু, হামলা আমি করব। কোথায় তাকে খুন করে পুঁতে রেখেছ, এখন সাধু সাজতে এখানে এসে চড়াও হয়েছ। তোমাদের খুনে বদমাসদের চালাকি আমি বুঝি না ভেবেছ? দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা!

জগা কি আর সেখানে দাঁড়ায়!

তারপর বিপদের ওপরে বিপদ। জগার অস্থানে ফুস্কুড়ি, চাকা-চাকা ঘা, রস গড়াচ্ছে। ফ্যাক্টরির ডাক্তার গম্ভীর মুখে সুঁই ফুঁড়ে বললেন—ঠিক মতন ইঞ্জেকশন নিয়ে যাবে। খারাপ পাড়ায় গেছ যদি আর শুনি রিপোর্ট করব, চাকরি ড্যাডাং হয়ে যাবে বলে দিচ্ছি। সারা বিশ্ব বলে এডসের ভয়ে নামাবলি, তুলসী মালা নিচ্ছে, উনি এখন যাচ্ছেন ফুর্তি করতে! হতভাগা, উদো কাঁহিকা।

এরপর থেকেই জগা খুব সিরিয়াসলি দুগ্‌গামণিকে সাধাসাধি করতে থাকে। তিন ভরি সোনার শোক তার কবেই উড়ে গেছে। তার মেয়ে গেছে, ছেলে গেছে, বউ গেছে, সুনাম গেছে, স্বাস্থ্য গেছে, ঘর সংসার গেছে, চাকরিটাও এবার যে কোনও দিন যাবে। তারপর অন্ধকার। ডোবার জলে ডুবে মরা ছাড়া জগার উপায় থাকবে না। কারণ, জীবনের মানে কী তাই আর জগা বুঝতে পারছে না। একগোছা রুটি আর চচ্চড়ি, গেলাস ভর্তি পোড়া পোড়া গন্ধঅলা চা, হাউ হাউ করে বুড়ো মায়ের বকবকানি, খোকার কান্না, মেয়েগুলোর ঘুরঘুরনি, রাতের বিছানায় পেষবার ধসবার দুর্দান্ত একখানা রক্তমাংসের ফোঁসফোঁসে শরীর—সব মিলিয়ে জীবন। এক এক করে সবগুলি মাইনাস হয়ে গেলে আর জীবন কোথায়? ঠাহর হয় না।

কিন্তু দুগ্‌গামণি বিমলা মাসির চাইতে তাকে কম ঘেন্না করে না। অত ঘেন্না সেই লক্ষ্মীমন্ত বউমানুষটির শরীরে যে কী করে এল তা জগা অনেক ভেবেও বোঝে না। এ যেন এক মস্ত ধাঁধা। মেয়েমানুষ—তাকে ধামসাবে, ঠ্যাঙাবে, বাপ-বাপান্ত গাল দেবে। তবু সে হাত টিপবে, পা টিপবে, মাথা টিপবে। যে কাতে শুতে বলবে সে কাতে শোবে, পা-ধোয়া জল খাবে, ধেনোর বমি সাফ করবে, এক বছর দু বছর ছাড়া-ছাড়া পোয়াতি হবে, শাউড়ির পিকদান হাতে করে মাজবে, ঠোনা খাবে, সোয়ামির পাতে খাবে...এ যে দেখি সব উল্টো বুঝলি রাম।

জগা আজকাল ক্লান্তিতে, দুর্বলতায় রাস্তাধারের দোকানে খাওয়ার তাড়সে বিছনা কামড়ে পড়ে থাকে চোপর দিন। অর্ধেক দিন কাজে যাচ্ছে না। শুয়ে কমজোরি মানুষের ঘুম আসে। ঘুমের মধ্যে জগা দেখে তার ক্যালেন্ডারের ছবিটি সে স্বয়ং হয়ে গেছে। অনন্তনাগের শয্যেতে নারায়ণ, পায়ের কাছে বসে পদসেবা করছেন লক্ষ্মী। ও মা! লক্ষ্মী তো নয়! ও তো দুগ্‌গা, দুগ্‌গামণি। পা টিপছে আর ফোঁস ফোঁস করে কাঁদছে দুগ্‌গা। জগা নারায়ণ মেরেছে সপাটে এক লাথি। সারাক্ষণ ফ্যাঁসর ফ্যাঁসর প্যানপ্যানানি, ঘ্যানঘ্যানানি ভাল্লাগে নাকি? হলেই বা নারায়ণ, জগার নারায়ণ, সে

জগারই মতন। ব্যস, আর যায় কোথায়! দুগ্‌গামণি লক্ষ্মীর শরীর কোলাব্যাঙের মতো ফুলতে লাগল। ফুলছে তো ফুলছে, ফুলতে ফুলতে আকাশ-পাতালজোড়া এক ভয়ঙ্করী মা-কালী। লকলকে জিব। খোলা চুল সিঁথির দু পাশ থেকে কুঁকড়ে কুঁকড়ে হাঁটু অব্দি নেমেছে। তলার দিকটা অন্ধকার। কিন্তু বুকের ওপর কাঁচা রক্তের মালা, একটিই মাত্তর নৃমুণ্ড। মুণ্ডটি জগার।

দোহাই মা, দয়া করো মা। আর কখনও অমন পাপ কাজ করব না মা। এই নাকে খত দিচ্ছি, কানে খত, নিজের লাথানো পা নিজে মট করে ভাঙছি। শান্ত হ মা।

বাবা মা, কিছু বলেই সে সেই রক্তদশনা জিহ্বালোলা দুগ্‌গা-কালীকে তার মশান নৃত্য থেকে থামাতে পারল না।

অবশেষে ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে জগা জেগে ওঠে। সুনসান ঘর। টিনের চালে ঝমাঝম বিষ্টি পড়ছে। লণ্ঠনটা ভুষো কালি পড়ে পড়ে আর আলোর ডিবে বলে চেনা যাচ্ছে না। ঘরময় আরশোলা ঘোরার ফরফর শব্দ হচ্ছে, তার চিটে মশারিটার মধ্যে ডাঁশ ঢুকেছে বেশ কয়েকটা। বাইরে ব্যাঙ ডাকছে। ঘেঁও ঘেঁও সুর বিষ্টির শব্দের সঙ্গে মিশে যেন নরকের বৈতরণী নদীর আওয়াজ বলে মনে হয়, ঘরময় শুধু ছায়াবাজি আর ছায়াবাজি। দুগ্‌গা সেই আধো আঁধার ঘরে তার স্মৃতির কোটর থেকে বেরিয়ে এসে হলুদ ফরাসডাঙার ডুরে গাছকোমর বেঁধে পরে হাতে তিনভরির বিছেটি নিয়ে বলল নাও। এবার আমাকে নাও। নেবে তো!

জগা বুঝল ভোর হয়েছে। না হলেও হচ্ছে। এবার তাকে কারখানার জন্যে তৈরি হতে হবে। বিষ্টিতে নিষ্টি ভেসে যাচ্ছে বললেই হয় কিন্তু জগার ঘরে বাইরে কোনও তফাত নেই। সে বিষ্টিতে ভিজে ভিজেই সব সারল। কারখানার খাকি প্যান্ট, রংচটা নীল শার্টটা পরল। মাথায় গামছা জড়াল। ফুটো ছাতাটা মাথার ওপর ধরে বেরিয়ে পড়ল, দরজাটা ভেজিয়ে নারকোল দড়ি দিয়ে কড়া দুটো কষে বেঁধে। ঘরে আর তার নেবার মতো কিছু নেই। তাই তালা চাবিরও দরকার নেই। তবু যদি কারুর ইচ্ছে যায় সে খোদ ঘরটাই নেবে। ঘর নিলে যাবে মালিক পতিতবাবুর। তার কাঁচকলা। সে প্রতিজ্ঞে করেছে ঘরের লক্ষ্মী সে ঘরে ফিরিয়ে আনবেই আনবে। নইলে তার নাম জগন্নাথ দাস নয়। নইলে সে বেজন্মা। তার মা মায়ের মা তার মা সব বেবুশ্যে। তার বাপ, বাপের বাপ, তার বাপ সব চামকাটা গোখোরের বংশ।

এদিকে দুগ্‌গা পড়েছে মহা ফাঁপরে। লক্ষ্মী যে এত গোঁয়ার জেদবন্দি মনিষ্যি তা সে কোনও দিনই বোঝেনি। সত্যি কথা বলতে মেয়েদের বোঝবার সময় তার কোথায়? গুড়গুড়ে ছানাপোনাগুলো হঠাৎ একদিন মুখ তুলে কথা বলতে শুরু করলে সে বোঝে—হ্যাঁ, এ বড় হয়ে গেছে। এই পর্যন্ত। সাধারণত সে দেখতে পায় মাটি রঙের চারটি সরু সরু হাত বাসন ধুচ্ছে, মুছছে, বড় মানুষদের ঘর ধোয়া পাকলা করছে এই পর্যন্ত। মেয়েদের মুখের চেয়ে হাত সে বেশি চেনে।

মজুমদার-বাড়ির ছোটবাবু হেন ধনী লোক লক্ষ্মীকে ঘর দুয়ার মোছা, আর কিছু তার নিজের কাজের জন্যে রাখতে চেয়েছে। সোজাসুজি দুগ্‌গাকেই বলেছে কথাটা।

—অ বউ, দুগ্‌গা-বউ।

তখন সাঁজ-সন্ধের অন্ধকার ভারী হয়ে নামছে। মজুমদার বাড়ির পর একটা সরু গলি দিয়ে শর্ট কাট করলে চট করে বড় রাস্তায় পড়া যায়। ফেল্যাট বাড়ি সেখানেই। সেই সরু গলিতে অন্ধকারে গা মিশিয়ে কালী মজুমদার।

দুগ্‌গা মাথায় কাপড় তুলে দিয়ে চমকে সরে দাঁড়ায়। লক্ষ্মী-সরস্বতী ররে গেছে কুণ্ডু-বাড়িতে। কাজ সারছে। শিবুর গায়ে জ্বর। সে বাড়িতে একটা ট্যাপা পুতুল নিয়ে শুয়ে আছে। শুয়ে কি থাকে? 'তুই যাবি না—তোর সঙ্গে যাবো মা,' শুরু কি আর করেনি? এখন ফেল্যাটের কাজ সেরে তাকে খুব তাড়াতাড়ি শিবুর পাশে গিয়ে উপস্থিত হতে হবে।

—বলি, জানোই তো আমি বউ-মরা মানুষ। সন্নিসি বললেই হয়। মা গত হলেই সংসার ছাড়ব। তা, আমার কাজগুলি করার মানুষ পাই না বউ। তোমার লক্ষ্মী বড় লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে, সকাল বিকেল যদি একটুখানি হাজরে দেয় তো তাতেই আমার চলে যাবে। পঞ্চাশটা টাকা অমনি হাতখরচ বলে দেব।—কালী মজুমদার একেবারে হাত খোলা, দিলখোলা, দরাজ ব্যাপার।

এ তো হাতে চাঁদ পাওয়া। লক্ষ্মী পাওয়া।

তা লক্ষ্মী সেই লক্ষ্মীই পায়ে ঠেলল।

—খাঁদুবাবুর কাজ করতে তো বাইধর আছে।

—তুই কী করে জানলি?

—কেন, বুড়ো মা-ই তো বলেন, খাঁদুর যাতে কোনও কষ্ট না হয় সে জন্যে একেবারে আলাদা চাকর মোতায়েন রেখে দিইচি। খাওয়াদাওয়া, জামাকাপড় ফর্সা রাখা। ঘরদোর পরিষ্কার সাফসুতরো রাখা। তো তারপরে আবার লক্ষ্মী কী করবে?

—নিশ্চয়ই কিছু আছে কাজ। পঞ্চাশটা টাকা দেবে রে।

—খাঁদুবাবুকে দেখলে আমার ভয় ধরে। ওর ঘরে আমি কাজ করতে যাব না। লক্ষ্মী ঘোষণা করে। কোনওক্রমেই তাকে রাজি করানো যায় না।

অগত্যা পরদিন দুগ্‌গা বুড়ো মাকেই বলে—ঠাকুমা, ছোটকত্তাকে বলে দেবেন লক্ষ্মী পারবে না।

—কী পারবে না রে? কী বলে দেব ছোটকত্তাকে?

—লক্ষ্মীকে ওঁর ঘরে কাজের কথা বলেছিলেন তো! তা মেয়ে তো চব্বিশ ঘণ্টা আমার সঙ্গে কাজ করে করেই ফুরোতে পারে না! আসল কথাটি ভাঙে না দুগ্‌গা।

—ও মা। সে কী কথা! খাঁদুর খাস লোক তো বাইধরই রয়েছে। ঠিক আছে, আমি খাঁদুর সঙ্গে কথা বলব অখন।

হরিহরের বাংলা-ভবনে সেদিন খুব মোচ্ছব। বউ খুনে ট্যাঁপলা বলছে—যত খাবি তত খা। ফ্রেন্ডস অ্যান ফ্রাদার্স। আমার খাতায় খা।

আসলে পরিকল্পনার প্রথম স্তর সফল হতে চলেছে। লক্ষ্মীটাকে তার মায়ের আঁচল-ছাড়া করতে হবে। তারপর সরস্বতী। আর শিবুটা তো ছারপোকা। টিপে ধরলেই হল। তারপরেই ঘরের আসল মাল দুগ্‌গামণিকে বেঁধে ছেঁদে গুদোমজাত করতে হবে। ব্যাপারটা কিছুই না। ওমপ্রকাশের ফিল্যাট বাড়ি তৈরি হচ্ছে, তার

নীচতলায় মিটার ঘর। সেটাই সুবিধে হবে।

একটু দূরে একটা বেঞ্চিতে একটা নতুন লোক এসে বসেছে। গালে তিনদিনের বাসি দাড়ি। চোখদুটো কোটরে-ঢোকা, কিন্তু হাফ-প্যান্টের তলা থেকে যে পা-জোড়া আর হাফ-শার্টের তলা থেকে যে হাতজোড়া বেরিয়ে আছে, সেগুলো মোটেই হেলা করবার জিনিস নয়।

লোকটা ছোলা-পেঁয়াজ খাচ্ছে, গেলাসে চুমুক মারছে আর আড়ে আড়ে এ দিকে চাইছে।

—কে হে তুমি লটবর? তিরছি নজরে চাও কেন বাবা: খাঁদুবাবু দরাজ গলায় সুর করে গেয়ে উঠল।

ওমপ্রকাশ বলল—ভেইয়া, পসন্দ হো জায় তো, ইঁহা চলা আও না, আরে ট্যাঁপলাবাবু বহোত্ দিলদার ইনসান হায়। তুমাকে ভি পিলাবে।

লোকটি গুটিগুটি সত্যিই এসে বসল।

—নাম কী তোমার? বলি কোন নামে তোমার চান্দবদনী ধনী ডাকে তোমাকে?

—নটবর।—ওই যে আপনারা ডাকলেন না?

—ওহ্ তাই তুমি সুটসুট চলে এলে?

—সত্যি ভেবেছিলাম আমাকেই ডাকছেন।

ক্রমে খাঁদুবাবুদের প্ল্যান-পরিকল্পনায় নটবরও যোগ দিল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই একেবারে ভেতরের লোক হয়ে গেল। তবে খাঁদুবাবু সাফ-সাফ বলে দিলেন—নটবর বড্ড বড় নাম বাওয়া, তোমাকে নাটা বলে ডাকব। বলি গোঁসা করবে না তো?

—তাই করি? মানুষ চিনি না? আপনাদের মতো রইস লোকের পায়ের ধুলো পেলেও আমার—

—বাস বাস আর বলতে হবে না—হরিহর! মাংস-রুটি লাও। আমার খাতায়।

ট্যাঁপলাবাবুর খাতায় সেদিন জগার ফিস্টিটা নেহাত মন্দ হল না। তন্দুরি রুটি আটখানা, দু ভাঁড় মাংস, দেড় বোতল বাংলা। খারাপ?

জগা কদিনই বামুনগাছির রাস্তায় রাস্তায় দুগ্‌গামণির তত্ত্ব নিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেক কষ্টে ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে সার্টিফিট বার করে ছুটি নিয়েছে সে। এবার একটা হেস্তনেস্ত করবেই। হয় এস্‌পার নয় ওস্‌পার। সন্ধেবেলা শরীর ম্যাজম্যাজ করছিল। পেটের মধ্যে ব্যাঙের ডাক। কোন সকালে মুদির দোকান থেকে টোকো পাঁউরুটি আর জল খেয়ে পেট ভরিয়েছে। হরিহরের দোকান দেখে সে আর নিজেকে সামলাতে পারেনি। তা ছাই গাদা খুঁজতে খুঁজতে একেবারে আসল মুক্তো পেয়ে গেল। চার পাঁচটা বেহেড মাতাল শুওো তার ছেলেপিলের মা দুগ্‌গামণিকে...

জগার মাথায় যেন আগুনের ভাঁটি। পারলে সে এখ্‌খুনি লোকগুলোকে ঘুঁষো মেরে নাক ফাটিয়ে দেয়। কিন্তু না। ঝোঁকের মাথায় কাজ করে জগা জীবনে বড়ই ঠকেছে। এবার তাকে ভেবে-চিন্তে এগুতে হবে।

কিন্তু খাঁদুবাবুর পরিকল্পনার প্রথম ধাপ ভেস্তে গেল।

বুড়ো মা বললেন—হ্যাঁরা খাঁদু, বাইধরকে নিয়ে তোর বড্ড অসুবিধে হচ্ছে, নয়?

—কেন মা? এ কথা কেন?

দুগ্‌গার মেয়ে লক্ষ্মীটাকে ঢোকাতে চাইচিস কেন? যা খুশি তাই করবি, ছোট মেয়ে বলতে পারবে না কিছু—এই, কেমন?

—কে বললে?

—যেই বলুক, আমি বেঁচে থাকতে অসৈরন হবে না, জেনে রেখে দিবি। যা এখন চানে যা। বাইধর তেল গামছা দিয়েছে।

এদিকে মেজবউয়ের কানে কেমন করে গেছে কথাটি। মেজবউ আনচান করে উঠেছে। লক্ষ্মীর তো তা হলে বাজারদর উঠতে শুরু করেছে। এই বেলা না ধরতে পারলে একেবারে ফসকে যাবে। মেজবউ কাঁদো-কাঁদো হয়ে যায়।

বেগুনি রঙের ফ্রকটি সে আগেভাগেই বড় জায়ের থেকে বাগিয়ে রাখে। দিতে কি চায়? শতেক প্রশ্ন।

—তোর মেয়েদের কি জামার অভাব, যে রং-চটা জামাটা চাইছিস? তা ছাড়া বড়ও তো হবে গায়ে। মেজবাবুর নামে এবার যে হাঁড়ি ফাটবে রে?

এ সমস্ত ঠাট্টা টিটকিরিই মেজবউ সয়ে যায়। বলে—দাওই না।

ভোরবেলা কলতলায় বাসনের পাঁজা নিয়ে বসেছে দুগ্‌গা সঙ্গে লক্ষ্মী-সরস্বতী।

মেজবউ স্বর্গের পরীর মতো এসে দাঁড়াল।

—দ্যাখ তো লক্ষ্মী। এ জামাটা তোর গায়ে হয় কি না! ছেঁড়া-বোতাম জামা পরে ঘুরিস। বড্ড খারাপ লাগে আমার।

লক্ষ্মী উঠে দাঁড়াতে আলতো করে মেপে দেখল মেজবউ। একেবারে ফিট।

নিল লক্ষ্মী, সে বড় হচ্ছে, তার লজ্জা নিবারণ হয় না। অগত্যা। কিন্তু মুখ তার গোঁজ। তার নিজের বাড়ির স্মৃতি তার মনে এখনও জাগরূক। হাত পেতে কারওর থেকে কিছু নেবার অবস্থা বা ব্যবস্থা কোনওটাই তাদের ছিল না। ঠাকুমা-বুড়ি শুয়ে-বসে মায়ের ছেঁড়া কাপড় সেলাই করেই কত জামা ইজের বানিয়ে দিয়েছে। মা বড্ড কাপড় ফাটাত। দিব্যি রং, শক্তপোক্ত, পেছনটা ফেটে গেল, কি কোথাও খোঁচ লেগে গেল। সেলাই করে ক'দিন চলল। তাপ্পি দিতে হলেই মা আর পরবে না। ব্যস সে কাপড় অমনি দুই মেয়ের হয়ে গেল।

মেজবউ বলল—সরস্বতী, তোকেও দোব, এখন এই সে কেমন লাল টুকটুক ফিতে। মাথায় ফুল করে বাঁধবি।

সম্প্রতি ফিতের ফ্যাশন উঠে গেছে। এসেছে হেয়ার-ব্যান্ড। মেজবউয়ের মেয়েরা ফিতে বাঁধতে চায় না। তাই নতুন নতুন ফিতেই রয়ে গেছে। মেজবউ করুণ মনে দাতব্য করে।

দু' দিন পর প্রস্তাবটি এল।

লক্ষ্মী কুণ্ডুবাড়ি সারাদিন খাবে দাবে থাকবে। মেজবউয়ের কোলের বাচ্চাগুলোকে দেখবে, মাইনে হ্যাঁ তা-ও পাবে বই কী। পঞ্চাশ টাকা।

দুগ্‌গা হাতে চাঁদ পায়। একটা মেয়ে অন্ততপক্ষে বামুনগাছির বস্তির ওই নরককুণ্ড থেকে বাঁচবে। খাওয়াদাওয়া পাবে। গায়ে-গতরে ভরবে, বাড়বে। ভদ্দরলোকের

বাড়ি, মেয়েগুলোর সঙ্গে থাকতে থাকতে কত ভদ্রতা, লেকাপড়া সব শিকে যাবে।

—নিশ্চয়ই বউদি। করবে বই কী।

লক্ষ্মী বাসন ফেলে উঠে দাঁড়াল।

—না।

—সে কী? কেন?—মেজবউ আর দুগ্‌গার গলা মিলে যাচ্ছে।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে অনেক সাধ্য-সাধনায় লক্ষ্মী বলল—ওদের বাড়ি অনেক লোক। অনেক ব্যাটাছেলে। আমার ভয় করে।

—তাতে কী? তুই থাকবি মেজ মামির ঘরে। ওর মেয়েদের সঙ্গে।

—না, থাকব না।

লক্ষ্মীর এই 'না'-কে কিছুতেই হ্যাঁ করা গেল না। অবশেষে সরস্বতীকে বুঝিয়ে সুজিয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে মেজবউদির কাছে নিয়ে গেল দুগ্‌গা।

—লক্ষ্মী রাজি হচ্ছে না বউদি। সরস্বতীকে রেখে দিন না কেন? খুব কাজের। আর খুব শান্ত।

সে কথা মেজবউ খুব ভাল করেই জানে। কিন্তু সরস্বতীকে যে তার পেট ভাতায় রাখার ইচ্ছে ছিল—ওকে কিন্তু অত মাইনে দেব না দুগ্‌গা।

তিরিশটা টাকা দেবেন বউদি—তাতেই হবে।

সরস্বতী বহাল হয়ে গেল।

আর লক্ষ্মী ফিল্যাট বাড়ির দিদিমণির বাড়ি একদিন গিয়ে প্রায় কেঁদে পড়ল।—দিদিমণি আপনার বাড়ি আমাকে রাখো না। সব করে দেবো। কিচ্ছু দিতে হবে না। খালি পরিষ্কার নতুন জামা-প্যান দিও। আর লেকাপড়া শিকিও।

দিদিমণির অনেক দিন এ মেয়েটির ওপর নজর ছিল। কিন্তু তিনি প্রাইমারি ইস্কুলের টিচার। সাধ্য কি একটা রাতদিনের লোক রাখেন!

—তোর মা রাজি হবে কেন?

—আমি পেলিয়ে আসব।

অতঃপর দুগ্‌গাকে রাজি হতেই হল। এখন লক্ষ্মী দিদিমণির বাড়িতে। সরস্বতী কুণ্ডুবাড়িতে। মেয়েদের ভাতের ভাবনা নেই। শিবুই ছোট ছোট হাতে মাকে সাহায্য করে। দুগ্‌গা দু-দণ্ড বসবার জিরোবার সময় পায়। মাথার উকুন টিপে টিপে মারে, শিবুর মাথা ন্যাড়া করে দেয়। বিছানা বালিশ রোদে দ্যায়, কাচে, এ বাড়ি থেকে চাদর ও বাড়ি থেকে বালিশের ওয়াড়, সে বাড়ি থেকে কাঁথা এনে বিছানাটিকে গুছিয়ে তোলে সে। পাতার ঝাঁটা গাছটা দিয়ে ভাল করে ঘর ঝাঁটায়। গোবর-ন্যাতা দেয়। সামান্য যে কটা সিলিভারের বাসন ছিল মাটি তুলে মেজে ঝকঝকে করে তক্তপোষের তলায় কাঠের পিঁড়িতে সাজিয়ে রাখে। জনতায় পলতে পরায়। এ বাড়ি ও বাড়ি থেকে চেয়ে-চিন্তে পুজোর পাওনায় যে কটি শাড়ি-জামা-ফ্রক-ইজের জমেছে সব একটা টিনের ফুলকাটা বাক্সে রেখে দেয় সে গুছিয়ে। এই ফুলকাটা তালা দেওয়া বাক্সটিই তার আপন রোজগারের কেনা প্রথম আসবাব। শাড়ির ভাঁজে থাকে তার জমানো টাকা। আরও আসবাব সে কিনবে। আয়নাওলা টেবিল, ছবি, তাক...।

এখন আর বাড়ি বাড়ি বাসি রুটি খেয়ে বেড়ায় না সে। গরম চা-টুকু খায়। যে বাড়িতে মুড়ি দিল কি টাটকা পাঁউরুটি দিল খেল। বাকি সব রুটি বাড়ি নিয়ে এসে সে সারা দুপুর রোদে শুকিয়ে নেয়। এগুলো হোটেলে বিককিরি হয়। কে জানে কী করে। বড়লোকেদের হয়তো সাধ হয় বাসি রুটি ভাজা খাবে। ভগমান জানেন।

সন্ধে ছ'টার পর দুগ্‌গার আর বাড়ি-বাড়ি কাজ থাকে না। সে দাঁতে ফিতে টিপে পারা-ওঠা চটা আয়নায় মুখ দেখে দেখে চুল বাঁধে। সিঁদুর পরে, সাবান দিয়ে গা ধোয়, শিবুটাকে মোছায়। তারপর নিজে একখানা পরিষ্কার ছিটের বেলাউজ, মেজবউদির দেওয়া ছাপা শাড়ি পরে, শিবুকে মেজবউদির তিন নম্বর মেয়ের দরুন ফুল-ফুল ফ্রকখানি পরিয়ে, মাথায় লাল ফিতের ফুল বেঁধে দিদিমণির বাড়ি যায়।

তখন দিদিমণি তাঁর দুটো ঘরের একখানা ঘরে কয়েকটা বাচ্চা নিয়ে পড়াতে বসিয়েছেন। লক্ষ্মী আসাতে তাঁর ঘর সংসারের কিচ্ছুটি আর করতে হয় না। সময়টুকু তাই বিক্রি করছেন দিদিমণি। আয় এক লাফে তিনগুণ হয়ে গেছে।

—দুগ্‌গা এলি? যা রান্নাঘরে গিয়ে বোস। দিদিমণি হাসিমুখে বলেন। রান্নাঘরের দোরগোড়ায় পিঁড়ি টেনে শিবুকে নিয়ে বসে দুগ্‌গা।

গ্যাসের উনুনটি লক্ষ্মীর নাগালের মধ্যে আনবার জন্যে নিচু করে ধাপি বানিয়ে দিয়েছেন দিদিমণি।

একটি সবুজ, সামনে ঝালর ফ্রক পরে মাথায় পরিষ্কার বেড়াবিনুনি বেঁধে লক্ষ্মী গরম জল করে আটা ঠাসল। ছোটি ছোট লেচি কেটে পুট পুট করে বেলে ফেলল। দুগ্‌গা একবার বলে—আমি বেলে দেব রে?

—কোনও দরকার নেই—লক্ষ্মীর কথাবার্তার রীতই পাল্টে গেছে। দুগ্‌গা অবাক হয়ে দেখে তার সেদিনের সেই ফ্যাকাশে রোগা মেয়ে কেমন চকোসা, গায়ে-গতরে হয়ে উঠেছে। চুলের বিনুনিগুলো কী? ইয়া মোটা। তার ওপরে রুটি সেঁকছে দেখো। গোল জালির ওপর একটা করে রুটি ফেলছে, সেটি টোপর হয়ে ফুলে উঠছে, তাকে শূন্যে ছুড়ে দিচ্ছে লক্ষ্মী জালির হাতল একটু নাচিয়ে। রুটির অপর পিঠ সো-ওজা এসে পড়ছে জালির ওপর। ছেঁচকি করছে লক্ষ্মী, কী সুন্দর বন্ন? লালচে লালচে পুরুষ্টু বেগুন ভাজা। চাটনি।

—ও কীসের চাটনি করছিস রে লক্ষ্মী?—দুগ্‌গা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

—আমসত্ত্ব দিয়ে টোম্যাটো দিয়ে খেজুর দিয়ে—

—আমসত্ত্ব তো লোকে এমনি খায়, আবার...

—একটু খেয়ে দ্যাখো না দুগ্‌গা, লক্ষ্মী একটা একটা রুটি দিয়ে মাকে আর শিবুকে একটু দে দিকিনি।—পিছনে দিদিমণি এসে দাঁড়িয়েছেন।

লজ্জা পেয়ে উঠে দাঁড়ায় দুগ্‌গা—না না দিদি, অমন করলে আর আসবনি, সন্দেবেলা মেয়েটার জন্যে মন কেমন করে। আর এমন সুন্দর কাজ করে যে চোখ জুড়োয়।

—তা যা বলেছিস। তবে আসবিও। চাটনিও খাবি। লক্ষ্মীর হাতে গড়া পাতলা পাতলা রুটি আমসত্ত্বর চাটনি দিয়ে—তার সঙ্গে অমৃতর কোনও তফাত বোঝে না

দুগ্‌গা।

আবার একদিন সরস্বতীর বাড়ি যায় দুগ্‌গা। তেমন আমল পায় না সেখানে। তবু যায়। সারাক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে সরস্বতী ছোট্ট বাচ্চাটাকে পাউডার মাখাল। টাটকা জামা পরাচ্ছে। তুলতুলে পায়ে তুলতুলে মোজা জুতো। তার ওপরের মেয়েটার চুল আঁচড়ে দিচ্ছে। হেয়ার-ব্যান্ড আটকে দিল। তার নিজের বয়সী মেয়ে দুটোকেও জামা-জুতো পরাচ্ছে সরস্বতী।

—এই মেজবাবুর চা আন।

—এই, অমনি আমার জন্যে একজোড়া পান, গাটা কেমন গোলায়।

জোড়া পায়রা বসে এখন বাকুম-বাকুম করবে। পাঁচটা ছানাপোনাকে নিয়ে সরস্বতী জেরবার।

এ বলে—রেলিং-এর মাথায় চড়ব।

তো ও বলে—পার্কে যাব দৌড়তে।

আর একজন বলে—এক্কা দোক্কা খেলব।

তো আর দুজন বলে—ও আবার একটা খেলা না কি! চলো আমরা ক্যারম খেলি।

তবু ওরই মধ্যে সরস্বতী হুমদো বেড়ালের মতো মোটা হয়েছে। গায়ে মাথায় চেকনাই। জামা কাপড়ে ছিরিছাঁদ। ছেলেপিলের লোক। মেজ বউ খুব সাবধান মানুষ। দুগ্‌গাকে বলে—কিছু মনে করো না দুগ্‌গা, শিবুকে ওদের সঙ্গে না-ই খেলতে দিলে। মাথায় উকুন।

এরপরই শিবুর মাথাটি ন্যাড়া করে দিয়েছিল দুগ্‌গা।

এখন কথা হল, লক্ষ্মী-সরস্বতী বাড়ির বার হয়ে গেছে। আছে শুধু ছারপোকা শিবু। অর্থাৎ কিনা খাঁদুবাবুর চালাকি ছাড়াই দুগ্‌গামণি হেলেন বিবির বাড়ি সুনসান। অথচ কিনা এখনও প্ল্যান মাফিক কাজ হল না।

—কেন?

না দুগ্‌গামণি দরজা সারিয়েছে। বেরোবার সময়ে তালা দিয়ে বেরোয়। রাতে খিল আঁটে। ভেতরের কড়ায় তালা লাগায়। এখন, আলগা আগড় ঠেলে বস্তির মেয়েমানুষের মুখ বেঁধে জবরদস্তি করা এক আর তালা ভেঙে ডাকাতি করা আর এক।

ট্যাঁপলা এমনটাই বলেছিল। ট্যাঁপলা অতি বেপরোয়া মানুষ। কিন্তু খাঁদুবাবুর তো তা মতলব নয়। দুগ্‌গা তার ঘরেই অবস্থান করবে। ওমপ্রকাশের দেওয়া ফিল্যাটের ঘর। মাঝে মাঝে ট্যাঁপলা ইত্যাদি প্রসাদ পাবে, কিন্তু দুগ্‌গামণির স্বত্ব একা খাঁদুর। যতই হোক খাঁদু ভদ্দরলোক বাড়ির ছেলে (?) না? তার এক দাদা ব্যারিস্টার আরেক দাদা ডাক্তার না? বাইরের চোখে দেখাবে খাঁদু নিজের অংশ বিক্‌কিরি করে ভেন্ন হল—দাদা বউদিদি-ভাইপো ভাইঝিরা দেখে না পোঁছে না। বাড়িতে একটি পাঁচকাজের লোক রেখেছে খাঁদু। কে? না দুগ্‌গা। ব্যস ফুরিয়ে গেল। কে অত চড়াও হয়ে দেখতে যাচ্ছে—দুগ্‌গা কতক্ষণ থাকছে, কী করছে। খাঁদুবাবুর বয়স যতই হোক, দেখতে একটি চিমসে বুড়ো বই তো নয়। কুচ্ছো করা অত সোজা নয়কো। কিন্তু

খাঁদুবাবুর কপাল মন্দ। বুড়ো-মা মরেও মরে না। এই চোখ উল্টে গেল। আবার দেখো উঠছে হাঁটছে খবরদারি করছে। ওমপ্রকাশের ফিল্যাটও শেষ হয় না। দিনের পর দিন ভারা বাঁধাই আছে। বড় বড় ডোব্ ডোব্ গর্ত হয়েই আছে। পিলসুজের মতো পিলারগুলি খাড়া, ওপরে দীপটি নেই। বললে ওমপ্রকাশ বলে—আরে ভেইয়া, এ তো আচ্ছাই আছে। তুমার তো সুবিস্তা হোল। তৈয়ার হয়ে গেলেই রমরম বিক্রি হয়ে যাবে। তুমার জন্যে কি আর ফিল্যাট ফেলে রাখতে পারব? এমন অবস্থায় দুগ্‌গামণিকে নিয়ে একটি পার্ট-টাইম ডেরা করবার কথা ভেবেছে খাঁদু। কিন্তু ওমপ্রকাশ তার মিটার ঘরের পাশে দারোয়ানের ঘরটিও দিতে দ্বিধা করছে। আর এদিকে ট্যাঁপলা হয়ে পড়েছে মরিয়া।

বউ খুন করে পার পেয়ে ট্যাঁপলা জীবন এবং জগৎটাকে তার হাতের পাঁচ ভাবে। সবই খুব সহজ সোজা করে ফেললেই হয়ে গেল। ট্যাঁপলার গায়ে হাত ছোঁয়াতে পারবে না কেউ। তা ছাড়া ট্যাঁপলা নাম-করা দুষ্কৃতী। রাজনৈতিক দলের ছাতার ছায়ায় থাকে। তাকে বড় একটা কেউ ঘাটাতে যায় না। কাজেই ট্যাঁপলা দুগ্‌গামণিকে চাইছে অথচ পাচ্ছে না, এমন একটা পরিস্থিতি বেশি দিন গড়ানোর নয়। সুতরাং ট্যাঁপলা তার নতুন স্যাঙাত নাটাকে দলে নেয়। মনের প্রাণের কথাবার্তার আভাস দেয়।

—বুঝলি নাটা। খাঁদুবাবু ভেবেছে ব্যালিস্টার ভাই বলে, আর বাড়ির দুটো পয়সা আছে বলে আমরা আর মানুষ নই। আমাদের আর শখ আহ্লাদ থাকতে নেই। তা ছাড়া ভেবে দ্যাখ, কী আছে ওই চিমসে বুড়োর, দুগ্‌গার ও নখের যুগ্যি? মুখ বেঁধে নিয়ে গিয়ে তোড়াখানেক টাকা ঢেলে দিলেই অমন রসবতী মেয়েছেলে ওর দিকে ঢলবে?

নাটা কোনও কথা বলছে না। তার ভেতরটা উত্তেজনায় গুরগুর করছে।

দিই মেরে নাকের ওপর, কিংবা রগ ঘেঁষে।—ভাবছে সে, আবার সামলে যাচ্ছে, ঝোঁকের মাথায় কিছু করাটা ঠিক নয়।

—ঢলাবার জন্যে চাই এমনি মরদের মতো লাশ। গেঞ্জির হাতা তুলে মাসল দেখায় ট্যাঁপলা। বুক চিতোয়। লুঙ্গি তুলে উরু দেখায়।

অমনি নাটার মধ্যে কী যেন একটা হয়ে যায়। প্রবল রক্তোচ্ছ্বাস মুখে সে বিরাশি-সিক্কার এক চাপড় মারে ট্যাঁপলার উরুতে। চণ্ডালোপম রাগকে প্রাণপণে হাসিতে পরিণত করে বলে ওঠে হাঃ হাঃ হাঃ। এই না হলে মরদ। এই না হলে উরুত!

ট্যাঁপলা খুব চমকে গেছিল। তার উরুতে পাঁচ আঙুলের দাগ দাগড়া দাগড়া হয়ে বসে গেছে। সেদিকে তাকিয়ে সে বলে—তাই বলে তুই এমন চাপড় মারবি স্যাঙাত যে...নাটা বলে—এ হে হে হে, ভুল করেছি মাফ করো স্যাঙাত। তোমার এমন দুর্যোধনের মতো উরুত। তার চামড়া এত নরম, মেয়েছেলের পেটের মতো হবে তা কি আমি ভেবেছি?

—মুখ সামলে নাটা। ট্যাঁপলা গর্জায়। মেয়েছেলের সঙ্গে তুলনা দিলে তার আর জ্ঞান থাকে না। মেয়েছেলে আবার মনিষ্যি? যে তার সঙ্গে ট্যাঁপলা-হেন মহাপুরুষের তুলনা!

—যাক গে আসল কথা হয়ে যাক—ট্যাঁপলা বলে। আমার একটা ঘর নেওয়া

আছে। বস দিয়েচে। দুগ্‌গা যখন রাত করে দিদিমণির বাড়ি থেকে ফিরবে, গলিটা দিয়ে শর্ট কাট করবে, তখন তুই পেছন থেকে কোঁতকা মেরে ওকে ধরাশায়ী করবি। তারপর তোতে-আমাতে ওর মুখে কাপড় গুঁজব। হাত পিছমোড়া করে বাঁধব। তবে তুই ভাগ চাস না নাটা, খুব খারাপ হয়ে যাবে, ট্যাঁপলা ওই মহাভারতের অর্জুনের মতো হিজড়ে নয়। যে নিজের জেতা মেয়েছেলে পাঁচজনের হাতে ছেড়ে দেবে। তোকে টাকা দেব। বসের সঙ্গে ভাব করিয়ে দেব। চাই কি একটা চাকরিও হয়ে যেতে পারে। চাকরি বাকরি হলে একটা মেয়েছেলে জুটতে কতক্ষণ?

নাটা বলে—তা তো বটেই। তা তো বটেই।

জগদীশপুর কোনার বাস ধরতে চৌরাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে জগা। আজ আর ওমপ্রকাশের মিটার ঘরে আস্তানা জোটেনি। ট্যাঁপলার পরিকল্পনার কথা নাটা ওমপ্রকাশকে ফাঁস করে দিয়েছে। ওমপ্রকাশ ফাঁস করবে খাঁদুবাবুকে। তারপর খাঁদুবাবুর অন্য ইয়ার-বক্সিরা তো আছেই। ওমপ্রকাশই পরামর্শ দিল, আজ আর এখানে রুখিসনি নাটা। কদিনই বাদ দে। ও ট্যাঁপলাবাবু বহোত খতরনাক চিজ আছে। মনে কুছু খেলে গেলেই হল। সুতরাং নাটা বাড়ি যাচ্ছে। সেই নারকোল দড়ি দিয়ে কড়া বাঁধা, আরশোলা-ফরফর, ডাঁশ-ভরা ফাঁকা ঘরখানায়। খোকাটার কদিন খবর নেওয়া হয় না। বিমলা মাসির ঘরে গিয়ে খোকা যেন তার বাপ-মা সব ভুলে গেছে। মারটুকুই ছেলের মনে রইল? আদরটা মনে রইল না? ছেলে দই-ভাত ভালবাসে বলে যে সে কতদিন কারখানা যাবার আগে ভাঁড়ে করে দই কিনে রেখে গেছে? সে সব মনে পড়ে না খোকার?

কাঁধের ওপর একটা ভারী হাত পড়ল। চমকে ফিরে তাকিয়ে জগা দেখে একটি ইয়ং ম্যান। ইয়া চেহারা। গেঞ্জির ভেতর দিয়ে ফুটে বেরোচ্ছে। রংটা ফর্সার দিকে। এক হাতে জগার কাঁধ ধরে অন্য হাত দিয়ে ছেলেটি কাকে একটা ডাকল। ভিড়ের মধ্যে থেকে ইস্প্রিঙের মতো লাফিয়ে, এঁকে বেঁকে যে এসে দাঁড়াল সে আরেকটি ইয়ং ম্যান। পাতলা চেহারা। কিন্তু জগা অভিজ্ঞ লোক, চেয়ে বুঝল—এ একেবারে ইস্টিল।

—কী জগন্নাথবাবু?

জগা এত চমকে গেছে যে সে আরেকটু হলে লাফিয়ে উঠত। কাঁধ চেপে তাকে টিপে ধরে ছোকরা বললে—তবে নাটাবাবু বলব?

—না না না, আ আমি... এর চেয়ে বেশি কথা জগার মুখ দিয়ে বেরোল না।

—আমাদের সঙ্গে চলুন, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা হয় না।

জগাকে একরকম টেনেই দুজনে নিয়ে যায় একখানা বড় বাড়ির নীচের ঘরে। দেখলেই বোঝা যায় পাঁচ শরিকি বাড়ি। চারদিকে পাঁচিলে অশত্থ, বট, পাকুড় গজিয়েছে, খোলা উঠোন রাম-পেছল। কড়ি বরগা থেকে উইয়ের লম্বা মোটা লাইন। ঘরের মাথার দিকে তাকালে আর কিছু দেখা যায় না। ঝুলে ময়লায় এত কালো। দু ব্লেডের একটা পাখা কিন্তু আছে। পাখা চালাতেই, তার ওপর থেকে মৈথুনরত দুটো চড়ুই পাখি উড়ে চলে গেল। কটা খড়কুটো খসে পড়ল। জগা ভাবল—ভদ্দরলোকের

ছেলেরাও তাহলে গুম খুন ধরেছে? আজ তার কোমরে বাঁধা হপ্তার টাকা। খাওয়াচ্ছে হপ্তাভর তিন কমরেট—খাঁদুবাবু, ওমপ্রকাশ আর ট্যাঁপলাবাবু। তার টাকা প্রায় যেমন কে তেমন। তা সেই কটা টাকার জন্যে আজ ভদ্দরবেক্তির ছেলেরা তার লাশ ফেলবে! দেখা যাক! সে শেষ পর্যন্ত লড়ে যাবে।

—আপনি কি জানেন আপনার বন্ধুরা এক একজন খুনে, বদমাস, রেপিস্ট?—চমকে উঠল সে। জানে জগা জানে। কিন্তু এদের কী বলবে?

তা ছাড়া, বদমাস জানে। কিন্তু খুনে?

—ট্যাঁপলাবাবুর সঙ্গে তো আপনার খুব দহরম মহরম।

—না মানে ইয়ে উনি ভালবাসেন। তাই...।

উনি কাউকে ভালবাসেন না জগন্নাথবাবু। উনি ওঁর স্ত্রীকে পুড়িয়ে মেরেছেন। স্ত্রীর হাতের লেখা মকসো করে সুইসাইড নোট বানিয়েছেন, পলিটিক্যাল খাতিরে বেকসুর খালাস পেয়ে গেছেন।

জগা হাঁ করে রয়েছে। এমন কথা এমন খবরাখবর যে সে কখনও শোনেনি এমন নয়। কিন্তু এতটা সামনাসামনি। হাতের কাছে। হতে পারে ট্যাঁপলাবাবুর দুগ্‌গার ওপর একটু ইয়ে হয়েছে। তা হতেই পারে। কার বউ, কেমন বউ দেখতে হবে তো? লোকটা অশ্লীল! কিন্তু তাই বলে বউ খুন?

—প্রমাণ কী এর? বললেই হল? ট্যাঁপলাবাবুর মনটা বড়, একটু ছেলেমানুষের মতো। যেটা চাই সেটা চাই-ই। এরকমটা আছে ঠিকই কিন্তু...

—প্রমাণ? মাসলওলা ছেলেটি বলল—প্রমাণ আমরা? আমরা ওর সব জানি। আমরা ওর ছেলে। বলতে লজ্জা হয়, কিন্তু কথাটা সত্যি। জগা কোঁচো চেয়ারের ছারপোকার কামড়েও দাঁড়ায়নি। এখন অবাক মেনে সটান উঠে দাঁড়াল।

—ট্যাঁপলাবাবুর ছেলে? আপনারা?

ছেলে দুটি একটু হাসল—বিশ্বাস হচ্ছে না, না? ট্যাঁপলাবাবুও এক সময়ে রমণীরঞ্জন নস্কর ছিলেন। ক্রমে কুসঙ্গে কুপ্রবৃত্তিতে এখন ট্যাঁপলা হয়েছেন। আমি বক্সিং বীর, বড় ছেলে—নাম সুকুমার। আর ও আমার ভাই কারাটে বীর, ব্ল্যাক বেল্ট পেয়েছে, ওর নাম পরিমল।

—এই বাড়ি কার জানেন?

—কার?

—আপনার বন্ধু ট্যাঁপলাবাবুর ঠাকুর্দার। শরিকি হলেও শ্রী-ছাঁদ ছিল। ট্যাঁপলাবাবুর দয়ায় এই দশা হয়েছে।

—অ্যা আমাকে এ সব বলছেন কেন? আমি কী করেছি?

—আপনি আর একটি বউয়ের সর্বনাশ করতে যাচ্ছেন। দুগ্‌গামণি বলে একটি বউ আছে বামুনগাছির বস্তিতে। তিনটি বাচ্চা নিয়ে স্বামী পরিত্যক্ত। তার ওপর এখন চোখ পড়েছে ট্যাঁপলাবাবুর। চোখ আরও আছে। খাঁদুবাবুর, কালোয়ার ওমপ্রকাশের। রিকশার মালিক বাবুগুণ্ডার। এই বউটি নির্ঘাত খুন হবে। জগা ভ্যাঁক করে কেঁদে ফেলল। তার বুক ধকধক করছে। মুখ শুকিয়ে কিসমিস।

—কাঁদলে কী হবে? আপনিই তো এটা সম্ভব করতে যাচ্ছেন।

—না, না। আপনারা ভুল বুঝেছেন। আমি শুধু আমার বউকে ফিরে চাই।

—আপনার বউ?

—হ্যাঁ দুগ্‌গামণি।

—ও, তবে আপনিই সেই পাষণ্ড?

—যা বলেন তাই। যা বলেন তাই।

—নিজের বউকে নিজে লুঠ করবেন?

—কী করব? যেতে চায় না যে?

—মেরে বার করে দিয়েছেন। এখন সে রোজগারের মুখ দেখেছে, স্বাধীন হয়েছে, তু বলতেই যাবে কেন?

—আজ্ঞে বলে, আমায় ঘিন্না করে।

— তবে? ঘেন্না কললে আর কী উপায়? জোর জবরদস্তি করে কি আর মানুষের মন পাকেন?

জগা এবার অঝোরে কাঁদতে লাগল। সে কেমন করে এই ছেলে-ছোকরাদের বোঝাবে দুগ্‌গা একটা মানুষ নয়? একটা বউ নয় শুধু। একটা গোটা জীবনের চাবিকাঠি। চাবিকাঠিটি হারিয়ে গিয়ে সে নি-ঘর নি-ভাত, একটা নি-মানুষ হয়ে গেছে। জীবনটাও তার জীবন নেই। নি-জীবন। এর চেয়ে মিত্যুও ছিল ভাল।

—জোয়ান পুরুষ মানুষ কাঁদছেন মানে? ছ্যাঃ—বক্সিং বীর মন্তব্য করল। কারাটে বলল—আর একটা চানস্ দিতে পারি যদি আপনাদের প্ল্যান ট্যানগুলো ডিটেলে বলে দেন।

—বলব। কিন্তু দুগ্‌গামণি বাঁচবে তো?

—আলবত বাঁচবে। আমরা আমাদের মায়ের হত্যার প্রতিশোধ নেব।

—আমাকে জড়াবেন না দাদা। পুলিশ আমি বড্ড ভয় পাই।

তারপর পরামর্শ হল।

আজ লক্ষ্মী কথামালা শেষ করেছে। দিদিমণি আনন্দ করে বললেন—খেয়ে যা দুগ্‌গা, তোতে শিবুতে খেয়ে যা। যাবি তো সেই কাশী, গয়া, রাঁধবি তো খিচুড়ি-লাবড়া। লক্ষ্মীর রান্না খেয়ে আজ মুখ ছাড়া।

দিদিমণি মানুষ ভাল। লক্ষ্মীকে ভালওবাসেন। তবে বাসেন কি আর সাধে? ছিলেন একলা বেওয়া মানুষ। অসুখ-বিসুখ করলেও দেখবার কেউ নেই। এখন জ্বরে জলপটি, মাথায় হাওয়া, গা হাত পা ব্যথা বলে নরম হাতের গা-টিপুনি পা-টিপুনি। হট ব্যাগ। ডাক্তার ডাকা। পথ্যি। এ তো সময়ে অসময়ে আছেই। আরও আছে। বাড়ি টিপটপ। চা, কফি, রান্নাবান্না, দই বসানো, ছানা-কাটা। দিদিমণি যেন রাজার হালে রয়েছেন ওই একটি পুঁটকে মেয়ের দৌলতে। এদিকে আয় বেড়ে গেছে তিনগুণ। দিদিমণি মনে মনে বলেন—লক্ষ্মীই এসেছেন আমার ঘরে। সেই কৃতজ্ঞতায় দিদিমণি দুগ্‌গাকে একটু বেশি বেশি খাতির করেন। পুজোয় কাপড় দিচ্ছেন। রখে রাসে দোলে

শিবুর হাতে দু চার টাকা গুঁজে দিচ্ছেন। তা তাই বা করে কে? দিদিমণির মনোগত ইচ্ছে লক্ষ্মীটাকে বরাবরের জন্যে নেন। লোকেকে লোক মেয়েকে মেয়ে।

দিদিমণির বাড়ি পেট পুরে খেয়ে দেয়ে যেতে দুগ্‌গার নটা বাজল। শীত এখনও তেমন পড়েনি। তবু সুনসান রাত। শিবু বলল—'মা গলিতে ভয় করে, কোলে নে।'

বেড়ে মেয়েকে কোলে নিয়ে গলির মাঝ বরাবর এসেছে। এমন সময় রাস্তার বালবে কে ঢিল ছুড়ল। নিকষ আঁধার। যেন নরকেরও নরক তস্য নরক গলি। পেছন থেকে কোমরের কাছে কোঁতকা খেল দুগ্‌গা। শিবু কোল থেকে ছিটকে পড়ল। দুগ্‌গাও গেল অন্ধকারে যেন তলিয়ে। পড়তে না পড়তে কে তার মুখে গুঁজেছে রুমাল, হাতে বেঁধেছে দড়ি আর পায়ে বেঁধেছে দড়া। অন্ধাকার গলি দিয়ে দুগ্‌গা মিটার ঘরের দিকে বাহিত হয়ে যায়। তার চোখ বাঁধা, মনের ভেতর ধাঁধা। হাজার চেষ্টা করেও চেঁচাতে পারছে না।

গলির মোড়ে ট্যাঁপলা দাঁড়িয়ে ছিল। চাপা গলায় বলল—নাটা, মিটার ঘরে নিয়ে আয়, আমি যাচ্ছি।

বড় রাস্তায় পড়ে দুগ্‌গা হাত-ফেরতা হয়ে গেল। দুগ্‌গার জায়গায় অন্য এক দুগ্‌গা নিয়ে নাটা মিটার ঘরে চলল। ভেতরে সেই দুগ্‌গাকে ঢুকিয়ে দিয়ে নাটা বাইরে থেকে আস্তে, খুব আস্তে শেকল দিয়ে এল। আর একদিক থেকে আসছে ওমপ্রকাশ আর খাঁদু। শেকল খুলছে আস্তে, খুব আস্তে। ট্যাঁপলার বিশ্বাসঘাতকতা নাটকীয়ভাবে ফাঁস করতে হবে কি না। শুনতে পেল—ট্যাঁপলা বলছে—অ্যাঁ ছেঁড়া লেপের মধ্যে মাদুর এই হল গিয়ে মেয়েমানুষ? দাঁড়া তোকে দেখাচ্ছি মজা নাটা, তোরই একদিন কি আমারই একদিন। তেড়ে ফুঁড়ে উঠছে ট্যাঁপলা। অমনি এক গদাম করে আওয়াজ।

—কী হল? কী হল রে খাঁদুবাবু।

—আর কী হল। কবে থেকে বলছি, ফোর ফর্টি ভোল্ট। মিটারগুলো অমন বেবাক রাখিসনি।

ওমপ্রকাশের মিটার ঘর দাউ দাউ করে জ্বলছে। যেমন হয়, খাঁদু ওমপ্রকাশ বাবুগুণ্ডা সেখান থেকে দে দৌড়। আশপাশের লোক দমকলে খবর দেয়। তারাই আগুন নেভায়। ট্যাঁপলার বেগুন পোড়া লাশটি বার করে। সবাই সাক্ষ্য দেয়, ট্যাঁপলা মাঝে মধ্যেই ওমপ্রকাশের মিটার ঘরে শুত বটে।

অনেকেই বলল, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। ট্যাঁপলা তার বউকে পুড়িয়ে মেরেছিল। পুলিশে ধরতে পারেনি। কিন্তু ভগমান ধরেছেন। যা এবার স্বগ্‌গে গিয়ে বউয়ের পায়ে ধরে ক্ষমা চাইগে যা।

এক পড়শির এ কথায় আরেক পড়শি তার ভুল ধরিয়ে দেয়—বাঃ, ট্যাঁপলা কী করে তার বউয়ের পা ধরবে? বউ লক্ষ্মী মেয়ে, সে তো স্বগ্‌গে গেছে। ট্যাঁপলা কি সেখানে যেতে পারবে নাকি? রামঃ!

কিন্তু দুগ্‌গার কী হল? সেই দুগ্‌গা, যার জন্যে এত প্ল্যান-পরিকল্পনা, ছক-কষা। এত লোভ-লালসা, তিন চার পার্টির মধ্যে ত্রিভুজ-চতুর্ভুজ যুদ্ধ?

গলির মোড়ে সুকুমার-পরিমল দুজনেই দাঁড়িয়ে ছিল যখন দুগ্‌গার মুখের ঢাকা খোলা হয়। নাটা ওরফে জগাও দাঁড়িয়েছিল। শিবু মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছিল 'ও মা, ও বাবা' বলে এবং জগা তাকে জীবনে এই প্রথম কোলেও নিয়েছিল।

সুকু-পরি বোঝায়—দুগ্‌গাদি আপনার কোনও ভয় নেই। আপনি জগাদার সঙ্গে নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরে যান।

ভেতরের কথা বেমালুম চেপে গিয়ে জগাও হিরো-হিরো ভাব দেখিয়েছিল।—আমি নইলে হতটা কী গোছের।

দুগ্‌গাও বলেছিল—আসচি। আমার ট্রাঙ্কোখানা নিয়ে আসচি। তা সেই ট্রাঙ্কো নিয়ে দুগ্‌গামণি আজও আসছে, কালও আসছে। বামুনগাছির কোণে কোণে তাকে খুঁজেছে জগা, খুঁজেছে সুকুমার পরিমলও। কিন্তু জগার ঔরসের মেয়েগুলিকে লোকসংসারের কাজে বিলি করে দিয়ে দুগ্‌গামণি উধাও হয়ে গেছে।

ক্রমে ক্রমে শিবুটা গিন্নি হয়ে উঠেছে। প্রায় পেট থেকে পড়েই খাটছে তো? দেখতেও হয়ে উঠেছে সোন্দর। মায়ের মতো খোকা খোকা কোঁচকা কোঁচকা চুল। অমনি গোছানো, সাফসুতরো, কেউ তাকে দেখলে আর একদা সর্দিমাখা কুচ্ছিত রক্ষেকালীর বাচ্চা বলে চিনতেও পারবে না। খোকাকে বিমলামাসির বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছে জগা। ছেলেমেয়েকে নিয়ে নতুন করে সংসার পেতেছে। জগা রাঁধে, শিবু বাড়ে, খোকা এঁটো কাঁটা কাঁড়ে। তিনজনে মিলে সংসারটিকে যথাসম্ভব লক্ষ্মীশ্রীসম্পন্ন করে রেখেছে। জগার বিশ্বাস উপযুক্ত বেদিটি হলেই তার দুগ্‌গামণি আকাশ ফুঁড়ে নামবে। কিন্তু বেদি বোধকরি আর মনের মতো হয় না।

ট্রয়-যুদ্ধের শেষে হেলেনসুন্দরী মুখ মুছে দিব্যি মেনেলাউস কত্তার ঘর করতে চলে গিয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধশেষে পাঁচ ছেলে, বাপ, ভাই হারিয়ে দ্রৌপদীও রানি হয়ে যুধিষ্ঠির কত্তার পাশে বসেছিলেন, এন্তেকালে নিজের সারাজীবনের গুণপনার ছব্বা সেই ধম্মবুড়োর মুখ থেকে শুনবেন বলে। কিন্তু আমাদের দুগ্‌গামণি কোনা বস্তির জগা-মিস্তিরির একদা-তাড়ানো বউ ঘেন্না-ছেদ্দা, কর্তব্য-অকর্তব্য, সদুপায়-অসদুপায়ের মধ্যে বোধহয় কিছুতেই আপস করতে পারল না। নিজের সন্তানগুলিকে পর্যন্ত দিকে দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কত ধানে কত চাল বুঝে নিতে দিয়ে সে হুঁশ হয়ে গেল। কোনার লোকেরা, বামুনগাছির লোকেরা তাকে নিয়ে কুচ্ছো কী আর করে না? কুচ্ছো না করলে আর কোন মানুষটার ভাত রোচে? করে, কুচ্ছো করে। আবার রূপকথাও গড়ে। কেউ বলে সে লাইনে জয়েন করেছে, কেউ বলে তার মানুষ ছিল, তারই সঙ্গে ভেগেছে, কেউ বলে সে আসলে মায়াবতী ডাইনি ছিল। শ্যাওড়া গাছের ডাল চালিয়ে একেবারে ভাইনিলোকে ভ্যানিশ করে গেছে। বুড়ো মা, রান্না মাসি, বিমলা মাসি এরা বলে কোনও দিন একটুক বেচাল দেখিনি মা। সতী-লক্ষ্মী সীতা-মায়ের অংশ ছিল দুগ্‌গা। বসুন্ধরা মায়ের কোলের ভেতর গুটিয়ে গেছে। রামায়ণ কি মিছে

কথা মা। আজও ঘটে।

জগা তিন ভরির বিছে হার একখানা গড়িয়ে রেখেছে। অনেক কষ্টেই জিনিসটা করেছে জগা। দুগ্‌গা এলেই তার গলায় পরিয়ে দেবে। এটাই হবে তার মাফ চাওয়া বলো মাফ চাওয়া, পিরিতের দেখনাই তো পিরিতের দেখনাই, বউয়ের প্রকৃত মূল্যের স্বীকৃতি তো তাই-ই। কিন্তু দুগ্‌গা আর সে হার পরতে কোনও দিনই আসেনি।

পত্রিকা শারদীয় ১৯৯৬ (১৪০৩)

কর্কটক্রান্তি

বাণী বসু

উপন্যাস পঞ্চক

সময়টা অগাস্ট মাস। ভ্যাদভেদে পচা গরম। কিন্তু হলে কী হবে এই সময়টা আমাদের ভয়ানক ব্যস্ত যায়। স্টাফরুম দেখো, সকাল দশটা থেকে বিকেল সাড়ে চারটে পর্যন্ত ভর্তি। বাঁই বাঁই করে ফ্যানগুলো ঘুরে যাচ্ছে, পরদা উড়ে যাচ্ছে বিজলি-হাওয়ায়। কিন্তু আমাদের গলগলিয়ে ঘামার কোনও বিরাম নেই। কল্পনা, রুচিরা, রাজশ্রী তিন চারবার করে মুখ ধোবার বেসিনের কাছে গিয়ে মুখে গলায় জলের ঝাপটা লাগিয়ে এল।

বিজনবাবু বললেন—আরে আরে আরে, এরাই তো সেই তিনটে মেয়ে যারা নাকি পুজো শেষ হলেই বাঁদুরে টুপি বার করে ফেলে। একটি নাতিশীতোষ্ণ দ্বীপ, একটি ভূমধ্যসাগরীয় আবহাওয়া তোমরা সত্বর বার করো এদের জন্যে, নইলে যে কী থেকে কী হয়ে যায়...

রুচিরা ভেজা মুখে হাঁ হাঁ করে উঠল—নিজের বাঁদুরে টুপিটা আর আমাদের মাথায় নাই চাপালেন বিজনদা। আমাদেরগুলো ত্রিকোণ স্কার্ফ। অতি সুন্দর রঙিন রঙিন বিদ্যুৎ সব। একটা করে মাথায় বেঁধে পাস করে যাব লোকেদের বুক ধড়ফড় করে উঠবে। বাঁদুরে টুপির সঙ্গে তাহাদের কোনও কথা নাই।

রাজশ্রী মজার মুখ করে বলল—সবাই জানে ছেলেরাই বেশি শীতকাতুরে হয়। পুজো শেষ হতে না হতেই শুধু বাঁদুরে টুপি কেন লেপ কম্বল, পুলোভার, উলের মোজা সবই বার হয়ে যায়। মেয়েদের নাকি ফ্যাটের লাইনিং বেশি থাকে বলে, শীত কম লাগে। তা বিজনদা অন্য ছেলেদের বাদ দিন, আপনার তো লাইনিং কিছু কম না, তা সত্ত্বেও এত জলদি জলদি বাঁদুরে টুপির খোঁজ পড়ে কেন?

কল্পনা আর একবার দৌড়ে মুখ ধুতে ছুটে গেল। বলল—লেপ, কম্বল, পুলোভার, বাঁদুরে টুপি! বাপরে আমার সাঙ্ঘাতিক গরম লাগছে। তোরা শুরু করেছিস কী?

বিজনবাবু নড়েচড়ে, সাদা পাঞ্জাবির পকেট থেকে দলা পাকানো রুমাল বার করে ঘাড় মুছতে মুছতে বললেন—বুঝছ না কল্পনাদিদি, তোমার বন্ধুদের আসল চাঁদমারিটি কী?

—কী বিজনদা? কী বিজনদা, সমবেত হইচইয়ের মধ্যে থেকে বিজনদার উত্তর বেরিয়ে আসে—আরে বাবা এদের লক্ষ্য ওই 'বাঁদুরে টুপি', টুপিটা বাদ দিয়ে বাকিটুকু ওরা রাখতে চায়, বোধ হয় আমারই জন্যে।

—এ মা ছি ছি, মাথায়ও আসে বাবা আপনার!—অনেকেই তীব্র প্রতিবাদ করে উঠল, কেউ মিচকি মিচকি হাসতে লাগল।

এরই মধ্যে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বেজে গেল।

বিজনদা বললেন—নাও, গা তোলো সব, শ্যামের বাঁশি বেজেছে।

আমাদের ঘণ্টাবরদারের নাম শ্যাম থাপা।

সত্যি, বিজনদা রিটায়ার করে গেলে যে আমাদের স্টাফরুমের কী দশা হবে! মাতিয়ে রেখে দ্যান একেবারে। বিজনদা বলেন—আমি গেলে কী দশা হবে জানো না? গুরুদশা। গুরুদশা।—স্টাফরুম প্রায় খালি হয়ে গেল। ওদিকে ফিলসফির মমতা শুধু এক মনে পড়ে যাচ্ছে। ইংরেজির বলাকা তার ঢাউস ব্যাগ থেকে একটা ঝকঝকে ম্যাগাজিন বার করল। বাংলার নবাগতা মেয়েটি নয়নিকা হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকে বলল—আরতিদি, বলাকাদি আমার ছাতাটা দেখেছেন কেউ?

—কী রকম?

—নীলের ওপর শাদার প্রিন্ট। জার্মান ছাতাটা। ডাবল স্প্রিং। কালকে ফেলে গেছি।

—লাস্ট আওয়ারে যদি ফেলে গিয়ে থাক তা হলে হয়ে গেল—আমি বললাম।

—আর পাঁবো না? এম্যাঁ, ওঁটা ছোঁট মামার গিফট—নয়নিকা অনুনাসিক স্বরে প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে। সঙ্গে সঙ্গে সে দুটো হাতের পাতা বাচ্চাদের মতো ঝাড়তে থাকে।

—এখনি আশা হারিয়ো না, আমরা না হলেও অন্য কেউ কেজে রেখে দিয়ে থাকতে পারে।—মমতা বলল।

—প্রিন্সিপ্যালের ঘরে খোঁজ করেছিলে? বলাকা জিজ্ঞেস করল।

—অফিস, প্রিন্সিপ্যালের ঘর সব হয়ে এসেছি। এ ম্যাঁ। কী হবে?

এই সময়ে শৌভিক আফটারশেভের গন্ধে হাওয়া ভারী করে ঘরে ঢুকল।

শৌভিক খুব চালাকচতুর স্বভাবের এক নাতিযুবক নাতিপ্রৌঢ়। ছটফটেও বটে, শৌখিনও। ব্রিফ কেস রেখে পাখার তলায় বসল।

—উঃ কী গরম!

জালালও ঢুকছিল। জালাল হাফিজ। বলল—কর্কটক্রান্তির আইশ্যা পাইশ্যা থাকনও চাই, আবার ভারখোয়নস্কের জাড়ও লাগব, এমনডা তো হয় না ব্রাদার।

—জালালদা আমার ছাতাটা দেখেছেন? নীলের ওপর শাদার প্রিন্ট?

নয়নিকা এ বার তার অনুনাসিকতা খানিকটা সামলে নিয়েছে।

—অফ অল পার্সন্স আমি তোমার ছাতা লইমু ক্যান? জালাল কি ছাতার দালাল?

শৌভিক হাসল। বলাকাও ম্যাগাজিনের আড়ালে হাসছে। মমতা বই থেকে মুখ তুলেছে। স্মিত মুখ।

নয়নিকা কাঁদো-কাঁদো হয়ে ক্লাসে চলে যায়।

স্টাফরুমের বাইরে লম্বা করিডর। শেষ হয়েছে একটা ব্যালকনিতে। যার ওপর কৃষ্ণচূড়ার মেটে লাল ফুল আর সবুজ ঝিরঝিরে পাতা এই ক'দিন আগেও পড়ে থাকতে দেখেছি।

জালাল বাইরে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরই বলাকা ম্যাগাজিনটা মুড়ে ব্যাগে

ঢুকিয়ে রাখল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল—আরতি এ পিরিয়ডটা আছ তো? আমি একটু আসছি। দেখো।

আমি ঘাড় হেলাই।

তৃতীয় জন বেরোল শৌভিক।

মমতা বই থেকে মুখ তুলে আস্তে গলায় বলল—বারান্দা মিটিং। আমি বোঝার হাসি হাসলাম।

—কারও দিকে কারও তাকাবার পর্যন্ত দরকার হয় না। অ্যাতো আন্ডারস্ট্যান্ডিং। মমতা আবার বলল।

—ইউনিটি অ্যান্ড সলিডারিটি—আমি বলি, এই দুটো না হলে কোনও কাজই হয় না।

—আর অকাজ?

—অকাজও হয় না...দেখাই যাচ্ছে।

আমাদের কলেজটা ভারী সুন্দর। সবাইকার চোখে হয়তো নয়। আমার ভাল লাগে। সাধারণত স্কুল-কলেজ মানেই একটা তেধেড়েঙ্গে বিরাট বিকট বাক্স। হয়তো সম্ভ্রম উৎপাদক, হয়তো ভয়-ধরানো। ভয়-সম্ভ্রম এগুলো তো শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িয়েই আছে। আমাদের ব্লু গেটটা দিয়ে ঢুকলে চোখে পড়বে তিন চারটে ছোট বড় বাড়ি। প্রত্যেকটা লতায় আচ্ছন্ন। মর্নিং গ্লোরির চাদর আমাদের স্টাফরুম-কাম-অফিস বাড়িটাতে। উল্টোদিকে অনার্স ভবন, বোগেনভিলিয়ায় ছাওয়া, এ বার একটু লেট ফুল দিয়েছে, এখনও অনার্স ভবনের গায়ে ফাগ ছড়ানো। মেন বিল্ডিংটা মাথায় গম্বুজঅলা একটা মুক্তো শাদা বাড়ি। এখানে অধ্যক্ষ বসেন, যাবতীয় পাস ও হায়ার সেকেন্ডারি ক্লাস হয়; এ বাড়িটার গায়ে কোনও লতা নেই। আছে একটা আম গাছ, জানলা দিয়ে যার পত্রসম্ভারের শোভা দেখতে দেখতেই আমি বিভোর হয়ে যাই, আর আছে একটা গন্ধরাজ।

মেন বিল্ডিংয়ের সামনে পুকুর বা লেক। এটা এল শেপের। এল-এর ছোট বাহুটা দেখতে গেলে মেন বিল্ডিংয়ের পেছনে চলে যেতে হবে। লেকটাতে শালুক পদ্ম চাষ করার কথা হচ্ছে। ওঃ তা হলে যে কী গ্র্যান্ড হবে! বাঁধানো লেকের ধারে ধারে মেহেদির বেড়া, বড় বড় গাছ। একটা বট আছে, তার তলায় বাঁধানো বেদিতে বসে মেয়েরা আলুকাবলি খায়। বটটার কী যে বিশেষত্ব! টুকটুকে লাল ফলে ছেয়ে থাকে। বটফল যে এত সুন্দর একটা ব্যাপার তা এখানে আসার আগে চোখে পড়েনি। লেকের অপর পাড়ে সায়েন্স বিল্ডিং, ক্যান্টিন, আর কমনরুম। সায়েন্স বিল্ডিংয়ের কেমিস্ট্রি ল্যাব থেকে মাঝে মাঝেই উৎকট গন্ধ আসে, কিন্তু হলে কী হবে, ওই বাড়িটার কোলেই সারা শীত আলো করে থাকে চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, প্যানজি, লার্কস্পার, পয়েনসেটিয়া, গোল্ডেন রড...। এ ছাড়াও আমাদের কলেজে আছে কাঞ্চন, কামিনী উভয়ই, শ্রীরামকৃষ্ণর নিষেধ অমান্য করে। আছে বকুল শিমুল। পারুল কাকে বলে আজও জানি না। পারুলের জন্যে আমরা প্রায়ই দরবার করছি। সম্প্রতি একটা

স্থলপদ্ম লাগানো হয়েছে। গেটের ঠিক পাশেই আর একটা কৃষ্ণচূড়া। স্টাফরুম বিল্ডিংয়ের পেছনে খেলার মাঠ, সবুজ ঘাসে ভরা, দুদিকে দুটো পোস্ট, ব্যাডমিন্টনের জন্য পোঁতাই থাকে। টুর্নামেন্ট থাকলে আমরা স্টাফরুমের জানলা দিয়েই দেখতে পাই। বার্ষিক ক্রীড়ার জন্যে অবশ্য আরও বড় মাঠ ভাড়া নিতে হয়।

আমাদের কলেজ হলটাও আমাদের গর্বের বিষয়। চমৎকার একটা পঁচিশ বাই পঁয়তাল্লিশ স্টেজ। আয়তনে হলটা বেশ বিশাল। ঠিক কত মাপ বলতে পারব না। মেঝে সামান্য উঁচু হয়ে সামনে থেকে পেছনে চলে গেছে সিনেমা হলের মতো। তার ওপরেই সিটগুলো বসানো। হলের দেওয়ালে দেওয়ালে মহামানবদের ছবি। সব এক মাপের, একভাবে হেলে আছে। ভারী ভারী এগজস্ট লাগানো আছে সাত সাত চোদ্দোটা। এটা আমাদের কলেজের রজতজয়ন্তীতে স্থানীয় মানুষদের দানের টাকায় তৈরি—জ্যোতিষচন্দ্র হল। এটা মেন বিল্ডিংয়ে। এরই ওপরে লাইব্রেরি। লাইব্রেরিটাই আমাদের বাড়ানো দরকার। কিন্তু যেহেতু এই বিল্ডিংয়ের ভিত তিনতলার নয়, তাই লাইব্রেরিটা দোতলা করা যাচ্ছে না।

সুরকি বিছোনো পথ দিয়ে ছাতা মাথায় ক্লাসে যাই। যেতে যেতে পথে ভাদ্রের তাতে রবি যদিও মধ্য গগনে উঠেছিলেন তবু রোদের ঝাঁঝের সঙ্গে গন্ধরাজের গন্ধ মিশে একটা ভারী তৃপ্তিকর উত্তেজক উত্তেজক প্রশ্বাস নিই। ক্লাসটা টুয়েলভের, এমনিতে সত্যিই এ সব ক্লাসে বড় ক্লান্তিকর লাগে। তবে ছাত্রীদের মুখগুলো খুব টাটকা ফলের মতো, বেশিরভাগই এমন উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে থাকে যে শেষ বেঞ্চের গল্প করা বা কাটাকুটি-খেলা, বা সিনেমা-পত্রিকা দেখা মেয়েগুলোকে দেখেও দেখি না। এই সব গোলাপজাম কালোজাম বৈঁচি ফলসা আঙুর জামরুলদের আজ 'ক্রসিং দা বার'-এর শেষের অংশ পড়াব। কবিতাটা যে প্রচলিতার্থে বিদায় সম্ভাষণ নয়, আমি চলে যাই, তোমরা ভাল থেকো গোছের ছিঁচকাদুনির ছিটেফোঁটা যে এতে নেই, তা কী করে এদের বোঝাব ভাবতে ভাবতে যাচ্ছিলুম: দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে এসেছি, সুদীর্ঘ। এ বার যে পথে যাব, তা উত্তাল সাগরের মধ্য দিয়ে, অচেনা অজানা। কিন্তু তোমরা যারা কাঁদতে চাও, তারা কেঁদে-কেটে আমার মেজাজের যে মগ্নতা, একমুখীনতা তা নষ্ট করে দিয়ো না। কারণ আমি একটা বিপুল সুন্দর রহস্যের মুখোমুখি হতে যাচ্ছি, সামথিং পজিটিভ, সি মাই পাইলট ফেস টু ফেস। এমন নয় যে ভগবান ব্যাটাকে একবার দেখতে পেলে এক হাত নিয়ে নেব তিনি কেন আমার বন্ধুকে অসময়ে ছিনিয়ে নিলেন, তিনি কেন এই করলেন, তিনি কেন তাই করলেন না,—এ সব নয়। শুধু সেই দুরন্ত রহস্য ঘেরা আশা—সি মাই পাইলট ফেস টু ফেস। নচিকেতা দাঁড়াবে মৃত্যুর সামনে। না কোনও প্রশ্ন নয়, কোনও নালিশ নয়, শুধু দেখা, শুধু চেনা, শুধু সেই অসীম শক্তিধর সেই বিরাটের মুখোমুখি হওয়া। বোঝাতে পারব নাকি ফলসা, বৈঁচি, আঁশফল, জামগুলোকে। ওরা ও সব গড টড জানে না, জানে না মানে ভাবে না। পরীক্ষার সময়ে—'হে ভগবান যেন "কমন" পাই', বা 'উঃ কী অ্যাকসিডেন্টাই না হতে যাচ্ছিল, ঠাকুর বাঁচিয়ে দিয়েছেন', এই রকম প্রশ্নহীন, ও-তো-আছেই গোছের একটা ব্যাপার গড এদের কাছে। কেউ কেউ এখনও সারা

বৈশাখ শিবলিঙ্গের মাথায় জল ঢেলে যায়, উপোস করে সরস্বতী ঠাকুরকে অঞ্জলি দেয় শতকরা নিরানব্বুই জন, বেড়াতে গিয়ে ভ্রমণ-তালিকায় মন্দির-টন্দির রাখে, যে মূর্তিই থাকুক, ভক্তির ভঙ্গিতে নমো করে। কিন্তু এক জন ঈশ্বর-বিশ্বাসী কবির কাছে ঈশ্বরের মুখোমুখি হবার যে অবর্ণনীয় রোমাঞ্চ, মৃত্যুর মতো ভয়াবহ শেষকেও যা অনন্ত আশাময় করেছে তা কি এই টাটকা ফলের ঝুড়ির কাছে পেশ করা যাবে!

চিন্তার সূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। অধ্যক্ষের ঘর থেকে স্মিতা আর রত্না বেরোচ্ছে। স্মিতা খুব গোপন ভঙ্গিতে রত্নার প্রায় কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কিছু বলছে। স্মিতা বেশ ভারী চেহারার বলে ও কতটা লম্বা বোঝা যায় না। দেখছি বেশ লম্বাই। অনায়াসেই ওর মুখ রত্নার কানে পৌঁছে গেছে। রত্না একটু অতিরিক্তই লম্বা, রোগা, ফরসা। বড় বড় চোখ ওর গোলাপি রঙা চশমার ফ্রেমের আড়ালে আরও বড় দেখায়। খুব পাওয়ার। শাদার ওপর কালো ফুটি-ফুটি একটা শাড়ি পরেছে রত্না। বর্ণনাটা হঠাৎ পড়ে মনে হওয়া সম্ভব আমি একটি খুব ধারালো সুন্দরীর কথা বলছি। কিন্তু রত্নার এফেক্টটা আদৌ এমন সুন্দরীর না। সুন্দরী হওয়ার পক্ষে ও বড্ড রোগা, বড্ড ফ্যাকাশে, বড্ড শান্ত ও সুদূর ওর চোখ। ও খুব বুদ্ধিমতী আমি জানি, এই কলেজেই আমার ছাত্রী ছিল ও, আমার গোড়ার দিকের ছাত্রী। অনেকেরই। বিজনবাবুর, শৌভিকের, বলাকার...। কিন্তু বুদ্ধির ঝকমকানি ওর চোখে-মুখে, কোথাও নেই। একটা ভাবলেশহীন, বা বলা যায় সময়ে সময়ে ভিতু ভিতু ভাব ওর চোখে-মুখে, হাবে-ভাবে। আমি জানি রত্না প্রচুর স্ট্রাগল করেছে, করছে। ওর বাবা ও যখন পার্ট টু দিচ্ছে তখনই মারা যান, মা ছোটতেই গত। সেই থেকে ও, ওর দিদি আর ছোট ভাই প্রাণান্তকর জীবনসংগ্রামে নেমেছে। ওর দিদি বোধহয় কোনও স্কুলে প্রাইমারিতে কাজ করে, ছোট ভাই ডাক্তারি পড়ছে। দুটি মেয়ে মিলে তার সমস্ত খরচ জোগায়। স্মিতা কেন ওর কানে ফিসফিস করছে? রত্নার কি এ সবের সময় আছে? আমাকে দেখেই স্মিতা ছিটকে গেল। পেছন থেকে মন্তব্য হল—'হুইস্পারিং ক্যামপেইন।' শম্পা। শম্পার গলা আমি চিনতে পেরেছিলাম। সামান্য, অতি সামান্য হেসে ডান দিকের সিঁড়ির দিকে মোড় নিলাম একবারও পেছন না ফিরে। টেনিসনের ঈশ্বর-চেতনা একেবারে গুলিয়ে গেছে। বুকের মধ্যেটা ধকধক করছে, রাগে, উদ্বেগে। বেচারি। কে? আমি? না টেনিসন? না রত্না? না কি টুয়েলভ সির মেয়েরা?

ভাল পড়াতে পারছিলাম না। আমার চোখ ফেটে জল আসছিল। টেনিসনীয় ভাবনার বদলে আমার মস্তিষ্কে ভেসে উঠছিল—এমনি একটা সংলাপ।—স্মিতা, তুমি রত্নাকে কী বলছিলে?

—আরে? সেটা তোমাকে বলতে হবে এমন কোনও এগ্রিমেন্ট আছে না কি?

—রত্নাকে তুমি ছেড়ে দাও স্মিতা।

—কেন, রত্না কি তোমার একার প্রপার্টি? অ্যান্ড হোয়াট ডু য়ু মিন বাই 'ছেড়ে দাও'? ভেরি অবজেকশনেবল ভেরি ভেরি। আমি কি জোঁক না কুমির?

—না, না, তুমি জোঁকও না, কুমিরও নয়, কিংবা হয়তো তুমি দুই-ই স্মিতা। আমার কথা তুমি ঠিকই বুঝতে পেরেছ। প্লিজ। রত্নাকে ট্রাবল দিয়ো না, ওর খুব,

খু-উ-ব ষ্ট্রাগলের জীবন।

—সেটা তোমার থেকে আমি ভাল জানি আরতি।

হঠাৎ মনে হল, তাই তো, রত্না এম ফিলে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, সেই এক আই পির ছুটি-টুটির ব্যাপারে তো স্মিতা টিচার্স রিপ্রেজেনটেটিভ, তার সঙ্গে কথা বলতেই পারে। শুধু শুধু বড্ড ব্যস্ত হই। কিন্তু...কিন্তু...রত্না তো বলছিল না। স্মিতাই তো বলছিল? তা হলে?

একটি মেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে—ম্যাডাম, পাইলট কেন? জাহাজের চালককে তো ক্যাপটেন বলে! প্লেনের চালককে বলে পাইলট, যেমন রাজীব গান্ধি।

শক্ত প্রশ্ন। প্রশ্ন করতে আমি এদের সব সময়ে উৎসাহিত করি। উত্তর সব সময়েই যে দিতে পারি তা নয়। অনেক সময়ে এমন হয় উত্তরটা সেই মুহূর্তে মাথায় এল। কোনও দিন ভাবিনি। মেয়েটিকে বোঝাবার চেষ্টা করি 'পাইলট' কথাটার অর্থের বৃহত্তর পরিধির কথা। চালক, বিধাতা, নিয়ন্তা এই অর্থে 'ক্যাপটেন' শব্দটা ব্যবহার করা যাবে না, তা নয়, কিন্তু 'পাইলট'টা আরও ভাল। 'ওহ্ ক্যাপটেন, মাই ক্যাপটেন' ওয়াল্ট হুইটম্যানের, মনে পড়ল। সেখানে ক্যাপটেন বলা হচ্ছে এব্রাহাম লিঙ্কনকে, এক ব্যক্তিকে। যতই শক্তিমান, যতই ভালবাসার হন, তিনি একজন মানুষ, এখানে পাইলট ব্যক্তিত্বের অতীত, শক্তিমত্তার অতীত, ভালবাসার পরিধি দিয়ে ধরা যায় না এমন একটা কিছু, তাই পাইলট।

মেয়েটি খুশি হল কিনা জানি না। সবাই ধরতে পারল কিনা জানি না। কিন্তু আমার মনটা খুশি হয়ে গেল। একটা মরাটে, ফ্যাকাশে ক্লাস কেমন জীবন্ত হয়ে গেল। কেন তোরা প্রশ্ন করিস না, টাটকা ফলের ঝুড়ি। তোরা কি তোদের পুরন্ত মুখগুলো শুধু শুধুই মেলে রাখবি? আলোর দিকে অন্ধকারের দিকে উঁচিয়ে রাখবি না? বিদ্ধ করবি না বর্ণহীন আকাশকে? না হলে ঝরবে কী করে আমাদের অজস্র অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর? সারাজীবন ধরে যে কত জিজ্ঞাসা আমাদের? কোনও জিজ্ঞাসাই কি বিশুদ্ধ অ্যাকাডেমিক? আমার তো মনে হয় সবই যেন জীবন মরণের প্রশ্ন। না জানলে জীবনে রং কম পড়ে যায়, সেই বর্ণহীনতার অন্য নাম মরণ, আসল মরণ, যা আমরা জীবনেই ভোগ করে থাকি। মারের সাগর পাড়ি দিই না আমরা, আমরা মরেই আছি। এ সব ভাবতে ভাবতে সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক থাকায় সিঁড়ির মোড়ে সুশোভন সেনের সঙ্গে প্রায় ধাক্কা লেগে গেল। আমি বললাম—সরি, মানে দুঃখিত।

একটা দেঁতো হাসি হেসে সুশোভন উঠে গেলেন, রেজিস্টারটা বাগিয়ে ধরে যেন সেটা ঢাল। আমি একটা ঘৃণ্য শত্রু। এই ভদ্রলোকটির ইন-বিল্ট ঢালে আমার সব রসিকতাই ঠেকে যায়। কেন কে জানে সুশোভন আমাকে সাঙ্ঘাতিক অপছন্দ করেন। হতে পারে আমি দেখতে-শুনতে তাঁর পছন্দমতো নই। কিন্তু আমি তো আদৌ তাঁর সঙ্গে বিয়ে বসতে চাইছি না! গড ফরবিড। আমি যা চাই তা ভদ্রতা, সৌজন্য, আরেকটু এগিয়ে গেলে বলতে হয় সহযোগ, যা ছাড়া একটা কর্মক্ষেত্রের বাতাবরণ সুস্থ সুন্দর হতে পারে না। কিন্তু সুশোভন ঠিক করে নিয়েছেন আমি 'হ্যাঁ' বললে উনি 'না' বলবেন, আমি হাসলে উনি পাঁচন খাওয়ার মতো মুখ করবেন, আমি রসিকতা

করলে উনি রেগে যাবেন। আমার সঙ্গে কোনও টাক রাখবেন না উনি। এই বিতৃষ্ণার কারণ আমি জানি না। কেমন একটা হীনম্মন্যতা হত এত সময়ে। শাইলককে বিচারসভায় জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল সে আন্তোনিওকে এত ঘৃণা করে কেন? তিন হাজার ডুকাটের বদলে সে এক পাউন্ড পচা মাংস কেন চাইছে? তার উত্তরে শাইলকের উত্তরটা ছিল এত নিষ্ঠুর যে তা আমাদের আপাদমস্তক কাঁপিয়ে দেয়:

'মুখ-ব্যাদান-করা শুয়োরের মুখ যদি কেউ সইতে না পারে
বেড়াল দেখলে কেউ যদি খেপে যায়

ব্যাগ পাইপের নাকি সুর শুনে যদি কারও ইয়ে পেয়ে যায়, তো তারা কি তার কারণ দেখাতে পারবে? আমার যেন্নাও সেই জাতীয়।' অবশ্য শাইলকের যেন্না ছিল খুবই র‍্যাশন্যাল। আন্তোনিও তাকে যথেষ্ট অপমান করেছিল। কিন্তু আমি তো সুশোভনকে কোনও অপমান করিনি। তা হলে? কারও অকারণ ঘৃণা, অকারণ বিদ্বেষ জাগাবার মতোই কি আমার...কী? চেহারা? চরিত্র?

মমতা বলে—দূর আরতিদি, কী যে বলো! অকারণ কেন হবে? সবই সকারণ। তুমি তো ওর কথা শুনে চলো না। মতে মত দাও না, তোমার মতামত খুব পরিষ্কার, স্ট্রং, স্ট্রেট।

—শুধু এই কারণেই কেউ কাউকে ঘৃণা করতে পারে মমতা।

—আরে এই সব মন্ত্রী ষড়যন্ত্রী মশাইদের পথের কাঁটা যে তোমার মতো মানুষ। বোঝো না কেন?

—কেমন মানুষ আমি?

—বাঃ কংগ্রেস নও, সি পি এম নও, বি জে পি নও, প্রো-সুশোভন নও, প্রো-শৌভিক নও। তুমি তো 'ওকে বোঝা গেল না' জাতীয়।

—কেন মমতা। তুমি তো বোঝো। যা ভাল, যা প্র্যাকটিক্যাল, যা ন্যায়, তাতে আমার সায় আছে, যা মন্দ-অন্যায়-অসম্ভব তাতে আমার সায় নেই। এর চেয়ে পরিষ্কার অবস্থান কারও হতে পারে?

—ঠিক আছে, এবার থেকে পিঠে একটা প্ল্যাকার্ড এই মর্মে লাগিয়ে রেখো। তবে শুভ-অশুভ ন্যায়-অন্যায় এ সবের ধারণাও কিন্তু সবার এক নয় আরতিদি।

—সে কি রে? এগুলো সেই ক্যাটিগরিকাল ইমপ্যারেটিভের গোত্রে পড়ে না?

—কান্ট-ফান্ট খুব পুরনো তত্ত্ব হয়ে গেছে আরতিদি, এখন নিয়ো-ইউটিলিটেরিয়ানিজমের যুগ। সেই এক বাঙালি সাহিত্যিক লিখেছিলেন না—'সব এলোমেলো করে দে মা লুটেপুটে খাই'—এ হল একেবারে তাই।

—তো ইউটিলিটির সঙ্গে এর কী সম্পর্ক? এ তো অ্যানার্কির কথা বলছিস।

—ইউটিলিটিটা আসলে ব্যক্তিগত, দলগত। কীসে আমার ফায়দা হবে। যেমন ধরো—এ লোকটা জানে-শোনে। বেশ বেশ তা আমাদের কোনও কাজে লাগবে কি?—নাঃ, বড্ড ত্যাড়া—তো ছুড়ে ফেলে দাও।

কিংবা ধরো ওরে বাবা, বন্যা, বন্যা এসেছে! কী ভয়ংকর।

—হ্যাঁ ভয়ংকর কিন্তু বড্ড ভালও। বন্যা থাকলে বন্যাত্রাণও থাকে। সরকার

দিচ্ছে, বেসরকার দিচ্ছে, জনগণ দিচ্ছে, প্রতিষ্ঠান দিচ্ছে—নিজের ছাপ্পা মেরে তুলে নাও, দু পকেট ভরে নাও।

মমতাটা থাকে চুপচাপ। কথা যখন বলে তখন চোখা করে বলে।

সামনে দিয়ে প্রীতম চলে যাচ্ছে।

—নোমোস্কার আর্তিদি, ভাল?

প্রীতম জয়সোয়াল হিন্দির অধ্যাপক। দিনের মধ্যে যোতোবার দেখা হোয় তোতোবার নোমোস্কার করে। ভীষণ বিনীত, সুভদ্র, কিন্তু সুজন কি না বলতে পারব না। একদিন আমার হাতে 'সেকশুয়াল পলিটিক্স' বইটা দেখে অনেকক্ষণ আড়চোখে চেয়ে ছিল, শেষটা শম্পার রিপোর্ট। ভেবেছিল বোধ হয় 'লার্ন ইয়োরসেল্ফ' সিরিজের কোনও বই পড়ছি। খালি 'পলিটিক্স' শব্দটায় খটকা লাগছিল। তবে বুদ্ধিমান ছেলে। একটু পরেই বুঝে ফেলল, বলল—'আপনি তা হলে ফেমিনিস্ট আছেন, আর্তিদি?'

আমি বলি—আপনার আপত্তি আছে?

—আমার মতো চুলাপুঁটির অবজেকশনে কী আসে যায়, তা সেই জন্যই আপনি সাদি কোরেননি।

—কে বলল আরতিদি বিয়ে করেনি? দুটো যমজ ছেলে আছে, ইলেভেন-এ পড়ছে।

—কেওয়া?

—ছিঃ ছিঃ এই তো মমতার বিয়েতে আরতিদির হাজব্যান্ড এসেছিলেন। ছিঃ ছিঃ।

—ছিঃ ছিঃ তো ঠিক আছে। লেকেন আর্তিদি সিঁদুর-ইঁদুর পোরছেন না। আমার মিসটেক হোতেই পারে।

—সিঁদুর অবশ্য সবাই-ই পরেন, তবে ইঁদুর ঠিক পরবার জিনিস কি না—আমি হাসি-ঠাট্টা করে ব্যাপারটা হালকা করে দিতে চাই। কিন্তু প্রীতম হতে দিলে তো? প্রীতম বললে—মাফি মাঙছি আর্তিদি। লেকিন সিন্দুর না পরে, জিনস-প্যান্ট পরে, পাইলট-ইনজিনিয়ার পুলিশ হয়ে সব কী হবে বলতে পারেন? যে যার কাম না কোর্লে সোসায়টি বরবাদ হোয়ে যাবে কি না বলেন?

আমার হাসি পাচ্ছিল। শম্পার বোধহয় ভীষণ রাগ হচ্ছিল। আমি বললাম—ডাক্তারে সিঁদুর পরতে বারণ করেছে, অ্যালার্জি হয়।

—আরে ডাক্তার তো সোব জানে, আমার নানিকে বলে চিকেন এক্সট্র্যাক্ট খিলাতে, আমার মা বাপজি তো সব বাপ বাপ বলে সে ডাক্তারকে বিদা করে দিল।

—আপনার নানির তখন বয়স কত?

—কত হোবে? পঁচাশ, পঁচপন হোগা, বহোৎ পার্সন্যালিটি থা উনকো। মরদ জৈসা। আমার বাপজিকে ভারী বিমার সে বাঁচাকে গোদ লিয়েছিল। নানাজি গুজর জানে কি বাদ প্রপার্টি সব হি সমহালকে রখ্খি উনহোনে।

—তা ওঁর কী হয়েছিল।

—টিউবারকুলোসিস।

—চিকেন এক্সট্র্যাক্টটা খাওয়ালেন না?

—আমার বাপজি বললেন—রাম, রাম, মর জায়েগি ইয়ে তো বাত। তো লেট হার ডাই ইন পিস অ্যান্ড গো টু হেভন।

শম্পা উঠে গেল। বোধহয় জ্বলছে। আমি যদি ফেমিনিস্ট হই, তা হলে ও তো সুপার ফেমিনিস্ট।

আমি বললাম—আপনি শিওর যে আপনার নানি স্বর্গে গেছেন?

—রাম জানে—সংক্ষিপ্ত জবাব এল।

তা সেই যাই হোক। ওর আসতে যেতে নমস্কারে শম্পা জ্বলে গেলেও আমি জ্বলি না। একটা ন্যূনতম ভদ্রতাবোধ তো আছে। হোক না তর্ক-বিতর্ক। মতামত তো ভিন্ন হতেই পারে। আমি যদি কোনও দিন প্রীতমকে আমার মতে আনতে না পারি, সে আমার দুর্ভাগ্য। কিন্তু ও তো আমাকে অসম্মান করে না।

শম্পা বলে—ওই প্রীতমও তো সুশোভন সেনের দলে।

আমি বলি—সেটা কেন জানিস? মেল শভিনজম। এত বড় একটা কলেজে পুরুষরা সংখ্যালঘু। অধ্যক্ষ একজন মহিলা। ওর মতো ছড়ি ঘোরানো জয়সোয়াল এটা সইতে পারবে কেন? ওদের বাড়ির বউরা এখনও শ্বশুর-শাশুড়ির সামনে পুরো এক হাত ঘুংঘট রাখে।

অধ্যক্ষ শাশ্বতীদি আমাকে ডেকেছেন। কী ব্যাপার? দেখা যাক।

—মমতা সরকারকে এবার কালচারাল কমিটির কনভিনর করছি। কারও আপত্তি হবে বলে মনে করেন?

—না, মানে...টিচার্স কাউন্সিলে ব্যাপারটা ঠিক হলেই ভাল হত না?

—তাই হবে। কিন্তু নানারকম নাম আসতে থাকবে, তখন আপত্তি তোলাটা অশোভন দেখাবে।

তার মানে কারও কারও নামে শাশ্বতীদির আপত্তি আছে!

—আপনি মমতা সরকারের নামটা আগে প্রোপোজ করে দেবেন। আপনার তো বন্ধু।—উনি বললেন।

বন্ধু ঠিকই। রবীন্দ্রসংগীতে ডিপ্লোমাও আছে। কিন্তু এ কলেজের কালচারাল ব্যাপারের সর্বাধিনায়িকা বলাকা, সঙ্গে থাকে কল্পনা, রাজশ্রী, শৌভিক, সুশোভন। এরা কেউ গান, কেউ নাচ, কেউ নাটক, কেউ ভাষ্য ইত্যাদির এক্সপার্ট। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি।

—আপনার আপত্তি আছে?

—না আপত্তি নয়, আসলে ট্র্যাডিশন একটা চলে আসছে তো।

—ট্র্যাডিশন আবার কী? একে যে ট্র্যাডিশন বলে না তা আপনি ভাল করেই জানেন।

ভিমরুলের চাকে ইনি খোঁচা দিতে চাইছেন। কেন? এঁর নিয়োগের সময়ে কোনও কোনও দিক থেকে প্রবল আপত্তি উঠেছিল শুনতে পাই। ওপরে ওপরে সব শান্ত, সুন্দর।—নতুন প্রিন্সিপ্যাল আসছেন, শুনেছ? মালদা থেকে নাকি।

—মফস্বল?

—কলকাতার কলেজকে বাগে আনতে পারবেন তো?

—আহা, আমরা সহযোগিতা করলে না পারবেন কেন? আমরা তো আছি-ই।—ওপরটা হল এই। ভেতরে ভেতরে শুনেছি, মন্ত্রিমহল পর্যন্ত গড়িয়েছিল। কিন্তু সে সবই গুহায় নিহিত।

এখন, ইনি তথাকথিত ট্র্যাডিশন ভাঙছেন, ভাঙুন, কিন্তু প্রতিহিংসার বশে কিছু করছেন না তো? ভিনডিকটিভ মনোভাব আমার ভাল লাগে না। বলাকা সত্যিই দারুণ গায়। শৌভিকেরও অভিনয় ক্ষমতা আছে।

শাশ্বতীদি বললেন—মমতা সরকারের ওপর আপনাদের কনফিডেন্স নেই, না কী? ও তো শুনি রবীন্দ্রসদনেও গায়।

—হ্যাঁ, তা গায়। রবীন্দ্রজয়ন্তীর সকালে তো বটেই।

—তা হলে? গত তিন বছর ধরেই দেখছি কোনও কমিটিতে কোনও চেঞ্জ হয় না। যাদের কোয়ালিটি আছে তারা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এ দায়িত্বগুলো নেবে এতে আপত্তির কী আছে?

—কিছু নেই। আমি প্রস্তাবটা করব।—আমি রাজি হয়ে যাই।

প্রস্তাবটা পাশও হয়ে গেল। মমতাও থাকত কমিটিতে, কিন্তু বলাকা নেত্রী। এবার আর সবাই কমিটিতে, মমতা নেত্রী। সেকেন্ড করল বলাকা স্বয়ং। কিমাশ্চর্যম্! যাই হোক মনটা খুশিতে ভরে গেল। ভাবলাম রত্না পাশে বসেছে। মুখ ফিরিয়ে নিজের খুশি জানাতে গিয়ে দেখি রত্না তো নয়। নয়নিকা। নয়নিকাটা এতই নতুন, এতই ছেলেমানুষ যে কিছুই বুঝবে না। অনেক দূরে পেছনের দিকে রত্না বসে রয়েছে। একটা হলুদ রঙের জ্বলজ্বলে তাঁতের শাড়ি পরেছে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। যেন ও জানত আমি ওকে খুঁজব। চোখদুটো ও নামিয়ে নিল।

রত্নাটা কবে ওর এই ভয় আর সমীহ কাটিয়ে উঠবে? চার বছর হল আমরা একসঙ্গে চাকরি করছি। একেবারে বন্ধুর মতো ব্যবহার করি ওর সঙ্গে। যখন ছাত্রী ছিল, আমার প্রতি ওর একটু বেশি পক্ষপাত ছিল এটা বোঝাই যেত। এরকম হয়। কোনও কোনও মানুষের সঙ্গে কোনও কোনও মানুষের ওয়েভ লেনথ মিলে যায়। আমি সাধারণত আমার পক্ষপাতের কথা বুঝতে দিই না। পক্ষপাত ছেড়ে, একবার প্রজ্ঞা নামের একটি মেয়ের লেখার প্রশংসা করে তাকে ভয়ানক বিপদে ফেলে দিয়েছিলাম। ছাত্রীদের মধ্যেও নানা পলিটিকস থাকে। যে সব চেয়ে বেশি মার্কস নিয়ে এসেছে তার শ্রেষ্ঠ স্থান নিয়ে ছাত্রীদের মনে কোনও গোল থাকে না। এই শান্তশিষ্ট বেশি নম্বর না পাওয়া মেয়েটির তিন-চারটি লেখা দেখে আমার ধারণা হয় দু-চারটে ভুল আছে, সেটা শুধরে যাবে, কিন্তু মেয়েটির লেখায় গভীরতা খুব। চমৎকার গোছাতেও পারে। স্বভাবতই আমি সে কথা তাকে বলেছিলাম ক্লাসে সবার সামনেই। মেয়েটি শেষ পর্যন্ত অনার্সের অন্য মেয়েদের সম্মিলিত র‍্যাগিং-এ কলেজ ছেড়ে দেয়। ওকে ওরা যা বলত তার মধ্যে কোমলতমটা হচ্ছে 'এ বি'জ বেবি।' ঘটনাটা আমি জানতে পারি অনেক পরে, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। সব বারের ছাত্রীরা নিশ্চয়ই এ রকম হয় না। কিন্তু আমি সাবধান হয়ে গেছি। রত্নাও ছিল খুব

চুপচাপ, ভিতু-ভিতু, সব মাতৃহারারাই কি এমন স্বভাবের হয়? রত্নাকে অত পছন্দ করলেও আমি চাইনি ও এ কলেজে আসুক। যখন ছাত্রী ছিল একভাবে দেখেছে, এখন এসে যে দেখবে আসলে বলাকা আর আমি আদায় কাঁচকলায়, শৌভিক-জলাল বিজনদাকে দেখতে পারে না, রাজশ্রী-কল্পনা-রুচিরা নিজেদের সুবিধেমতো পছন্দ বদল করে, বিজনদা বাইরে খুব হাসিখুশি, মনে মনে সুশোভন সেনের বিরুদ্ধে প্যাঁচ কষেন,...এ সব তো ও জানবে, আমি তা চাইতাম না।

মমতা বলত—কী যে বলো আরতিদি, ছাত্রী বলে কি চিরকালই ছাত্রী থাকবে না কি? চিরকাল তোমাকে পুজোর বেদিতে বসিয়ে রাখবে? মানুষকে, সমাজকে চিনতে দাও ওকে। চেনবার সুযোগ দাও।

—তা ছাড়া, শম্পা বলত—আমাদেরও তো দল ভারী হবে। খাদির ব্যাগ, ব্লাউজ-পিস বা ফুল-তোলা টেবল ম্যাট দিয়ে কি ওকে দলে টানা যাবে?

—কিন্তু এই চাপ?—আমি বলেছিলাম—এই শ্রদ্ধাভঙ্গ? মেয়েটার যে বড্ড স্ট্রাগল। ওদের দু' বোনেরই শরীর-স্বাস্থ্য এত খারাপ যে ওরা ঠিক করেছে ভাইটিকে ডাক্তার করবেই। বর্ধমানে চান্স পেয়েছে ছেলেটি। তিন জনে মিলে কী খাটা খাটে! বাবা এক পয়সাও রেখে যাননি...

—তুমি কি মনে করেছ অন্য কলেজে গেলে ও বেটার কিছু দেখবে?

আমার বুক তোলপাড় করে একটা কান্না উঠে আসতে লাগল। প্রাণপণে সেটা গিলে নিয়ে বললাম—দেখবে না?

—তুমি কি পাগল হয়েছ?

—বয়স বাড়ছে, বুদ্ধি তোমার বাড়ছে না আরতিদি।

আমি বলেছিলাম—দেখতেও তো পারে। একটা চান্স? একটা ক্ষীণ আশাও কি নেই, যে আমার প্রিয় ছাত্রী রত্না ভাল-ঘরে-বরে পড়ার মতো একটা সুস্থ সভ্য কলেজে পড়বে, অর্থাৎ কাজ করতে পারবে?

—ওই যে বললাম, তুমি এখনও ইলিউশনিস্ট রয়ে গেছ—শম্পা বোঝায়।

—ইলিউশনিস্ট কী জিনিস রে?

—যারা সব জেনেশুনেও মোহ-আবরণে সব ঢেকে রাখতে ভালবাসে।

—ও।

অতএব এখন রত্না আমার কলিগ। দূর থেকে রত্নার সঙ্গে আমার চোখাচোখি হল, ও চোখ নামিয়ে নিল। কেন নিল? সমীহবশে? না শ্রদ্ধা চলে গেছে, আর আমার দিকে তাকাতে পারছে না? না, বিক্রীত হয়ে গেছে? রত্না, রত্না বিক্রীত হয়ে যেয়ো না। ইলিউশনিস্ট এ বি-র এত কষ্ট হতে থাকে যে, অধ্যক্ষের অনুমতি নিয়ে তিনি বাইরে চলে যান।

মমতার খালি একটাই শর্ত। আমাকে যখন কালচারালের ভার দেওয়া হয়েছে, তখন আমি আমার রুচি-পছন্দ এ সব খাটাতে পারব তো?

—অবশ্যই। তবে ন্যাচারালি ডেমোক্র্যাটিক উপায়ে—শাশ্বতীদি বললেন।

শম্পা বলল—ডেমোক্র্যাটিক উপায়ে অটোক্র্যাসি? সবাই হাসতে লাগল। শাশ্বতীদিও। মিটিংয়ে মিষ্টিটা খুব ভাল দিয়েছে। বেশ বড় গোলাপি পেঁড়া। অর্থাৎ গোলাপের পাপড়ি দেওয়া নরম তুলতুলে সন্দেশ। আমি মিষ্টি খাই না। একটা নয়নিকাকে দিই, আর একটা পেছিয়ে গিয়ে হলুদ রোদের ঝলকানি আসছিল যেদিক থেকে সেই দিকে বয়ে নিয়ে যাই। রত্না নিজের বাক্স আড়াল করে, লম্বা লম্বা চ্যাপটা খালি হাত দিয়ে,—আমার আছে আরতিদি।

—জানি, তোমাকেও দিয়েছে। আমারটা নাও প্লিজ, আমি একদম মিষ্টি খেতে পারি না।

একটা ফিসফিস আওয়াজ কানে এল। আমি শক্ত হয়ে গেলুম। স্মিতা বসে আছে ওদিকে, কাকে যেন বলছে—ঘুষোঘুষি শুরু হয়ে গেল।

ঘুষোঘুষি মানে? মারামারি? না ঘুষ দেওয়া? গোলাপি পেঁড়া রত্নাকে ঘুষ? যে রত্নাকে দিনের পর দিন বিনা পারিশ্রমিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়িয়েছি, নোট তৈরি করে দিয়েছি, যে রত্না বি এ পাশ করতে ওয়ালডর্ফে, এম এ পাশ করতে ব্লু ফক্সে নিয়ে গিয়ে খাইয়েছি, সেই রত্নাকে এত দিন পর আমি একটা টাকা তিনেকের গোলাপি পেঁড়া ঘুষ দিচ্ছি? কেন? কী কার্য উদ্ধার করতে?

শম্পা সব শুনে বলল—ও মা, এর মধ্যেই সব জেনে গেল কী করে? কী চালাক? সব দিকে চোখ!

আমি বলি—কী বলছিস? কী জেনে গেল?

শম্পা বলল—এবার অনেকেই তোমাকে টি. আর. করে পাঠানোর কথা বলছে। সিনিয়রও বটে, বুদ্ধিও ধরো, অ্যাক্সেপ্টিবিলিটিও মন্দ নয়।

—বুদ্ধি ধরি, বলছিস?

—বলছি, তার সঙ্গে এ-ও বলছি এ মোহ আবরণ ঘুচাও হে।

—তবে আমি দাঁড়াচ্ছি না, আমি বসছি। আমার দুটো ছেলে ইলেভেনে-এ। শেষে ল্যাজে-গোবরে হবে, নাকি?

—তুমি তো শুধু ওদেরই মা নও, অঙ্ক সায়েন্সেরও মা, তুমি ছেলেদের কী দেখাবে?

—ওদের বাবা দেখে, তা সে-ও তো অঙ্কের নয়।

—ঠিক আছে আমি দেখিয়ে দেব। হয়েছে?

—তুই? সত্যি? কত পয়সা নিবি?

—এক পয়সাও না। কলেজ ক্যান্টিন থেকে জলখাবারটাও খেয়ে যাব। তোমাকে সে বাবদও খরচ করতে হবে না।

—উঃ আমি এত কিপটে? কিন্তু সত্যি তুই ওদের পড়াবি?

—সানন্দে! শর্ত আছে অবশ্য। দাঁড়াতে হবে।

—আমি যে ইলিউশনিস্ট, বললি?

—তা বলছি, তবে ইলিউশনের খুব কাছাকাছি থাকে স্বপ্ন, ভাল কিছুর জন্য আশা। তুমি স্বপ্ন দেখতে পার বলেই তোমাকে চাওয়া, নইলে আমাদের বয়েই যেত।

বুড়ো আঙুল নাড়ল শম্পা। তারপরে বলল—আমাদের এই প্ল্যানটা মনে হচ্ছে ফাঁসিতং। যাকগে সে। এত দিন পরে তুমি যেতে চাইলে দু'-চার জন ছাড়া কেউ না করবে মনে হয় না। টানা তিনটে টার্ম ওরাই গেছে।

এই আমরা ওরা, ফিসফিস, ঘুষোঘুষি, ফাঁসিতং—সমস্ত মিলিয়ে আমার মনটা কেমন গ্লানিতে ভরে গেল।

বলাকা আমি একসঙ্গে ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি। এক বেঞ্চে না হলেও কাছাকাছি বসতাম। শৌভিক এক-আধ বছরের সিনিয়র। আলাদা সাবজেক্ট। কিন্তু নাটক করত বলে ভালই চিনতাম। আমাদের ধারণা ছিল শৌভিক কোনও গ্রুপ থিয়েটারে যোগ দেবেই দেবে। এই কলেজে ওকে দেখব কেউই ভাবিনি। আমি আর স্মিতা এক দিনে চাকরিতে ঢুকেছি। দু'জনকে বসিয়ে তখনকার প্রিন্সিপ্যাল জ্যোতিষবাবু বলেছিলেন—আমরা একটা পরিবারের মতো, তোমরা এটা সব সময়ে মনে রাখবে।

জ্যোতিষবাবুর সময়ে কারও বিয়ে-টিয়ে হলে কলেজ থেকে বাস ভাড়া করা হত। ঝরঝরে বাসে করে গান গাইতে গাইতে মেদিনীপুরে সুশোভন সেনের বিয়েতে কত আনন্দ করে গেছি। বলাকা রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করেছিল বাড়ির অমতে। জ্যোতিষবাবু সাক্ষী ছিলেন। কলেজেই খাইয়েছিল বলাকা—হাই-টি। ব্যবস্থাপনা করেছিলাম আমি আর তখন সদ্য-আসা জালাল। আমরা বলাকাকে গোদরেজের আলমারি উপহার দিয়েছিলাম। আর প্রত্যেকে একগোছা করে গোলাপফুল।

রাশিকৃত গোলাপফুল বুকে নিয়ে 'লাভলি লাভলি' বলতে-থাকা বলাকা আর 'ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ' বলতে-থাকা বলাকার বরকে যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। যমজ ছেলে নিয়ে আমি যখন নার্সিংহোম তখন যতীনবাবু, ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন, তাঁর ফোন এল,—'ও সব শুনছি না, বিয়েতে বাদ গেছি (বিয়েতে বাদ-যাওয়া মানে আমি বিবাহিতই কলেজে ঢুকেছি) এবার আমরা কবজি ডুবিয়ে খাব।'

জ্যোতিষবাবু চৌকো বাঘের মতো মুখখানা দুলিয়ে দুলিয়ে বললেন—না না ওকে তোমরা বেশি ট্যাক্স কোরো না, একসঙ্গে দু'জনকে মানুষ করতে হবে। যমজের হ্যাপা কত।

তখন শান্তিদি ছিলেন, বললেন—না, না, ট্যাক্স করব কেন? শুধু মাংসের ঝোল আর বাসমতী চালের সাদা ভাত, সঙ্গে কচি আঁবের অম্বল, আর কী বিজন? ঝুরঝুরে আলুভাজা?

বিজনবাবু বললেন—ডাল আলুভাজা তো পাতে দিতেই হয়। ও সব ছাড়ুন গিয়ে। আইসক্রিমটা হচ্ছে কি না বলুন।

শান্তিদি আর জ্যোতিষবাবু দু'জনে মিলে আমাকে না জানিয়ে আইসক্রিমের ব্যয় বহন করেছিলেন। আমার বেলাও উপহার সেই স্টিলের আলমারি। বাচ্চাদের জামাকাপড় রাখা হবে। শান্তিদি উলের স্যুট বুনে দিয়েছিলেন, বলাকা তোয়ালে সেট, সুপ্রিয়াদি চমৎকার ঝাপলা করে দিয়েছিলেন। আর কত খেলনা?

আমি বুঝি না, এরা কেন আমাকে মোহগ্রস্ত বলে। আমি যে দেখেছি। নিজের চোখে।

সবই যে অবশ্য খুব ভাল ছিল, তা বলব না। জ্যোতিষবাবু কারও ওপর দু' বারের বেশি তিনবার অসন্তুষ্ট হলেই "ইয়োর সার্ভিসেস আর নো লঙ্গার রিকোয়ার্ড" ধরিয়ে দিতেন, রামধন বেয়ারা মেন বিল্ডিংয়ের সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কে কখন ক্লাসে যাচ্ছেন দেখত, ক্লাসে রেজিস্টার দিয়ে আসার নিয়ম ছিল তখন, তাতে ধরা যেত কোন কোন ক্লাস হল না। শিক্ষক সংসদ বা ছাত্র সংসদের সব কিছুতেই সায় দেওয়া ছাড়া আর কোনও কাজ ছিল না । গভর্নিং বডির মিটিং মানে ছিল ফীস্ট। কড়াইশুঁটির কচুরি, পটলের দোরমা, রাবড়ি, মাংসের চপ, ব্যস ফিনিশ। মাইনে-কড়িই বা কী ছিল আমাদের। কিন্তু চলে যেত তো।

আমাকে নিয়েই কত মজার ঘটনা ঘটেছে। যমজ নিয়ে নাটা-ঝাপটা খাচ্ছি। একবার এ অসুখে পড়ে তো তারপরেই ও। স্বভাবতই তার পরে আমি। নেহাত শাশুড়ি ছিলেন, লোকজনও মোটামুটি মিলে যেত। তাই। আমি কক্ষনও একটানা ছুটি নিতাম না। মঙ্গলবার টুটুলের কোঁ কোঁ করে জ্বর এল তো আমি সি এল নিলাম। বুধবার দিন জ্বর নেমে গেলে হাজিরা দিলাম, বৃহস্পতিবার জ্বর এল বুবুলের, সে দিনও আমি অ্যাবসেন্ট। শুক্রবার গেছি, শনিবার গেছি, সোমবার আমার নিজেরই জ্বর এল, মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। তো আমি ভয়ে ভয়ে ফোন তুলে বললাম—স্যার, আজ আমার বড্ড জ্বর। ওদিক থেকে টেলিফোন রেখে দেওয়ার কড়াক শব্দটা হল। টেলিফোন রাখার শব্দ তো নয়, বজ্রপাতের শব্দ।

ওদিকে যা ঘটেছিল প্রত্যক্ষদর্শী শান্তিদির কাছে শুনেছি। জ্যোতিষবাবু সঙ্গে সঙ্গে কলেজের ছাপ-মারা লেটার প্যাড নিয়ে খসখস করে লিখতে লাগলেন, ডিয়ার ইত্যাদি ইত্যাদি, আই রিগ্রেট টু ইনফর্ম ইউ দ্যাট ইয়োর সার্ভিসেস আর...

এই অবধি দেখে, দণ্ডায়মান শান্তিদি বললেন—যমজ স্যার।

—কী বললে? অ্যাঁ? হ্যাঁ, যমজ। ঠিকই। যমজ।

যতীনবাবু বললেন—মেয়েটা মহা আতান্তরে পড়বে দেখছি। যমজ সোজা কথা। অ্যাঁ? বলে যমজ!

জ্যোতিষবাবু ততক্ষণে যা লিখে ফেলেছেন তার বয়ান হল—আই রিগ্রেট টু ইনফর্ম ইউ দ্যাট ইয়োর সার্ভিসেস আর রিকোয়ার্ড।

শান্তিদি আড়চোখে দেখে বলেন—স্যার, ওটা কি রিগ্রেট হবে? মানে খবরটা তো ঠিক দুঃখের নয়।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, গ্র্যাড, গ্র্যাডই হবে তো!—জ্যোতিষবাবু গম্ভীরভাবে রিগ্রেট কেটে গ্র্যাড করেন। তারপরে বয়ানটার দিকে চেয়ে মিটিমিটি হেসে বলেন—এ আবার কী ধরনের ড্রাফট? এটা তো এবার ছিঁড়ে ফেললেই হয়।

যতীনবাবু বললেন—অবশ্যই। আমাকে দিন।

জ্যোতিষবাবু বলেন—বেশ কুচিকুচি করে ছিঁড়ো। যমজ তো? ঠিকই।

যমজদেরই উনি কুচিকুচি করে ছেঁড়ার নির্দেশ দিচ্ছেন কি না বোঝা গেল না। সত্যি-সত্যি চাকরি গেছে এমনও হয়েছে। রেখা পালিতের চাকরি গিয়েছিল মিথ্যে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দিয়ে ছুটি নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিল বলে। চিকেন পক্স হয়েছে

এই মর্মে চিঠি পেয়ে জ্যোতিষবাবু নিজে গাড়ি নিয়ে রেখাকে দেখতে যান। রেখার মা বললেন—সে কী ওরা যে কয় বন্ধু মিলে দক্ষিণভারত বেড়াতে গেল। আপনাকে বলে যায়নি?

—হুম্—একটি মাত্র শব্দ। এবং তারপরই রেখা পালিতের চাকরি নট।

অরুণ সামন্তর চাকরি যায় ছাত্রীদের সঙ্গে অশোভন প্রেম করত বলে। সব ইয়ারেই তার কিছু কিছু প্রিয় পাত্রী ছিল। মেয়েরা কমপ্লেইন করে। জ্যোতিষবাবু এক দিন দরজার আড়ালে ঘাপটি মেরে অরুণ সামন্তর লেকচার শোনেন যাতে নাকি সে বলেছিল: এই যেমন নীলাঞ্জনা, এত সুন্দরী যে উপস্থিত থাকলে আমার লেকচার গুলিয়ে যায়, খালি মনে হতে থাকে নীলাঞ্জনা আরেকটু কাছে আসুক, আরেকটু মিষ্টি হাসুক, আর অনুপস্থিত থাকলে...

এই সময়েই জ্যোতিষবাবু স্বয়ং ক্লাসরুমে উপস্থিত হয়ে প্রায় তার ঘাড় ধরে বাইরে টেনে আনেন। সে এক কেলেঙ্কারি। জ্যোতিষবাবুকে বরখাস্ত করতে হয়েছিল, না অরুণ নিজেই আর আসেননি, জানি না। তবে একনিষ্ঠ প্রেমিকদের প্রতি জ্যোতিষবাবুর সমর্থন ছিল । জালাল হাফিজ যখন ইন্দিরা ভট্টাচার্য বলে থার্ড ইয়ার পল সায়েন্সের একটি মেয়েকে বিয়ে করতে বদ্ধপরিকর হল, এবং মেয়েটিও অনুরূপ গোঁ ধরল, জ্যোতিষবাবু ইন্দিরাকে নিজের বাড়িতে রেখেছিলেন, এবং ওরা দু'জন যখন দু'দিকের পরিবারের দ্বারাই বিতাড়িত হয়ে ঘর পাতল, ইন্দিরার পড়ার ব্যবস্থা, সে পাশ করামাত্র চাকরি ইত্যাদির ব্যবস্থা জ্যোতিষবাবুই করে দিয়েছিলেন।

ইন্টারকাস্ট, ইন্টাররিলিজয়স এ সব ভাল—তিনি নাকি মন্তব্য করেন, কিন্তু ছাত্রী-অধ্যাপকের ভাব—এ মোটেই ভাল প্রিসিডেন্স নয়। মন্তব্য করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিশাল মাথাটি নড়ত। সে দৃশ্য সামনে দেখলে ভয় করে। পরে মনে পড়লে দম-ফাটা হাসি পায়। তারপর থেকেই বোধহয় উনি পুরুষ অধ্যাপক নেওয়া কমিয়ে দিলেন। ফলে আজ এঁরা বেশ সংখ্যালঘু। কিন্তু সংখ্যায় লঘু হলে কী হবে ভারে-ভরে এঁরা রীতিমত গুরু। এবং সর্ব অর্থেই গুরু থাকার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। মহিলা অধ্যক্ষকে এঁরা মানবেন না, মহিলা হেড হলে তাকে ঘোল খাওয়াবেন।

—কেন রে বাবা, মমতা বলে, এত কমপ্লেক্স যদি যাক না পুং কি কো-এড কলেজে।

—অত্ত সোজা—শম্পা মন্তব্য করে।

রাজশ্রী বলে—এভাবে বোলো না। চাকরিটা একটা মরণ-বাঁচনের ব্যাপার। কে কোথায় পেল, সেটা ভাগ্য।

—তো সেটা মেনে নিলেই হয়।

—তা তোমাদেরই বা এত পুং-বিদ্বেষ কেন শম্পাদি!

—ঝগড়া হয়ে যাবে কিন্তু রাজশ্রী, পুং-বিদ্বেষ থাকলে আমাদের ঘরের পুংগুলো রক্ষা পেত? সাত বছর চুটিয়ে প্রেম করে তবে বিয়ে করেছি। দেওর দুটোও আমার ভরত, লক্ষ্মণ, পুং-বিদ্বেষ থাকতে যাবে কেন? ওদেরই কমপ্লেক্স। মেয়েদের আন্ডারে কাজ করব?

—তাই? রাজশ্রী বলে—জালালদা, বিজনদা তো খুব হিউমারাস। ঠাট্টা ইয়ার্কি করেন।

—তা করবেন না কেন? ঠাট্টা-ইয়ার্কির জন্যে তো কর্তৃত্ব লাগে না।

—ব্যাপারটা ভাবতে হয়, রাজশ্রী বলে, মেল শভিনিজম আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। আজকে দিয়েছি বাসে একটা বদ লোকের পা মাড়িয়ে—স্টিল হিল দিয়ে।

—কেন? কী শভিনিজম দেখাল বাসের লোক?

—গা ঘেঁষে বিশ্রীভাবে দাঁড়িয়ে ছিল, ঠিক করে দাঁড়াতে বললুম, বলল, ট্যাক্সি করে যান, নারীমুক্তি লেডিজ সিট দুটো এক সঙ্গে হয় না। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে পারেন তো আপিস যান।

—তুই কী বললি? কল্পনা জিজ্ঞেস করল।

—কী বলব বল, বললুম কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে আমার আপত্তি নেই, আপত্তি অন্য কিছু মেলাতে, যে চেষ্টাটা আপনি তখন থেকে চালিয়ে যাচ্ছেন।

—বললি? কথাটা তুই বললি?

—বলিনি, খালি পা মাড়িয়ে দিলাম, আচ্ছা করে।

আমরা হাসিতে ফেটে পড়ি।

বিজনদা ঢুকে পড়েছেন।—কী ব্যাপার? অ্যাত হাসি?

হাসি বেড়ে যায়। হাসতে হাসতে চোখ ফেটে জল এসে পড়ে সবার।

—আমাকে নিয়েই হাসছ নাকি?

এবার আর শম্পা সামলাতে পারে না, ছুটতে ছুটতে ঘরের বাইরে চলে যায়।

—পাগলি নাকি? আস্ত পাগলখানা,—বলতে বলতে বিজনদা বেরিয়ে যান। আমরা হাসছি না কাঁদছি বোঝা যায় না।

এরই মধ্যে তিন চারটি মেয়ে পরদা একটু ফাঁক করে বলে—সি. এম এসেছেন? পি. এম?

মমতা কোনও মতে সামলে সুমলে বলে—দেশের অবস্থা খুব খারাপ। সি. এম পি. এম দুজনেরই ডাক পড়েছে।

—এই চুপ—কল্পনা চাপা গলায় মিনতি করে।

মেয়ে ক'টি ভড়কে পালিয়ে যায়। ওদের রকম দেখে মনে হয় যদি কুমড়ো পটাশ হাসে! তেমন দিদিরা যদি হাসেন এমন একটা পরিস্থিতির উত্তর জানে না বলেই ওরা দুড়দুড় করে পালিয়ে গেল।

এই তো বেশ। এই হাসি, এই ইয়ার্কি, এই গান, পাঠ্য নিয়ে এই ভাবনা-চিন্তা। ক্লাসে তিনটি মেয়ে বলছে—'ম্যাডাম পার্সেন্টেজটা দিয়ে দেবেন, আমরা নৃত্যনাট্যে আছি।' গানের সুর ভেসে আসে, ঘুঙুরের ঝমঝম, নাটকের রিহার্স্যাল হচ্ছে, একটি মেয়ে যথাসাধ্য হেঁড়ে গলা করে চেঁচিয়ে উঠল, 'চোপ-চোপরও।' এই তো বেশ।

কিন্তু সব কিছুর মধ্যে দিয়ে অন্তঃশীলা কেন বয়ে যায় অস্বস্তির চোরা টান! ব্যালকনি মিটিং বেড়ে যায়। ক্যানটিনে আমরা ক'জন ঢুকতে শৌভিক, সুশোভন, স্মিতা, জালাল, হুড়মুড় করে বেরিয়ে যায়—হ্যাঁ হ্যাঁ চা খাওয়া হয়ে গেছে। আপনারা

বসুন, তোমরা বসো।

সবাইকারই তো বসার জায়গা হয়ে যায়, একটু চেয়ারগুলো টেনেটুনে বসলে। বেরিয়ে যেতে হয় কেন। কেউ এলে কাউকে বেরিয়ে যেতে হবে? কী অপ্রতিভ অস্বস্তি এদের মুখে-চোখে। শম্পা বলল—'ক্যাচ কট কট।' সবাই হাসল। আমি হাসতে পারলুম না। মমতা বলল—টি. আর হতে হলে যে কাউকে রামগরুড়ের ছানা হতে হয় এই প্রথম জানলাম। একটু হাসো তো? উঃ!

সায়েন্স বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে আসছে বলাকা। আমাকে দেখে চমকে গেল।

অমন চমকাবার কী আছে? বলাকা কি সায়েন্স বিল্ডিংয়ে যেতে পারে না? কারও সঙ্গে দরকার কিংবা কথা কিংবা নিছক আড্ডা মারতে পারে না? চমকাবে কেন?

বলাকা বলল—চা খেলাম এক কাপ। ওরা মকাইবাড়ির চা খায়। আমি ফিকে হাসি। কৈফিয়তের কী দরকার বলাকা? আমারই বা হাসি ফিকে হয় কেন? কই প্রাণখুলে হাসতে পারলাম না তো? বলতে পারলাম না তো—যাই, আমিও এক কাপ খেয়ে আসি তবে। কে আমার মুখ চেপে ধরল?

সুশোভন সেন যখন-তখন বিগলিত হাসছে আমাকে দেখে। হাতে সেই ঢালের মতো রেজিস্টার।

—আমি দাঁড়াচ্ছি জানেন তো?—আমাকে বলতেই হয়।

—হেঁ-এঁ—

—এক নম্বরটা কি আর দেবেন? দুইটা দেবার কথা ভাববেন অন্তত।

—আপনি তো বেরিয়ে যাচ্ছেন উইথ ফ্লাইং কালার্স। আমার ভোটটা কোনও ফ্যাক্টরই নয়।

—কী করব আর? হাসি। আমিও হাসি। দাঁত বার করে হাসি না। যাতে দেঁতো হাসি কেউ বলতে না পারে।

এবং সব কিছুর মধ্যে দিয়ে চোরা স্রোতের মতো অস্বস্তি বয়। রত্না আসছে না। রত্না কলেজে আসছে না।

ওর বাড়িটা বড্ড দূরে। ফোনও নেই। পাশের বাড়ির একটা নম্বর আছে। খুঁজে বার করে অনেক চেষ্টার পর লাগাতে পারি।

—রত্নাকে একটু ডেকে দেবেন? কলেজ থেকে, হ্যাঁ খুব জরুরি।

প্রায় পনেরো মিনিট অপেক্ষা করবার পর ওদিক থেকে ক্ষীণ গলা ভেসে আসে, মনে হচ্ছে রত্না খুব হাঁপাচ্ছে।

—আসছ না কেন রত্না? কী হয়েছে?

—জ্বর দিদি।

—এত দিন ধরে? ডাক্তার দেখাওনি?

—হ্যাঁ ভাইরাল ফিভার। অ্যান্টি বায়োটিক দিয়েছেন।

—তো এলে কেন? জ্বর গায়ে?

—আপনি ডাকছেন...

—দিদিকে পাঠালে পারতে। আসছ না, খবরটা পাচ্ছি না, প্রিন্সিপ্যালও ছুটিতে,

মেয়ের পরীক্ষা। যাক গে শুয়ে পড়ো গে যাও। আমি কাল পরশুর মধ্যে দেখতে যাব।

—কী দরকার, আমি শিগগির ভাল হয়ে যাব।

—সে তো একশো বার যাবে। আমি একবার তোমাকে দেখতে যেতে পারি না?

—সে কী কথা? নিশ্চয়ই আসবেন। এখন...দিদি... শ্মিতাদি এসেছেন...আর, আর শৌভিকবাবু...থেমে থেমে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রত্না।

—তুমি যাও।

গলা আমার বুজে আসে। শ্মিতারা পৌঁছে গেছে? অলরেডি? আমি কি বড্ড দেরি করে ফেলেছি? এক সপ্তাহের ওপর রত্না আসছে না। একটা ভোট তা হলে গেল? পরক্ষণেই মনে হল—ছি ছি, আমি এ কী ভাবছি। রত্না, রত্না আমার ছোট বোনের মতো। কী ভালই না বাসে আমাকে। তার অসুখে শ্মিতারা প্রথম দেখতে গেছে বলে সে ওদের ভোটটা দিয়ে দেবে আমি এমন ভাবতে পারছি?

রাত্তিরে ভাল করে খেতে পারি না। ঘুমোতে পারি না। যেন শয্যাকণ্টকী হয়েছে। ভেতর থেকে একটা গ্লানিবোধ কেমন কুরে কুরে খায়। বুবুল বলে—মা, তুমি ওয়াক তুলছ কেন? অ্যাকোয়া টাইকটিস দেব?

—দে।

টুটুল জোয়ানের আরক নিয়ে এল। ওদের বাবা গম্ভীর ভাবে বলল—ক'দিন ধরেই তোমাকে খুব বিচলিত দেখছি। ও সব টি. আর. ফি. আর হতে যেয়ো না। লড়ার মানসিকতা অন্য।

—বাঃ জীবনে কি কম লড়াই করেছি?

—দেখো আরতি জীবনসংগ্রাম আর ভোট লড়া এক জিনিস নয়। যা পার তাই করো, যা পারবে না করতে যাচ্ছ কেন? শম্পারা তোমায় নাচিয়ে দিল, তুমিও অমনি নেচে উঠলে?

আমার খুব রাগ হয়।—টিচার্স রিপ্রেজেনটেটিভের কাজ এমনকী একেবারে মহামহিম কাজ যে আমি পারব না?

—ওটা পারবে না বলিনি। এই ভোট লড়াটার কথা বলছি।

—তুমি নেচে-ওঠার কথা বলছ কেন? টিচার হিসেবে আমার একটা দায়িত্ব নেই? চিরকাল এড়িয়ে থাকলে চলে? যদি আমাকে অনেকে চায়, যদি তারা মনে করে আমিই তাঁদের কথা ঠিকমতো পেশ করতে পারব গভর্নিং বডির কাছে, তা হলে আমি সেই শরণাগতদের ফিরিয়ে দেব?

ও হাসতে লাগল।—একেবারে শরণাগত? আসলে সবই ইগোর খেলা আরতি, দেখতে চাও তুমি কতটা জনপ্রিয়।

—ইগো সবাইকারই আছে। তাই বলে এটা মোটেই তুমি যা বলছ সে সব না।

—তবে তুমি না ঘুমিয়ে রাত কাটাও। আমি আর কী বলব।

ইগোর খোঁটায় ভীষণ অভিমান হল। পরদিন শম্পাদের বললাম—ধুর আমি দাঁড়াব না, নাম উইথড্র করে নিচ্ছি।

মমতা বলল—পারলে এ কথা বলতে? আমার থিসিস কমপ্লিট করতে ছুটি চাই। শম্পা ইন্টারন্যাশনাল ম্যাথমেটিকস কনফারেন্সে বার্লিন যাবে—ছুটি চাই। উইথ ফুল পে। এ সব হতে দেবে শ্মিতাদিরা? রূপাদের ছাত্রী নেওয়া বেড়ে যাচ্ছে। এদিকে ল্যাবে ইনস্ট্রুমেন্ট যথেষ্ট নেই। রেজাল্ট খারাপ হয়ে যাচ্ছে ওদের। ইচ্ছে করে এ সব করা হচ্ছে। একটা ঘরকে কাঠের পার্টিশন দিয়ে চারটে ক্লাস। ওরা কীভাবে ক্লাস নেয় নিজের কানে শুনে এসো একবার। তপতীদের স্পেশ্যাল পেপারের লোক নেই। নতুন লোক এল, স্পেশ্যাল পেপার কী? না ওশানোগ্রাফি। এদিকে মেয়েরা পড়তে চায় কার্টোগ্রাফি। আন্দোলন করছে। এ কি তোমাদের সেক্সপিয়ার পড়াতে পড়াতে শেলিতে যাওয়া আরতিদি? অ্যাডমিশনে কত কারচুপি হয়, খবর রাখো? যদি সুশোভনবাবুর চারটে ক্যানডিডেট লো সেকেন্ড ডিভিশনেও অ্যাডমিশন পায় তা হলে আমাদের কারও একটাও অমন ক্যানডিডেট চান্স পাবে না কেন? বুঝলুম তোমার সাংসারিক অসুবিধে হবে। কিন্তু যেমনি তোমার একটা ব্যক্তিসত্তা আছে তেমন একটা সমষ্টিসত্তাও তো আছে, না কী? সমাজ যদি কোনও বিশেষ ভূমিকা তোমার কাছ থেকে দাবি করে, তুমি নিজের ঘরের সময়টা কমে যাবে বলে স্রেফ সেটাকে এড়িয়ে যাবে? আমি বলব এটা চূড়ান্ত স্বার্থপরতা।

শম্পার মতো ডাকাবুকো মেয়ের চোখেও জল, বলল, জানো তো যাদবপুরে একটা লিভ ভ্যাকান্সি পেয়েছিলাম, এক বছরের লিয়েন নিয়ে যেতে চাইলুম, দিল না; শাশ্বতীদির ওপর সে কী তম্বি। 'এর পর ম্যাথস ডিপার্টমেন্ট যদি লোক না পায়, আমাদের বলে কোনও লাভ হবে না।' সব এককাট্টা। আচ্ছা আরতিদি আমি কি চিরকালই আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কলেজে পড়ে থাকব?

শম্পা পিওর ম্যাথসে ফার্স্টক্লাস, বি এসসি এম এসসি দুটোতেই। ডক্টরেট হয়ে গেছে। উচ্চ প্রশংসিত ওর কাজ। কিন্তু কী এক অন্তর্গত পলিটিকসের ফলে বেচারা কিছুতেই আর ইউনিভার্সিটিতে যেতে পারছে না।

কত করে তোমার জন্য ক্যামপেন করছি—কল্পনা বলল।

ছুটির পর সেদিন রত্নার বাড়ি যাই। আঙুর, মুসাম্বি, বড় বাক্স ভর্তি সন্দেশ নিয়ে। টেবিলে এ সব রাখতে গিয়ে একটা থলিতে হাত ঠেকে যায়। গড়িয়ে পড়ে তা থেকে সেই মুসাম্বিই, থোকা থোকা আঙুর। গত কাল শ্মিতারা দিয়ে গেছে।

রত্না এমনিতেই রোগা। এখন এত রোগা হয়ে গেছে। ওর দিদি সবে ফিরেছে, বলল—দেখুন তো দিদি এত ফল, মিষ্টি, যথাসাধ্য তো করি, ডাক্তার খেতে বলছেন, ও কিছুই খেতে চায় না।

রত্নার বরাবরই খাওয়ায় একটু অনীহা। খানিকটা খাবে। খানিকটা ফেলে রাখবে। পিটপিটেও আছে। এই জন্যেই ওর কোনও দিন স্বাস্থ্য ভাল হল না।

আমি বললাম—জ্বরে ওরকম মুখ খারাপ হয়, একটু জোর করে মুসাম্বির রস খাও রত্না, কথা শোনো। তোমাকে তো তাড়াতাড়ি দাঁড়াতে হবে। আমাদের গভর্নিং বডির ইলেকশন আসছে। আমি দাঁড়িয়েছি, আমাকে ভোটটা দিতেও তো তোমাকে যেতে

হবে।

রত্না শূন্যের দিকে একটুখানি চেয়ে থেকে চোখ বুজিয়ে ফেলল। জ্বরের তাপে মুখটা শুকিয়ে গেছে। আমার কথায় যেন আরও এক পোঁচ কালি ওর মুখে লেপে গেল।

আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। রত্না একবারও বলল না, আপনি দাঁড়িয়েছেন আরতিদি, আপনাকে তো ভোট দেবই। আমাকে কি বলতে হবে?—এ বিষয়ে কোনও কথা তো বললই না। কেমন যেন নিরুৎসাহ। সেটা কি শ্বিতাদের আসার জন্য? এমন কী নিন্দা আমার নামে করতে পারে ওরা আমার ছাত্রীর কাছে যে ও এত শীতল হয়ে যাবে?—না কি এটা ওর অসুখের জন্য?

ওর দিদিকে বললাম—ভাইরাস ফিভার বড্ড ভোগায়। ওকে মুরগির স্যুপ করে দাও, ফল তো খাবেই। ছানা-টানা...।

—সলিড একদম খেতে পারছে না—ওর দিদি চিন্তিত মুখে বলল।

—তোমরা আরেকজন ডাক্তার কনসাল্ট করো...

—হ্যাঁ, শৌভিকবাবু একজন স্পেশ্যালিস্ট আনবেন কালকেই...

বিছানার ওপর নিস্পন্দ দেহটা রত্নার কেমন যেন আলোড়িত হয়ে উঠল। ও কি আমায় কিছু বলতে চাইল? বলতে চাইল কি স্পেশালিস্টই আনুক আর যা-ই আনুক আমি আপনারই আরতিদি। ও কি বলতে চাইল শৌভিকবাবুর আনা স্পেশালিস্ট আমি দেখাব না। না, না রত্না এমন ভুল কোরো না। নিরাময়, সে যার হাত দিয়েই আসুক তাকে উপেক্ষা কোরো না। আসলে আমি ভেবেছিলাম ওদের ভাই-ই তো ডাক্তারি পড়ছে, দরকার হলে ভাল আরও ভাল ডাক্তার তো তারই হাতে—এদিকটা একেবারে চিন্তা করিনি। তা ছাড়া আমি সাধারণ গৃহস্থ মানুষ। অত প্রভাব-প্রতিপত্তি আমার নেই যে ছুট বলতেই স্পেশালিস্ট ডাক্তার আমার কথায় ছুটে আসবে। আমি পরামর্শ দিতে পারি, ভালবাসা দিতে পারি, দরকার পড়লে সেবাও দিতে পারি, কিন্তু যার জন্য প্রচুর অর্থ, প্রভাব, জানাশোনা লাগে তেমন কিছু তো...নিজের অক্ষমতায় আমার নিজেরই হাত কামড়াতে ইচ্ছে করল।

নিচু হয়ে রত্নার গায়ে হাত রাখলাম,—'রত্না, যে ডাক্তার আসবেন তাঁকে সব কিছু ভাল করে বোলো কিন্তু। আমি খবর নেব।'

বার্ষিক-উৎসবের দিন আগত প্রায়। কলেজে অন্যান্যবার সাজ-সাজ রব পড়ে যায়। এবার যেন সব কিছু কেমন মিয়োনো। মমতা কাঁদো-কাঁদো মুখে এসে বলল—আরতিদি আমার ভীষণ ভয় করছে। আজ এ মেয়ে আসে তো কাল ও আসে না। গ্রুপ ডান্সগুলো একবারও পুরো রিহার্সাল হচ্ছে না। অরুণেশ্বরের গান যে গাইবে সে সেই গোড়ার দিকে একবার এসেছিল, ব্যস। সে নাকি সুচিত্রাদির প্রিয় ছাত্রী, তাকে নিয়ে নাকি ভাবনা নেই, ঠিক গেয়ে দেবে। কিন্তু নাচ? নাচের মেয়ে তার সঙ্গে প্র্যাকটিস করবে না? আমি এবার ডুব মেরে দেব। দিঘা চলে যাব।

বলাকা বলল—ও প্রত্যেকবারই এমন হয়। ছাত্রীরা আজকাল ভীষণ প্রফেশনাল হয়ে গেছে। সব টুইশনি করে, নানা নাচগানের প্রোগ্রামে অংশ নেয়, ওদের কাছ থেকে

আনরেমুনারেটিভ কলেজের কাজ বেশি পাবে না, আসল দিনে ঠিক উতরে দেবে, দেখো...

—বলছ?—মমতা বলল—কিন্তু তুমি কেন 'কমলিকা'কে রোজ রোজ আটকাচ্ছ।

—দেখো মমতা—সুমনা আমাদের এ ব্যাচে বেস্ট। বেস্ট মানেই তো আর প্রেসিডেন্সির বেস্ট নয়। ওকে আমাদের রীতিমত চোখে চোখে রাখতে হয়, ট্রেইন করতে হয়, কী আরতি, হয় না?

আমি কিছু বললাম না।

বলাকা বলল—সুমনাকে কমলিকা চুজ করাই তোমার ভুল হয়েছে।

—চুজ করার সময়ে তুমিও তো ছিলে...

—তা অবশ্য ছিলাম, আমি এতটা ভেবে দেখিনি, তুমি তোমার রিহার্স্যালের সময়টা চেঞ্জ করো না।

—এখন আবার সময় কী? এখন ১১/১২টা থেকে ৪/৫টা পর্যন্ত টানা রিহার্স্যাল চলা উচিত।

আমি ওকে আড়ালে পরামর্শ দিলাম—শাশ্বতীদিকে দিয়ে একটা নোটিস করিয়ে নিক। যারা নৃত্যনাট্য ইত্যাদিতে আছে তাদের ক্লাসে যেতে হবে না এ ক'দিন। রিহার্স্যাল-রুমেই তাদের উপস্থিতি নোট করা হবে।

রবীন্দ্রনাথের শাপমোচন আমাদের অভিশাপ হয়ে দেখা দিল। অরুণেশ্বরের রোলে সেই গাইয়ে মেয়েটি শেষ পর্যন্ত এল না। তার গানগুলো গাইল মমতা নিজে। দু-এক বার সুর ফসকাল। একদিনও তো প্র্যাকটিস করেনি। ওদিকে সুমনা-কমলিকা খুব ভাল নাচলেও গানের সঙ্গে মিলল না অনেক জায়গাতেই, সুমনার ফিগার হয়ে যাচ্ছে, তারপর গানের কলি আসছে।

প্রথমেই বলেছিলাম 'শাপমোচন' নামাচ্ছ, দু'টি গানের, দু'টি নাচের মেয়ের ওপর সমস্ত নির্ভর করছে। ভেবে কোরো।

বলাকাও বলেছিল।

কিন্তু মমতার 'শাপমোচনের' ওপর ভীষণ ঝোঁক। বলল আমি বেশি মেয়ের দায়িত্ব নিতে পারব না বলাকাদি। অল্প ক'জন হলেই ভাল।

—সেই অল্প ক'জন ফেইল করলে?

—বিকল্প রাখব...

এখন এ তো ইন্টারন্যাশনাল খেলায় ক্রিকেটের টিম গড়া নয় যে, মোঙ্গিয়ার চোট লাগল তো সাবা করিম খেলল। শ্রীনাথ বেজুত তাই কুরুভিল্লাকে চান্স দেওয়া হল। মমতা চেষ্টা করেছিল ঠিকই, কিন্তু আসল সময়ে পারফর্ম করতে পারবে কি পারবে না এই অনৈশ্চিত্য নিয়ে কেউই এগিয়ে আসেনি। ভাষ্যটা পড়ল বড় ভাল। তাইতেই মোটামুটি উতরে গেল। আমাকে স্টেজ ম্যানেজমেন্টে, শম্পাকে গ্রিনরুমে যেতে হল, কারণ বলাকা আসেনি, কাল বলাকার পা ভেঙেছে, শৌভিক আসেনি, ছেলের নাকি কী হয়েছে ধরা যাচ্ছে না, পেটে প্রচণ্ড ব্যথা। কল্পনা, রাজশ্রী অবশ্য এসেছিল, ওদের দু'জনকেই স্টেজে মেয়েদের সঙ্গে বসতে হয়েছে। পরে শুনলাম ভাষ্যটাও বেশির

ভাগটাই কল্পনার পড়া। তাই অত ভাল হয়েছে, অত ম্যাচিওর। সুশোভন সেন এসেছিলেন, নাটক আরম্ভ হবার আগেই শশব্যস্ত হয়ে চলে গেলেন। বাড়ি থেকে ফোন এসেছে, জরুরি। কী তা জানা যাচ্ছে না। কিন্তু সুশোভনের মুখ উদ্বেগে কালো হয়ে গিয়েছিল। জালাল প্রত্যক্ষদর্শী। তারই বিবরণ। 'শাপমোচন' চলাকালীন জালালের মন্তব্য—বইস্যা দেখন যায় না। প্রত্যক্ষশ্রোত্রীর বিবরণ। শম্পা।

নাটকটা আরও মুখ থুবড়ে পড়ল। কোন চরিত্র কখন আসছে, কখন যাচ্ছে, কেন যাওয়া আসা করছে আমরা বুঝতে পারছিলাম না। চরিত্র ঢুকে যায় তারপর টেবিল নিয়ে ডেকোরেটরের লোক ঢোকে, চেয়ার নিয়ে পেছনে ভলান্টিয়ার। পথের দৃশ্যে পেছনে রাজপ্রাসাদের থাম খিলান দেখা যায়। সে এক মহা হাসির ব্যাপার। শুনলাম শৌভিক নাকি রিহার্স্যালটা কোনও সর্দার-নটুয়ার হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন, কিছু দেখেনইনি।

কিন্তু আমাদের আশ্চর্য করল মেয়েদের উপস্থিতির হার। এত কম! সামনের দু' তিনটে সারিতে কিছু গেস্ট, যাঁরা বেশিক্ষণ রইলেন না, তারপর স্টাফ, সে-ও তেমন কিছু নয়। পেছনে মেয়েরা লক্ষণীয়ভাবে কম।

ইউনিয়নের মেয়েদের ডেকে জিজ্ঞেস করলাম কী ব্যাপার?

ওরা আমতা আমতা করে বলল—প্রথমেই তো আমরা 'শাপমোচনে'র অ্যান্টি ছিলুম। মেয়েরা ছিল 'তাসের দেশ'-এর পক্ষে। অনেক বেশি মেয়ে চান্স পেত দিদি। মমতাদি তো শুনলেন না।

—তাই তোমরাও এলে না? কলেজে একটা ফাংশন হচ্ছে, আমরা টিচাররা প্রাণান্ত খেটে দাঁড় করাচ্ছি। বেশি মেয়ে চান্স পেল না, শুধু এই কারণে তোমরা এলে না? অল্প মেয়েতেই তো রিহার্স্যালের এই দশা। বেশি নেবার ঝুঁকি কে নেবে?

—আমরা তো এসেছি দিদি, ওরা মানে ওরা যদি না আসে কী করতে পারি? আসলে বলাকাদি সেন্টিমেন্টগুলো ঠিক বোঝেন... কাঁচুমাচু মুখে জি এস বলল।

আমরাও যা বোঝার বুঝলাম। প্রায় পরিকল্পিতভাবে উৎসবটাকে বানচাল করে দেওয়া হয়েছে। এত ছোট আমরা? এত ছোট? একটা বছর শুধু এক বিশেষ ক্ষেত্রে খবরদারির ভার অন্যকে দেওয়া হয়েছে, এতে আমরা এত সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র করতে পারি? এত বুদ্ধি খরচ! এত গোপন মিটিং! এত গোপন ফোন।

ক্রমশই আরও খবর আসতে লাগল। সুচিত্রা মিত্রর ছাত্রী যে মেয়েটির গান গাওয়ার কথা ছিল, তাকে নাকি ইউনিয়নের কোনও মেয়ে বারবার বলে এসেছে—দিদিদের মধ্যে ভীষণ পলিটিকস হচ্ছে, গাইতে গেলে বিপদে পড়বি। ওই মেয়েটির ঘনিষ্ঠ বন্ধু বাঁশির আমাদের পাড়ায় মামার বাড়ি। তার কাছ থেকেই এ কথা শুনলুম।

মেয়েদের মধ্যে চি চি পড়ে গেছে। ফাংশন ফ্লপ, ফ্লপ, ফ্লপ। মমতাদির গান বেসুর হয়েছে...হি হি...। স্মিতা বলল, সত্যি, ওই ন্যাকা-ন্যাকা প্রেমকাহিনী যে তোমরা কী করে বরদাস্ত করো। শাপমোচন তা হলে হল ন্যাকা।

মমতা ছুটি নিয়েছে। মেয়েটার না নার্ভাস ব্রেক-ডাউন হয়। স্মিতার মুখোমুখি হলাম। ক্রোধ সংবরণ করে বললাম, স্মিতা আমরা কি পরস্পরের শারীরিক, মানসিক স্বাস্থ্যের

কথাও ভাবব না?

—আমাকে কেন সব সময়ে ব্লেম করো বলো তো আরতি।

—ব্লেম করছি না। 'আমরা' বলেছি। কর্তৃত্ব দখলের লোভে আমরা যে ভুলে যাচ্ছি আমরা সহযাত্রী, সহযোদ্ধা!

—তুমি ভুলতে পারো আরতি, আমি ভুলি না, জানো রত্নার কী হয়েছে? খবর রেখেছ? পলিটিকস করতে কে ব্যস্ত আরতি? আমি না তুমি?

শেষের কথাগুলো আমার কানে ঢুকলেও মাথায় ঢুকল না। আমি আকুল হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—কী হয়েছে? কী হয়েছে রত্নার?

—কী আর?

—কী? বলো স্মিতা কী?

—ক্যা ন্ সা র।

চোখের সামনে সব অন্ধকার। এক অতল শূন্যের মধ্যে কে আমাকে ছুঁড়ে দিয়েছে। কিচ্ছু ধরতে পারছি না। সুতোর মতো কী সব ঝুলছে। ঝিকমিক করছে খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু। ইলেকট্রন? আমি কি ইলেকট্রনদের উপবৃত্তে ঘোরার দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি? কে আমি? কে দেখছে? একজন দেখছে। তার কোনও পরিচয় নেই। জ্যামিতিক বিন্দুর মতো তার শুধু অস্তিত্বটুকু বজায় আছে। আছে কী? অত ক্ষুদ্রায়তন অস্তিত্ব দিয়ে ইলেকট্রন হয়তো দেখা যায়, পরমাণু জগতে চলে গেছে সে, কিন্তু বোঝা যায় কি? তা হলে একজন ইলেকট্রনের মৃত্যু দেখছে, আর একজন সেই দেখাটাকে বুঝতে পারছে। আমি কী তা হলে? ওই পরমাণু? না এই দর্শক? অণোরণীয়ান মহতো মহীয়ান বলে একটা কথা আছে না? আমিই কি তা হলে সেই অণুর অণু। আমিই কি সেই মহতের মহৎ? আমিই না সে? সবার মধ্যে এক আমি-বোধ আছে সেই আমি? সবার মধ্যে এক সে-বোধ আছে, সেই সে?

স্মিতা ধরেছে মাথার দিকটা, পায়ের দিকটা শম্পা। মাঝখানে পিঠের তলায় হাত রেখেছে সাবিত্রী আমাদের ফোর্থ ক্লাস স্টাফ, আমি বাহিত হয়ে যাই কোন দিকে জানি না। এমন উঁচু থেকে, শূন্য থেকে কখনও তো সিলিং দেখিনি, দিক নির্দেশ করতে হয়নি। কী করে বুঝব?

—আপনার কি এরকম ব্ল্যাক-আউট মাঝে মাঝেই হয়? মাথা নাড়ি। না। না। না।

—ব্যাপারটা ঠিক কী হয়েছিল।

—আমি ওঁকে একটা খারাপ খবর দিয়েছিলাম। খারাপ বলেই খবরটা আগে দিইনি। শুনে উনি কেমন ঢলে পড়লেন। ভাগ্যে আমি ধরি। না হলে যে কী হত?

—একদম রেস্ট।

—ই. সি. জি. কেমন দেখলেন?

—ঠিক আছে। মানে ন্যাচারালি, এখন খুব ভাল না। পরে আর একবার দেখতে হবে। এখন প্রেসক্রিপশনটা নিয়ে একজন দোকানে যান। হার্ট স্পেশালিস্টকে দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেখিয়ে নিন।

দিন সাতেক বেড-রেস্টের পর, বুবুল-টুটুল আর তাদের বাবা বেরিয়ে গেলে তাড়াতাড়ি একটা বাইরের শাড়ি পরে নিই। চুলে একটু চিরুনি বুলিয়ে, মুখে একটু পাউডার থুপে, ব্যাগে কত পয়সা-টাকা আছে উঁকি মেরে দেখে, বাড়িতে তালা মেরে বেরোই।

ট্যাক্সি। ট্যাক-সি। ট্যাক-সি।

—চলুন কীর্তি মিত্র লেন।

—কোথায়?

—নর্থে। শ্যামবাজারের দিকে। ফড়িয়াপুকুর চেনেন।

—ও। ঠিক আছে।

ট্যাক্সিটাকে দাঁড় করিয়ে রাখলাম। দরজা খুলে দিল স্বপ্না, রত্নার দিদি।

—কেমোথেরাপি চলছে দিদি, ওর চেহারা দেখা যায় না, ও কাউকে ঢুকতে দেয় না ঘরে, আমি আর একটি নার্স আছে, ব্যস।

—আমি? আমাকেও ও দেখা দেবে না।

—আপনি সইতে পারবেন না দিদি। মাথার চুল খাবলা খাবলা। রং ঝুলের মতো। গলা ফুটো করে খাওয়ানো হচ্ছে। ও কথা বলতে পারে না।

—স্বপ্না আমাকে একবারটি যেতে দাও।

—ও আমাকে হাত ধরে মিনতি করে বলেছে কাউকে যেন ওর কাছে নিয়ে না যাই।

—স্মিতা? শৌভিকবাবু?

—কেউ না। কেউ না।

—আমার বেলায় ব্যতিক্রম হবে স্বপ্না। ওর বাইরের চেহারার কতটুকু মূল্য আমার কাছে?

—আসুন।

ম্যাকসি পরা এক বীভৎস একদা-মনুষ্যমূর্তি শুয়ে আছে চোখ বুজে। ঢোঁক গিলছে, গলার নলির ওঠা পড়া স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। সিকরুমের সমস্ত আনুষঙ্গিক। অ্যালটি-সেপটিকের গন্ধ। বেডপ্যান, রাশি রাশি ওষুধ, তার ঝাঁঝালো গন্ধ, মাথায় ক্যাপ পরা নার্স শিয়রের কাছে।

—হসপিট্যালে নিয়ে যাওনি? সন্তর্পণে বাইরে এসে প্রশ্ন করি। আমার গলা কাঁপছে।

—হ্যাঁ, কেমোথেরাপি তো ঠাকুরপুকুরেই হল। এখন ওরা বলছে...দিদি আর তো কোনও...এখন বাড়িতেই...। স্বপ্না দুহাতে মুখ ঢাকল।

আমার স্বামী বলল—ওই ইলেকশন থেকে তোমার নামটা তুলে নাও আরতি। তোমার শরীরের যে অবস্থা ওই নার্ভের লড়াইটা তোমার পক্ষে খুব খারাপ।

—ডাক্তার তো বলেইছেন—তেমন কিছু ভাববার নেই। সাডন শক থেকেই ওটা হয়েছিল।

—ঠিকই। কিন্তু ব্ল্যাক-আউট মিনিট পাঁচেক পুরো ছিল—ওটা একেবারেই ভাল না।

—কিন্তু টেকনিক্যালি এখন তো আর উইথড্রয়ালের সময় নেই।

—মারো গোলি তোমার টেকনিক্যালিটিকে। ব্রেফ মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দিয়ে দাও।

—তোমার ভয় নেই। আমি জিতছি না। কাজেই কাজও আমাকে করতে হবে না।

—না জিতলে তুমি কি বাঁচবে? আমার স্বামী ছোট্ট করে বলল।

অনেক সময়ে ছোট্ট ছোট্ট ব্যাপারেও জীবনের চেয়ে বড় হয়ে ওঠে প্রেসটিজ। তা ছাড়া আমার একার তো নয় এ প্রেসটিজ। এ অনেকের মান, অনেকের লড়াই। পরিস্থিতির চাপে নিজের জীবন, নিজের ভাল-মন্দ তুচ্ছ মনে হয়। যেমন অনেক সময়ে দ্বিতীয় দিন কি তৃতীয় দিন লেট বাঁচাতে আমরা মরিয়া হয়ে চলন্ত ভিড়াক্কার বাসে উঠতে যাই, পা ফসকে পড়ে যাই চাকার তলায়। স্পট ডেড। কিংবা অঙ্গহীন। তখন লোকে বলে আপিসে পৌঁছনোটা কি জীবনের চেয়েও বড় ছিল? একটা পুরো পরিবার নির্ভর করে রয়েছে মানুষটার ওপর। একবার ভাবল না? সত্যিই, ভাবে না মানুষ। আগের দিনই বসের কাছ থেকে নির্দয় গাল খেয়েছে, নির্মম আচরণ পেয়েছে সহকর্মীদের থেকে। বাঁকা কথা, চোরা হাসি। আজ এ বাসটা ধরতেই হবে। ব্যস, জীবনটা চলে গেল। তারপরই কত ফুলের মালা, শোকপ্রস্তাব, বসের বক্তৃতা মানুষটি কেমন নিয়মানুবর্তী ছিলেন, প্রাণের চেয়েও বড় ভাবতেন ডিসিপ্লিনকে। সহকর্মীদের সায়। কিছু ক্ষতিপূরণ আসে কোম্পানি থেকে, সবাই মিলে চাঁদা তুলে কিছু ভিক্ষা তুলে দেয় বিধবার হাতে। সেই চাঁদা দেবার সময়ে কয়েক জন আবার অসন্তোষ প্রকাশ করে—'এই সেদিন তো অমুকের বিয়ের চাঁদায় একশো টাকা গচ্চা গেল', 'এবারেরটা পঞ্চাশ করো মাইরি।'

আমিও তেমন শরীরের কথা, হৃদয়ের কথা ভাবি না। ভাবি না আমার টুটুল-বুবুলের কথা, তাদের বাবার কথা। সম্মেলক সম্মান, কালেকটিভ প্রেসটিজ আমার জীবনের চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়ায়।

ট্যাক্সি ডেকে বুবুলকে নিয়ে নিজের ভোটটা দিয়ে আসি, শেষবেলায়। অদ্ভুত কথা শুনি, অ্যাম্বুলেন্সে করে রত্না নাকি ভোট দিয়ে গেছে। মাথায় স্কার্ফ বাঁধা, সারা শরীর সাদা চাদরে ঢাকা শবদেহের মতো। হলে হয়েছে আমাদের ভোট। স্টেজের ওপর পার্টিশন করে বুথ। স্ট্রেচারে করে সেই পর্যন্ত তোলা হয় রত্নাকে। সে ভোট দিয়ে গেছে।

—অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা—এ সব কে করল? ওই মরণাপন্ন রোগীকে নিয়ে এ কী খেলা!

শম্পা বলল—কেউই নাকি জানে না। তবে আমি জানি। কে বা কারা।

সন্ধে সাতটার সময়ে ফোন এল। আমি নির্জীবের মতো শুয়ে। উঠতে পারছি না। ও-ই ধরল। সংলাপটা শুনছি আর আমার হার্টবিট যেন কমে যাচ্ছে।

—শম্পা? ও, বলো...

—না ও তো শুয়ে আছে। কী দরকার ডিস্টার্ব করে, আমাকেই বলো না।

—হ্যাঁ? জিতেছে? এক ভোটে এগিয়ে? ওরে বাবা,

—না শম্পা, আমার হল শাঁখের করাত। আসতে কাটে যেতে কাটে। জিতলেও মুশকিল, হারলেও মুশকিল, তাই আনন্দ করতে পারছি না।

—শুনলে তো? জিতেছ—আমার দিকে তাকিয়ে ও বলল।

—আর কে? কে?—আমি ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করি

—বিজনবাবু, জালাল হাফিজ, তুমি আর...স্মিতা।

—শৌভিক তা হলে হেরে গেছে? আহা কী আনন্দ। কী আনন্দ আকাশে বাতাসে। একজন অন্তত সরেছে।...

পরের দিন মনে হল শরীরে নতুন বল, মনে নতুন উৎসাহ। কীভাবে বিজনবাবু, জালাল, স্মিতাকে অভিনন্দন জানাব, মনে মনে তোলপাড় করতে লাগলাম চান করতে করতে। সব অভিনন্দন তো আন্তরিক নয়! শৌভিককে যদি পাই কী বলব? 'সরি' বলাটা খুব বাজে দেখাবে। সকলেই জানে আমি 'সরি' নই। ঠিক করি শৌভিককে বলব—"আই ফিল ফর য়ু;" ভাল হবে না? এটা মিথ্যে নয়। তবে শৌভিক টৌভিক ঝানু ভোট-লড়িয়ে। ওরা এ সব হেসে উড়িয়ে দেয়। আমাদের মতো না কি? মমতার নার্ভাস ব্রেক-ডাউন, আমার হার্ট, শম্পাটা অত স্টেডি। সে পর্যন্ত ইদানীং মৌনী তা ছাড়া কেমন প্যারানয়েড হয়ে গিয়েছিল। রাজশ্রী আর কল্পনার দিকে সন্দিগ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করবার সময়ে কয়েকজনই ওকে ধরে ফেলেছে।

কিন্তু রত্না? আমার আনন্দ করবার সময় নেই, আমি কোনও ক্রমে তৈরি হয়ে নিয়ে আবার ট্যাক্সি ধরি। কীর্তি মিত্র লেন। রত্না কেমন আছে?

শুকনো নিঃশব্দ বাড়িটা হাট করে খোলা পড়ে আছে। কয়েকজন ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে। ডেডবডি নাকি কলেজে নিয়ে গেছে, কলেজ থেকেই গাড়ি নিয়ে রীদটীদ নিয়ে সব এসেছিল। কলেজ থেকেই শ্মশানে যাবে।

এক ভদ্রমহিলা বললেন—নিস্তব্ধে ভুগেছে গো, একটি দিন জানতে দেয়নি। আর একজন ভদ্রলোক বললেন—শেষ সাত দিন প্র্যাকটিক্যালি না খেয়ে বেঁচেছিল। স্যালাইনের ওপর। কাউকে কাছে যেতে দিত না। যখন ডেডবডি বার করলেন এঁরা এই আপনাদের কলেজের সব প্রিন্সিপ্যাল, ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল হবেন—সুশোভন সেন, শৌভিক ভট্টাচার্যি, একজন ভদ্রমহিলাও এসেছিলেন, স্বপ্না তো ছাড়বেই না। ওঁরা বললেন—না, ও আমাদের কলেজের প্রথম ছাত্রী-অধ্যাপিকা, ওর মৃত্যুর তাৎপর্য আলাদা, আমরা যথাযোগ্য মর্যাদা দেব।

সবাই জানতে পারল, খালি আমিই জানলাম না! আমাকেই কেউ বলল না। তবে এ তো খুব অপ্রত্যাশিতও ছিল না। যে কোনওদিন ঘটতে পারত। আমিও খোঁজ নিতে পারতাম, নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু নিজের হার-জিতের কঠিন স্নায়বিক উদ্বেগে আমার মাথায় আর কিছুই ছিল না। যত অপ্রিয় হোক, এ কথা আমায় স্বীকার করতেই হবে। অন্তত নিজের কাছে। এবং এ-ও স্বীকার করতে হবে শৌভিকদের পাঠানো অ্যাম্বুলেন্সে রত্না ভোট দিতে আসায় আমি প্রচণ্ড শক পেয়েছি। রত্নার প্রতি, মনের কোণে সামান্য হলেও বিতৃষ্ণা জেগেছিল। রত্না তা হলে বিক্রি হয়ে গেল? মৃত্যুপথযাত্রিণী অতি স্নেহের জন সে আমার, তার প্রতি ভালবাসা ও করুণা আমার এক তিল কমেনি।

নিজেকে ভাল করে বিশ্লেষণ করেই এ কথা বলছি। খালি আমার সেই মোহগ্রস্ত স্বপ্নাবিষ্ট সত্তার দিকে তাকিয়ে বলি—আমাকে তা হলে হারিয়েই দিলে? সবই তা হলে মোহ? স্বপ্ন?

কলেজে পৌঁছেও আমি রত্নাকে দেখতে পাইনি। চারদিকে শুধু ফুল ছড়িয়ে, শবাধারের চাকার দাগ এবং তীব্র ইউক্যালিপটাসের গন্ধ। ছাত্রীরা ছিল ছড়িয়ে ছিটিয়ে। সেই লাল-ফল বটগাছের তলায় আমি ভেঙে গেলাম টুকরো টুকরো হয়ে। ছাত্রীরা আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল।

সুমনা বলল—সে দৃশ্য আপনি দেখতে পারতেন না দিদি।

কৃষ্ণকলি বলল—গলা পর্যন্ত ব্যান্ডেজে ঢাকা মমির মতো। মাথাটা নানদের মতো ঢাকা। মুখটা এত ছোট যে... কেঁদে ফেলল, কৃষ্ণকলি।

—আমরা চিনতে পারিনি রত্নাদিকে। কেউ না। এ যেন অন্য কেউ। অনিন্দিতা কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে গেল।

আর সবাই জল এনে ওর মুখেচোখে ছিটোতে থাকল।

রচনা এসে বলল—প্রিন্সিপ্যাল আপনাকে ডাকছেন আরতিদি। ধরব?

—না, আমি পারব।

তবু রচনা একদিকে সুমনা একদিকে আমার সঙ্গে চলতে লাগল।

শাশ্বতীদি একলা বসে আছেন। বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবলে ওঁর সামনে কলমদানি, রাইটিং প্যাড, কলিং বেল। কয়েকটা ফাইল পাশের দিকে সরানো। শাশ্বতীদির কোঁকড়া চুলে বেশ পাক ধরেছে। চোখ দুটো সামান্য ফোলা, লাল। যেন কত দূরে, একটা সম্পূর্ণ একলা মানুষ। আমরা তো শেষ পর্যন্ত একলাই!

আমি বসেছি ওঁর হাতের নির্দেশে, ওঁর সামনে। চোখে চোখ মেলাচ্ছি না, কেঁদে ফেলব। লোকসমক্ষে কান্নাকাটি করতে আমার বড্ড লজ্জা হয়।

—একটু জল খাও আরতি। উনি আমায় আপনি বলতে ভুলে গেছেন।

খেলাম।

—বি স্টেডি।

—আমি ঠিক আছি।

—শুনছিলাম তুমি নাকি টি. আর-এর পদ থেকে ইস্তফা দেবে?

—ঠিকই শুনেছেন।

—শরীরের জন্য? শরীর তো এখন ভালই আছে।

—তা আছে।

—তবে?

—না, মানে আমি কি কিছু করতে পারব শাশ্বতীদি? এ ঘুঘুর বাসা ভাঙতে হলে আমার চেয়ে আরও বুদ্ধিধর কাউকে...

—বুদ্ধি মানেই তো বদবুদ্ধি, ভেদবুদ্ধি।

—তা অবশ্য ঠিক। তবে...

—তোমাকে একটা জিনিস দেখাব বলে ডেকেছি।

ড্রয়ারের ভেতর থেকে একটা ছোট চিরকুট বার করলেন শাশ্বতীদি। চার ভাঁজ করা। খুলে দেখি সেটা একটা ব্যালট পেপার। ভেতরে আমার ছাপানো নামের পাশে আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা—আরতিদি।

আমি জিজ্ঞাসু চোখে শাশ্বতীদির দিকে চাই। তারপরেই বুঝতে পারি। বুকে আঁকড়ে ধরি কাগজটাকে। পাগলের মতো শুঁকতে থাকি। ব্যালট পেপারের থেকে নির্ভুল ওষুধের ঘ্রাণ, মৃত্যুর ঘ্রাণ, সে সব ছাপিয়ে একটা নম্র শ্রদ্ধাশীল দ্বন্দ্বদীর্ণ জীবনের ঘ্রাণ। টেবিলের ওপর মাথা রেখে আমি মূর্ছাহতের মতো পড়ে থাকি।

অনেক অনেকক্ষণ পর শাশ্বতীদির হাত মাথায় অনুভব করি।

—ওঠো আরতি।

—আমি...আমি কি এই ব্যালটটা রাখতে পারি?

—নিশ্চয়ই। তোমার জন্যেই ওটা চুরি করেছি। একজনের লাস্ট টেস্টামেন্ট। তোমাকে সে দিয়ে গেছে। মনে রেখো সে তার শেষ প্রাণবিন্দু দিয়ে তোমাকে নির্বাচন করে গেছে।

হাতের মুঠোয় ভাঁজ করা কাগজটা নিয়ে আমি বেরিয়ে আসি। হাঁটতে থাকি গেটের দিকে। ব্লু গেটে পৌঁছে একবার ফিরে দাঁড়াই। গোটা কলেজটা আমার চোখের সামনে শান্ত ছবির মতো বিছিয়ে আছে। সুরকি, ঘাস, ঝরা ফুল, ঝরা পাতা, গন্ধরাজ, কাঞ্চন, কৃষ্ণচূড়া, আম, বট, মেহেদির বেড়া, চকচকে পুকুরের জল, তেলাপিয়ারা ঘাই মারছে। মুক্তো সাদা মেন বিল্ডিং। স্টাফরুমের বাড়িটা বালি রঙের। ছাইয়ের ওপর সবুজ বর্ডার সায়েন্স বিল্ডিং। অনার্সভবনের গায়ে বোগেনভিলিয়ার সবুজ-চাদর। কিন্তু কীসের যেন একটা ছায়া পড়েছে সমস্তটার ওপর। বিরাট বিকট ছায়া। বার বার চোখ কচলাই। চোখের দোষ হল? অনেক কেঁদেছি তাই কি এমন বিকৃত ছায়া দেখছি। না তো! এক পাশে সার দিয়ে কল। কলের জলে মুখ ধুই, চোখে জলের ঝাপটা দিই, তখনও ছায়া যায় না। ভাল করে দেখতে দেখতে হঠাৎ বুঝতে পারি ছায়াটা একটা বিরাট অনৈসর্গিক কাঁকড়ার। বিরাট! বিরাট। আমাদের গোটা কলেজটাকে ছেয়ে ফেলেছে। সাঁড়াশির মতো দাঁড়াগুলো দিয়ে টুঁটি টিপে ধরেছে আমাদের আত্মার। আমিও তার আওতার মধ্যে চলে এসেছি। এ কি সত্য? না কি ছায়া? আস্তে আস্তে বুঝতে পারি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে অসহায়, নিরীহ, ভালমানুষ, আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বিবেকী যে সে-ই শেষ পর্যন্ত ওই ভয়ানক কর্কটটাকে লড়াই দিয়েছে। কর্কটের ছায়া এখনও আমাদের ওপর, এই বট, ওই কাঞ্চন, ওই দিঘি, আর এই ইট কাঠগুলোর ওপর থমকে আছে।

সরে যাবে।

শিকার তো নিয়েছ। হে কর্কট এবার তুমি সরে যাও।

পত্রিকা শারদীয় ১৯৯৭ (১৪০৪)

দেবী, উইমেন'স্ লিব ও নেপো

বাণী বসু

উপন্যাস পঞ্চক

আমার পৈতৃক বাড়িটি জরাজীর্ণ হইয়া গিয়াছে। যেখানে-সেখানে প্রাচীর হইতে বাহির হইয়াছে বট-অশ্বত্থের চারা। তাহারা আর প্রকৃতপক্ষে চারাও নাই। রীতিমতো বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। সহসা দূর হইতে দেখিলে মনে হইবে আহা বাড়িটিতে ব্যাবিলনীয় ঝুলন্ত উদ্যান সৃষ্টি করিয়াছিল কে? প্রত্যেক কার্নিশ হইতে বহুবিধ বন্য বৃক্ষ-গুল্মাদির অংশ ঝুলিতেছে। নানা প্রকারের ফার্নও বাদ যায় নাই। কোনও কোনও গুল্মাদি দেখিয়া আমি পুলকিত হইয়া ভাবি ইহা কোনও প্রকারের অর্কিড নহে তো। অভিজ্ঞতা নাই। কিন্তু ধনীগৃহে, উপরন্তু হর্টিকালচারে দেখিয়াছি। কল্পনা করি কোনও দূর-দূরান্তের যাযাবর পক্ষী এই অর্কিডের বীজ (?) ভক্ষণ করিয়া মদীয় গৃহের উপর দিয়া উড়িয়া যাইতে যাইতে পুরীষ ত্যাগ করিয়াছিল। সেই পুরীষে বহুমূল্য রত্নের মতো লুকাইয়া ছিল অর্কিডের বীজ। আজ তাহাই আমার কার্নিশের শোভাবর্ধন করিয়া ঝুলিতেছে। পুষ্পধারণ করিবে এমত সার বা রসদ পাইতেছে না। কিন্তু পত্রের শোভাতেই আমার কার্নিশকে সুসজ্জিত রাখিয়াছে।

বাসগৃহের এইরূপ অবস্থায় আমার কিছু সুবিধা হইয়াছে। যেমন আমাকে উড়ুম্বর অর্থাৎ ডুমুর, কাগজি লেবু, ধানিলঙ্কা, তিতা অর্থাৎ নিম্বপত্র, বিল্বফল ইত্যাদির জন্য বাজারে যাইতে হয় না। সকলই আমার গৃহের প্রাচীরে অথবা জমিতে মজুদ। আমি কিছু পুষ্পবিলাসী। সুতরাং যে বন্য পুটুস এবং নয়নতারা দিয়া প্রকৃতি স্বহস্তে আমার গৃহ সাজাইয়া দিয়াছেন আমি সেগুলিরই সদ্ব্যবহার করি। পূর্বপুরুষের ফেলিয়া যাওয়া ডিক্যান্টারে, ফুট বোলে, ফ্লাওয়ার ভাসে ফার্ন গুচ্ছসহ সাজাইয়া রাখি। নিখরচায় গৃহসজ্জা।

ইহা তো গেল সুবিধার কথা। অসুবিধাগুলি কিন্তু বিস্তর। প্রথমত আমার একার ক্ষমতায় এই বৃহৎ গৃহ পরিচ্ছন্ন রাখা সম্ভব নহে। এক সময়ে ইহা ছিল বিশাল যৌথ পরিবারের বাসভূমি। আশ্রিত-আশ্রিতা, গ্রাম-হইতে-আসা উচ্চাশী তরুণকুল এবং তদোপযুক্ত ভৃত্যকুল এখানে বাস করিয়া গিয়াছে। শুনিয়াছি, আমার প্রপিতামহের সময়েই দুইশত পর্যন্ত লোকের পাত পড়িয়াছে দৈনিক। যাহা হউক তাঁহারা যথাসময়ে ঈশ্বরপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সেই যৌথ পরিবার সঙ্কুচিত হইতে হইতে এখন একটিমাত্র শিবরাত্রির সলিতা অর্থাৎ আমাতে আসিয়া ঠেকিয়াছে। আমিই শেষ, কারণ আমার বয়স বর্তমানে তেতাল্লিশ অতিক্রান্ত। আর কেহ যে আমাকে বিবাহ করিতে উৎসুক হইবে এমন আশা দেখি না। উৎসাহ দেখি একমাত্র এই অঞ্চলের দাসী-শ্রেণীর মহিলাগুলির। তাহারাও ঠিক পত্নী হইতে চাহে না। কারণ কাহারও না কাহারও পত্নীত্ব তাহাদের রহিয়া গিয়াছে, তাহারা পুত্র কন্যাদিসহ আসিয়া আমার রক্ষিতা

হইতে চায়। কীভাবে আমার এ ধারণা বা ভয় হইল তাহা সবিশেষ বুঝাইয়া বলি।

আজিকাল পুরুষ ভৃত্যাদি পাওয়া দুষ্কর। দাসকুলের পুরুষরা কোনও না কোনও কল-কারখানায় দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে নিযুক্ত হইয়া থাকে। যদি না থাকে তো তাহারা ছোট বড় মাঝারি নানা মাপের মস্তানি-বৃত্তি গ্রহণ করে। তাহাতে ওয়াগন ব্রেকিং ব্যাঙ্ক ডাকাতি হইতে বাড়ির মহিলা হত্যা করিয়া তাঁহার সমস্ত অলঙ্কারাদি অপহরণ, ছিঁচকে চুরি ইত্যাদি বহু প্রকার উপার্জনের পথের সন্ধান পাইয়া যায়। আর যদি তাহাও জোগাড় করিতে না পারে, তাহা হইলে ইহারা বিবাহ করে। বিবাহে সাত আট হাজার পণ লয়। ইহা ব্যতীত বধূটি গৃহ হইতে গৃহান্তরে ঠিকা কাজ করিয়া উপার্জন করিয়া আনে। কাজে কাজেই পুরুষটির আর কাজের প্রয়োজন থাকে না। তাহার আহার-নিদ্রা-মৈথুনের একটি আইনসঙ্গত ব্যবস্থা হইয়া যায়। কিন্তু কাজ-করিতে-ইচ্ছুক নানা বয়সের মহিলাগুলি আমার মতো চিরকুমার ও একাকী লোকের পক্ষে বড়ই বিপজ্জনক। নির্জন গৃহে আমি তাহাদের উপর অত্যাচার করিয়াছি এই দাবি করিয়া সাশ্রুনেত্রে, বিশ্বাস উৎপাদক স্খলিত বেশবাসে তাহারা পল্লীর সমাজপতিস্বরূপ যতেক যুবককে ডাকিয়া আনিতে চাহে যদি আমি তাহাদের দাবিমত অর্থ না দিই, বা গৃহের কয়েকটি ঘর ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া না দিই। এই বৃহৎ গৃহ আমি একা ভোগ করিব এবং তাহারা ছয় সাতটি সন্তান, স্বামী ইত্যাদিসহ বস্তির একখানি মাত্র ঘরে বাস করিবে ইহার কোনও যুক্তি তাহারা খুঁজিয়া পায় না। বস্তুত আমিও পাই না। যাহারা সন্তান-উৎপাদন করার তাহারা যতগুলি সম্ভব করিবে এবং যাহাদের অতিরিক্ত স্থান রহিয়াছে তাহারা স্থান ছাড়িয়া দিবে, যাহাদের অধিকতর উপার্জন তাহারাই শিশুগুলির ভরণপোষণ করিবে, তাহাদের মতো পিতাদের আহার বিহারের ব্যবস্থা করিয়া দিবে—ইহাই তো লজিক। কিন্তু লজ্জার বিষয়, আমার মতো নগণ্য মানুষ সিস্টেমের শিকার। তাই উচিত বুঝিয়াও ফুটপাতবাসী বিশাল পরিবারগুলিকে আমি বাড়িটি ছাড়িয়া দিয়া নিজে ফুটপাত আশ্রয় করি নাই। ভিখু নামে একটি ভিখারি শ্রেণীর প্রৌঢ়কে আমি গৃহটি মার্জনা করিবার দায়িত্ব দিয়াছি। যে অংশটুকু আমি নিত্য ব্যবহার করি শুধু সেইটুকু। বাকি অংশটি আবর্জনায় একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। নিজের খাদ্যবস্তু আমি নিজেই প্রস্তুত করিয়া লই একটি স্টোভের সাহায্যে। এই ভাবেই আমার চলিতেছিল। ভালই চলিতেছিল।

এমন অবস্থায় আমার একটি তালেবর বন্ধু আমাকে একটি পরামর্শ দিল। কহিল—তোমার মাথা খারাপ হইয়াছে?'

—'মাথা খারাপের কী কী লক্ষণ তুমি আমার মধ্যে দেখিলে?'—আমি বলিলাম।

সে বলিল—'লক্ষণ একটাই। এই সুবৃহৎ গৃহ অর্থাৎ প্রপার্টি থাকিতেও তুমি দীনহীনের জীবন যাপন করিতেছ। জানো না কি আজিকালি প্রমোটার নামধারী কল্কি অবতার উঠিয়াছেন? তাঁহারা তোমাকে অচিরেই এই গৃহের দায় হইতে মুক্ত করিবেন, সেইসঙ্গে তুমি মূল্যস্বরূপ যাহা পাইবে নগরীতে ছোট একটি ফ্ল্যাট কিনিয়া, বাকি অর্থ লগ্নি করিয়া আরামে দিনপাত হইবে।'

আমি বলিলাম—'শহর হইতে দূরে এই ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে, এই ভগ্ন গৃহে কোন অবতার আকৃষ্ট হইবে হে? হইলেও যাহা দিবে তাহাতে কোথাও স্থান সঙ্কুলান হইবে না।'

বন্ধুবর কহিল—'বাজারের খবর তারক তুমি কিছুই জানো না। আমি তোমাকে প্রোমোটার জোগাড় করিয়া দিব। আমাকে তুমি মাত্র শতকরা দুই ভাগ দালালি দিবে। মূল্য তোমার পছন্দ হইলেই বিক্রয় করিবে। নচেৎ নহে।'

আমি বলিলাম—'বুঝিয়াছি। এই অধমের ঘাড় মটকাইয়া কিছু গুছাইয়া লইতে চাহ। তাহা হইবে না। খুব বেশি হইলে আর পঁচিশ বছর বাঁচিব, তাহার পর এ গৃহ ধূলিসাৎ হইয়া যাক, বাদুড়ের বাসভূমি হউক, ভূতেদের রাজধানী হউক আমি দেখিতে আসিব না।'

বন্ধুর ধৈর্য আমা হইতে অনেক বেশি। সে হাসিয়া বলিল—'ভাল। এক পার্সেন্টই না হয় লইব। তা তোমার বাকি পঁচিশ বৎসর যদি মহানগরীর বুকে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকিতে পারো, করিবে না কেন? তোমার বাসগৃহও আমি জোগাড় করিয়া দিব, এবং তাহার জন্য তোমায় কোনও হাঙ্গামা পোহাইতে হইবে না। উহার জন্য পার্সেন্টেজ দাবি করিব না। হাজার হউক বন্ধু লোক।'

এই ননীগোপালের উদ্যোগেই আমার গৃহটি বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। যাহা পাইয়াছি তাহাতে কলিকাতার উত্তরে ভদ্রপল্লিতে একটি এক ঘরের ফ্ল্যাট, সংলগ্ন কলগৃহ, বারেন্ডা, বসিবার ও খাইবার মিলিত কক্ষ, আধুনিক রন্ধনশালা সকলি মিলিয়াছে। মিলিয়াও যাহা আছে তাহাতে আমার অবশিষ্ট জীবনের যাবতীয় শখ মিটিয়া যাইবে।

ননীগোপাল উদ্যোগী হইয়া বহু বিশালাকৃতি আসবাবও বিক্রয় করিয়া দিল। এগুলি নাকি আসল বর্মা সেগুন ও মেহগিনি হইবে। একটি দেরাজ যে মূল্যে এক অ্যান্টিক-বিলাসী ভদ্রলোক কিনিয়া লইলেন, তাহা বিশ্বাস করিবেন না।

ননীগোপালই বলিল—'বহির আলমারি ইত্যাদি ভাল করিয়া খুঁজিয়া ঝাড়িয়া দ্যাখ। গুপ্তধনের নকশা হয়তো মিলিবে না। কিন্তু দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ও পুস্তকের পৃষ্ঠায় রাখা নোট, মোহর ইত্যাদি হয়তো পাইতে পারিস।'

সত্যই। বেশ কিছু দুর্মূল্য পুস্তক বাহির হইল, যাহা পুরাতন বহির দোকানে বিক্রয় করিয়া ভাল মূল্য পাইলাম।

আর যাহা পাইলাম তাহা একটি খাতা। চামড়া-বাঁধানো। তাহাতে সযতনে কেহ একটি উপন্যাস মকশো করিয়াছে। কিছুদূর পড়িয়া বুঝিলাম বিষয়বস্তু সামাজিক, লেখক অশিক্ষিত নহেন। তবে কিছু নূতন, কিছু লাজুক, উপন্যাসের নামকরণ করেন নাই। নিজের সহিও দেন নাই। সবখানি পড়িয়া শিরোনামটি এই অধমই দিয়াছে।

স্থির করিলাম উহা প্রকাশের দফতরে লইয়া যাইব। লেখাটির কিছু মূল্য থাকিলেও থাকিতে পারে।

প্রকাশক মহাশয় বলিলেন—'ইহা যেমন চন্দ্রাবতরণের যুগ, কম্পুটার যন্ত্রের যুগ, তেমনি ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির যুগও। প্রমাণ? আমার এই জামেয়ার, কালের প্রভাবে কীটাদি ইহাতে নূতন রকম নকশা করিয়াছে। একজন সমঝদার ভদ্রলোক ইহা পঞ্চাশ

হাজারে ক্রয় করিতে চাহিয়াছিলেন। দিই নাই। সগৌরবে ইতিহাস পরিয়া আছি।'

সত্যই, বিস্মিত হইয়া দেখিলাম সূক্ষ্ম কাশ্মীরি সুচের পরিপাটি নকশায় সমুদ্র-নীল শালটি অপরূপ। কিন্তু ইহাও সত্য যে কীটাদি তাহাতে স্বকীয় নকশা ফুটাইয়াছে। এবং প্রকাশক মহাশয় সত্যই ইহা পরিয়া আছেন।

বলিলাম—'আশ্চর্য!'

প্রকাশক হৃষ্টচিত্তে বলিলেন—'এই পাণ্ডুলিপিটি অ্যান্টিক। তারকনাথ রায়চৌধুরীর সৌজন্যে প্রাপ্ত হইল, এইভাবে প্রকাশ করিব। মূল্য হিসাবে এই জামেয়ারটি আপনাকে দিব। খুশি?'

স্বীকৃত হইলাম। বিশ্বাস না করেন, আমার বসিবার ঘরে দেয়াল লগ্ন অ্যান্টিক জামেয়ারটি দেখিয়া যান।

—ইতি তারকনাথ রায়চৌধুরী।

প্রাপ্ত অ্যান্টিক উপন্যাস—

বিনতা

বিনতা দেবী তত দিনই দেবী ছিলেন, যত দিন গৃহে অনীতার আগমন হয় নাই।

মাত্র ষোলো বৎসর বয়সে রূপলাবণ্যবতী বিনতার যে গৃহে বিবাহ হয়, সে গৃহে তখন ধনসম্পদ সুখসৌভাগ্যের অবস্থান তুঙ্গে। বিকালে যদি মেজকর্তার গাড়ি হগ মার্কেট হইতে কেক-পেটি-পেস্ট্রি লইয়া আসে, তাহা হইলে সন্ধ্যাবেলায় বড়কর্তা বাগবাজার হইতে আনেন সদ্য-তোলা জোড়া ইলিশ, রাত্রে ছোট কর্তার ফিটন ঋতুর সর্বশেষ রসাল চৌসা ও দসেরি লইয়া ঢোকে। গৃহের বিবাহিতা কন্যাগুলি যখন টমটম চাপিয়া পুত্র-কন্যাসমেত আসিয়া পড়ে তখন গৃহ গুলজার হইয়া ওঠে, জরদা-কিমাম সহযোগে তাম্বুল চর্বণ করিতে করিতে বহু প্রকার খোসগল্প হয়, ভোজনবিলাস তুঙ্গে উঠিয়া থাকে, নাতি-নাতনিগুলি কেহ পদ্মকাটা আমসত্ত্ব, কেহ স্লেচ্ছ কেক, কেহ বড় দিদিমা-কৃত রসবড়া ভক্ষণ করিতে করিতে হুটোপাটি করে। কেহ তাহাদের শাসন করে না। গৃহে দুইটি মুলতানি গাভী মজুত, একটি অস্টিন যান, একটি ফিটন। গোহাল ও আস্তাবল গৃহের পিছনে। নাতি-নাতিনিরা ইচ্ছামতো সহিস অথবা শফারকে ফরমাস করিয়া বেড়াইয়া আসে। সে সময়ে দিদিমাদিগের কাছ হইতে তাহারা যথেষ্ট পথখরচ পায়, তাহা দিয়া শিশুপ্রিয় লাট্টু লেত্তি, চলন্ত এঞ্জিন গাড়ি, বেলুন, ঘাড়-নাড়া বৃদ্ধ পুতুল, কাচের বা কাচকড়ার ডল, ঘুড়ি, বল প্রভৃতি নানা প্রকার বস্তু ক্রীত হয়। বালক-বালিকাদের কলকাকলিতে গৃহের সুখ পরিপূর্ণ হইয়া যায়।

ষোড়শবর্ষীয়া বিনতা যখন দুগ্ধ-অলক্তকের থালির উপর আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং তাঁহার হস্তে একটি ল্যাঠা মৎস্য রুমালসহ ধরাইয়া দেওয়া হইল তখন আত্মীয়বর্গ, বন্ধুবান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী উপস্থিত সকলেই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন।

আহা এমন চন্দ্রের ন্যায় মুখশোভা, এমন কুঞ্চিত কেশে বিপুল কবরী, এমন বর্ণ, গৃহের বৈভবের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। গৃহের ঐতিহ্যে একটি বস্তুরই অভাব ছিল। তাহা হইতেছে গৌরবর্ণ। এত দিনে সে অভাব ঘুচিল। বিনতাদেবীর শ্বশুরগুলি সুপুরুষ হইলেও কৃষ্ণবর্ণ। শ্বশ্রূমাতারা স্বাভাবিক বাঙালিনী। এখন গৃহের সমস্ত বর্ণকালিমা দূর করিয়া দিয়া যেন সূর্যকিরণের উদয় হইল।

ইহা তো গেল দর্শনধারী। অর্থাৎ প্রাথমিক রূপমুগ্ধতা। ইহার প্রভাব বহুকাল রহিল। বধূমাতা স্নানান্তে যখন কুঞ্চিত কেশদাম প্রলম্বিত করিয়া গতায়াত করেন তখন সকলেই মুগ্ধ চক্ষে চাহিয়া থাকেন। শ্বশুর মহাশয় তাঁহার রূপের মধ্যে দেবী প্রতিমার আদল আবিষ্কার করিয়া পুলকিত হন। পুরুষমানুষের মুখে মহিলাদের রূপবর্ণনা শোভা পায় না, তাই তাঁহার জবানিতে তাঁহার পত্নীই বলিতে থাকেন, 'রূপ তো অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু এমন লক্ষ্মীশ্রী আমাদিগের বধূমাতার মতো কোথাও দেখিয়াছ কি? সাক্ষাৎ জগজ্জননী দেবী যেন ঘরে আসিয়াছেন।'

রূপমুগ্ধতার পরের পর্যায়ে আসিল গুণমুগ্ধতা। আহা, মুখে কথাটি নাই। যাহা বলো, যে বলো, বিনা বাক্যে তাহাই সমাধান করিতে বসে। এমন সর্বজনীন অধীনতা সহসা চোখে পড়ে না। বাড়ির পুরুষরা রাত্রে একত্রে খাইতে বসিবেন। বড়জন অর্থাৎ বিনতার নিজ শ্বশুরের বহুমূত্র রোগ। তিনি দুইবেলাই রুটি খাইয়া থাকেন। দ্বিতীয় জন উদরাময়ের রোগী। ক্ষুধামান্দ্য, আমাশয় ইত্যাদি তাঁহার নিত্যসঙ্গী, সুতরাং তাঁহাকে বহু সময়েই 'পোরের ভাত' করিয়া দিতে হয়। তৃতীয়জন কিছু ভোজনবিলাসী। একাসনে ত্রিশ-চল্লিশ খানি লুচি, আধসের পাঁঠার মাংস, তদনুযায়ী সুপক্ক পদাবলি, শেষ পাতে ক্ষীর বা রাবড়ি তাঁহার প্রতিদিনের আহার। বাড়ির একমাত্র পুত্রসন্তান অর্থাৎ বিনতার স্বামীও এই শেষোক্ত দলে। একে পুত্র, তায় একমাত্র, তাই তাঁহার সমাদর এবং দাবি সবার উপরে। মানুষটি রাজসিক মেজাজের। একখানি লুচিও না ফুলিলে, কিংবা কোনও ভোজ্যবস্তুর স্বাদ-গুণ সম্পর্কে সন্দেহ জন্মিলে তিনি পুরা থালিটিই টান মারিয়া উঠানে ফেলিয়া দ্যান। নূতন থালায় যাবতীয় আয়োজন করিয়া আবার তাঁহাকে সরবরাহ করিতে হয়। এই বিরতির সময়টা, যখন রান্নাগৃহে পাচিকা, তিন মাতা ও বধূরানি গলদ্ঘর্ম হইতেছেন সে সময়টা বাটির একমাত্র পুত্রের মুখ হইতে অনর্গল নারীকুলের অক্ষমতা, উদাসীনতা, এমনকি ইচ্ছাকৃত এবং অমার্জনীয় অবজ্ঞার বিষয়ে তেজোদৃপ্ত বক্তৃতা বাহির হয়। ইহার উপর রহিয়াছে তাঁহার মক্ষিকাভীতি। পাখা চলিতেছে পত্নী কিংবা মাতা বাতাস করিতেছেন, তৎসত্ত্বেও তাঁহার সর্বদা মনে হয় ওই থালির কোণে একটি ক্ষু—দ্র মক্ষিকা বসিয়াই উড়িয়া গেল। তখন তাঁহার সংশয় প্রশমিত করিবার চেষ্টা করিলে উল্টা বিপত্তি। থালি তো তিনি ফেলিয়া দ্যানই, উপরন্তু পাখাবাহিনী পত্নীটিকে গালিগালাজ শাপ-শাপান্ত করিয়া ছাড়িয়া দ্যান। বিস্ময়ের কথা, এত্যাদৃশ লাঞ্ছনার পরও সুন্দরী বধূ চুপটি করিয়া বসিয়া থাকে, মুখের আভা পাল্টায় না, চক্ষে জল আসে না, যেন সে সত্যই মক্ষিকা-বৎসটিকে ধরিয়া তাহার স্বামীর পাতপ্রান্তে ইচ্ছা করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল, এমনি অপরাধী মুখ। মাতা বসিলে তিনিও কিছু পাল্টা গালিগালাজ

করিতেন ফলে কুরুক্ষেত্র হইত। কিন্তু বধূ বসিলে চিন্তা নাই। তিন শ্বশ্রূমাতা গালে হস্ত দিয়া বলিতেন, এমন ঠাণ্ডা, এমন গুণের বধূ তাঁহারা দেখেন তো না-ই, কল্পনাও করিতে পারেন না।

সারাটি দিন বধূ একবার এ শ্বশুর একবার ও শ্বশুর, একবার ও শ্বশ্রূমাতা আরেকবার ও শ্বশ্রূমাতার কাছটিতে বিনীত বশংবদ হইয়া বসিয়া থাকে, ইঁহার ফরমাশ খাটে, উঁহার ফরমাশ খাটে, খাটিতে খাটিতে ছুটিতে ছুটিতে অনেক সময়ে তাহার মুখ রক্তাভ হইয়া উঠে, এবং ঘর্মসিক্ত কপোলে বিন্দু বিন্দু জল দেখা যায়। কিন্তু তাহার মুখের হাসি কেহ মুছিতে পারে না। রাত্রিকালে স্বামী তাঁহার নিত্য-নৈমিত্তিক তর্জনগর্জনের ব্যথা ও অপমান দূর করিয়া দিতে পারেন কি না জানা যায় না। তবে বধূটির একে একে তিনটি পুত্র জন্মিল। শাশুড়িমাতারা বলাবলি করিতে লাগিলেন—'রূপ সুন্দর গুণ সুন্দর দ্যাখো গর্ভও সুন্দর। আমরা কতগুলি কন্যার জন্ম দিয়াছি, বধূমায়ের তিনটিই পুত্র।'

অতঃপর শুরু হইল এই সমৃদ্ধিশালী পরিবারের পতন। বঙ্গবাসীর এরূপই নিয়ম। এক পুরুষ অর্জন করে, পরের পুরুষ তর্জন করে, পরবর্তী পুরুষের জন্য থাকিয়া যায় শুধু চর্বণ। আমাদের এই ছিল, আমাদের তাই ছিল, প্রপিতামহ এই ছিলেন, পিতামহ তাই ছিলেন।

বিনতার বিবাহ-উৎসব হইয়াছিল অন্ততপক্ষে সাতদিন ধরিয়া। ইংলিশ ব্যান্ড, হাউই বাজি, অব্যূঢ়ান্ন, গাত্রহরিদ্রা, স্বতন্ত্র মহিলা নিমন্ত্রণ, পুরুষ নিমন্ত্রণ, সাহেব এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের স্বতন্ত্র আপ্যায়ন—এগুলি তো ছিলই, ইহার উপর আত্মীয় পরিজন কুটুম্ব বন্ধুবান্ধব ও ভৃত্যাদিকে নূতন পোশাক বিতরণ, গৃহখানি আমূল সংস্কার ও নবদম্পতির জন্য নূতন ঘর, ফিটন বিক্রয় করিয়া স্টুডিবেকার ক্রয় ইত্যাদি ইত্যাদি। সপ্তাহব্যাপী সেই বিবাহোৎসবের স্মৃতি শুধু স্বজনদের কাছেই নহে, সমগ্র অঞ্চলটিতে একটি সুখশ্রাব্য রূপকথার ন্যায় বাঁচিয়া রহিল।

বধূ আসিয়া দাঁড়াইলে দুগ্ধও উথলাইয়া ছিল, চতুর্দিকে সুলক্ষণও দৃষ্ট হইয়াছিল, বধূর ভিজা পদপাল্লবদুটিরও ছাপও পড়িয়াছিল পুরাপুরি, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও গৃহের কন্যাগুলির বিবাহ ও তত্ত্ব-তাবাসের অপরিমিত ব্যয়, যে কোনও উৎসব বা পূজা উপলক্ষে দানধ্যান, শেয়ার-বাজারের দালালদের কথায় নির্ভর করিয়া বহুলগ্নি ইত্যাদির ফলে সংসারটি ক্রমে ডুবিতে লাগিল। মহিলারা আর্থিক অবস্থা বুঝিলেন না। পুরুষরা বুঝাইলেন না। বিনতার শ্বশুরগুলি মস্তকের ঘর্মে চরণসিক্ত করিয়া বড় হইয়াছিলেন। নিজেদের জেদে, পরিশ্রমে, অধ্যবসায়ে। তাহারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ কি না বলা যায় না তাঁহাদের কন্যাগুলি, বিশেষত পুত্রটিকে তাঁহারা মাটিতে পা ফেলিতে দিলেন না।

গৃহিণীরা প্রতিবাদ করিলেও কর্তারা বলেন—'আহা, আমরা বড় কষ্টে মানুষ হইয়াছি, আদর কাহাকে বলে, খেলেনা কাহাকে বলে জানি নাই। উহারা যাহা চায়, তাহা দাও।' মাতাগুলি কন্যাদিকে তবু শাসন করেন, তাহাদের তো চৌদ্দ পূর্ণ হইলেই শ্বশুরঘর যাইতে হইবে। কিন্তু পুত্রটি সবার আদরে 'স্পয়েল্ট' হইল। গৃহিণীরা নালিশ

করিলে কর্তারা হাসেন—'আহা, ভগিনীর বেণী কাটিয়া দিয়াছে? পাচকের বাক্স কুয়ায় ফেলিয়াছে? উহা ছেলেদের দুষ্টামি, এখন আমোদ করিবার, উপভোগ করিবার বয়স, শাসন করিও না। সময় আসিলে স—ব ঠিক হইয়া যাইবে।'

সময় আসিল। কিন্তু সব ঠিক হইল না। কন্যাগুলির তো নানা স্থানে বিবাহ হইয়া যাইতেছে। কিন্তু পুত্রটি? কখনও খান সাহেব রাখিয়া সে এস্রাজ বাজাইল, ভাল লাগিল না। ফুটবল খেলিল, হাঁটুতে চোট পাইল—ওরে বাবা! কাব্য লিখিল, রবিবাবুকে পাঠাইল, জবাব আসিল না, শখের নাটকে অনেক পয়সা খরচ করিল, শিশিরবাবু বলিলেন—'কণ্ঠস্বরে ওজন আছে কিন্তু রঞ্জন লাগিবে, আকৃতি ভাল কিন্তু এক্সপ্রেশন নাই, সর্বদা চটিজুতো রগড়াইলে রাজার মতো, পাঠানের মতো চলিবে কী করিয়া? কিছুকাল লেফ্‌ট রাইট অভ্যাস করো।' ডিগ্রির প্রতিও পুত্রটির বড় বিরাগ দেখা গেল। সে তো সেক্ষপীয়র, রবিবাবু, বৈষ্ণব পদাবলী, টি. এইচ হাক্সলি, ব্যাশাম, হেগেল, বালজাক, স্তাঁদাল, বিল্বমঙ্গল, চন্দ্রগুপ্ত, নরনারায়ণ পড়িয়াছে, পড়িতেছে। ডিগ্রির পিছনে ছুটিয়া কী করিবে? সে কি রামা? না শ্যামা? তৎসত্ত্বেও তিন কর্তার বহুস্তরীয় যোগাযোগ কর্মের ব্যবস্থা হইল। কিন্তু কোথাও তাহার সহিত কর্মচারীর মতো ব্যবহার, কোথাও বড় পরিশ্রম, কোথাও প্রবাস, কোথাও বড় দুর্নীতি—এইরূপ বাহানায় ভাল ভাল চাকুরিগুলিতে সে ইস্তফা দিয়া আসিল। গুরুজনে প্রমাদ গণিলেন। অবশেষে পিতৃত্রয় কোনওরূপে কিছু উপার্জনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া রূপসী বধূ ঘরে আনিলেন। আশা—এইবারে সে উদ্যোগী হইবে, পত্নী ও পরিবার প্রতিপালনে সচেষ্ট হইবে। কিন্তু কার্যত দেখা গেল, তাহার দায়িত্ববোধ তো হয়ই নাই। উপরন্তু সে ভারী মজা পাইয়াছে। গৃহে মাতা ও দুই কাকিমাতা মোট তিনটি দাসী ছিল, বিবাহ করিয়া সে আরও একটি সম্পূর্ণ বশীভূত, ভীত ও সর্বক্ষণের দাসী লাভ করিল। নূতন দাসীটি পান হইতে চুন খসিলে তিরস্কার শোনে, ফরমাশ খাটিতে একতলা হইতে তিনতলা পর্যন্ত ছুটাছুটি করে, গাল দিলে অভিমান বা ক্রন্দন করিয়া ভাবাবেগঘটিত সমস্যার পর্যন্ত সৃষ্টি করে না। সুতরাং এই দ্বিতীয় প্রজন্ম আপন রুচিমতো আড্ডা মারিয়া, কাব্যচর্চা করিয়া ও ফুটবলের মাঠে 'গো-ও-ল গো-ও-ল' চিৎকার করিয়া কাটাইতে লাগিল। তাহার পিতা সহসা মারা গেলেন, মাতাও অল্পদিন পর তাঁহাকে অনুসরণ করিলেন। একটি বিরাট উপার্জনের পথ বন্ধ হইল। তৃতীয় পিতৃব্য পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন, আরও একটি বৃহৎ উপার্জন বন্ধ হইল। দ্বিতীয় জন একা সমস্ত দায়-দায়িত্ব পালন করিতে করিতে ক্রমশই অস্থির হইয়া পড়িতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে বিনতার দেবীত্বের আরও একটি অমোঘ প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। তাহার প্রথম সন্তানটি দীর্ঘ রোগভোগের পর ইহলোকের মায়া কাটাইল। রোগভোগ কালে সাহেব ডাক্তার আসিয়া কয়েকবারই দেখিয়া যাইলেন, ঔষধাদি আধুনিক, আশ্বাস দিলেন বালক নিশ্চয় ভাল হইবে। কিন্তু বাটীর দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য কবিরাজি। সাহেব ডাক্তার শুধু রোগীর অবস্থা নির্ণয়ের জন্য। তাঁহার ঔষধাদি ফেলিয়া দেওয়া হইতেছে। ডাক্তার যে পথ্য বলিয়া দিতেছেন তাহাও দেওয়া হইতেছে। কবিরাজের

অনুপান-সহপানও চলিতেছে। এমত অবস্থায় বিনতার মাতা বলিলেন—'করিতেছিস কী? এখনও মুখ খোল। ছেলেটির যে নাভিশ্বাস উঠিল!' বিনতা বলিলেন—'মা আমি তো কখনও ইঁহাদের উপর কথা কহি নাই। ইঁহারা নিশ্চয় ভাল বুঝিতেছেন বলিয়াই এরূপ করিতেছেন।'

'তুই তো মূর্খ নোস বিনো'—মা পরম খেদে বলিলেন—'ম্যাট্রিকুলেশনে জলপানি পাইলি...'

বালকটি মারা গেল। পরিবারের উপর এরূপ বিপর্যয় নামিয়া আসিতে পারে কেহ কল্পনাও করে নাই। বংশের অনেক আদরের প্রথম পৌত্র। আহা এই সেদিনও যে সে বল এবং জুতা লইয়া খেলিয়া বেড়াইতেছিল। এই সেদিনও কালোজাম খাইয়াছে। মায়ের মতো দেবকান্তি বালকটি। মিষ্টভাষী। তাহার দুষ্টামিও কত মিষ্ট ছিল। চোখের জল আর কাহারও থামিতে চাহে না। সেই সময়ে কাঁদিতে কাঁদিতে বালকের দিদিমা বলিলেন—'আপনারা তো চিকিৎসার নামে চিকিৎসা-বিভ্রাট করিলেন, বিনোকে তো আমি কত করিয়া বলিয়াছিলাম এরূপ দু নৌকোয় পা দেওয়াতে আপত্তি করিতে, কিন্তু সে বলিল বড়দের সিদ্ধান্তের উপর কথা বলা তাহার অভ্যাস নাই। আপনাদের দোষেই নাতিটি গেল।'

এত শোকের মধ্যেও সমস্ত পরিবারটি অভিভূত, চমৎকৃত হইয়া রহিল। এরূপ বাধ্যতা, বিনয়, ত্যাগ...ইহা কি কল্পনা করা যায়। শ্বশুরগুলি বিদ্বান ছিলেন। একজন বলিলেন—বাইবেলে বর্ণিত আব্রাহাম কর্তৃক আইজাকের বলির ঘটনার সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য। ছোট কর্তা বলিলেন একই কাহিনী ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ইসলামেও আছে। পুত্র ইসমায়েলকে সেখানে পিতা ইব্রাহিম বলি দিতে উদ্যত হন। ইহাই পবিত্র ইদুজ্জোহা বা বকরীদ নামে মুসলমানদের অবশ্যপালনীয় বার্ষিক উৎসব। এ স্থলে এই শোকের মধ্যেও বধূর আত্মত্যাগে তাঁহারা স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তাঁহারা নিজেরাই কি বধূর কাছে যেহোভা বা আল্লাহর স্থলাভিষিক্ত? ঘটনাটি পারিবারিক ইতিহাসে দৃষ্টান্তস্বরূপ রহিয়া গেল।

বধূর অনেক গহনা। সে পরিত না। অনেক শাড়ি ও জ্যাকেট, তাহাও সকলই সযত্নে আলমারিতে তোলা রহিয়াছে। ননদগুলি কি অন্য কেহ যখন যাহা চায় সে তৎক্ষণাৎ তাহা দিয়া দেয়। বধূর দেবীত্বের ইহাও কি একটি প্রমাণ নহে? তাহার দানশীলতা ও আত্মত্যাগের কথা যতই লোকমুখে প্রচারিত হয়, ততই তাহা বাড়িয়া যায়।

এদিকে দুই পুত্র ভুলু ও কালু বড় হইয়া উঠিতেছে। ভুলু-কালুর পিতার স্নেহেরও একটি অদ্ভুত লজিক আছে। জ্যেষ্ঠ লালুটি প্রথম বলিয়াই হউক, দেবকান্তি বলিয়াই হউক, তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। সে চলিয়া যাওয়াতে তিনি ভিতরে ভিতরে মর্মাহত হইলেন। স্ত্রীর সহিত একাঙ্গে তাঁহার কী বাক্যবিনিময় হইল কেহ জানিল না। তিনি তাঁহাদের উভয়ের জন্য প্রস্তুত ঘরখানিতে এখন হইতে একলা থাকিতে লাগিলেন। দুই বালকপুত্র ও ছোট ননদটির সহিত স্ত্রীর স্থান হইল পাশের ঘরে। আলমারি, ড্রেসিং টেবিল, ছবি ইত্যাদি যাহাই তাঁহার অতিরিক্ত মনে হইল পাঠাইয়া

দিলেন স্ত্রীর কক্ষে। ঘরটা গুদামসদৃশ হইল। ছোট ননদ বিস্তর আপত্তি করিল, কেহ শুনিল না। অপরপক্ষে তাঁহার বৃহৎ কক্ষখানি অল্প কয়েকটি রুচিসম্মত আসবাব, নন্দলাল বসুর ছবি, পিত্তলের বুদ্ধমূর্তি, চিনামাটির ফুলদানি, জয়পুরি ট্রে ইত্যাদিতে সজ্জিত হইয়া গৃহের সর্বোত্তম কক্ষ হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। রাত্রি সাড়ে নয়টা হইতে সকাল সাড়ে নয়টা পর্যন্ত ইহার মালিক ইহা অধিকার করিয়া থাকেন। অন্য সময়ে ঘরটি খালি পড়িয়া থাকে, কিন্তু সেখানে কাহারও ঢুকিবার হুকুম নাই। স্ত্রী ঘরটি স্বহস্তে মার্জনা করিয়া থাকেন, দাসদাসীরা ঢোকে না। কোথাও কোনও ত্রুটি হইলে অর্থাৎ টেবিলে ধূলিকণা, বালিশের স্থাপনা সমান ইত্যাদি না হইলে বিনতাকে পরুষবাক্য শুনিতে হয়। কিন্তু তিনি দেবী, স্মিতাস্যে সকলই সহিয়া যান। স্মিতাস্য হইবারও অবশ্য একটা বিপদ আছে। স্বামী বলেন—'হাসিতেছ? আবার হাসিতেছ?'

লালু মারা যাওয়ায় দাদু-ঠাকুমা-পিসিমা প্রভৃতিদের স্নেহ ভুলু কালুর উপর যেমন শতধারে ঝরিতে লাগিল, ঠিক তেমনই অনুপাতে তাহাদের পিতার শাসন বাড়িয়া উঠিল। ইহা একটি অদ্ভুত লজিক। লালু, প্রিয় পুত্রটিকে ঈশ্বর লইয়াছেন অতএব ভুলু-কালুকে শাসন লাঞ্ছনা গঞ্জনা শাস্তি যন্ত্রণা দিয়া তিনি যে কাহার উপর শোধ তুলিতেছেন বোঝা গেল না। তাহারা খেলিতে পারিবে না, বুলবুল ভাজা খাইতে পারিবে না, সমবয়সী বন্ধুদের সহিত মিশিতে পারিবে না। পিতা সকাল-সকাল বাহির হইয়া যান এবং রাত্রে ফেরেন, এই যা রক্ষা। না হইলে তাহারাও অচিরেই দাদা লালুকে অনুসরণ করিত।

রবিবারগুলিতে পিতা গৃহে থাকেন এবং তাহাদের জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তোলেন। খেলিবার বল উঠান হইতে শট খাইয়া পিতার কক্ষে লাফাইয়া প্রবেশ করে, পিতা ডাকিয়া পাঠান। কোনও একটি কক্ষের চৌকির তলা হইতে তাহাদের গর্তের ইন্দুরের ন্যায় টানিয়া বাহির করা হয়, পিতার সম্মুখে আসিতে আসিতেই ভুলুর প্যান্ট ভিজিয়া যায়, কালুর কানে এমন একটি প্যাঁচ পড়ে যে সে ভবিষ্যতে ওই কানটিতে শুনিতে পাইবে কি না তাহা দাদু-ঠাকুমারা জল্পনাকল্পনা করেন। যে স্কুল-কালেজি পড়াশুনো তিনি নিজের বাল্যে ও কৈশোরে একেবারেই অবহেলা করিয়া পার পাইয়াছিলেন, সেই পড়াশুনাতেই তিনি তাহাদের সারা দিন নিযুক্ত থাকিতে বলেন। পিতৃব্য-দাদু গৃহশিক্ষকের ব্যবস্থা করেন, মাতা ঘুরিতে ফিরিতে 'ভুলু হাতের লেখা অভ্যাস করো', 'কালু আঁক কষো' বলেন বটে কিন্তু তাঁহার সময় কই? শাশুড়িদ্বয়, পক্ষঘাতগ্রস্ত শ্বশুরটি এবং অগ্নিশর্মা স্বামীটির সেবা করিতে করিতে তাঁহার দিন চলিয়া যায়। তাঁহার পুত্র দুটি দাদু-ঠাকুমাদের পাইলেও তাঁহাকে বড় পায় না। সুতরাং তাহাদের যাহা ইচ্ছা পড়ে, যাহা ইচ্ছা করে, লুকাইয়া চুরাইয়া।

আরেকটি সমস্যা হইল ছোট কর্তার কন্যাটিকে লইয়া। তাহার বিবাহের বয়স হইয়াছে। সে ম্যাট্রিকুলেশন পাস দিয়াছে। অথচ কী সর্বনাশ, সে বিবাহ করিতে চায় না, আরও পড়িতে চায়। বাংলাতে ও অঙ্কে লেটার পাইয়া তাহার জিদ আরও বাড়িয়া গিয়াছে। তাহার উপর মেয়েটি যাহার তাহার সহিত মেশে, পাড়ার জগন্নাথদা অর্থাৎ গাঁজাখোর (?) বেকার যুবকটি তাহার গালগল্পের সঙ্গী। সে চেঁচাইয়া কথা বলে,

ততোধিক চ্যাঁচাইয়া হাসে...এবং সুবিধা পাইলেই ছাদে বা বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকে। তাহার এই অত্যধিক বারান্দা-প্রীতি তাহার দাদা অর্থাৎ বিনতার স্বামীর মনে বিভীষিকা সঞ্চার করিল। চক্ষু বুজিলেই তিনি দেখিতে পান তাঁহার লেটার-প্রাপ্ত ভগ্নী বারান্দা অবলম্বন করিয়া একটি প্রেম করিয়াছে, এবং সেই প্রেমিকের সহিত পলাইয়া যাইতেছে। পরিবারের মুখমণ্ডলে কালি লিপ্ত করা আর কাহাকে বলে।

একদিন তিনি চুপিচুপি, মার্জারের মতো নিঃশব্দে, কিছু একটা পাঠে নিমগ্ন ভগ্নীর পিছনে গিয়া দাঁড়াইলেন। সে রবীন্দ্র রচনাবলীর খণ্ডের ভাঁজে একটি পত্র রাখিয়া মনোযোগ দিয়া পড়িতেছে। বজ্রগম্ভীর স্বরে দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন—'টুনি, কী পড়িতেছ?' টুনি তৎক্ষণাৎ বইটি বন্ধ করিয়া দিল। দাদার সহিত অতঃপর ভগ্নীর ধস্তাধস্তি আরম্ভ হইল, ভগ্নীও 'প্রেমপত্র'টি দিবে না, দাদাও সেটি না লইয়া ছাড়িবেন না। অবশেষে পত্র হস্তগত হইল, দেখা গেল পত্রটি লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সম্প্রতি প্রবাসীর পাতায় ইঁহার 'পথের পাঁচালী' নামে একটি নবেল বার হইতেছে। টুনি তাঁহার লেখায় মুগ্ধ হইয়া দাদা সম্বোধন করিয়া তাঁহাকে একটি পত্র দিয়াছিল, এটি তাহারই উত্তর। বিভূতিভূষণ 'ইতি তোমার বিভূতিদাদা', বলিয়া পত্র শেষ করিয়াছেন। ইহার পর টুনির বহু আপত্তি, ক্রন্দন ইত্যাদি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া তাহার বিবাহ দেওয়া হইল। তাহার দাদা জলদের ন্যায় স্বরে বলিলেন—শ্বশুর গৃহ হইতে টুনি যত খুশি লেখক-সাহিত্যিকের সহিত রাখিবন্ধন করুন, তিনি এ ঝুঁকি লইতে পারিবেন না।

টুনির একমাত্র ভরসাস্থল ছিল তাহার বউদিদি। সে বউদিদিকে বলিল—'তুমি বিবাহ বন্ধ করো বউদিদি, আমি এম এ পাশ করিব, প্রোফেসর হইব, লিখিব। মহিলা বিভূতিভূষণ হইতে পারি না, অন্ততপক্ষে স্বর্ণকুমারী তো হইব। তুমি দাদাকে বলো।'

বিনতার অস্পষ্ট স্মরণ হইল তিনিও ম্যাট্রিকুলেশনে জলপানি পাইয়াছিলেন, কিন্তু পিতা-মাতা কেহ তাঁহার কালেজি শিক্ষার ব্যাপারে কর্ণপাত করেন নাই। কেন করেন নাই? কালেজি শিক্ষা নারীদের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া, আবার কী? যাঁহারা ক্রিশ্চান, মেমভাবাপন্ন বা ব্রাহ্মভাবাপন্ন, যাঁহারা ইংরাজদিগকে উঠিতে বসিতে অন্ধ অনুকরণ করেন তাঁহারাই গৃহের নারীদের বেথুন কলেজে পাঠান। তিনি মধুর হাসিয়া বলিলেন—গুরুজনদের কথা অমান্য করিতে নাই। তাঁহারা যাহা করেন ভালর জন্যই করেন।'

—'ভাল? তোমার কী ভাল হইয়াছে বউদিদি? খালি খাটিতেছ আর গাল খাইতেছ?'

বিনতা বুঝিলেন টুনিটা সত্যই ব্যাপিকা। তাঁহার স্বামী ইহা অহরহ বলিয়া থাকেন। তিনি বলিলেন, 'আমার গোলাপি রং-এর বারাণসীটি এখনও পরি নাই তোমাকে দিব, জ্যাকেটসহ, বোগদাদ মুক্তার সেটটিও। আর কী কী লইবে বলো?'

টুনি বলিল—'ধ্যাত্তেরিকা বারাণসী। নিকুচি করিয়াছে মুক্তার।' বিনতা আবারও বুঝিলেন পতি গুরুজন, যাহা বলেন, ঠিক বলেন। টুনি ব্যাপিকা।

অতএব বহুবিধ শাটি ও অলঙ্কারসমেত, বউদিদির গোলাপি বারাণসী, বোগদাদি

মুক্তার সেটসহ, বিচিত্র দানসামগ্রী আসবাব সঙ্গে করিয়া টুনিরানি সংসার-সাগরে ভাসিয়া গেল। তাহার বাংলা অঙ্কের লেটার, প্রোফেসর হইবার সাধ এবং বিভূতিভূষণের চিঠিটিও সঙ্গে গেল। বলা বাহুল্য, সংসার সমুদ্রের তরঙ্গাভিঘাতে এগুলি সে রক্ষা করিতে পারে নাই।

অনীতা

ছায়া পশ্চিমগামিনী। আর দুই এক প্রহরের মধ্যেই পূর্বদিগন্তে লজ্জার অরুণাভা ছড়াইয়া সূর্যোদয় হইবে। কিন্তু এখনও পৃথিবী নিদ্রামগ্না। যাঁহারা সূর্যোদয়ের পূর্বে শয্যাত্যাগে অভ্যস্ত তাঁহারা অবশ্য পক্ষিকুলকে লজ্জা দিয়া স্তোত্র উচ্চারণপূর্বক কেহ গঙ্গা অভিমুখে যাইতেছেন, কেহ আবার স্বগৃহেই কর্পোরেশনপ্রদত্ত প্রাতঃকালীন জলে অঙ্গমার্জনা করিয়া স্নান করিতেছেন।

একটি গৃহ কেবল শোকমগ্ন। গৃহের কর্তাটি কালি রাত্রে সহসা সন্ন্যাস রোগে ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। সন্তান-সন্ততিগুলি কেহ সাবালক, কেহ নাবালক। তৃতীয়া কন্যাটি শোকের ক্রন্দনে ক্লান্ত হইয়া একসময়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া ছিল। সে সহসা দেখিল তুমুল বাত্যাতাড়িত সমুদ্র। সিন্ধুতরঙ্গ তাহার দিকে ধাবিত হইতেছে। সে দিশাহারার মতো পলাইতেছে। সহসা তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল আকাশাভিমুখে নীল শার্ট পরিহিত একটি আবক্ষ তরুণ মূর্তিতে। মূর্তিটি সরল, সুকান্তি, কিছু কাতর, যেন ভাষায় না হইলেও ভাবে বলিতেছে—'আইস, আইস, আমাকে বাঁচাও,' গদগদ কণ্ঠে কন্যাটি কহিল—'আসিতেছি, আসিতেছি, ভয় করিও না।' তৎক্ষণাৎ তাহার কণ্ঠের উপর কণ্ঠ তুলিয়া একটি গভীর স্বর বলিল—'যাইও না বৎসে, যাইও না।'

কন্যা বলিল—'কেন না যাইব? তরঙ্গে তরঙ্গে ওই দিব্যকান্তি তরুণ যে ডুবিয়া যায়।'

স্বর বলিল—'কী চাহ জীবনে? সম্পদ-স্বাচ্ছন্দ্য-সুখ না ওই তরুণের বিপদ হইতে উদ্ধার?'

কন্যা দ্বিধামাত্র না করিয়া বলিল—'অবশ্যই আর্তের উদ্ধার।'

স্বর কহিল—'কী চাহ? সুখ না প্রণয়?'

কন্যা নির্দ্বিধ কণ্ঠে বলিল—'অবশ্যই প্রণয়।'

দৈববাণী কহিল—'তাহা হইলে মরো।'

কন্যার তন্দ্রাভঙ্গ হইল। গৃহে বহু আত্মীয়। ক্রন্দনোচ্ছ্বাস নূতন করিয়া আরম্ভ হইয়াছে। শবদেহ সৎকারের ব্যবস্থাগুলি হইতেছে। কন্যাটি অর্থাৎ অনীতা চতুর্দিক দেখিয়া তাহার সদ্য-দৃষ্ট স্বপ্নটি স্মরণ করিল, তাহার পর ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

পিতার অপ্রত্যাশিত মৃত্যুতে সমগ্র পরিবারটি এরূপ সংগ্রামে লিপ্ত হইল যে তাহাদের শোক করিবার সময় রহিল না। কেহ টুইশানি করিয়া, কেহ ভাড়াটে ফুটবল খেলিয়া, কেহ জলপানি পাইয়া সংসার তরণীটিকে কোনও মতে ভাসাইয়া রাখে এবং

প্রাণপণে দাঁড়াইবার চেষ্টা করিয়া যায়।

পরিশ্রম, কর্ম, শিক্ষাপ্রীতি ও কর্তব্যবোধের সামগ্রিক ফলস্বরূপ সংসারটি দিব্য দাঁড়াইয়া গেল। ক্রমে তাহারা যে বাড়িটিতে ভাড়া থাকিত সেটি কিনিয়া লইল, পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্র একটি সেকেন্ড হ্যান্ড অস্টিন কিনিল, বাটীতে অতিথি-অভ্যাগত কুটুম্বাদির আপ্যায়ন এমনকী অফিসস্থ সাহেব-আপ্যায়নও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতে লাগিল। জননীটির বিনয়, বুদ্ধি, সংযম, সেবা, মিতব্যয়িতা প্রভৃতি গুণাবলির সমবায়ে পরিবারটি সুসংগঠিত হইল।

তৃতীয়া কন্যা অনীতার কতকগুলি জিদ আছে। যাহা ধরে তাহা ছাড়ে না। নিজের পড়ার সময় কাটিয়া সে গৃহের বালক দাসটিকে বর্ণ-পরিচয় করায়। সে যে পিতৃহীন এবং সংসারটিকে গুছাইতে যে তাহার জ্যেষ্ঠদের প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে, তাহা সে বিলক্ষণ বোঝে। সুতরাং তাহার কোনও দাবি নাই, আবদার নাই। পিতা থাকাকালীন সে যে সমস্ত বালিকাসুলভ আবদার করিত, না পাইলে কাঁদিতে বসিত, সে সকল অভ্যাস তাহার দূর হইয়া গেল। দাদারা গৃহশিক্ষক দিতে চাহিলে সে না করে, মূল্যবান পুস্তকগুলি যথাসাধ্য কাপি করিয়া কাজ চালায়। সে অন্যায় দেখিতে পারে না, প্রতিবাদ করে। পড়া দেখিয়া লইবার জন্য সে একবার এ ভ্রাতা একবার ও ভগ্নীর কাছে যায়, গান শিখিবার জন্য পাশের বাড়ির অর্গ্যান ও সম্মুখের বাড়ির সংগীত শিক্ষকের সাহায্য লয়। অর্থাৎ প্রতিবেশিনী বান্ধবী যখন সংগীত শিক্ষা করে সে নীরবে বসিয়া থাকে। এই ভাবে কালেজি শিক্ষায় ও সংগীতে তাহার কিছু পারদর্শিতা জন্মিল।

কালেজ পার হইয়া অনীতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিল। গুটিকয় তরুণী অধ্যাপকের পিছনে পিছনে ক্লাসে যায় আবার পিছনে পিছনে ফিরিয়া আসে। তাহা সত্ত্বেও এক দিন অনীতা একটি তরুণের সহিত মুখোমুখি হইয়া গেল। কবি কি আর শুধু শুধু লিখিয়াছিলেন—'তোমার চোখে দেখেছিলেম আমার সর্বনাশ।' সন্দেহ নাই কবিরও কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল। কিন্তু তরুণটিকে তাহার কেমন পরিচিত লাগিল। যেন বহুকালের চেনা, কোথায় যেন দেখিয়াছে। প্রণয়ে অবশ্য এরূপ হইয়া থাকেই। উপরন্তু দেখা গেল—ধ্যানধারণা, আদর্শ, রুচি প্রভৃতি সবেতেই উভয়ের অপূর্ব মিল। প্রণয়ে এরূপও অবশ্যই হইয়া থাকে। কিন্তু প্রণয়তরণী বাহিরে অভিঘাতে টালমাটাল হইল। দেখা গেল তরুণটি প্রেমবলে বলীয়ান হইয়া কবিতাই লিখিতেছে, কবিতাই লিখিতেছে, ক্রিকেটই খেলিতেছে, ক্রিকেটই খেলিতেছে, লেখাপড়া ছাড়িয়া দিতেছে। কোনওটিই আন্তরিকভাবে করিতেছে না। অনীতা এদিকে এম এ উপাধি অর্জন করিয়া নিজ কালেজেই অধ্যাপনা করিতে শুরু করিয়াছে। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিটি পাইল বলিয়া।

অনীতার গৃহে জ্যেষ্ঠরা এমত সময়ে একটি পাত্র স্থির করিয়া ফেলিলেন—উচ্চশিক্ষিত, স্বাস্থ্যবান, বিত্ত অত্যধিকও নাই আবার অল্পও নাই, বিদ্যার কিছু ঐতিহ্যও আছে। সংবাদটি কর্ণগোচর হইলে অনীতা দৃঢ় কণ্ঠে জানাইয়া দিল এ বিবাহ সে করিবে না। সে ভুলুকে বিবাহ করিবে।

ভুলু! ভোলানাথ। তাহাকে কী করিয়া জামাতা করা যায় কেহই ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিলেন না। ভুলুর মতি স্থির নাই, তাহার কর্ম-সর্ম নির্ভরযোগ্য নয়। তাহার সপক্ষে কী বলিবার আছে জানিতে চাহিলে অনীতা জানাইল, ভুলুর বংশগৌরবের কথা। দাদারা কহিলেন—'সে তো অতীত, তুমি তো আর অতীতের সহিত ঘর করিবে না।' তখন অনীতা জানাইল ভুলুর ন্যায় ভদ্র, সৎ, পূত-চরিত্র যুবক ইদানীং দৃষ্ট হয় না। তাহার প্রতিভাও আছে। একদিন না একদিন তাহা ফুটিয়া বাহির হইবেই।

অনিশ্চিত প্রতিভা অনিশ্চিত ভবিষ্যতে ফুটিয়া বাহির হওয়ার আশ্বাস কাহারও মনে ধরিল না।

ওদিকে ভুলুর গৃহেও যখন অনীতাকে বধূ করিবার প্রশ্ন উঠিল, সকলে হায়, হায় করিয়া উঠিল। এম এ পাশ দিয়াছে, কালেজে অধ্যাপনা করে সে কি আর নারী আছে! হায়, তাঁহাদের ভুলু বুঝি কোনও 'মেয়েমর্দ'র কবলে পড়িল, বয়সেরও নিশ্চয় বৃক্ষ-প্রস্তর নাই। দেখিতে অতি সাধারণ, শ্যামবর্ণা। হায়, গৌরবর্ণের যে ঐতিহ্যটি তাঁহাদের বিনতার কল্যাণে গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা ধূলিসাৎ হইল। কিন্তু ভুলুও অটল।

যে কথাটি ভুলু কাহাকেও বলিতে পারিল না, তাহা হইতেছে অনীতার মধ্যে সে একটি নির্ভরযোগ্য বন্ধু পাইয়াছে। অনেকটা আরাম-কেদারার ন্যায়। সে ধনীগৃহের আদরের দুলাল, বাহিরের পৃথিবী তাহার কাছে যেন যুদ্ধোন্মত্ত রাক্ষসকুল, অনীতাটি তাহার রাম-লক্ষ্মণ।

অপর পক্ষে অনীতা যে কথাটি নিজেও জানিল না, তাহা হইতেছে—ভুলুর মধ্যে সে একটি বিভ্রান্ত আত্মাকে দেখিয়াছিল। যে তাহার পরিবারে তৃপ্তি পায় না। বন্ধুবর্গের সহিত শুধু কালক্ষেপ করে উপরন্তু জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নানাবিধ মহামানবের দর্শন তাহার মস্তিষ্কে এ প্রকার খিচুড়ি পাকাইয়া গিয়াছে যে তাহা হইতে ব্যবহারিক জীবনে চলিবার কূৎ-কৌশলগুলিকে সে স্বতন্ত্রিত করিতে পারে না। অনীতা না থাকিলে ভুলুর কী হইবে? ভুলু যদি ভাঙা-হাল ছেঁড়া-পাল তরণী তো অনীতা তাহাকে হাল দিবে, পাল দিবে। তাহার পর ভুলু-তরণী ঠিকই তাহার দাঁড়গুলি খুঁজিয়া বাহির করিয়া সংসার মহানদীতে ভাসিবার ছন্দটি ফিরিয়া পাইবে। ইহা প্রকৃতপক্ষে সংস্কারক, সংগঠকের মনোভাব, এবং ইহাই সম্ভবত অনীতার মধ্যে প্রবল। অহো, প্রণয়ের যে কতরূপ ভিত্তিই থাকে!

পরিবার দুটির সম্মতি ব্যতীতই দু জনে বিবাহ করিল। অনীতা পরিবার কর্তৃক পরিত্যক্তা হইল। কিন্তু ভুলুর উদারহৃদয় পিতামহ স্বয়মাগতা পৌত্রবধূটিকে শেষ পর্যন্ত স্বীকার করিলেন।

বলিতে ভুলিয়াছি, যেদিন তাহারা রেজিস্ট্রি করিতে যাইবে, তাহার পূর্ব দিন অনীতা তাহার সেই স্বপ্নটি আরেকবার দেখিল। এবং এবার তরুণকে চিনিতে পারিল। সে ভুলু। এবার স্বপ্নে 'তাহা হইলে মরো' বলিয়া কেহ তাহাকে অভিশাপ দিল না, শুধু মহাসিন্ধুর এপার হইতে ওপার পর্যন্ত জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে একটি অবর্ণনীয় বিষাদের দীর্ঘনিশ্বাস, একটি শব্দহীন ক্রন্দন পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল। আবক্ষ

নিমজ্জিত ভুলুকে যখন অনীতা তাহার স্বপ্নের তরীতে টানিয়া তুলিল, তখন পরিশ্রমে তাহার প্রাণ যায় যায়, ভুলু শবদেহের মতো পড়িয়া আছে। চরাচরব্যাপী ক্রন্দন এবং নভোমণ্ডলব্যাপী জলদের যমসদৃশ ভ্রুকুটি ও ক্ষিপ্ত হুঙ্কারের মধ্য দিয়া অনীতা শ্রমক্লান্ত দেহে তরণী চালনা করিতে লাগিল। বৃষ্টিধারার সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া অবিরল ঘর্মধারা বহিতেছে, শ্বাস প্রায় বন্ধ হইয়া যায়, হস্ত হইতে দাঁড় স্খলিত হইয়া পড়ে, কিন্তু সে কিছুতেই ছাড়িবে না, এই তাহার অনমনীয় জিদ। আকাশবাণী হইতে লাগিল বজ্রহুঙ্কারের মধ্য দিয়া—'এখনও ছাড়িয়া দাও। ধনরত্ন যাহা চাও দিব, মানযশ কিছুই তোমার অলভ্য থাকিবে না, শুধু উহাকে ছাড়িয়া দাও,' তখনও অনীতা প্রাণপণে তরী বাহিয়া যাইতেছে। কিছুই বলিতেছে না, বলিবার শক্তি নাই। শুধু মনে মনে উচ্চারণ করিতেছে।

—'ছাড়িব না, ছাড়িব না, ছাড়িব না।'

—'তাহা হইলে কী চাও?'

অনীতা এখনও রুদ্ধশ্বাস, কিন্তু তাহার মধ্য হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল—'এই মুমূর্ষু দেহে প্রাণ সঞ্চার করো, আমার শ্বশুর তাঁহার হৃত রাজ্যপাট ফিরিয়া পান, সংসার ও ধরণী শস্যশ্যামলা হউক, শ্বশ্রূ চক্ষুষ্মতী হউন, প্রাণিসকল সুখী হউক, বৃক্ষলতা ফলবতী হউক, ভুবন শান্তিময় হউক...।'

পুরাণকাহিনীর মতো কেহ 'তথাস্তু' বলিল না। শুধু শেষ বজ্রহুঙ্কারটি যেন কাহার উদ্দেশে 'দয়ধ্বম' বলিয়া নীরব হইয়া গেল।

এই স্থলে আমাদের প্রথম অধ্যায়ের সেই সংক্ষিপ্ত বাক্যটি স্মরণ করিতে হইবে। বিনতা দেবী ঠিক ততদিনই দেবী ছিলেন যতদিন গৃহে অনীতার আগমন হয় নাই। শুধু একবার স্মরণ করিয়া বাক্যটিকে স্মৃতির পশ্চাতের কুঠুরিতে পাঠাইয়া দিলেও আপত্তি নাই।

অনীতা সদ্য তাহার স্নেহময়ী জননীকে দুঃখিত করতঃ ছাড়িয়া আসিয়াছে। সে প্রৌঢ়া বিনতাকে যথার্থই মাতা বলিয়া গ্রহণ করিল। করিতে কোনও অসুবিধাই হইল না। প্রথমত বিনতা মৃদুভাষিণী, সদাহাসিনী, দ্বিতীয়ত তাঁহার সুন্দর মুখমণ্ডল বড় শ্রদ্ধা-উদ্দীপক। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাহার অত্যন্ত অস্বস্তিকর একটি উপলব্ধি হইল। তাহার শ্বশ্রূমাতা যেন আজিও মাতা হইতে পারেন নাই, বধূটিই রহিয়াছেন। তিনি অবগুণ্ঠনে নিজের অনিন্দ্য মুখশ্রী অর্ধেক ঢাকিয়া খালি আজ্ঞা পালন করিয়া বেড়ান। পক্ষাঘাতগ্রস্ত শ্বশুরটির আজ্ঞা, বৃদ্ধা শাশুড়ির আজ্ঞা, স্বামীর আজ্ঞা, পুত্রদের আজ্ঞা। সে আরও অস্বস্তি ও বিষাদের সহিত আবিষ্কার করিল শ্বশ্রূমাতা যে শুধু বধূটি হইয়া আছেন, তাহাই নহে, তিনি দাসীও হইয়া আছেন। সেই যে বাঙালি বিবাহে নিয়ম আছে বধূ আসিলে মাতা জিজ্ঞাসা করেন—'বৎস কী আনিয়াছ?' উত্তরে পুত্র বলে 'তোমার দাসী আনিয়াছি।' বিবাহ-বিধি-অন্তর্গত এই লজ্জাকর বাক্যটি বিনতা দেবীর ক্ষেত্রে সর্বাংশে প্রযোজ্য। তাহার অর্থ অবশ্য এ নহে যে বিনতাকে কেহ ভালবাসে না। সকলেই ভালবাসে এবং দেবীপ্রতিম বলিয়া তাঁহার প্রশংসা করে। কিন্তু বাক্যে ও ব্যবহারে সামঞ্জস্য কই?

এখনি ইহার প্রমাণ উপস্থিত করিতেছি।

প্রাতঃকালে অনীতাকে দুই পিতামহ ও শ্বশুরের সহিত চা পান ও জলযোগ করিতে হয়। সে ইহার পছন্দ করে না। দাদাশ্বশুর ও শ্বশুরের সমুখে আধ-ঘোমটা দিয়া আড়ষ্টভাবে চা পান! কিন্তু মুখ ফুটিয়া এ কথা বলা শক্ত। প্রাতরাশ বিনতা দেবী একটি একটি করিয়া আনিয়া সবার সম্মুখে রাখেন, তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য উঠিতে গেলেই শ্বশুর হুঙ্কার দিয়া উঠেন—'তুই বোস।' ভয়ে ও অস্বস্তিতে কাঁটা হইয়া অনীতা বসিয়া পড়ে। শ্বশুর ও দাদাশ্বশুর (পক্ষাঘাতগ্রস্তজন অবশ্য এখন আর সুস্থ-মস্তিষ্কও নাই) দুটির ইচ্ছা বিদুষী বধূটির সহিত গল্পাগাছা করেন। তাঁহারা পরম প্রীত হন। ফরমায়েশ করিয়া পছন্দমতো গানগুলিও তাঁহারা শুনিয়া লন। অনীতাকে গাহিতে বলিলেই সে গায়। গান শেষ হইলে সে উচ্ছিষ্ট বাসন তুলিতে যায়, শ্বশুর হুঙ্কার দিয়া বলেন—'তুই বোস্।' দাদাশ্বশুর ডাকিতে থাকেন—'বিনো। বিনো।'

বিনতা সম্ভবত দোতলায় কোনও কৃত্যে গিয়াছিলেন, আসিতে দেরি হয়, অবশেষে আসিলে তাঁহার স্বামী পরুষকণ্ঠে বলেন—'কোথায় থাকো, ডাকিলে সাড়া পাওয়া যায় না।' বিনতার শ্বশুর বলেন—'এঁটোগুলি তুলিয়া লইয়া যা।' অনীতা শশব্যস্ত হইয়া নিজের উচ্ছিষ্ট বাসন লইয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। এমন অনাসৃষ্টি কাণ্ড সে জীবনে দেখে নাই। ততক্ষণে বিনতা দেবী বাকি বাসনগুলি তুলিয়া লইয়াছেন। অনীতা কোনওক্রমেই উঁহাকে তাহার বাসনে হাত দিতে দেয় না। বিভিন্ন চৌপাইতে উচ্ছিষ্ট বাসন রাখিবার স্থানগুলিও সে তাড়াতাড়ি নেতা দিয়া মুছিয়া দেয়। কিন্তু এই অনুষ্ঠান প্রতিদিন পুনরাবৃত্ত হয়। উচ্চস্তরের আলোচনা করিতে করিতে চা-পান, অনীতা উঠিতে গেলেই—'তুই বোস।' এবং তাহার পরই 'বিনো বিনো। উচ্ছিষ্ট বাসনগুলি তুলিয়া লইয়া যা।'

দেবীর সহিত কি কেহ এ রূপ ব্যবহার করে?

যতদিন তাহার নূতন বধূত্ব না যায় অনীতা এগুলি সহ্য করিল। তাহার পর সে প্রাতঃকালে প্রথমেই রন্ধনশালে যায় এবং রাঁধুনির সহিত প্রাতরাশগুলি প্রস্তুত করিয়া ফেলে। দিদিশাশুড়ি ও শাশুড়ির রাখিয়া, স্বামী ও দেবরের ঢাকিয়া, একটি কাঁসার বগিথালায় সে-ই দুই দাদাশ্বশুর ও শ্বশুরের প্রাতরাশ বহিয়া লইয়া যায়। শেষ হইলে—'বিনো' ডাক উঠিবার পূর্বেই একপ্রকার চিলের মতো ছোঁ মারিয়া এঁটো বাসন তুলিয়া লয়। অনীতার খেলাধুলার অভ্যাস এই কাজে তাহার বিশেষ সহায়ক হইয়া দাঁড়াইল। তাহার পর, কালেজ যাইবার পূর্ব পর্যন্ত তাহার ডিউটি দিদি শাশুড়িটিকে সঙ্গ দেওয়া। বড় দুই জন এখন গত। তৃতীয়া রাতে কষ্ট পান, নাতি-বধূর সঙ্গ এবং গান তাঁহাকেও বশীভূত করিয়া ফেলিল, তিনি একদিন মতপ্রকাশ করিলেন নারীর আসল রূপ তাহার বুদ্ধিতে, তাহার হৃদয়ে। এবং তাঁহার নাতি-বধূ অনীতা তাঁহাদের পুত্রবধূ হইতেও ভাল। এই সময়ে দুর্ভাগিনী বিনো খুড়ি-শাশুড়ির পান ছেঁচিতেছিলেন। অনীতা লজ্জায় অধোবদন হইয়া এই তুলনা শুনিল। কী বলিবে ভাবিয়া পাইল না। তাহার পর মরমে মরিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সকালে সে কালেজে পড়াইতে যায়। ফিরিতে বিকাল। শ্বশ্রূ চা খাবার করিতে

থাকেন। অনীতা বিশেষ ক্লান্ত। তবু শ্বশ্রূমাতার সারাদিন কর্মসূচি বিশেষ অবিরাম উপর-নীচ দৌড়াদৌড়ির কথা স্মরণ করিয়া উপরন্তু কর্তব্যবোধে বলে—'মা, এগুলি আমি করিতেছি। আপনি একটু বসুন।'

বিনতা বলেন—'তুমি কোথা হইতে কোথা সারাদিন পরিশ্রম করিয়া বাড়ি আসিলে, এখন তুমি কাজ করিবে আমি বসিব? তাহাও কি হয়? তা ব্যতীত আমি দুপুরে বিশ্রাম লইয়াছি। ভাবিও না।'

এখন সংসারটিতে পাঁচটি পুরুষ। এক জন পক্ষাঘাতগ্রস্ত, এক জন বৃদ্ধ, এক জন দুর্বাসা। ইঁহারা কেহ এক গ্লাস জল গড়াইয়া খান না। দুটি বৃদ্ধ, একটি বৃদ্ধা বিশেষত পঙ্গু বৃদ্ধটিকে হাসপাতালের সেবিকার মতো সেবা করিতে হয়। গৃহে পাচিকা আছে, ভৃত্য আছে, দুটি দাসী আছে ঠিকা কর্ম করিবার। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বিশৃঙ্খলার শেষ নাই। সহসা দেখিলে মনে হইবে এটি একটি বৃহৎ ওয়েটিং রুম। লটবহর লইয়া সকলে কোথাও যাইবে বলিয়া প্রস্তুত হইতেছে। ট্রেন আসিতে বহু বিলম্ব। ইতিমধ্যে এ-পুঁটুলি ও-পুঁটুলি খুলিয়া ইহারা যেমন-তেমন করিয়া কাজগুলি সারিয়া ফেলিতেছে। একদিন সকাল-সকাল কালেজ ছিল, অনীতা নীচে নামিয়া শুনিল—রাঁধুনি হতাশ হইয়া বলিতেছে—'দুইটা কয়লার উনান পুড়িয়া খাক হইয়া যাইতেছে, এখনও কোনও জোগাড় পাইলাম না। শুদ্ধ ভাতে সিদ্ধ ভাত করিয়া রাখিয়াছি, তাহাই খাইয়া যাও।'

ভাতে-ভাত খাইয়া কালেজ যাইতে অনীতার কোনও আপত্তি ছিল না। কিন্তু সে দেখিল রাঁধুনি তৃতীয়বার হাঁড়ার মতো উনানগুলিতে কয়লা দিতেছে। দাদাশ্বশুর মহাশয়া আরেক দিক হইতে ডাকিতেছেন—'বিনো, বিনো।' দিদিশাশুড়ি মহাশয়া আরেক দিক হইতে ডাকিতেছেন—'বউমা, বউমা, শীঘ্র আসিয়া দেখো কী সর্বনাশ হইয়া গেল—'

রাঁধুনি বামুন মুখ পাংশুবর্ণ করিয়া বলিল—'কর্তাবাবু এখনি খাইতে নামিবেন, আমি কী দিয়া ভাত ধরিয়া দিব?'

অনীতা এক মুহূর্ত ভাবিল, তাহার পর রাঁধুনিকে বলিল, 'শীঘ্র পোস্ত বাটিয়া ফেলো, আমি আনাজ কুটিয়া দিতেছি।' তাহার যে গৃহকর্ম খুব অভ্যাস আছে, এমন নয়। তাহার পিতৃগৃহে মাতা ছিলেন, দুইটি দিদি ছিল, দাদারাও যে যাহার নিজের কাজটুকু করিত। তবু যথাসাধ্য তাড়াতাড়ি বৃহৎ বঁটিতে আঙুল কাটিয়া সে সকালের এবং বৈকালের সমুদয় পদের জন্য আনাজ সাধ্যমতো হিসাব করিয়া কাটিয়া দিল। রাঁধুনিকে মাছ কাটিতে বলিয়া সে নিজেই একটি উনানে তরকারি চড়াইয়া দিল, অপর উনানে দুধ জ্বাল হইতে লাগিল। আধ ঘণ্টা পর কর্তাবাবু খাইতে নামিলে হন্তদন্ত, ভীত, সন্ত্রস্ত বিনতা দেবী দেখিলেন উচ্ছে-বেগুন হইতে অম্বল পর্যন্ত রাঁধা হইয়া গিয়াছে, শেষোক্তটিকে রাঁধুনি জলে বসাইয়া শীতল করিবার চেষ্টা করিতেছে। কর্তাবাবু আজ বিশেষ গোলমাল না করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। তাহার পর স্বামী ও দেবরের সহিত একত্র খাইয়া অনীতা কালেজের পথ ধরিল। এখন স্টুডিবেকারটি যাইয়া একটি সেকেন্ড হ্যান্ড মরিস মাইনর আসিয়াছে। কিন্তু সামাজিক উৎসবে

যোগদানের নিমিত্ত ছাড়া তাহা ব্যবহার হয় না। অনীতাকে পাব্লিক বাসেই যাইতে হয়। তাহার দুইটি ক্লাস আজি নষ্ট হইল। কিন্তু সে বড় একটা কামাই করিতে চাহে না। একে সরকারি কলেজ, তাহাতে নূতন চাকরি, কিন্তু তাহারও উপর তাহার ভয় বাড়িতে থাকিলে তাহাকে বৃদ্ধদের সহিত গল্প করিতে হইবে। সে নিষ্ঠুর নহে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সঙ্গ কামনার আর্তি তাহার কাছে বৃথা যায় না। কিন্তু ইহা দুইবেলা আছেই। তৃতীয় দফা আরম্ভ হইলে তাহার পক্ষে সহ্য করা কষ্ট হইবে। বলিতে কী অনীতা সম্পূর্ণতই মানবী। এইগুলি ইহার দুর্বলতা।

অনীতার আর একটি সমস্যা হইল তাহার শ্বশুর মহাশয়ের প্রীতি। এতদিনে তিনি তাঁহার সংগীত কাব্য-দর্শন-খেলাধুলা প্রভৃতি প্রিয় বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনায় যোগ দিতে চেষ্টা করিত। তাহার পর দেখিল শ্বশুর মহাশয় কিন্তু কিছুই শুনিতে চাহেন না, ভিন্ন ব্যাখ্যা বা প্রতিবাদ তো নহেই। তিনি শুধু সমর্থনই চান। ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের পাশে আবদুল করিম খান সাহেবের কণ্ঠ যদি তাঁহার বিড়ালের 'ম্যাও' ধ্বনি মনে হয় তো অনীতাকেও তাহাই মনে করিতে হইবে, শরৎচন্দ্রকে যদি তাঁহার রুচিবিকারগ্রস্ত মনে হয় অনীতারও তাহাই মনে হইতে হইবে, এমনকী ফুটবল অপেক্ষা ক্রিকেট যদি অনীতার অধিক মনোমত হয় তাহা হইলে সে-কথা বলিলে চলিবে না। সব বিষয়ে এইরূপ সায় দেওয়া অনীতার পক্ষে কষ্টকর। সে-ও তো কিছু লেখা-পড়া করিয়াছে। স্বাধীন চিন্তাদি করিতে শিখিয়াছে। কিন্তু সায় দেওয়া ব্যতীত আর কোনও উপায় নাই। এই নিষ্ফল, ক্লান্তিকর একতরফা 'আলোচনা' যেদিন রাত্রি দুইটা অবধি চলিল, সেদিন সদা-প্রশান্ত ভুলু পর্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—'তোমাকে কি বাবা বিবাহ করিয়াছেন? তাঁহার জন্য একটি উচ্চশ্রেণীর দাসী জোগাড় করিতেছি জানিলে কদাচ বিবাহ করিতাম না।'

অনীতা দেখিল মহা বিপদ। তাহার স্বামী খেপিয়া যায়। এতদিনে সে বুঝিয়াছে—এ পরিবারে বধূগুলি সব শ্বশুরদের নানাবিধ সেবার জন্যই সরবরাহ হয়। স্বামীদের অধিকার শুধু গভীর রাত্রে। তাহার ভিতরে বিদ্রোহ জাগিল। ইহার পর দিন সে রাত্রির ভোজনপর্ব শ্বশুরের সহিত সারিল না। বলিল ক্ষুধা নাই। প্রকৃপক্ষে শ্বশুরের সহিত খাইতে বসিলে খাওয়াও হয় না। গল্প শুনিতে হয়, যতিহীন বিরামহীন গল্প এবং গল্প। পারিবারিক গল্প, বড় বড় মানুষ সম্পর্কে গল্প। তাহা প্রথম প্রথম ভারী আকর্ষণীয় লাগে, তাহার পর পুনরাবৃত্তিতে পুনরাবৃত্তিতে সেগুলি ক্লেশকর হইয়া যায়। ক্ষুধার গ্রাস মুখের বাহিরে থাকিয়া যায়, কারণ শ্বশুর তাঁহার স্বাভাবিক জলদ-স্বরে বলিতে থাকেন—'শুনিতেছিস না? অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিস? ভাল লাগিতেছে না, না কী?'—ইহার পর তিনি রন্ধনের নানারূপ কল্পিত ত্রুটির কথা উল্লেখ করিয়া ভোজন এক চতুর্থাংশ অসমাপ্ত রাখিয়া চলিয়া যান। তালতলার চটির ভয়াবহ শব্দ বহুক্ষণ ধরিয়া শুনা যায়।

রাত্রিতে অনেক সময়ে ঘুম ভাঙিয়া যায়। নিজের মায়ের মুখ অনীতার স্মরণে আসে। কবে সে আবার মাকে দেখিতে পাইবে? কবে দাদা দিদিগুলি তাহাকে ক্ষমা করিবে? বিনতা দেবীর মুখখানি ভাসিয়া উঠে। তাহার বড় সাধ যায়, মা বলিয়া

ডাকিয়া তাঁহাকে আদর করে, যেমন স্বীয় জননীকে করিত, কিন্তু পর দিন প্রাতে শ্বশ্রূমাতাকে দেখিয়া রাত্রের আবেগ উবিয়া যায়। তিনি যেন একটি যন্ত্র। আবেগ নাই। আদর নাই, বিরক্তি নাই, প্রার্থনা নাই, প্রাণ নাই। এই দেবীকে কিংবা যন্ত্রকে কি কেহ জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিতে পারে। তবু সে যখন 'মা' বলিয়া ডাকে তাহার কণ্ঠের সমস্ত মাধুর্য, হৃদয়ের সমস্ত স্নেহকাতরতা ও করুণা যোগ করিয়া ডাকে। ডাকটি স্বতঃস্ফূর্ত। কেননা, অনীতা স্বভাবে মাতৃ-উপাসক।

আরও কতগুলি ইঁহাদের ধরন তাহার খারাপ লাগিল। সংবৎসরের জন্য মার্কিনের সেমিজ, সায়া ও লাল বা সবুজ পাড় কোরা মিলের শাড়ি কেনা থাকে। বিনতা দেবী ও তাঁহার খুড়ি-শাশুড়ি তাহাই গৃহে পরিধান করেন। দিদি শাশুড়ি পরেন কারণ, তিনি আজকাল সেমিজ পরিতেই অভ্যস্ত, মিলের শাড়ি ব্যতীত অন্য শাড়ি তাঁহার বয়ঃকুঞ্চিত শরীরে বড় এবং ভারী লাগে। কিন্তু বিনতা এইরূপ পরিবেন কেন বিশেষত তিনি দীর্ঘকায়, শাড়িগুলি তাঁহার খাটো হয়। সে ধীরে ধীরে নিজের উপার্জন হইতে মাতার জন্য তাঁতের শাড়ি, ব্লাউস-জ্যাকেট ও লংক্লথের পেটিকোট, গরমে ব্যবহারের জন্য ট্যালকম পাউডার, হেজলিন, স্নো শীতের জন্য লেবুযুক্ত গ্লিসারিন ইত্যাদি সরবরাহ করিতে লাগিল। কবে যে বিনতার অঙ্গে মিলের শাড়ির পরিবর্তে ধনিয়াখালি, শান্তিপুরী উঠিল, শীতে বধূর বুনিয়া দেওয়া উলের ব্লাউজ ও শাল উঠিল তাহা কেহ লক্ষই করিল না, হোমিওপ্যাথি ঔষধের ক্রিয়ার ন্যায় উহা সবার অগোচরেই রহিয়া গেল।

অনীতা এখন কালেজ হইতে বাহির হইবার পূর্বে প্রাতরাশ-পর্ব সম্পূর্ণ চুকাইয়া যায়। সারা দিনরাতের আনাজপাতি কাটিয়া দেয়। কী কী রান্না হইবে, কী মশলা বাটিতে হইবে ইত্যাদি বিষয়েও রাঁধুনিকে উপদেশ দেয়। এবং যে কোনও ছুটির দিনে বিশেষ বিশেষ পদ রন্ধন করিয়া সবাইকে পরিতৃপ্তি সহকারে খাওয়ায়। পিতৃগৃহে যে সে খুব রান্না শিখিয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু ইঁহারা বরাবর পাচকের হাতে খাইতে অভ্যস্ত। বাটীর বধূর রান্না এবং পাচিকার রান্নার মধ্যে তফাত থাকিয়াই যায়। এখন মাংস হইলে, বিশেষ মাছ আসিলে সকলে আবদার করিতে থাকেন অনীতাই ইহা করুক। বাটীতে লোক খাইলে বিশেষ বিশেষ পদগুলিও অনীতাকেই প্রস্তুত করিতে হয়। অনেক সময়ে শ্বশ্রূমাতার কাছ হইতে প্রণালী শিখিয়া লইয়াই করে। কিন্তু বস্তুগুলি ভালই উতরাইয়া যায়।

একদিন কালেজে গিয়া অনীতা দেখে কোনও ডিগ্‌নিটরির মৃত্যুতে অর্ধদিবস পরে ছুটি হইয়া গিয়াছে। সেদিন দুপুর আড়াইটার সময়ে বাড়ি ফিরিয়া সে দেখিল বিনতা খাইতে বসিয়াছেন। চিঁড়া ভিজা, সামান্য তরকারির ঝোল এবং একটি কদলি। সে অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল

—'মা, আজি কি কোনও ব্রত-পার্বণ আছে?' বিনতা অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন—'তুমি উপরে যাও। ব্রত নাই।'

—'তাহা হইলে আপনি এরূপ খাইতেছেন কেন?'

—'আজি ভাতে চুল বাহির হওয়ায় তোমার পিতা থালি ফেলিয়া দিয়াছেন, রন্ধন

খাইবার অযোগ্য বিবেচনায় ছেলেরাও ভাত ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে। যাহা ছিল রাঁধুনিকে বাড়িয়া দিয়াছি।'

—'ভাত কম বুঝিলাম। মৎস্য নাই কেন?'

—'মৎস্য তো আমি একাদশী ব্যতীত বড় একটা খাই না। কুলায় না। কর্তাদিগকে, ছেলেদের দিতে হইবে, তুমি খাটিতেছ, রোজগার করিয়া আনিতেছ, তোমাকেও দিতে হয়। রাঁধুনি খাইতে পাইবে বলিয়া পরের চাকুরি করিতে আসিয়াছে,...তাহার পর আর সঙ্কুলান হয় না।'

ভারতীয় নারীর আদর্শ দেবীজনোচিত বাক্য। সকলেই ইহা শুনিয়া বাহবা দিবেন। নারীর, বিশেষত গৃহিনীর ক্ষুধা পাইতে নাই, খাইলেও পরিমাণ যথাসম্ভব কম থাকিবে, মৎস্য ইত্যাদি প্রোটিন না ছুঁইলেই ভাল, পুরুষরা পেট ফাটাইয়া খাইয়া উঠিয়া গেলে যাহা থাকিবে তাহাও অতিথি আসিলে হাসিমুখে ধরিয়া দিতে হয়, যদি কিছু থাকে তা দিয়া উদর বোজে তো বুজিবে, না বোজে তো না বুজিবে।

কিন্তু অনীতা বাহবা দিতে পারিল না। ক্রোধে তাহার শরীর জ্বলিতেছে। সে হাত ধুইয়া রন্ধনশালে গিয়া দেখিল জ্বালের আলমারিতে দুগ্ধ সঞ্চিত রহিয়াছে। সে শেষ উনানে দুগ্ধ গরম করিয়া শাশুড়ি-মাতার পাতের পাশে রাখিল। বিনতা সভয়ে বলিলেন—'এ কী করিতেছ? এ কী করিলে? ইহা তোমার শ্বশুর ও দাদাশ্বশুর মহাশয়দের দুধ। যাঃ এঁটো করিয়া দিলে তো? অনীতা গম্ভীর মুখে বলিল—'বৈকালে যদি দুধ না পাওয়া যায়, তবে আজ উঁহারা দুধ খাইবেন না, আমি জবাব দিব। চিঁড়া ভিজাগুলি দুধ দিয়া মাখুন, এই আরও একটি কদলী দিতেছি, মাখিয়া লউন, কোনওমতে উদর পূর্তিটুকু তো আজ হউক।'

বামুনঠাকুর এই সময়ে বলিল—'ইহা তো নিত্য নৈমিত্তিকের ব্যাপার বউমা, মা তো প্রায়ই এইরূপ খাইয়া থাকে। দেখিতেছ না কী রোগা।'

অনীতা এইবার দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মৎস্য কোটা দেখে। বিরাট খণ্ডটি তাহার শ্বশুরের। মেজখণ্ড দুটি দাদাশ্বশুরদের, সেজো দুইটি তাহার স্বামী ও দেবরের, ন খণ্ড দুইটি তাহার দিদি শাশুড়ির ও তাহার, পরে আর একটি মাত্র খণ্ড পড়িয়া থাকে।

সে বলিল—'তাহা হইবে না মা। পরিমাণ তো কম ক্রয় হয় না। মৎস্য প্রোটিন। সুষম খাদ্য খাইতে হইলে নিয়মিত একশো গ্রাম প্রোটিন খাওয়া প্রয়োজন। মৎস্য সমানভাবে কাটা হউক তাহা হইলেই আপনার জন্য বাহির হইবে। সকালবেলার আহারটি সে দেখিয়া যাইতে পারে না, কিন্তু রাত্রিবেলা নিজে পরিবেশন করিয়া খাওয়ায়, কেহ কোনও বস্তু অপরিমিত চাহিলে অম্লানবদনে বলে আর তিনজনের মতো আছে, অর্থাৎ মাতা, সেও রাঁধুনি। অন্তত রাত্রিবেলাটুকু পেট পুরিয়া খাইয়া কয়েক মাসের মধ্যেই বিনতা দেবীর স্বাস্থ্য সামান্য ফিরিল। বৈকালেও অনীতা বাড়িতে কিছু হালকা জলখাবার প্রস্তুত করে, কিংবা বাহির হইতে মিষ্টান্ন, ফল ইত্যাদি ক্রয় করিয়া আনে। শ্বশ্রূমাতাকে জোর করিয়া খাওয়ায়।

ইতিমধ্যে সংসারে একটি গোলযোগ উপস্থিত হইল। তাহার দেবরটি এক প্রতিবেশী-কন্যার প্রেমে পড়িল। এইরূপ পাড়া-প্রেমের কতকগুলি কুশ্রী দিক আছে।

প্রেম তখনই সুন্দর যখন তাহার মধ্যে গোপনতা থাকে, অগোপন হইলেই অশালীন হইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। হাতে-হাতে প্রণয় দৃষ্টিপাত, পত্রক্ষেপণ, প্রণয় সম্ভাষণ ইত্যাদি ঠিক লোকের চোখে পড়িয়া যায়। ফলে প্রতিবেশী কর্তারা এ বাড়ির কর্তাদের নিকট নালিশ করিলেন, প্রতিবেশী-গৃহিণীরা বাড়ি বহিয়া আসিয়া ইঁহাদের যাহা নয় তাহা বলিয়া গেলেন।

দেবরের সহিত অনীতার একটি সুন্দর সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে। সে স্বীকার করে বউদিদি আসিবার পর তাহাদের বাড়িটি মানুষের বাড়ি হইয়াছে, পূর্বে ভূতের বাড়ি ছিল। সংসারে যুবক পুত্র দুটির বাস্তবিক কোনও স্থান ছিল না। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের অসুখ বিসুখ এবং কর্তাটির পছন্দ-অপছন্দ কেন্দ্র করিয়া জীবনযাত্রা ঘুরিত। এখন আত্মীয় বন্ধুরা আসেন, পল্লীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বউদিদির ভারী ভক্ত হইয়া পড়িল। দেবর ও বউদি বালক-বালিকাগুলিকে লইয়া 'বাল্মীকি-প্রতিভা' ইত্যাদি মঞ্চস্থ করে, কেহ না আসুক তিন জনে মিলিয়াও গল্প সল্প করে। বউদিদি একদিন দেবরকে ডাকিয়া বলিল—'কালু তুমি বোঝো না কেন প্রণয় অতি সুন্দর বস্তু, কিন্তু উহা নিভৃতের, পাঁচজনের চোখে পড়িলে উহা হাস্যকর কিংবা লজ্জাকর হইয়া যায়। তুমি পাস দাও, মেয়েটিও পাস দিক, তাহার পর বিবাহ হইবে, এই কথা তুমি উহাদের গৃহে জানাইয়া দাও।' কালু কথা শুনিল। তাহার প্রেমিকার পরিবার সেই পল্লী ছাড়িয়া একটি দূরস্থ পল্লিতে বাসা ভাড়া করিলেন। পাত্র হিসাবে কালু তো খারাপ নহে। জাতি-বর্ণও মিলিয়া গিয়াছে, তাঁহারা নিয়ন্ত্রিত পূর্বরাগে বিশেষ আপত্তি করিলেন না। কিন্তু কালুর পিতার তর্জন-গর্জন চলিতেই লাগিল, চলিতেই লাগিল।

এই সময়ে ছোট দাদাশ্বশুর দেহ রাখিলেন। দিদিশাশুড়ি অনীতাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া বলিলেন—'দিদি। আমি আর অধিক দিন নাই। এ সংসারের এক প্রকার সুখ-ঐশ্বর্যের দিন শেষ হইয়া গিয়াছে। তুমি সে কাল দেখো নাই। কিন্তু আগামী দিনে তোমরা তোমাদের মতো সুখে-শান্তিতে থাকো ইহাই আমার কামনা। অত্যধিক লইয়া কী হইবে, কিছুই থাকে না। তা দিদি, তোমাকে কতকগুলি দায়িত্ব দিয়া যাইব। আমার বধূমাতা বড় ভাল, অতিরিক্ত ভাল। সে কাহারও উপর মুখ তুলিয়া কথা বলিতে পারে না। নিজের স্বামীটিকে যমের ন্যায় ভয় করে, আর সত্যই কর্তারা আদর দিয়া উহার মাথাটি একেবারে খাইয়াছেন। তুমি কালুর সহিত তাহার পছন্দের ওই মেয়েটির যাতে বিবাহ হয় তাহা দেখিবে। এই সংসারটি আমরা অনেক কষ্টে গড়িয়াছি। একত্র রাখিবে, সংসার-চালনার ভার তোমার। সর্ব অর্থে।'

অনীতা বলিল—'ঠাকুমাতা, এগুলি করিতে হইলে গুরুজনদের সহিত আমার সংঘর্ষ হইবে। তাহাতে আমার বড় বিপদ।'

দিদিশাশুড়ি বলিলেন—'আমি এ কয় বৎসর তোমাকে খুব ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়াছি। তুমি বুদ্ধিমতী, হৃদয়বতী। তুমি যাহা করিবে, ঠিক হইবে আশীর্বাদ করিতেছি। কালুর বিবাহ বিষয়ে যত্ন করিলে সে ও তাহার বধূও তোমার প্রতি প্রসন্ন থাকিবে। তুমি সকল দিক বুঝিয়া না চলিলে সংসারটি মুখ থুবড়িয়া পড়িবে।'

গুরুজনদের সহিত যে সংঘর্ষের কথা অনীতা উল্লেখ করিয়াছিল তাহা কিন্তু

অনুমান মাত্র নয়, তাহা শুরু হইয়া গিয়াছে। বিনতা দেবীর জ্বর হইয়াছে। বহু নিষেধ সত্ত্বেও তিনি জ্বর গায়ে পাখা হস্তে স্বামীর সম্মুখে বসিলেনই। এবং আজি সত্য সত্যই তাঁহার অনবধানতাবশত পাতে একটি মক্ষিকা পড়িল। 'কী পড়িল? কী পড়িল?' স্বামী চেঁচাইতেছেন। বিনতা ক্ষীণ কণ্ঠে বলিতেছেন—'কিছু পড়ে নাই, উহা তোমার চক্ষের ভ্রম।' 'অনীতা কী পড়িল রে?'—অনীতা ভয়ে ভয়ে বলিল—'আপনার যদি সন্দেহ হয় ওই স্থান হইতে কিছু ভোজ্য ফেলিয়া দিন না।' শ্বশুর অগ্নিশর্মা হইয়া বলিলেন—'অবশ্যই মক্ষিকা পড়িয়াছে। সকলেই মিথ্যা আশ্বাস দিতেছে।' তাহার পর পত্নীর দিকে ফিরিয়া কর্কশ কণ্ঠে বললেন—'ইতর-কন্যা, লজ্জা নাই। কর্মকুশলতা নাই, বসিয়া বসিয়া ঢং করিতেছ?'

অনীতা আর সহ্য করিতে পারিল না। সে আসন হইতে উঠিয়া পড়িল। তাহার মুখমণ্ডল রক্তাভ। সে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পর শ্বশুর তাঁহার নিজ কক্ষে বধূমাতাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার একটি অভ্যাস ছিল। ক্রোধ এবং ক্রোধজনিত দুর্ব্যবহার করিবার পর দরবিগলিত হইয়া যাইতেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'বউমা খাবার ফেলিয়া চলিয়া আসিলি কেন?'

অনীতা বলিল—'কন্যা হইয়া মাতার অবমাননা সহ্য করিতে পারি নাই। আমি বধূ, আমার সম্মুখে তাঁহার এ লাঞ্ছনা কী করিয়া করিলেন, আমার খাইবার প্রবৃত্তি নাই।'

'তোর একবারও মনে হইল না, ওইভাবে উঠিয়া আসায় আমার অপমান হয়?'

'মনে হয় নাই। মায়ের প্রতি রূঢ়তা, কর্কশ, অশালীন বাক্য আমাকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিল।'

ইহার পর রাত্রিকালে পত্নীর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া কর্তাবাবু হয়তো তাঁহার কাছে পুনঃপ্রতিষ্ঠা আদায় করিয়া লইলেন। কিন্তু অনীতা কিছুতেই তাঁহাকে ক্ষমা করিতে পারিল না। শ্রদ্ধা করিতেও অপারগ হইল। গুরুজন কি শুধু বয়সের আধিক্যেই হইবেন? বয়সোচিত আচরণ তো তাঁহার চাই। বাহিরে কিছু প্রকাশ হইল না। অনীতা যে সর্বক্ষণ ইহা মনের মধ্যে পুষিয়া রাখিয়া দিত তাহাও নহে। কিন্তু দুটি সম্পর্কের কেন্দ্র হইতে কিছু একটা খসিয়া পড়িয়া গেল।

অনুরূপ ঘটনা আরও একটি ঘটিল। কর্তা স্বয়ং নটা সাড়ে নয়টায় ফিরিলেও তাঁহার দাবি, ছেলেরা তাঁহার পূর্বে ফিরিয়া আসে। বড় অশান্তি এড়াইতে যথাসম্ভব এ নিয়ম মানিয়া চলে। কনিষ্ঠর সাহস বেশি। সে অতশত মানে না। আজই ভুলু বলিয়া গিয়াছে কর্মস্থল হইতে সে তাহার দিদিমাতাকে দেখিতে যাইবে। সাড়ে নয়টা বাজিয়া গেল, ভুলুর দেখা নাই। পৌনে দশটা বাজিলে পিতা ঘোষণা করিলেন অনীতাকে লইয়া খাইতে বসিবেন। কিন্তু সে শুধু নামেই খাইতে বসা। ভোজনে তাঁহার মন নাই। প্রতিটি বস্তু চাখিতেছেন, ফেলিতেছেন, ছড়াইতেছেন, ত্রুটির কথা বলিয়া ধমকাধমকি করিতেছেন। ভোজনপর্ব তো নয়, মুষলপর্ব। দশটা বাজিলে তিনি অগ্নিশর্মা হইয়া বলিলেন—'কোথায় যাইতে পারে একটি প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে, এত রাত্রে, কাহারও কি ধারণায় আছে! দ্যাখো কোন পাড়ায় গিয়াছে।'

অনীতা ব্রজাহত। এইরূপ কুৎসিত ইঙ্গিত যে কোনও ভদ্রলোক তাঁহার নিজপুত্রের সম্পর্কে পুত্রবধূর কাছে করিতে পারে পারেন, তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। তাহার প্রবল বমি পাইতেছে। সে উঠিয়া পড়িল। এ মতো সময়ে কড়া নড়িল, ভুলু আসিল, অনীতা নিজ কক্ষে গিয়া ভুলুকে অত্যন্ত রাগ করিয়া বলিল—'তুমি কি জানো না, বিলম্ব হইলে গৃহে কীরূপ অশান্তি হয়?'

ভুলু বলিল—'একে যান পাইতেছিলাম না, তাহার পর অত্যধিক জ্যাম। মাঝপথে নামিয়া সমস্ত পথ হাঁটিয়া আসিয়াছি। এইভাবেই খেলাধুলা গিয়াছে, বন্ধুবান্ধব গিয়াছে। এবার আত্মীয়স্বজনও যাইবে, কাহারও সহিত আর সম্পর্ক রাখিবার প্রয়োজন নাই।'

এই সময়ে শ্বশুর মহাশয় পুত্রবধূকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

—'খাবার ফেলিয়া চলিয়া আসিলি যে বড়?'

—'আপনি কী বলিয়াছিলেন স্মরণ করুন পিতা, তাহার পর আমার গলা দিয়া কিছু নামিতে চাহে নাই।'

শ্বশুর বলিলেন—'উৎকণ্ঠায় আমি নানারূপ কথা বলিয়া ফেলি। তাহাতে তুই এ রূপ করিবি?'

বধূ বলল—'উৎকণ্ঠা প্রকাশের একটা রীতি আছে। ভাষা ও ভাব তাহাকে এত দূর লঙ্ঘন করিয়া গেলে আমি সহিতে পারি না।'

আসলে মানুষটি চিরকাল যাহাকে যাহা খুশি বলিয়া পার পাইয়া গিয়াছেন। কেহ প্রতিবাদ করে নাই, কোনও প্রতিক্রিয়া হয় নাই। এই প্রথম তিনি বিদ্রোহের সম্মুখীন হইলেন এবং বধূর প্রতি দ্বেষ পুষিয়া রাখিলেন।

ইতিমধ্যে অনীতার গবেষণাপত্র শেষ হইল। তাহার একটি পুত্র জন্মিল। দিদিশাশুড়িটি মারা গেলেন, এবং সংসারে দ্বিতীয় বধূ অস্মিতার আবির্ভাব হইল।

অস্মিতা

অস্মিতা আসিল বহু বাগ-বিতণ্ডার পর। কর্তাও রাজি হইবেন না, অনীতাও তাঁহাকে রাজি করাইবেই। যাহা হউক, অবশেষে বিবাহোৎসব সমাধা হইল, যথোপযুক্তভাবে। শয়নকক্ষ লইয়া একটি প্রব্লেম হইল। অনীতা ও বিনতার ইচ্ছা ছিল বিনতার শয়নকক্ষটি কালু-অস্মিতাকে দেওয়া হইবে। বিনতার সিঙ্গল-খাটটি কর্তা মহাশয়ের ঘরে ঢুকিবে। অন্যান্য অতিরিক্ত জিনিসপত্র চলিয়া যাইবে নীচের কক্ষে। গৃহটি একতলায় ও দোতলায় একই রকম। উপরে চারিটি কক্ষ, নীচে চারিটি কক্ষ। নীচে যে স্থলে রন্ধনগৃহ, দোতলায় তাহার উপর দালানের অংশ। ইহারা যখন বাড়ি করিয়াছিলেন চারিদিক ফাঁকা ছিল, একতলার কক্ষে আলো বাতাস ঢুকিত। সেগুলি শয়নকক্ষ হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারিত, কিন্তু এখন চারিদিকে বাড়ি উঠিয়া যাওয়ায়, একতলাটি আর তেমন নাই। একটি শয়নকক্ষ এখন খাবার ঘর হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বৈঠকখানার পাশের ঘরদুটির একটিতে মেজো খুড়া মহাশয় থাকিতেন, আজিও

তাঁহার জিনিসপত্র বর্তমান। অন্যটি নবদম্পতির জন্য স্থির হইল। কেননা কর্তা মহাশয় কোনওক্রমেই নিজ ঘরে পত্নীকে থাকিতে দিবেন না। ইহা যে কী যুক্তি, কী গোপন ব্যাপার কেহ বুঝিল না। কর্তা সারাদিন বাহিরে থাকেন, পত্নী যদি দুপুরবেলায় বিশ্রামের জন্য ঘরটি ব্যবহার করেন তিনি জানিতেও পারিবেন না। রাত্রে শয়ন লইয়া কথা। উভয়েই এখন পঞ্চাশোর্ধ্ব। ধৃতরাষ্ট্রও তো গান্ধারীকে লইয়াই বনে গিয়াছিলেন। অনীতা নিজের শয়নকক্ষটি ছাড়িয়া দিবার কথা চিন্তা করিয়াছিল, কিন্তু বিনতা দেবী তাহাকে নিরস্ত করিলেন—'তোমার ঘরে ছোট ছেলে বাড়িয়া উঠিতেছে, আলো বাতাস প্রয়োজন, উপরন্তু তুমি ঘরটির সংলগ্ন বাথরুম করিয়া লইয়াছ, নীচেও তাহা আছে, কিন্তু এটি তোমার নিজের করা, এ সব ভাবনা ছাড়িয়া দাও।'

ধনী-গৃহের কন্যা অস্মিতা নীচে শয়নকক্ষ পাইয়া চটিয়া গেল। কাহারও কাছে প্রকাশ করিল না। অনীতা নিজে পড়াশোনা করিয়া নিজের পায়ে দাঁড়াইয়াছে। বলিতে কি তাহার মনে হয়, এই কারণেই সে বাঁচিয়া গিয়াছে। বিনতা দেবীর মতো করিয়া বাঁচিয়া থাকা তাহার পক্ষে সম্ভব হইত না। অভিজ্ঞতাবলে অনীতা অস্মিতাকেও কালেজের পড়া চালাইয়া যাইতে পরামর্শ দিল। 'ম্যাট্রিকুলেশন পাশ দিয়াছ, কালেজে ভর্তি হইয়া যাও।'

'তাহার পর?'—অস্মিতা জিজ্ঞাসা করে।

—'তোমার নিজ ব্যক্তিত্ব, নিজ সম্মান ও ক্ষমতা জন্মিবে অস্মি।'

এ পরামর্শ অস্মিতা, তাহার পিতা-মাতা, কালু কেহই ভালভাবে লইল না।

অস্মিতার পিতা-মাতা বলিলেন—'লেজ-কাটা শিয়াল, অপরেরও লেজ কাটিতে চায়। আমার কন্যা আদরে লালিত সে কোন দুঃখে মাস্টারি করিতে যাইবে?'

কালু সর্বক্ষণের জন্য বধূকে চায়, সে তাহাকে অন্যতর কাজে ছাড়িতে চাহে না।

অস্মিতার নিজেরও পড়াশোনায় আগ্রহ নাই। ইহারা সকলেই তাহাকে ভুল বুঝিল। অনীতা জানিতে পারিল না।

অস্মিতা আসার সময়ে সংসারে বড় অনটন আরম্ভ হইয়াছে, বাহির হইতে বুঝা যায় না, বোঝেন খালি মেজো দাদাশ্বশুর ও বোঝে অনীতা। পিতামহগুলি যতদিন ছিলেন তাঁহাদের কাহারও কাহারও মোটা পেনশন ছিল। এখন অস্মির বিবাহের কিছু পূর্বে মেজো খুড়া মারা গেলেন। পক্ষঘাতগ্রস্ত দাদাশ্বশুরটি ব্যবসায় করিতেন। কবে সে সকল পাট চুকিয়া গিয়াছে। কলসির জল গড়াইয়া গড়াইয়া খাইয়া এখন সব তলানিতে আসিয়া ঠেকিয়াছে। তাঁহার জীবনের শেষ দিনগুলিতে খুড়ামহাশয় বিনতাকে কাতর মুখে বকিতেন—'এ কী বিনো, চালের জন্য ব্যয় এত কেন? এত বাজার করিয়া কী গুষ্টির পিণ্ডি রাঁধিলি?' ইত্যাদি ইত্যাদি। ভুলু কালু কেহই তেমন তৈয়ারি হইতে পারে নাই। কুলমর্যাদা, অভ্যাস ইত্যাদির রাজকীয়তার সহিত তাহাদের উপার্জনের সামান্যতম সামঞ্জস্যও নাই, উচ্চাকাঙ্ক্ষাও নাই।

অস্মিতা দেখে তাহার দিদি রান্নাঘর হইতে দুইটা ফার্নেসের মতো উনান তুলিয়া দিল, তোলা উনানের ব্যবস্থা হইয়াছে। উড়িয়া পাচক ঠাকুরের স্থলে সাধারণ কায়স্থ রমণী নিযুক্ত হইল। দাস-দাসীর সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে। এ কী! ইহারা কি তাহাকে

রান্নাশালে ঢুকাইবে? তাহাকে দাস-দাসীর কার্যগুলি করিতে হইবে নাকি? সে পিতৃগৃহে চলিয়া যায়।

আয় কমিয়া গিয়াছে, জিনিসপত্রের মূল্য ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। আগে দাদাশ্বশুর মহাশয় হাল ধরিয়া থাকিতেন। এখন সংসারের উপর যে গৃহিণী রহিয়াছেন তিনি চিরকাল আজ্ঞা পালন করিয়া আসিয়াছেন। কী করিয়া একটি সংসারকে সুষ্ঠুভাবে চালাইতে হয়, কেহ শেখায় নাই। উপরন্তু সমৃদ্ধিশালী সংসারের বধূ হইয়া প্রত্যেককে নিজের খেয়ালখুশিমতো চলিতে দেখিয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছে, এইভাবেই চলে, এইভাবেই চলিবে। কর্তার কথা তো বলিয়া কাজ নাই। তিনি কাহারও না কাহারও হাতের তেলোর উপর থাকিতে অভ্যস্ত। বেশি কথা কি তিনি পালং হইতে পুঁইয়ের তফাত ধরিতে পারেন না। কত টাকায় কী বস্তু পাওয়া যায় জানেন না, জানিতে চাহেনও না।

অনীতা জ্বালানির খরচ কমাইয়াছে, দাস-দাসীর খরচ কমাইয়াছে, মাতা এখনও শ্বশুর ও স্বামীর সেবায় দৌড়াদৌড়ি করিয়া থাকেন, সুতরাং রাঁধুনিকে জোগাড় দেওয়া, চালনা করা, ঘরদুয়ার কিছু নিজহাতে ঝাড়পোছ, কিছু দাসীকে দিয়া করানো এইভাবে সামলাইবার চেষ্টা করিতেছে। সে লক্ষ করিল না অস্মি প্রায় পিতৃগৃহেই থাকে। যখন আসে অতিথির মতো আসে, আবার চলিয়া যায়।

ইহারই মধ্যে একদিন অনীতা শ্বশ্রূমাতার কাছ হইতে একটি ভয়াবহ সংবাদ শুনিল। তাহার শ্বশুর মহাশয় অবসরগ্রহণ করিতেছেন। দুই বৎসর পূর্বেই। তাঁহার আর ভাল লাগিতেছে না। অফিস হইতে সাধাসাধি করিতেছে, এক্সটেনশনও তাঁহার বাঁধা কিন্তু তিনি রাজি নন। বিনতা বলিলেন—'আমি সম্মতি দিয়াছি। তোমরা তো আছ।' অনীতার মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। তাহারা তো আছে। ইহার অর্থ কী? তাহার স্বামী ও দেবরের আয় নির্দিষ্ট। তাহার দুইটি পুত্র-কন্যা সরল ও শ্রী বাড়িয়া উঠিতেছে, অস্মিতারও একটি হইল বলিয়া। এই সময়ে তাহারা আছে এই ভরসায়...

অচিরেই শ্বশুর মহাশয় ডাকিয়া পাঠাইলেন—'তিন চারিটি ছাত্রী পড়িতে চাহিতেছে। ইহারা সব ধনীকন্যা। বাড়ির মোটর পাঠাইয়া দিবে।' সে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার, পি-এইচ ডি-টি পাইল বলিয়া, সে বাড়ি বাড়ি ধনীকন্যা পড়াইতে যাইবে? অনীতার মুখে কথা সরিতেছে না।

শ্বশুর কহিলেন—'হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিয়ো না মা।'

অনীতা বলিল—'আমার পুত্র-কন্যা শিশু, তাহাদের দেখাশোনা, পড়াশোনা করাইতে হইবে, সংসারের নানা কাজ আছে, কালেজের দায়িত্বও ক্রমে বাড়িয়া যাইতেছে, আমি কী করিয়া...তাহা ব্যতীত কাহারও বাড়ি গিয়া কোচ করিবার কথা আমি ভাবিতেও পারি না।'

'বেশ, তাহারা এখানে আসে কি না জিজ্ঞাসা করিব, কিন্তু দ্বিধা করিয়ো না মা, বুড়ার কথা বাসি হইলে মিষ্ট লাগিবে।'

অতএব শুরু হইল ধনীগৃহের বিবাহোৎসুক, এবং বিবাহিতা, দিদিমণির-জীবন-সম্পর্কে-অশেষ কৌতূহলী ছাত্রীগুলিকে পড়ানো। সিনিয়র

কেমব্রিজ পাশেন্ডু এই ছাত্রীগুলি অর্থপ্রত্যাশী দিদিমণিকে অন্তর হইতে শ্রদ্ধা করিতে পারে না, এক ধরনের অবজ্ঞাসূচক সমীহের ভাব ধরিয়া রাখে। অনীতা কোনও নূতন শাড়ি পড়িলে তাহারা নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি করিয়া মৃদু হাসে। তাহাদের টাকায় দিদিমণি শাড়িটি কিনিতে পারিয়াছেন! অনীতা অপমানিত বোধ করে। কলেজে সে শ্রদ্ধা ও প্রশংসার পাত্রী, কিন্তু গৃহশিক্ষিকা হিসাবে তাহার জাত গিয়াছে। শিশু-কন্যাটি আসিয়া কোলে বসিয়া থাকে। পুত্রটি সারাদিনের পর সন্ধ্যাবেলাতেও মায়ের মনোযোগ না পাইয়া ছটফট করিয়া বেড়ায়। ঘর্মসিক্ত মুখে অনীতা প্রাণপণে পড়াইয়া যায়। অবশেষে ছাত্রীগুলি হয়তো মুচকি হাসিয়া বলে—'আজকের মতো থাক দিদিমণি, আপনার বাচ্চা কাঁদিতেছে।' অনীতা রক্তাভ মুখে বলে, 'হ্যাঁ, থাক।'

যে প্রতিবেশীরা পূর্বে মাস্টারনি বধূর প্রতি বিমুখ ছিল, এখন তাহারাই অবাক হইয়া বলে, 'এমন তো ভাবি নাই, তিনটা চারটা পাশ দেওয়া বধূ, কালেজে পড়াইতে যায়। কিন্তু রাঁধিতেছে, বাড়িতেছে, কুটিতেছে, ঝাড়িতেছে, পড়াইতেছে, হাসিতেছে, খেলিতেছে...' তাহাদের মেয়েলি গালগল্প অনীতার সহিত জমে না সত্য, কিন্তু তাহাদের ছেলেমেয়েগুলিকে বধূ কবিতা শিখাইতেছে, নাটক করাইতেছে, গান শেখাইতেছে। ছেলেমেয়েগুলি বধূর ন্যাওটা, তাই গৃহিণীরাও আপনাদের অজ্ঞাতে বধূটিকে ভালবাসিতে শুরু করিলেন।

একদিন সে বাড়ি ফিরিতেছে, একটি প্রতিবেশী গৃহিণী তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। একটি বৃহৎ রৌপ্য থালি দেখাইয়া বলিলেন—

'চিনিতে পারো?'

রূপার থালি একই প্রকার হয়। কী চিনিবে? তখন তিনি থালিটি উলটাইয়া দেখাইলেন, তাহাতে অনীতার জ্যেষ্ঠ দাদাশ্বশুরের নাম লিখিত আছে। বলিলেন, 'চারিদিকে টি টি পড়িয়া যাইতেছে মা, তোমার দাদাশ্বশুরগুলি বিখ্যাত ছিলেন, তোমার শ্বশ্রূ রাঁধুনিকে দিয়া গোপনে গোপনে রৌপ্য বাসন, স্বর্ণালঙ্কার প্রভৃতি বিক্রয় করিতেছেন।' তিনি সোনার একটি কানের ফুল ও একটি টিকলিও দেখাইলেন। এগুলিতে নাম লেখা ছিল না। কিন্তু অনীতা চিনিল ফুলদুটি অস্মির, কেহ উপহার দিয়াছিলেন।

মহিলা বলিলেন—'তোমাদের মুখে কালি পড়িতেছে। দেখাইলাম। যাহা বোঝো, করো।'

অনীতা বিমর্ষ, কালিমাময় মুখে গৃহে ফিরিল। সে এবং তাহার স্বামী উপার্জনের প্রায় সবটাই মাতার হাতে তুলিয়া দেয়। বাকিটুকুতে তাহাদের হাতখরচ, জামাকাপড়ের খরচ, পুত্রকন্যার স্কুলের খরচ চলে, দুর্দিনের জন্য সঞ্চয় বলিতে গেলে ইদানীং হইতেছেই না।

আয় কমিয়া যাওয়ায় সে মাতাকে বলিয়াছিল—'মা একটু বুঝিয়া সুজিয়া চলিতে হইবে।'

সে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া রন্ধনকার্য পরিচালনা করায় কেহ আর ভাত নষ্ট করে না। ছেলেরা পালা করিয়া বাজার যায়। পূর্বে গৃহে বসিয়া তরি-তরিকারি ফল পাকড়,

মৎস্য ইত্যাদি দ্বিগুণ ত্রিগুণ দামে কেনা হইত। এখন তো রন্ধনের পদ কমিয়া গিয়াছে। তবে রাত্রে যখন বালক-বালিকাগুলি ও অন্যরা ডাল-রুটি একটি তরকারি দিয়া খায়, তখন শ্বশুরমহাশয় লুচি, ভর্জিত বস্তু, মাখো-মাখো দম জাতীয় কিছু, বৃহত্তম মৎস্যখণ্ড, মিষ্টান্ন প্রভৃতি উদরসাৎ করেন। অবসর লইলেও তাঁহার দিনপঞ্জিকা একই রকম রহিয়াছে। সকাল সাড়ে নয়টা দশটায় তিনি আপিসের ন্যায় খাইয়া বাহির হইয়া যান। আর কাহারও অর্থাৎ যাহারা সত্য-আপিস যাইবে তাহাদের জন্য কিছু হইয়া উঠুক না উঠুক তাঁহার স্নানের গরম জল এবং ভোজ্য বস্তু ওই সময়ে প্রস্তুত হইতেই হইবে। তাঁহার স্বাস্থ্য অতি উত্তমও। শুধু রক্তচাপটি কিঞ্চিত ঊর্ধের দিকে। সারাদিন বাহিরে আড্ডা দিয়া তিনি রাত্রি নয়টা, সাড়ে নয়টার গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তাহার পরই ভোজনপর্ব। রন্ধনশালা হইতে ভোজনাগার পর্যন্ত ছুটাছুটি পড়িয়া যায়। ভাজিয়া রাখিলে চলিবে না, একটিও না-ফোলা থাকিলে চলিবে না। নোলায় খোলায়। অর্থাৎ ভাজো এবং দাও। ভাজো এবং ছুটিতে ছুটিতে দিয়া যাও। এই সময়ে তিনি একত্রে খাইতে পছন্দ করেন, অন্য কাহারও পাত খালি থাকিলে তাহাকে দেওয়া হইতেছে না কেন বলিয়া চিৎকার করেন। তাঁহার পত্নী এবং পুত্রবধূ কিছুতেই ভাবিয়া পায় না, এইরূপে 'নোলায় খোলায়' এবং অন্যান্য পাঁচজনকে একই তালে একই লয়ে পরিবেশন কীভাবে সম্ভব।

এইরূপ সময়ে যখন শ্বশ্রূমাতা আরও অর্থ দাবি করিয়া ছিলেন, অনীতা বলিয়াছিল, 'আমাদের যাহা আয়, তাহা সামান্য রাখিয়া সকলই দিয়া দিই। আর তো নাই মা। আপনি ব্যয়সংকোচ করুন।'

'সকলই তো সংকুচিত করিয়াছি, খালি ঘৃত, মিষ্টান্ন, ক্ষীর এগুলি রহিয়াছে। তোমার শ্বশুরের তো এগুলি না হইলে চলিবে না।'

—'যুদ্ধের বাজার মা। চালের দাম দেখুন, সকলই তুঙ্গে, তাহা ছাড়া বাবার উচ্চ রক্তচাপ, এরূপ গুরুভোজন প্রতিদিন ঠিক নহে।'

মাতার মুখ কিছু গম্ভীর হইয়াছিল, তিনি বলিয়াছিলেন

—'আচ্ছা, সে তোমাকে ভাবিতে হইবে না।'

এখন অনীতা বুঝিল এই নির্ভাবনার পিছনে কী সমাধান লুকাইয়া ছিল।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেবরজায়াটির সহিত পরামর্শ করিয়া সে একদিন চুপিচুপি শ্বশ্রূমাতাকে বলিল—'মা আপনি কি কিছু রৌপ্য বাসন বিক্রয় করিয়াছেন?'

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মাতা বলিলেন, 'করিয়াছি। তো কী?'

—'কাজটা ঠিক হয় নাই মা।'

—'আমার জিনিস আমি বিক্রয় করিয়াছি। বেশ করিয়াছি।'

—'আপনি অস্মির উপহারের জিনিসও কিছু কিছু...'

—'এ গৃহে তোমাদের উপহারের দ্রব্যের উপরও আমার অধিকার আছে। বেশ করিয়াছি। এ সমস্ত বস্তু বিপদের সময়ে কাজে লাগিবে বলিয়াই লোকে কিনিয়া রাখে।'

—'ঠিকই। কিন্তু বিপদ অর্থে মরণাপন্ন রোগ, উচ্চশিক্ষা ইত্যাদি...তেমন কিছু

তো...।' অনীতার অপেক্ষা বিপদে আজ আর কে পড়িয়াছে।

—'তাহা হইলে যাহা করিতে হয় তুমি করো। আমার দ্বারা সংসার পরিচালনা হইবে না।'

অনীতা কহিল, 'এ কথা যদি বলিবেনই তো আমি দু-তিন মাস নির্দিষ্ট অর্থের মধ্যে চালাইয়া দেখিবার চেষ্টা করি। এরূপ করিলে চতুর্দিকে আপনার পুত্রদের বড় নিন্দা হইতেছে। আপনি আর এরূপ করিবেন না, মিনতি করিতেছি।'

—'তুমি যদি ব্যবস্থা করিতে পারো তো করিব কেন?'

পাঁচজন। অর্থাৎ দুই পুত্র, দুই পুত্রবধূ ও মাতা মিলিয়া একটি মিটিন হইল। মিটিনে বাজেট পাশ হইল। স্থির হইল তিনমাস করিয়া পরিচালনা এক একজনের হস্তে থাকিবে, প্রথম অনীতা, তাহার পর অস্মিতা, তাহার পর মাতা।

অনীতার হৃদয়ে আজ বড় শান্তি। পূর্বেই বলিয়াছি মেয়েটি সংস্কারক প্রকৃতির। ইহারা ভাবে স—ব ঠিক করিয়া দিবে।

বুদ্ধি এবং যুক্তি এবং হৃদয় এগুলি ঠিকভাবে প্রয়োগ করিলেই স—ব ঠিক হইয়া যাইবে।

অস্মিতার গহনা বিক্রয় হওয়ায় অস্মিতা বিলক্ষণ চটিয়াছিল। ইদানীম তাহার একটি পুত্র হইয়াছে। অনীতা নাম রাখিয়াছে সুভগ। শ্বশুরগৃহে তাহার শিকড় কিছু দৃঢ় হইয়াছে। নীচে থাকিতে বাধ্য হওয়ায় সে ক্ষুব্ধ। শ্বশুরগৃহের, বিশেষত শ্বশুরমহাশয়ের তাহার বিবাহে আপত্তিও সে ভুলিতে পারে নাই। অনীতার উপর সে মোটামুটি প্রসন্ন। অনীতা তাহাকে বড় ভালবাসে। প্রকৃতপক্ষে একমাত্র দুই জায়ের কথোপকথনের সময়েই অস্মিতার হাস্যমুখ দেখা যায়। অন্য সময়ে তাহা করুণ, বিনত, নমিত হইয়া থাকে। কেন তাহা অনীতা ভাবিয়া দেখে নাই। অস্মি ঘন ঘন পিতৃগৃহে যায়, থাকিলে তাহাকে বা শ্বশ্রূমাতাকে সাহায্য করিবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করে না। নিজের কক্ষটি পর্যন্ত অপরিষ্কার, অগোছাল হইয়া থাকে। ইহা অনীতার ভাল লাগে না, কিন্তু সে ভাবে আহা ধনীর একমাত্র কন্যা, ধীরে ধীরে ঠিক হইয়া যাইবে। অস্মিতা যাহা কাহাকেও বলিতে পারে না, তাহা অনীতাকে বলে। যথা অস্মিতা—'আচ্ছা দিদি, আমি বুঝিতে পারি না কী করিয়া মাতা পুত্র, নাতি-নাতিনীদের বঞ্চিত করিয়া নিজের স্বামীকে ওইভাবে চর্ব্য-চুষ্য খাওয়ায়।'

অনীতা (হাসিয়া)—"তুমি রবি ঠাকুরের 'রাসমণির ছেলে' পড়িয়াছ? রাসমণি কীভাবে ছেলে কঠোরভাবে মানুষ করিতেন, কিন্তু স্বামীকে নিত্য ক্ষীর-মুড়া খাওয়াইতেন। ইহা সেই প্রকার।"

অস্মিতা—'রাসমণির স্বামী এবং আমাদের শ্বশ্রূমাতার স্বামীর মধ্যে কিন্তু বিলক্ষণ তফাত আছে।'

অতপর দুইজনেই হাসিয়া উঠিত।

এই সময়ে বিনতাদেবী বৈকালিক গাত্রধৌতি-পর্ব শেষ করিয়া হয়তো একবার উপস্থিত হইলেন। আবার ঘুরিয়া চলিয়া যাইতেন। অস্মিতা বলিত—'আমাদের দুইজনের ভাব উনি সুচক্ষে দেখেন না।'

অনীতা—'তাহা কেন? এমনিই আসিতে নাই?'

অস্মিতা—'লক্ষ করিবেন, যখনই আমরা উভয়ে একত্র থাকি, উনি এইরূপ ঘুরিয়া ঘুরিয়া যান।'

অস্মিতার চক্ষে সংসারের অনেক সত্য ধরা পড়ে যাহা অনীতার চক্ষে পড়ে না। অস্মিতা ঠিকই বুঝিয়াছিল। আরও কিছু সত্য অনীতার চক্ষে ধরা পড়ে নাই। তাহা কালুর পরিবর্তন। কালু এমনিতেই স্বল্পভাষী। ইহাদের মনের কথা বুঝা কঠিন। বিবাহের পর সে আরও গম্ভীর হইয়া গিয়াছে। আড্ডাগুলি আর বসে না। বন্ধু-বান্ধব আসিলে কালু অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া যায়। একদিন অস্মিতা কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া বলিল—তাহার স্বামী তাহাকে সন্দেহ করে, কুবাকা বলে। তাহা উচ্চারণ করা যায় না, এমনকী দু-চার ঘা পর্যন্ত কসাইয়া দেয়। অনীতা অবাক হইয়া গেল। কালু ক্রোধী বটে। কিন্তু বিনা কারণে এরূপ ব্যবহার! তাহার সংস্কারক বিদ্রোহী সত্তা আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। তবু সে বলিল—'প্রথমে বিবাহের পর পারস্পরিক বোঝাপড়ায় সাধারণত অনেক সময় যায়। তুমি কিঞ্চিৎ ধৈর্য ধরো। উহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করো, অমূলক সন্দেহে শুধু কষ্টই বাড়ে।'

অস্মিতা—'আমার পিতা-মাতা পর্যন্ত কখনও আমার গায়ে হাত তোলেন না। তাহার উপর ওইরূপ কুৎসিত গালি। আমি ঠিক করিয়াছি পিতৃগৃহে চলিয়া যাইব।'

অনীতা—'কী এমন বলিয়াছে যাহার জন্য তুমি এরূপ সিদ্ধান্ত লইতেছ?'

তখন অস্মিতা বলিল।

শুনিয়া অনীতার মাথা হইতে পা পর্যন্ত ঘৃণায় শিহরিত হইল। সে কহিল—'ঠিক আছে। তুমি পিতৃগৃহে যাও। যতদিন পর্যন্ত কালু তাহার আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করে ততদিন কিন্তু অনমনীয় থাকিতে হইবে। যদি কয়দিন পরেই আবার নিজ হইতেই ক্ষমা করিয়া দাও, জীবনভর ইহা চলিতেই থাকিবে।'

অস্মিতা বলিল—'তাই করিব।'

সে পিতৃগৃহে চলিয়া গেল। কিছুকাল পরে অস্মিতার পিতা-মাতা অনীতাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

—'কালুর ন্যায় অত্যাচারী অমানুষের কাছে কন্যাকে আর পাঠাইব না।'

অনীতা—'সে কী? কী বলিতেছেন?'

অঃ পিতা—'উহাকে পাশ দিয়া তোমার ন্যায় নিজে পায়ে দাঁড়াইতে বলিয়াছিলে মনে পড়ে? দেববটিকে বোধ করি ভালভাবেই চিনিয়াছিলে?'

অনীতা—'ভুল বুঝিয়াছেন। চিনি নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় নারীশিক্ষার পথটি খুলিয়া দিয়া আমাদিগের এত উপকার করিলেন, আমরা এত দিনেও তাহার সদ্ব্যবহার করিতেছি না। নারীদিগের শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন।'

অঃ পিতা—'কালুই তো ইহাকে পড়িতে দিতে চায় না। আমার কন্যা উহার বহু কাজ করিয়া দেয়। ঘর বন্ধ থাকে বলিয়া তোমরা বুঝিতে পার না। জানিবে আমার কন্যার অর্থের অভাব হইবে না। সে আর শ্বশুর-গৃহে যাইবে না।'

বিমর্ষ চিত্তে অনীতা ভাবিল, বংশগতি এইভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ভুলু যেমন

তাহার মাতার নির্বিকার স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, কালুও ঠিক তেমনই তাহার পিতার ন্যায় অত্যাচারী হইয়া উঠিতেছে। প্রকাশভঙ্গির পার্থক্য আছে, কিন্তু মূল ব্যাপার একই।

সে বলিল—'কাকাবাবু শুনুন, অত সহজ নহে। আপনি মনে করিতেছেন ইহাই সমাধান। কিন্তু আসলে ইহা আরও নূতন সমস্যার দ্বার খুলিয়া দিবে। অস্মি মুখচোরা, ভালমানুষ স্বামী-বিচ্ছিন্না অর্থেই স্বামী পরিত্যক্তা, এই লজ্জা দুঃখ মনে পুষিয়া সে কিছুই করিতে পারিবে না। আপনার কন্যাকে আপনি যতই প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করুন কেন, তাহাকে তো স্বীয় পরিবার, স্বীয় সংসারের মর্যাদা দিতে পারিবেন না! আপনার পুত্রটির বিবাহ হইবে, আপনারা একদিন থাকিবেন না, তখন সপুত্র অস্মির কী অবস্থা হইবে? ভাবিলেও ভয় হয়। এ সকল কথা মনেও আনিবেন না। সব ঠিক হইয়া যাইবে। খালি অস্মিকে একটু শক্ত হইতে হইবে।'

অল্পদিনের মধ্যেই অনীতার কথা ফলিল। কালু স্বয়ং গিয়া অস্মিতাকে লইয়া আসিল এবং অস্মিতা চুপে চুপে তাহার জাকে জানাইল কালু ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে। তাহার মুখে এখন বুঝি স্বর্গীয় বিভা। সেদিকে চাহিয়া অনীতার হৃদয় উচ্ছ্বাসে পূর্ণ হইয়া গেল, সে বলিল

—'সুখী হও অস্মি, আজি আমার আনন্দ তোমা হইতেও অধিক।'

এই সময়ে পক্ষাঘাতগ্রস্ত দাদাশ্বশুরটি মারা গেলেন এবং দ্বিতলে তাঁহার সুন্দর কক্ষটি অস্মি ইহাদের জন্য সাজাইয়া দিল।

কিন্তু ইহার পর হইতেই অস্মিতার একটি পরিবর্তন হইল। কাছে আসার পরিবর্তে সে দিদি হইতে দূরে সরিয়া গেল।

অনীতা ভাবিত আর তো অস্মি গল্প করিতে আসে না? আহা বুঝি উহার নূতন প্রণয়-পর্ব শুরু হইয়াছে। ভাল হউক, উহার ভাল হউক।

ইহার পরই গৃহে নূতন বাজেট-পর্ব।

অস্মিতার পরিবর্তনের কারণ কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য। কালু যখন দেখিল, বউদিদির পরামর্শে শেষ পর্যন্ত তাহাকে স্ত্রীর কাছে নত হইতে হইল, সে বউদিদির উপর জন্মের মতো চটিয়া গেল। সে স্ত্রীকে নির্দেশ দিল, 'বউদিদির সঙ্গে সম্পর্ক রাখিবে না।' অস্মিতা তাহার বিবাহের গুরুতর সংকট হইতে উদ্ধার পাইয়া বুঝিল—কালুর সহিত তাহাকে যখন ঘর করিতে হইবেই, তখন শান্তি বজায় রাখিতে কালু যাহা বলে তাহা করাই ভাল। তাহা ব্যতীত এত দিনে অস্মিতা তাহার দিদির প্রতি বিমুখ হইতেও শুরু করিয়াছে। উহার বড় সুনাম। অন্যে পরে কা কথা, তাহার নিজের মাতাই বলিয়া থাকেন—'অনীতার মতো পারিস না? কেমন সব দিক সামলাইয়া চলে।'

অস্মিতা তাহার স্বাভাবিক বুদ্ধিতে বুঝিয়াছে সাংসারিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপে তাহার শ্বশুর ও শ্বশ্রূমাতা উভয়েই বিলক্ষণ চটিয়াছেন। একজনের উপর চটিলে স্নেহটি অন্য দিকে ধাবিত হয়। সে প্রাণপণে শ্বশুর মহাশয়কে তুষ্ট করিবার চেষ্টা করে। দুইবেলা ধৈর্য ধরিয়া সে শ্বশুরের ভোজনপর্বে সপাখা উপস্থিত থাকে, এবং তাঁহার অবিরাম একই গল্প হা-হা হাসি শোনে। শুনিতে শুনিতে তাহার শরীর কেমন

করিতে থাকে তবু সে শোনে। এই ডিউটি করিয়া সে শ্বশুর-শ্বশ্রূ উভয়ের মন জয় করিয়া লইল।

অনীতা একেক দিন সময় পাইলে আসিয়া বসে। শ্বশুর বলেন—'তোর লেখাপড়া আছে, কেন বসিতেছিস?'

অনীতার সহিত গল্পের অধিকাংশ জুড়িয়া যেমন থাকিত কবিতার ব্যাখ্যা, মহাজনবাণীর ভাষ্য, স্মৃতিচারণ, অস্মিতার সহিত গল্পের অধিকাংশ জুড়িয়া এখন থাকে কর্তামহাশয়ের প্রবল পছন্দ-অপছন্দ, আত্মীয়-বন্ধু, পাড়া-প্রতিবেশীদিগের দুর্বলতা। কোথায় কে বাউনের ছেলে কায়েত বিবাহ করিয়াছে, কোন ভদ্রলোক উপর হইতে ভদ্র ভিতরে ভিতরে ঘুষখোর, আত্মীয়দের মধ্যে কে লোভী, কে পরশ্রীকাতর, কে ধরাকে সরা মনে করিতেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। একদিকে পত্নী হাসি মুখে বসিয়া ঘাড় নাড়েন। আরেক দিকে ছোট পুত্রবধূ বসিয়া ঘাড় নাড়ে। আহা! এই বধূটিকে ঘরে আনিতে তিনি নাকি আপত্তি করিয়াছিলেন! স্ত্রীর সহিত গল্পগুজবের সময়েও পুত্রবধূপ্রসঙ্গ উঠিয়া পড়ে। দুইজনে একমত হন অস্মিতা ভালো, অনীতা মন্দ। অস্মিতা বিনীত, অনীতা উদ্ধত। অস্মিতা নিঃস্বার্থ, অনীতা স্বার্থপর।

ইতিমধ্যে অনীতা দুইটি শাটা কিনিলে অধিকতর সুন্দরটি ছোট জা-এর জন্য রাখিতেছে। কিছু আনিলে সরল, শ্রী, সুভগ তিনজনকে বাঁটোয়ারা করিয়া দিতেছে, প্রাতঃকালে উঠিয়া একভাবে পাচিকা থাকিলে জোগাড়, না থাকিলে দুই বেলার প্রধান রান্না করিয়া কাজে যাইতেছে। সে নিশ্চিন্ত যে সংসারের পরিশ্রম ও হিসাব সে দেখিতেছে, পরিবেশন দেখা-শোনা অস্মি করিতেছে, মাতা সবার উপরে পরিচালনা কার্যগুলি করিতেছেন। সে জানিতেছে না গৃহের পুরুষরা ভোজনের সময়ে তাহাকে বড় দেখিতে পায় না। সে তখন পুত্র-কন্যার এবং নিজের পড়াশোনা লইয়া ব্যস্ত থাকে। সুতরাং বিনতা ও অস্মিতাকে ওই সময়ে দেখিয়া দেখিয়া তাহাদের মনের মধ্যে ইহাদের কর্মরত মুখচ্ছবি দৃঢ় হইয়া বসিয়া যাইতেছে।

এদিকে তিনমাস ছাড়িয়া ছয় মাস কাটিয়া গেল, কেহ তাহার কাছ হইতে কর্তব্যভার গ্রহণ করিল না। না অস্মিতা, না মাতা। উভয়েই বলিলেন—'বেশ তো চলিতেছে, চলুক না।' আসলে যুদ্ধের বাজারে জিনিসপত্র ক্রমেই মহার্ঘ হইতেছে, বাজেটের পরিবর্তন প্রয়োজন। কিন্তু নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা ফেলিয়া দিয়া খালাস পাইতে এখন ইহারা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। সংসারের মোটা ডাল-ভাতের ব্যবস্থা তো হইয়াছে। অতিরিক্ত যাহা হইবে তাহা ব্যক্তিগতভাবে করিলেই সুবিধা, ইহা পরে প্রকাশ পাইবে। যাহাই হউক, আর মিটিনও হইল না, বাজেটও হইল না, দায়িত্বের গুরুভার স্কন্ধে লইয়া অনীতা নিজে আরও দুটি ছাত্রী পড়াইতে উদ্যোগী হইল। একদিন কালুকে বলিল—'তুমিও দু চারটি ছাত্র পড়াও না; আমার জানা আছে, বলিয়া দিব।' কিছুর মধ্যে কিছু না, কালু থালি উঠানে ছুড়িয়া ফেলিয়া উঠিয়া গেল।

অনীতা বুঝিল যে কালুকে সে চিনিত, সে আর নাই। পালটাইয়া গিয়াছে।

ত্রিভুজ

ত্রিভুজ প্রেমের গল্প আমরা অনেক শুনিয়াছি। কিন্তু ত্রিভুজ ঘৃণার গল্প শুনিয়াছি কি? এই পরিবারে অনীতার অজ্ঞাতসারে ত্রিভুজ ঘৃণার গল্পটি বেশ জমিয়া উঠিল। সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ। দুই দিকের সম দৈর্ঘ্যের বাহু দুটি ঘৃণাময় বাহু। একটিতে কালু-অস্মিতা। অন্যটিতে-শ্বশ্রূমাতা। তৃতীয় বাহুটি ঘৃণ্য বাহু। উহা অনীতা।

অস্মিতার মাতা-পিতা এখন জামাতাকে ভুলাইতে চাহেন যে তাঁহারা তাহাকে অভব্য, অমানুষ অত্যাচারী ইত্যাদি মনে করিতেন, কন্যা ও নাতিকে চিরদিনের জন্য কালু হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহারা কালুকে বুঝাইলেন এ সকলই অনীতার পরামর্শ। তাঁহারা অস্মিতার জন্য মোটা হাত-খরচ বরাদ্দ করিয়াছিলেন। সুভগের জন্মের পর হইতে অস্মির শরীরে কিছু গোলযোগ দেখা দিয়াছিল। অনীতা এবং বিনতা তাহাকে ভারী কার্য করিতে কখনওই ডাকিতেন না। কিন্তু শীত আসিলে অনীতা দেখে অস্মি প্রত্যহ কালুর জন্য স্নানের গরম জল বহিয়া লইয়া যায়। একদিন সে বলিল—'অস্মি কী করিতেছ? ভার তুলিয়ো না, কালুকে বলো এইটুকু সে পারিবে।'

অস্মিতা করুণ মুখ করিয়া বলিল—'ও শুনিবে না।' তখন অনীতা শ্বশ্রূমাতাকে বলিল—'মা, কালুকে একটু বলুন, ইহা তো ঠিক নহে। আমি উহাকে ভাতের হাঁড়ি উলটাইতে পর্যন্ত দিই না, কিন্তু এইভাবে বৃহৎ কেতলিতে জল বহা। ইহা ছাড়াও বহু রাত্রে খাইয়া অস্মির পেটের রোগ ধরিয়া যাইতেছে। আপনি বলুন।'

বিনতা সহসা মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন—'আমি কেন বলিব? নিজেরা তো যাহা বুঝো তাহাই করো। একজন নিজের স্বামীটিকে ভেনিটি ব্যাগে পুরিয়াছে, আরেকজন শ্বশুরবাড়ির গোলাম হইয়াছে। কিছু বলিতে পারিব না।' অনীতা মাতার এই ভাব-ভঙ্গি দেখিয়া আশ্চর্য হইল। কিন্তু ওই যে সংস্কারক? সংস্কারক তাহাকে দিয়া বলাইল—'কালু কিন্তু কিছু কিছু অন্যায় করে। ইহা যদি মাতা হইয়া আপনি দেখাইয়া না দ্যান, কে দিবে?'

বিনতা পূর্বের মতো গলা চড়াইয়া, খিঁচাইয়া বলিলেন—'আমি শাশুড়ি। আমি আমার ছেলেদের দোষ দেখিব না, দেখিব না, দেখিব না। কালুর দোষ দেখিতেছ? জানো ছোট-বউ ভিতরে ভিতরে কী? জানো সে তোমার সম্পর্কে, ভুলুর সম্পর্কে কালুর কাছে কী বলে?'

শেষের কথাগুলি অনীতা বিশ্বাস করিল না। এগুলির প্রাসঙ্গিকতাই বা কী? সে অস্মিকে আপন ভগ্নীর ন্যায় ভালবাসে, সেবা করে। তবে বিনতা দেবীর পরিবর্তন দেখিয়া সে বড় ঘাবড়াইয়া গেল। এ কী?

আসল কথা, বিনতার দেবীত্বের এইবারে যথার্থ পরীক্ষা শুরু হইয়াছে। যতদিন অনীতা আসে নাই তিনি প্রাণপণে বৃহৎ পরিবারের মন জোগাইয়া দেবীপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। অনীতা আসিবার পর হইতে এ গৃহের পুরুষদের হ্যাংলা-পনা শুরু

হইল। বিদুষী যেন আর দেখে নাই! গান গাহিতে যেন আর কেহ পারে না! তাঁহার হৃদয় শেলের মতো বিঁধিয়া আছে—'বিনো, উচ্ছিষ্টগুলি তুলিয়া লইয়া যা।' তিনি অন্য সকলের দাসীত্ব করিয়াছেন। এখন কি পুত্রবধূর দাসত্ব করিতে হইবে? দ্বিতীয় শেল খুড়ি-শাশুড়ির সেই কথা। তাঁহার কাছ হইতে বৎসরের পর বৎসর আকণ্ঠ সেবা লইয়া তিনি কী করিয়া বলিতে পারিলেন—'অনীতা, তুমি আমার বউমার চেয়েও ভাল!' আর তাঁহার স্বামী? তিনি তো কোনওদিন তাঁহাকে গুরুত্ব দেন নাই। লাঞ্ছনা-গঞ্জনার আর শেষ রাখেন নাই। কিন্তু পুত্রবধূটিকে পাইয়া একেবারে গদগদ। তিনি নিজে কোনওদিন স্বামীর উপর প্রভাব খাটাইতে পারেন নাই। অথচ ইহারা দেখ দিব্য সুখে ঘর করিতেছে। ইহারই মধ্যে সান্ত্বনা যে ছোটবধূটি স্বামীর হস্তে কিঞ্চিত লাঞ্ছিত হইতেছে। ইহাই তো নিয়ম! ইহা তো সুন্দর কথা!

ইহার পর যেদিন অনীতা হিসাবের খাতা আনিয়া বলিল,

—'মা এ মাসে চালের খরচ বড্ড বাড়িয়া গিয়াছে দেখিতেছি। কেন বলুন তো।'

তিনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া শরৎচন্দ্রীয় চরিত্রের মতো করিয়া বলিলেন—'দুটো খাইতে দিতেছ বলিয়া ভাতের খোঁটা দিতে আসিয়াছ?'

অনীতা অত্যন্ত হতবুদ্ধি ও ব্যথিত হইয়া বলিল,—'কী বলিতেছেন? এই বাজারে মানুষ ফ্যান পর্যন্ত না পাইয়া পথে পথে মরিতেছে, আমি কীভাবে চাউলের জোগাড় করিতেছি আমিই জানি, হিসাবও আমাকে রাখিতে হইবে, কোনও বিষয়ে বেশি ব্যয় হইলে জিজ্ঞাসা করিব না? দাদাশ্বশুর মহাশয়ও তো ইহা করিতেন!'

—'তিনি করিতেন তিনি গুরুজন ছিলেন। তোমার কীসের হক? টাকার অহংকারে ধরাকে সরা দেখিয়াছ না কি?'

অনীতা এইবার ক্রুদ্ধ হইল—'অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিবেন না মা। আমি হিসাব রাখিতেছি বলিয়া সামান্য একটা প্রশ্ন করিয়াছি। ইহার মধ্যে বড়-ছোটর প্রশ্ন নাই। আর আমি মোটেই আপনাকে ভাত দিতেছি না। বাবারও কিছু অবদান আছে সংসারের ফন্ডে, তাহা হইতেই আপনার অন্ন সংস্থান হয়, আমার টাকাই বা কোথায় যে টাকার অহংকার দেখিলেন? দেখেন নাকি সারা দিন কালেজ করিয়া আসিয়া উঞ্ছবৃত্তি করি, কিছু অধিক আয়ের জন্য?'

উদ্‌গত ক্রোধ ও অশ্রু চাপিয়া সে চলিয়া গেল। তাহার মনে পড়িতে লাগিল তাহার বিবাহের সময়ে দাদা-দিদিরা কী প্রখর আপত্তি তুলিয়াছিলেন। তাহার পিতা কালেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন, মাতাকে স্বীয় উদ্যোগে শিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। পড়াশোনার ব্যাপারে তিনি ছেলে মেয়ে তফাত করিতেন না। চারিপাশের মানুষদের তুলনায় তাহাদের পরিবার ছিল উদার। দাদা-দিদিরা বলিয়াছিলেন—'ভুলুর পরিবার কনজারবেটিব, উহারা নারী শিক্ষায় উৎসাহী নয়। ও স্থানে তুমি কষ্ট পাইবে।' অনীতা এটিও চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল। মেয়েটি বীরাঙ্গনা, তাহাতে সন্দেহ কী! মাইকেল মধুসূদন যেরূপ জনাকে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, আমরাও সেরূপ অনীতাকে তুলিতে পারিব কী?

এ দিকে ঘটনার গতিবেগ বাড়িয়া চলিল। ট্রেন যখন তাহার লক্ষ্য হইতে কিছু

দূরে, কিছু বিলম্ব মেকাপ করিতে হইবে, তখন ট্রেন এইভাবে চলে, হুহু করিয়া। সরলের প্রবল জ্বর হইল, ১০৫ উঠিয়া যায়, মাথায় আইস-বেগ, পায়ে হট-বেগ, কিছুতেই জ্বর নামে না। গৃহ-চিকিৎসকটি স্পষ্টই ভয় পাইয়া গিয়াছেন, একটি প্রেসক্রিপশন লিখিয়া দিলেন। অনীতা বুঝিল ইনি অন্ধকারে ঢিল ছুড়িতেছেন। ভয়ে তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল। এতদিনে তাহার একটি ভাই ডাক্তার হইয়া বাহির হইয়াছে। সে তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইল। মামা আসিয়া রোগী পরীক্ষা করিয়া বলিল—'এ ঔষধ দিয়ো না। ইহার জার্মান মিজলস্ হইয়াছে। একটি দিন ধৈর্য ধরিয়া থাকো, মাথায় বরফ জল। সমস্ত শরীর ধুইয়া দাও। কিছু হইবে না।'

সে চলিয়া গেলে বিনতা দেবী ও তাঁহার স্বামী ঘরে ঢুকিয়া, বলিলেন—'কী হইল? ভুলু ঔষধ আনিল না? সেবন করাইবে না?'

অনীতা বলিল তাহার ভাই কী বলিয়া গিয়াছে। শ্বশুর মহাশয় রক্তচক্ষে চাহিয়া বলিলেন—'তোমার ভাই কি ধন্বন্তরী নাকি, স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিল? অভিজ্ঞ গৃহ-চিকিৎসকের পরামর্শ শুনিতেছ না?'

অনীতা বলিল—'ধন্বন্তরী না হইতে পারে, কিন্তু দায়িত্বশীল, আধুনিকতর, বিশেষ নিজ ভগ্নীর পুত্র বলিয়া অধিক যত্নবান। আমি সরলকে আর ওই স্ট্রং ঔষধ খাওয়াইব না।'

বিনতা ক্রুদ্ধা ফণিনীর ন্যায় বলিয়া উঠিলেন—'যবে হইতে কন্যাটি হইয়াছে তবে হইতেই পুত্রটিকে অনীতা অযত্ন অবহেলা করে। ও মরিয়া গেলেও উহার কিছু যাইবে আসিবে না।' ক্রোধে দুঃখে অনীতা জ্ঞান হারাইল, বলিল, 'রোগশয্যার পার্শ্বে নাটক করিবেন না। নিজ পুত্রকে আপনারা মারিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া আমিও সেই ঐতিহ্য চালাইয়া যাইব, এ ধারণা করিবেন না।'

বলিয়াই সে পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। এ সে কী বলিল? কেন সংযত হইতে পারিল না। ছি, ছি, ছি, ছি।

পরদিন বৈকালের দিকে সরলের শরীর আগাগোড়া চাবড়া চাবড়া রক্তাভ জর্মন হামে ভরিয়া গেল। জ্বর অনেক নামিয়া গেল। অনীতার ভাই আসিয়া পথ্য নির্দেশ করিল। রোগীকে এখন অত্যন্ত সাবধানে রাখিতে হইবে, ঠাণ্ডা না লাগে, উদরাময় না হয়।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা বিনতা ঠাকুর ঘর হইতে সান্ধ্যপূজা সারিয়া নামিতেছেন, অনীতা সাশ্রুনেত্রে তাঁহার পায়ে গিয়া পড়িল—'মা আমাকে ক্ষমা করুন, আমি আপনাদের অত্যন্ত দুর্বাক্য বলিয়া ফেলিয়াছি।' লজ্জায়, দুঃখে সে অঝোরে কাঁদিতেছে।

বিনতা বলিলেন, 'সরলের অসুখে আমারও মাথার ঠিক ছিল না, আমিও যা তা বলিয়াছি...'

ইহার পরের ঘটনাও সরলকে লইয়া। বার্ষিক পরীক্ষার পূর্বে পুত্রের পড়া ধরিতে গিয়া অনীতা দেখিল সারা সৎসর সে কিছুই পড়ে নাই। তখন সে নিত্য ধৈর্য ধরিয়া পড়াগুলি তাহাকে বুঝাইয়া দিতে লাগিল। এবং প্রতিদিন কালেজ হইতে ফিরিয়া পড়া

ধরিবে বলিয়া দিল। তৃতীয় দিনও যখন সরল পড়া পারিল না, টাঙ্ক দেখাইল না, তখন সে তাহাকে বেশ করিয়া প্রহার দিল। সরলের চিৎকারে তাহার দাদু-ঠাকুমাতা ছুটিয়া আসিলেন।

—'উহার গায়ে হাত দাও তোমার এত সাহস! বদমাস, বিদ্যাগর্বে গর্বিতা বধূ, তোমার লজ্জা নাই?'—দুইজনে মিলিত হইয়া এ রূপ বলিলেন। অনীতা বলিল—'ছেলের সম্মুখে আমাকে গালি দিবেন না। আমি রাগিয়া তাহাকে প্রহার করিয়া থাকি আপনারা আসিয়া রক্ষা করুন, ঠিক আছে, কিন্তু মন্দ কথা বলিবেন না।'

—'কী! আমাদের ভয় দেখাইতেছে। স্পর্ধা তো কম নহে!'—মাতা বলিলেন। পিতা বলিলেন—'কোনওদিন তো কাহারও জন্য আঙুলটিও নাড়িলে না। খালি নিজের স্বার্থ দেখিয়াছ। এখন আবার গুরুজনকে উপদেশ দিতেছ, লজ্জা করে না? তোমাকে আবার সাদরে ঘরে স্থান দিয়াছিলাম!'

এই সময়ে ছোট্ট বালিকা শ্রী কান্নাভেজা কণ্ঠে বলিল—'তোমরা সকলে মিলিয়া আমার মাকে কেন এমন করিতেছ? দেখিতেছ না মা কেমন কাঁপিতেছে, তোমরা এ ঘর হইতে চলিয়া যাও।'

বিনতা দেবী বলিলেন—'যেমন মা তেমন ছাঁ।'

অনীতা তখনও কাঁপিতেছে, উহার কি হিস্টিরিয়া হইল! সে খালি নিজের স্বার্থ দেখিয়াছে এতদিন? কিছুই করে নাই? তাহার সমস্ত জীবনের প্রাণান্তকর পরিশ্রম, প্রয়াস, শুভবুদ্ধি, ভালবাসা সব যেন তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতে লাগিল—'কিছু পারো নাই, ব্যর্থ, তুমি সম্পূর্ণ ব্যর্থ, তুমি সম্পূর্ণ ব্যর্থ।'

তাহাকে এইরূপ বেতসলতার ন্যায় কাঁপিতে দেখিয়া শ্বশুর মহাশয় ভয় পাইলেন, শাশুড়ি বলিলেন—'ও সকল ঢঙ।'

শ্বশুর নিজে আবেগপ্রবণ মানুষ; অল্পেই কাঁপিয়া থাকেন, কতদূর বিচলিত হইলে এই শক্ত ধাতুর সমর্থ মেয়েটি কাঁপিতে পারে, তিনি একরকম করিয়া যেন বুঝিলেন, বলিলেন—'বউমা স্থির হও। যাহা বলিয়াছি তোমার, তোমাদিগের ভালর জন্য বলিয়াছি। মিন করি নাই। কিছু উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। কাঁদিও না মা, কাঁদিও না।' অনীতা কাঁদিতেছে না, সে অর্ধসংলগ্ন চিন্তা করিতেছে আর ভিতরের কোনও মর্মান্তিক অ-সুখে কাঁপিতেছে। সে কিছু করে নাই? করিতেছে না? মাতার পরনের পোশাক সকলই তাহার কিনিয়া দেওয়া, কিয়ৎপূর্বে পিতা যে পাঁঠার মাংস খাইয়া আসিলেন, তাহা তাহারই পাক করা, যে কক্ষে তাঁহারা দাঁড়াইয়া আছেন, যে কক্ষে ইহারা পরে যাইবেন সেগুলি তাহার স্বোপার্জিত সামান্য সঞ্চয় হইতে সম্প্রতি সংস্কার করা হইয়াছে। সে কিছু করে নাই? ইঁহাদের জন্য সে আঙুলটিও নাড়ায় নাই?

এখন অস্মিতা নিজ ঘর হইতে বড় একটা বাহির হয় না। অনীতা কিছু গম্ভীর। সে চিন্তিত। বিনতা দেবী প্রায়শই ছোট বধূর ঘরে যান।

সেদিন অনীতা মটরশুঁটির কচুরি তৈয়ারি করিয়াছে। ছেলেমেয়েগুলি পেট ভরিয়া খাইলে বাকি ভাগ করিতে গিয়া অনীতা দেখিল একটু কম পড়িতেছে। সে নিজে দুইখানি লইল, বাকি সব ভাগ করিয়া রাখিতেছে, মাতা বলিলেন—

—'বউমা, তুমি কাজ-কর্ম করিয়া ফিরিলে, এতগুলি খাবার প্রস্তুত করিলে, মাত্র দুইখানিতে তোমার ক্ষুধা মিটিবে?'

—'আমি একখানি টোস্ট লইব মা, হইয়া যাইবে।' বিনতা বলিলেন—'কালু আর অস্মিকে বরং একখানি করিয়া কম দাও। উহারা তো এইমাত্র কড়াইশুঁটির কচুরি খাইয়াই উঠিল।'

—'মানে?' অনীতা চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল। মাতা বলিলেন—'ঘরের মধ্যে অস্মি আজকাল নিজেদের তিনজনের জন্য কত প্রকার খাবার প্রস্তুত করে। আজি সে মটরশুঁটির কচুরিই করিয়াছিল। শুধু শুধু তুমি কেন নিজেকে বঞ্চিত করিবে?'

ইহার পর একদিন সে বাড়ি আসিলে শ্রী তাহার আঁচল ধরিয়া হৃদয়বিদারক কান্না কাঁদিতে লাগিল।

—'কী হইয়াছে? কী হইয়াছে রে?'

'মা, কাকিমা আমাদের সম্মুকে বুল্টু (সুভগ)-কে পেন্সিল দিল, পাশের বাড়ির গীতাকেও দিল। আমাকে দিল না, পেন্সিল আমার চাই না, কিন্তু এরূপ করিলে আমি সহিতে পারি না।'

মেয়ের কষ্ট দেখিয়া অনীতা স্তম্ভিত হইয়া গেল। ইদানীম্ অস্মিতার অভব্যতা অস্বাভাবিক বাড়িয়া উঠিয়াছে।

ছেলেমেয়েগুলি যখন একত্রে খাইতে বসে সে ঘর হইতে মুঠো করিয়া মাছ, পিঠা, চপ ইত্যাদি ছেলের পাতে দিয়া যায়, তাহার পাতের পার্শ্বে পায়সের বাটি নামাইয়া রাখে, তাহার পর সরল ও শ্রীর পাতে চরণামৃত দানের মতো কয়েক ফোঁটা ফেলিয়া দেয়।

দেখিতে দেখিতে সে একদিন বলিল—'মা, অস্মিতা যখন নিজ পরিবারের জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে, জিনিসটি অত্যন্ত দৃষ্টিকটু ও হৃদয়বিদারকও হইতেছে, তখন আমরা স্বতন্ত্র হইয়া যাই।'

বিনতা চমকিত হইয়া বলিলেন—'আমাদের কী হইবে?'

—'আপনারা নির্বাচন করুন। আমার কাছে থাকিলে আমি সাদরে রাখিব, উহাদের কাছে থাকিলেও নিষেধ করিব না।'

বিনতা বলিলেন—'এ রূপ প্রস্তাব করিলে আমি অনশনে প্রাণত্যাগ করিবে।'

—'সে কী? কেন মা? আপনি কি দেখিতে পান না, ইহার ফলে ছেলেমেয়েদের কুশিক্ষা হইতেছে!'

—'সে উহারা বড় হইতে হইতে ঠিকই বুঝিয়া যাইবে। ছোট-বউ করিল তো কী হইল? তুমি তো করিতেছ না। আমরা জীবিত থাকিতে ভিন্ন হইতে পারিবে না।'

অতএব এই রূপেই চলিতে লাগিল।

অনীতা কী করিবে? সে এখন বৈকালের জলখাবার করিয়া পুত্র-কন্যা-স্বামী ও শাশুড়িকে ভোজন করায়, সুভগকে দেয়, বাকিটুকু শ্বশুর মহাশয়ের জন্য রাখিয়া উদ্বৃত্ত কালু ও অস্মির জন্য ভাগ করে। কোনওদিন উহারা এইমাত্র চাচার কবিরাজি

খাইয়া উঠিল, কোনওদিন লুচি ও মোহনভোগ। ইহার পর তাহাদের দেওয়ার কী অর্থ থাকিতে পারে?

কিন্তু ইহাতে বিনতা দেবীর মুখ গম্ভীর হইয়া যায়। মনুষ্য চরিত্রের তল পাওয়া ভার। যে বিনতা একদিন নিজেই অনীতাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, আজ তিনিই বিচলিত ও ক্রুদ্ধ হইতে লাগিলেন। অনীতা দেখিয়াও দেখিল না।

বিনতাকে পূর্বে সে প্রায়ই আত্মীয় বাড়িতে লইয়া যাইত। কিন্তু ইদানীম্ তাহার জীবন কর্মে পরিপূর্ণ। সময় পায় না। কিন্তু সে প্রায়ই বলে—'মা যান না, কাছাকাছি রিকশ করিয়া ঘুরিয়া আসুন।' এতদিন বিনতা এ অনুরোধ শুনিতেন না, সহসা দেখা গেল তিনি ছোট-বধূকে অবলম্বন করিয়া প্রায়ই এদিক-ওদিক যাইতেছেন। এখন সকালবেলায় তাহার ডিউটি, সন্ধ্যাবেলায় মাতা ও অস্মির। মাতা বড়বধূর কাছে সসঙ্কোচে অনুমতি লইতে আসেন, সে সানন্দে বলে—'নিশ্চয়ই! ঘুরিয়া আসুন। আমি সামলাইয়া লইব এখন।'

নূতন রাঁধুনিটি আজিকালি দুই প্রকার রান্না করে, জলের ন্যায় তরকারি ঝোল, ইহা পরিবারের জন্য, আর যথাযথ মশলা দিয়া রান্না, ইহা কালুর পরিবার ও শ্বশুর মহাশয়ের জন্য। অবাক হইয়া অনীতা দেখে দুই প্রকার ডালনা, দুই প্রকার মাছের ঝোল। উপরের জলীয়টির তলায় মশলাদারটি লুক্কায়িত রহিয়াছে। সে তিতিবিরক্ত হইয়া যায়, ক্রোধে সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া যায়, কিন্তু ইহা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেও তাহার ঘৃণাবোধ হয়।

রাঁধুনিটি বড় কামাই করে। মাসের মধ্যে পনেরো-ষোলো দিন। অধিকাংশই না বলিয়া। সে ক্রমাগত অগ্রিম লইয়া যায়। তাহার দুই তিন মাসের অগ্রিম জমিয়া যায় একেক সময়। অনীতার সম্প্রতি একটি জরায়ুঘটিত রোগ হইয়াছে। ডাক্তার ভারী কাজ করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং মোটামুটি বিশ্রামে থাকিতে বলিয়াছেন, ইহা সে বিনতা দেবীকে জানাইল। বলিল—'মা আপনার শরীরও খুব ভাল নয়, অস্মিরও নয়, আমার বিশ্রাম একান্ত প্রয়োজন, এই সময়ে আপনি রাঁধুনিকে একেবারে ছুটি দিবেন না। অগ্রিম দিলেই সে ছুটি লইবে, অগ্রিম একেবারে বন্ধ করুন।'

অতঃপর একদিন অত্যধিক শরীর খারাপে নীচে নামিয়া শুনিল রাঁধুনি আসে নাই। অর্থাৎ তাহাকে রাঁধিতে হইবে। কাজ করিতে শরীর খারাপ করিতেছে। সে বলিল—'মা, উহাকে অগ্রিম দেন নাই তো?' মাতা ইতস্তত করিয়া বলিলেন—'মাসের পুরা মাহিনাই সে ছোটবধূর কাছ হইতে অগ্রিম লইয়া গিয়াছে।' শুনিয়া সে ক্রোধে পাংশু হইয়া গেল। সে এত করিয়া নিজের শরীরের অবস্থা জানাইয়া ছুটি চাহিল, উপায়ও বলিয়া দিল—শুনিল না। অস্মি ইহা শুনিল না। কোনও ব্যাপারে একটি অতিরিক্ত টাকা দিতে হইলে উহারা গা-ঢাকা দেয়, আর মাসের পর মাস রাঁধুনিকে অগ্রিম দিতে ইহার বাধিতেছে না। বুঝিয়াছে। সে বুঝিয়াছে। এই জন্যই রাঁধুনিটি তিন-চতুর্থাংশ সরিষাবাটা দিয়া উহাদের জন্য মাছ আলাদা করিয়া রাঁধিয়া রাখে, বাকি এক-চতুর্থাংশে পরিবারের সকলের মাছ-ঝাল নহে, মাছ-জল হয়। এইভাবে রাঁধুনির সহিত যড় করিয়াছে। ছি, ছি, এত নীচতা করিতে পারে ওই মেয়েটি। আর এই

রাঁধুনিটি। ফলভোগ অনীতাকেই করিতে হইবে। মাতার বয়স হইয়াছে, ওই উনি শিলনোড়া লইয়া মশলা বাটিতে বসিয়াছেন। সে কঠিন কণ্ঠে বলিল—

—'আমি পারিব না। কতদিন আসিবে না এখন তাহার ঠিক কী? আমার শরীর আর বহিতেছে না। এই দুই লক্ষ্মীছাড়ায় মিলিয়া সংসারটিকে শেষ করিয়া দিবে।'

রাগে দুঃখে সে জ্ঞানহারা, অতিরিক্ত রক্তপাতে মাথা ঘুরিতেছে, গা বমি করিতেছে। সে কোনওমতে উপরে গিয়া শুইয়া থাকিল।

বলিয়াছি ঘটনা এখন তুফান মেলের গতিতে ঘটিতেছে। সুভগ আজিকাল তাহার দাদুর সহিত খাইতে বসে না। সন্তান ও স্বামীকে অস্মি ধীরে অতি ধীরে সওয়াইয়া সওয়াইয়া পরিবার হইতে স্বতন্ত্র করিতে ফেলিতেছে। কে জানে সুভগ যদি স্বাভাবিক নিয়মে দাদা-দিদি জ্যাঠামহাশয়-জেঠিমা এদের ভালবাসিয়া ফেলে?

সেদিন ছোটর পরিবার অনুপস্থিত। ভোজনের আসনের পার্শ্বে একটি পুতুল কম। কর্তা মহাশয়ের এমনিতেই মেজাজ খারাপ। অনীতা শুইয়া শুইয়া পড়িতেছে। ভুলু বসিয়া বসিয়া পড়িতেছে। এমন সময়ে তাহারা দেখিল সরল ও শ্রী এঁটো হস্তে ঘরে ঢুকিতেছে। দুইজনেই রাগত, এবং তাহাদের পিছন পিছন অগ্নিশর্মা দাদুমহাশয় পার্শ্বে ঠাকুমাতা। দাদুমহাশয় চক্ষু ঘূর্ণিত করিয়া চিৎকার করিয়া যাহা বলিলেন, তাহার সার হইল ছেলেমেয়ে দুটির বিশেষত মেয়েটির কোনও শিক্ষা হয় নাই। তাহারা মানুষের অধম। তাঁহার ন্যায় মানী, বয়স্ক ব্যক্তিকে অপমান করিয়াছে ইত্যাদি ইত্যাদি। বিনতা দেবী পুতুলের মতো নীরবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

হঠাৎ শ্রী সরু গলায় উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—'দাদু, তুমি শুধু শুধু নীচে আমাদের যাহা নয় তাহা বলিয়া বকিলে। তাহাতে দাদা রাগিয়া খাওয়া ফেলিয়া উঠিয়া আসিয়াছে। আমার খাওয়া হইয়াই গিয়াছিল, তাই আমিও উঠিয়া আসিয়াছি। এখন তুমি মা-বাবার কাছে আমাদের নামে নালিশ করিতে আসিয়াছ? যাও তুমি এখান হইতে, ঠাকুমা তুমিও চুপ করিয়া শুনিতেছ? কিছু বলিতেছ না? মা-বাবা আমাকে মারিলে সুখী হও, না? কেন দেখিতে পারো না? কেন আমাকে দেখিতে পারো না? চলিয়া যাও, তুমিও চলিয়া যাও...।'

ভুলু এবং অনীতা প্রথমটা হতবুদ্ধি। ততক্ষণে শ্বশুর মহাশয় কপালে করাঘাত করিতেছেন এবং ট্রাজিক হিরোর মতো বলিতেছেন—'এই আমাদের পুরস্কার বিনো। তোমার আমার এই পুরস্কার। জীবনব্যাপী কর্তব্য পালন, গভীর ভালবাসা ও আত্মত্যাগের এই পুরস্কার।'

অনীতা এবং ভুলু পুত্রকন্যাকে তিরস্কার করিয়া উঠিল। তবে বারো বৎসরের কন্যা, চৌদ্দ বৎসরের পুত্রের গায়ে তাহারা আর হাত তোলে না। শ্রী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—'তোমরা আমাকে বাড়ি হইতে বাহির করিয়া দাও। গঞ্জনা আমি আর সহিতে পারি না। দাদা আর বুল্টু মিলিয়া দুষ্টামি করে, সব সময়ে নিষ্ঠুরভাবে তিরস্কৃত হই আমি। যখন তখন ঠাকুমাতা বলেন—বিদ্যেধরী। যেমন মা তেমন ছাঁ। আমি থাকিব না। আমার এখানে স্থান নাই...।' ভুলু-অনীতা মেয়ের অদ্ভুত কথা ও অদ্ভুত কান্না দেখিয়া রীতিমতো ভয় পাইয়া গেল। তাহারা অনেক কষ্টে কন্যাকে শান্ত করিল।

সরলকে নম্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল—'কী হইয়াছিল বাবা?'

—'কিচ্ছু হয় নাই। কিচ্ছু করি নাই। শ্রী ঠিকই বলিয়াছে। আমরা এ গৃহ হইতে চলিয়া যাইব।'

ভুলু পুত্র-কন্যার কাছে রহিল। অনীতা নীচে গেল। শাশুড়িমাতা রান্না ঘরে, রাঁধুনি (নূতন) শেষ লুচিটি ভাজিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল—'কী হইয়াছে মা?'

বিনতা বলিলেন—'কিচ্ছু হয় নাই। উহারা ছেলেমানুষ। কী প্রসঙ্গ লইয়া হাসিতে আরম্ভ করে। উনি থামিতে বলিয়াছেন, থামে না। হাসিতেই থাকে। তাহার পর বিকট গর্জন শুনিয়া ঘরে গিয়া দেখি উনি উহাদের বিশ্রীভাবে বকিতেছেন, উঁহার চণ্ডাল রাগ তো জানো। ছেলে বয়স, হাসি ধরিয়াছে, কখনও থামিতে পারে? দেখো অনীতা, উহাদের তিরস্কার করিয়ো না। এ সকল লইয়া বেশি রগড়াইতে নাই। কী হইতে কী মনে লাগিয়া যায়।'

অনীতা বলিল, 'মা, শ্রী আপনাকেও তিরস্কার করিল। আপনি প্রতিবাদ করেন নাই, তাইতে বিগড়াইয়া গিয়াছিল। জানিবেন শ্রী আপনাকে অতিশয় ভালবাসে। আমি উঁহার হইয়া পুনঃ পুনঃ মাফ চাহিতেছি।'

বিনতা বলিলেন—'আমি কখনও উহার কথা ধরি। তুমি কী যে বলো অনীতা। তোমার পরেই শ্রী আমাকে ভালবাসে। আমি কী জানি না! "থাম্মা, আমাকে কোলে নিয়ে চাল-ডাল বাহির করো"—উহার সেই মিষ্ট আবদার কি আমি ভুলিয়া গিয়াছি?'

অনীতা খানিকটা নিশ্চিন্ত হইয়া আবার ময়দা মাখিল, লুচি ভাজিল, খাবার থালি পূর্ণ করিয়া উপরে গিয়া অনেক খোসামোদ করিয়া সমাদর করিয়া শ্বশুর মহাশয়কে খাওয়াইল।

সেই রাত্রেই অস্মিতা-কালু আসিলে বিনতা দেবী ব্যাপারটি সম্পূর্ণ পূর্বপ্রসঙ্গবিহীনভাবে, অতিরঞ্জিত করিয়া তাহাদের জানাইলেন। ফিসফিস করিয়া। তিনি এখন আর দেবী নাই, দেবীত্বের অ্যাসিড-টেস্টে ফেল করিয়া গিয়াছেন। তবে রোমক দেবী জুনো প্রতিহিংসা ও ঈর্ষাপরায়ণ বটে! পরবর্তী কয়েকদিন তিনি ছোটবধূকে সঙ্গে করিয়া আত্মীয়-পরিজন পাড়া-প্রতিবেশী যাহারাই রিকশর পরিধির মধ্যে বাস করেন, তাঁহাদের সবিস্তার বলিয়া আসিলেন, ফোনেও জানাইলেন—অনীতা এবং তাহার কন্যা তাঁহাকে যে অপমান করিয়াছে সারা জীবন তিনি তাহা কাহারও কাছ হইতে কখনও পান নাই।

এদিকে কিন্তু তিনি বড় বধূর সঙ্গে হাস্যরসাত্মক আলাপ করিতেছেন। নাতনিটিও নূতন পুস্তক লইয়া তাঁহাকে দেখাইতেছে। মালাই বরফ কিনিয়া চারিজনে মজা করিয়া খাইতেছে। শ্রী, সরল, সুভগ এবং ঠাকুমাতা।

অদ্যই বিনতা দেবীর শেষ অভিযান। তিনি এখন সম্পূর্ণ স্থির নিশ্চিত হইয়া গিয়াছেন বড় বধূর এত দিনের খ্যাতি, আত্মীয় মহলে তাহার আদর ও কদর সম্পূর্ণ ভাঙিয়া দিতে পারিয়াছেন। শুধু আর একজন আত্মীয়া আছেন। ইনি অনীতাকে বড়ই ভালবাসেন। অনীতাও ইঁহাকে যার-পর-নাই শ্রদ্ধা করে। তিনি জামাকাপড় পরিয়া

প্রস্তুত হইয়াছেন—গত পূজায় অনীতা যে জরির আঁশপাড় শান্তিপুরিটি দিয়াছিল তাহাই পরিয়াছেন। ছোটবধূ প্রস্তুত হইলেই তাঁহারা এই আত্মীয়ার ভুলটি ভাঙিতে যাইবেন।

আকাশে বিদ্যুৎ চমকাইল। কৃষ্ণকায় বিশাল পুরুষটি অনুচরকে বলিলেন—'শরসন্ধান করো।' অনুচর ধনু তুলিল। বিনতা বজ্রাহতবৎ পড়িয়া গেলেন।

আইরনি

সেই ভয়ানক রাত্রে বাড়িটি আত্মীয়স্বজনে ভরিয়া গেল। শবদেহ লইয়া অধিকাংশ পুরুষ চলিয়া গেলেন। ঘটনার আকস্মিকতায় অনীতা প্রস্তরমূর্তিবৎ, সে ভাবিতেছে—'মা! মা! চলিয়া গেলে? চিকিৎসার সুযোগ দিলে না? সেবা করিতে দিলে না? এমনি করিয়াই কি যাইতে হয়?' শ্রী এত কাঁদিতেছে যে তাহাকে শান্ত করা যাইতেছে না। সরল সারা দ্বিতল, একদল পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছে। শ্বশুরমহাশয় বলিলেন—'বউমা তোরা উপরে যা।'

অনীতা ধীরে ধীরে উপরে উঠিল। পিছনে পিছনে কন্যা। কেহই বসিতে পারিতেছে না। শ্রী ঠাকুমাতার ঘরে ঢুকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। বসিয়া বসিয়া শোকে, ক্রন্দনে, ক্লান্ত অনীতার একসময়ে তন্দ্রা আসিল। বহু রাত্রে তন্দ্রা ভাঙিয়া সে দেখিল শ্রী তন্দ্রার ঘোরে ফুঁপাইতেছে, সরল তখনও পায়চারি করিতেছে। সারা দোতলায় আর কেহ নাই। শুধু সে আর তাহার দুটি সন্তান। বহু আত্মীয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা সকলেই নীচে, গিয়া দেখিল—সবাই ঘুমে অচেতন, ইতস্তত যেমন-তেমন করিয়া ঘুমাইতেছে। অস্মি ঘুমাইতেছে, সুভগ ঘুমাইতেছে, শ্বশুরমহাশয় বসিয়া বসিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। নীচে কত লোক। তাই সেখানে এই আকস্মিক বজ্রপাতের বিভীষিকা নাই। কিন্তু নির্জন দ্বিতলে শোকার্ত পুত্র-কন্যা দুইটিকে লইয়া সে একা। কেহ নাই। কেহ নাই।

শ্রাদ্ধ-কর্ম হইতে লাগিল। নাতি-নাতনি পুত্রবধূরা ভুজ্যি উৎসর্গ করিল। কিন্তু আত্মীয়স্বজনেরা কেহই যেন তাহার সহিত কথা বলিতেছে না। তাহার কর্তব্য-কর্মগুলির সম্পর্কে বৈষয়িক কথা হইতেছে, কিন্তু উপরে তাহার ঘরে বিশ্রাম করিতেও কেহ আসিতেছে না, কেহ যাচিয়া তাহার সহিত কথাও বলিতেছে না।

শ্রাদ্ধ হইয়া গেল। নিয়মভঙ্গের পরিদিন অস্মিতা আসিয়া কিন্তু-কিন্তু করিয়া বলিল—'দিদি আজ হইতে আমাদের রান্নাবান্না সমস্ত আলাদা হইবে।'

বিস্মিতভাবে অনীতা চাহিল—সে নিজেই একবার ইহা ভাল মনে করিয়াছিল সে কথা সে আপাতত ভুলিয়া গিয়াছে। সদ্য শোকের আবহে সে দিশাহারা। মনে পড়িল খুড়ি ঠাকুমাতার কথা—'সংসারটিকে একত্র রাখিবে।' মনে পড়িল শাশুড়ি মাতার কথা—'তাহা হইলে আমি অনশনে প্রাণত্যাগ করিব।'

সে বলিল—'এখনি এ সকল কথা থাক না। পিতা রহিয়াছেন। দুদিন যাইতে দাও। তাঁহার সঙ্গেও তো পরামর্শ করা দরকার।'

অস্মিতা বলিল—'আপনার দেবর আর এক মুহূর্তও আপনার সঙ্গে থাকিতে চায় না। কেন, কী বৃত্তান্ত তাহা উহাকেই জিজ্ঞাসা করুন।'

কালু ভুলু অস্মিতা অনীতা অতএব নীচের ঘরে বসিল। কালু বলিল—

—"কেন থাকিতে চাহিতেছি না আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমার মাকে দাসীর মতো খাটাইয়াছ। তাঁহার গহনা-বেচা টাকায় দিনের পর দিন খাইয়াছ!'

অনীতা—'কী বলিতেছ কালু? ভাবিয়া বলো। তোমাদের সংসারে যতদিন আসিয়াছি ঘরে-বাহিরে চিরকালই আমি সর্বাপেক্ষা পরিশ্রম করিয়াছি। রন্ধন, লোক না আসিলে গৃহ-পরিষ্কার, কী না করিয়াছি।'

কালু মুখ বাঁকাইয়া বলিল—'সকালে দুইটা আলু পটল কাটিয়া চলিয়া যাইতে। বাকি সমস্ত কার্য করিত অস্মি এবং মা।'

অনীতা—'অস্মি আমি যতদূর জানি চিরকাল সংসারের জন্য সবচেয়ে কম করিয়াছে, সম্পূর্ণ তাহার নিজের সংসারের কথা বলিতে পারি না। আর মায়ের পরিশ্রম যাহা কিছু পিতার জন্য। বৈকালে কর্মক্লান্ত হইয়া ফিরিলে আমাকে তিনি চা-জলখাবার দিতেন বটে, আদর করিয়াই দিতেন, ইহাই কি দাসীত্ব? আর গহনা-বেচা? তাহা বন্ধ করিবার জন্যই তো প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছি। তাহা সত্ত্বেও কি তিনি গহনা বেচিয়াছেন? আমি তো জানি না।'

অস্মিতা বলিল—'মাতা বেশিরভাগ স্বর্ণ ও রৌপ্যই বেচিয়া দিয়াছেন।'

অনীতা বিস্মিত হইয়া বলিল—'তুমি জানিতে? আমাকে তো বলো নাই!'

—'কী করিয়া জানিব যে তুমি জানো না!'

—'দেখো অস্মি, তোমার সম্মুখেই কথা হইয়াছিল তিনি সত্য করিয়াছিলেন আর এরূপ করিবেন না। তাহার পর আমি তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়াছি। নিজের পড়াশোনা লইয়া মগ্ন থাকি, আমি কী করিয়া জানিব বলো!'

কালু বলিল—'তুমি, তুমিই কুবাক্য বলিয়া, না খাইতে দিয়া আমার মাকে মারিয়াছ।'

ভুলু বলিল—'কথাবার্তা এ রূপ চলিলে তো কথা বলাই চলে না।'

অনীতা বলিল—'নিজের মুখে বলিলে খারাপ শোনায়, কিন্তু না খাইবার অভ্যাস বহুকাল পূর্ব হইতেই মায়ের তৈয়ারি হইয়াছিল। আমিই তাহার প্রতিকার করি। এখনও প্রতিদিন রাত্রে তাঁহার মৎস্য আছে কি না না দেখিয়া খাইতে বসিতাম না। তাহা ব্যতীত বহুদিন হইল তিনি বহু রাত্রে তোমাদের সহিত খাইতে বসিতেন। সকালে তো আমি থাকিতামই না। তোমাদেরই তো দেখিবার কথা তিনি কী খাইলেন না খাইলেন। আর কু-বাক্য? কী কুবাক্য বলিয়াছি বলো তো? আমার মনে পড়িতেছে না।'

অস্মিতা বলিল—'আপনি আমাকে আর মাকে লক্ষ্মীছাড়া বলিয়াছিলেন।'

কালু বলিল—'কাহারও রিপোর্ট না, আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি।'

অনেক চিন্তা করিয়া অনীতার 'লক্ষ্মীছাড়া' শব্দটি আবছা মনে পড়িল, কেননা কথাটি জীবনে সম্ভবত একবার ব্যতীত তাহাকে বলিতে হয় নাই। সে অবাক হইয়া

বলিল—'সে কী! ও কথা তো আমি বলি নাই। বলিয়াছিলাম তোমাকে ও সেই দুষ্ট রাঁধুনিকে। তুমি উহাকে অনবরত অধিকার বহির্ভূত ভাবে আশ্রিম দিতেছিলে আর ও নিশ্চিন্তে কামাই করিতেছিল, আর আমাকে গুরুতর পীড়া লইয়া রাঁধিতে হইতেছিল।

তোমাকে তো আপন ভগ্নীর মতো স্নেহ করি, অস্মি, অপরাধ করিলে মাঝে মধ্যে ধৈর্যচ্যুতি কি হইতে পারে না, বলো?'

কালু চিৎকার করিয়া বলিল—'এখন আবার সাফাই গাহিতেছ? নচ্ছার মেয়েমানুষ! মা নিজে সমস্ত আত্মীয়স্বজনকে তোমার এই অপমানের কথা বলিয়া গিয়াছেন। কেহ তোমার মুখ দেখিতে চাহে না! কেহ না!'

অনীতা টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। বহু কষ্টে হতচেতনের মতো নিজ কক্ষে আসিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল। ক্ষীণ স্বরে ভুলুকে বলিল—'আমাকে এত অপমান করিল তুমি কিছু বলিলে না?'

ভুলু বলিল—'ও স্থানে কিছু বলিলে হাতাহাতি হইত। ইতর হইতে দূরে থাকাই ভাল।'

অনীতার কণ্ঠস্বর এখন আরও ক্ষীণ। সে বলিল—'পত্নীর সম্মানরক্ষার জন্য জীবনে একবার না হয় হাতাহাতিই করিতে। তুমি তো অন্তত জানো, উহাদের কথা কতদূর মিথ্যা! এ তো মিথ্যা! এত অপমান! এত অপযশ...তুমি কিছু করিলে না?'

ভুলুর জবাব অনীতা আর শুনিতে পাইতেছিল না। তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। মাতা ভাবিয়া গেলেন সে তাঁহাকে 'লক্ষ্মীছাড়া' বলিয়াছে? কী সাংঘাতিক ভুল? কী সর্বনেশে মূঢ়তা? একবার, একবার যদি তিনি রুখিয়া দাঁড়াইতেন। দুটি মন্দবাক্য বলিতেন, কাঁদিয়া ফেলিতেন, সে বুঝিতে পারিত, তৎক্ষণাৎ ভুল ভাঙিয়া যাইত। কিন্তু এখন তো আর উপায় নাই। কেহই আর তাহার কথা বিশ্বাস করিবে না। সে একজন ডিগ্রিধারী চাকুরিরতা মহিলা, তাহাকেই সকলে চতুর, দাম্ভিক বলিয়া ঠাওরাইবে। অস্মিতার মতো একজন ম্যাট্রিকুলেট বধূ যে আরও বহুগুণে চতুর হইতে পারে, এ কথা কে বিশ্বাস করিবে?

দূর হইতে তাহার কানে প্রবেশ করিতে লাগিল শ্রী আর সরলের ডাক—'মা তুমি এমন করিতেছ কেন? কী হইয়াছে? শরীর খারাপ লাগিতেছে?' সেইসঙ্গে সগর্জন ইতর হুঙ্কার—'নচ্ছার মেয়েমানুষ কোনও আত্মীয়স্বজন তোমার সহিত সম্পর্ক রাখিবে না, কেহ না।' সে যে বয়সে শ্বশুরগৃহে অ-নীতা হইয়া আপনি আসিয়াছিল, প্রায় ততদিনই কাটিয়া গিয়াছে, শ্বশুরগৃহের বহু আত্মীয়কে সে প্রাণাধিক ভালবাসে। তাঁহাদের সহিত তাহার কতকালের সম্পর্ক! কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল না, তাহার কিশোরী কন্যাটিকে কেহ সান্ত্বনা দিল না, স—ব চুকিয়া গেল, একজন মাত্র একজনের একটি কথায়? তিনি যে দেবী! দৈববাণীকে কে অবিশ্বাস করিবে?

হঠাৎ অনীতা অনুভব করিল সে একটি সুড়ঙ্গ-পথে বেগে ধাবিত হইতেছে। এত বেগে যে তাহার দেহ হইতে জামাকাপড় খসিয়া পড়িতেছে। তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিও খসিয়া পড়িতেছে। ওই তাহার দক্ষিণ পদ গেল, ওই বাম হস্ত ঘুরিতে ঘুরিতে চলিয়া যাইতেছে। ও-ই চক্ষু খসিয়া পড়িল, যাঃ! কর্ণ দুইটি খট করিয়া খুলিয়া

গেল। সে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে সামলাইতে পারিতেছে না। অথচ তাহার লাগিতেছে না। সে যেন ক্রমশ হালকা আরও হালকা হইয়া যাইতেছে। অবশেষে যখন তাহার চেতনাটুকু ছাড়া আর কিছুই নাই, তখন বেগ সংবরণ হইল। সে দেখিল সম্মুখে একটি জ্যোতিঃপুঞ্জ।

অনীতা জিজ্ঞাসা করিল, যদিও কণ্ঠস্বর দিয়া নহে—'আপনি কি ঈশ্বর?'

জ্যোতিঃপুঞ্জ বলিল—'না, আমি ঈশ্বর নহি, তোমরা যাহাকে চিত্রগুপ্ত বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকো, আমি কতকটা তাই।'

অনীতা বলিল—'আমি আমার শ্বশ্রূমাতা বিনতা দেবীকে দেখিতে বড় আকুল হইয়াছি, তাঁহাকে আমার কিছু বলার ছিল।'

উত্তর হইল—'এ স্থূল পরলোক। সকলেই সকলের মনের প্রাণের কথা বুঝিতে পারে, তুমিও ক্রমে পারিবে। ওই যে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠতুল্য ক্ষীণকায় জ্যোতি দেখিতেছ—উহাই তোমার শ্বশ্রূমাতা।'

—'উঁহার জ্যোতি এতো ক্ষীণ কেন?'

—'উনি সাম্প্রতিক জীবনে একটি সাঙ্ঘাতিক ভুল করিয়া আসিয়াছেন, তাই ম্রিয়মাণ। তোমার কথাগুলি বলিতে হইবে না। উনি পরলোকে আসিবামাত্র বুঝিতে পারিয়াছেন।'

হঠাৎ অনীতা ভীষণ ব্যস্ত হইয়া বলিল—'আমি তো তাহা হইলে মরিয়া গিয়াছি। আমার ভালমানুষ স্বামী, আমার কিশোর-কিশোরী পুত্রকন্যার কী হইবে? আমাকে শীঘ্র ফিরাইয়া দিয়া আসুন।'

জ্যোতিঃপুঞ্জ হাসিয়া বলিল (যদিও সে হাসি মর্ত্যলোকের হাসির অনুরূপ নহে)—'আবেগে, অন্ধ হৃদয়ের তাড়নায় নিজ সন্তানের কথা না ভাবিয়া পরের কথার যন্ত্রণায় ভারসাম্য হারাইয়া মৎপ্রদত্ত শক্তিশালী হৃদযন্ত্রটিকে বিকল করিয়া বসিলে। রামকৃষ্ণ বলিয়া একটি বুদ্ধিমান মানুষ বারবার বলিলেন—লোক না পোক! শুনিলে না, এখন ফিরিতে চাহো। পরলোকে আসিলে কেহ ফিরে? তবে শান্ত হও বৎসে, শীঘ্রই তোমার পূর্বস্মৃতি লোপ পাইবে। আর পূর্বজন্মের প্রিয়জনদের জন্য কষ্ট থাকিবে না।'

অনীতা বলিল—'দয়া করিয়া পূর্বস্মৃতি লুপ্ত হইবার পূর্বেই আমায় ফিরাইয়া দিন। মিনতি করিতেছি। নচেৎ উহারা ভাসিয়া যাইবে।'

আরেকটি বৃহত্তর জ্যোতিঃপুঞ্জ দৃষ্ট হইল। ইহা বলিল—'কেহই ভাসিয়া যাইবে না বৎসে। আবার মহাজীবনস্রোতে সকলেই ভাসিয়া যাইবে। এক জন্মের লীলাখেলা তো সাঙ্গ করিলে, কিন্তু আইরনিটুকু বুঝিলে কি?'

অনীতা বলিল—'আপনি কি ঈশ্বর? কী প্রকার আইরনির কথা বলিতেছেন?'

জ্যোতি বলিল—'আমি ঈশ্বর নহি। তোমার যাহাকে যম বলো আমি তাহার কাছাকাছি কিছু। আইরনি বুঝিতে পারিলে না? বিনতা, তুমি দেবী হইতে চাহিয়াছিলে, মান-সম্মান, সন্তান, সত্য শেষ পর্যন্ত সকলই ইহার জন্য বিসর্জন দিলে। বলো, দেবী হইতে পারিয়াছ কি?'

বিনতারূপ জ্যোতি ম্লান কণ্ঠে কহিল—'না।'

—'অনীতা, তুমি নারীদিগের মর্যাদা, শিক্ষা, ইত্যাদি চাহিয়াছিলে। পারিলে?'

অনীতা বিষণ্ণকণ্ঠে বলিল—'পারি নাই।'

যমজ্যোতি কহিল—'তোমরা ত্যাগ করিয়াছিলে, সংগ্রাম করিয়াছিলে, পারো নাই, কিন্তু তোমাদের এই ত্যাগ ও সংগ্রামের মধ্য দিয়া একরূপ বিনা আয়াসে কিংবা নেতিবাচক প্রয়াসে অন্য একজন দেবী হইয়া বসিয়াছে। স্মিতহাসিনী, স্বল্পভাষিণী, আধা অত্যাচারিতা, তবু ক্ষমাশীলা, পরিবার ও আত্মীয়কুলে উহার দেবীত্ব বিষয়ে কাহারও সংশয় নাই, উপরন্তু সে একপ্রকার মুক্তি ও মর্যাদা লাভ করিয়াছে। প্রথম হইতেই সে যাহা চাহিয়াছিল, স্বতন্ত্র সংসার, শ্বশ্রূমাতা ও জা হইতে মুক্তি, আত্মীয়গণের পৃষ্ঠপোষকতা, অপ্রিয় কাজগুলি স্বামীকে দিয়া করাইয়া নিজ প্রতিমা অক্ষুণ্ণ রাখা, স্বামীর অনুগত হইয়া তাহার বশ্যতা এই সকলই সে লাভ করিয়াছে। ইহাকে ফিমেল ডমিন্যান্স বলিবে না?'

তখন দুইজনে ভূলোকের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—জ্যোতির্বৃত্তের মধ্যে উদ্ভাসিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে—অস্মিতা।

যম এবার চিত্রগুপ্তের প্রতি ছোট্ট একটু ইঙ্গিত করিলেন। এই দিব্য ইঙ্গিতের অর্থ, 'আত্মাদুটির নূতন জন্মের সময় হইয়া গিয়াছে, পাঠাইয়া দাও।'

পরলোকের নিয়ম এক ধরনের অভিজ্ঞতা এক জন্মে হইয়া গেলে, পরজন্মে ভিন্নতর অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে পাঠানো হয়। যমের নির্দেশ ছিল বিনতা দেবী সারা জীবন যেহেতু স্বাধীনতাহীনতায় কাটাইয়াছেন, আজ্ঞা পালন করিয়া কাটাইয়াছেন, সেহেতু তিনি এইবারে আজ্ঞা দিবেন, মানুষের মুক্তির জন্য বীরের ন্যায় সংগ্রাম করিবেন। এবং অনীতা যেহেতু মুক্তি মর্যাদার জন্য তাহার পরিবারে অনেক সংগ্রাম করিয়া প্রাণ দিল সেহেতু সে মুক্ত নারী হইয়া অপরাপর মুক্ত নারীদের মধ্যে জন্ম লাভ করিবে। চিত্রগুপ্ত দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠস্বরূপ আত্মাকে দুইটি টুসকি দিলেন। দিয়াই তিনি জিভ কাটিলেন। তিনি সামান্য ভুল করিয়া ফেলিয়াছেন। দুজনের স্থান বদল হইয়া গিয়াছে। বিনতা দেবী এখন ইউনাইটেড স্টেটস-এ ফ্লোরিডার কমলালেবু বাগানের অধীশ্বরের গৃহে জন্মাইয়াছেন, অতলান্তিক সাগরের উপকূলে তিনি আপাতত সুইমিং কস্টিউম পরিয়া ট্যান হইতেছেন। শীঘ্রই ডেটিং শুরু করিবেন। নাম হইয়াছে লোলিটা। আর অনীতা উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে সামান্য উত্তর পশ্চিমাংশে, অ্যালাবামার গেটোতে। মার্টিন লুথার কিং নামে এক ব্যক্তির নেতৃত্বে কালো মানুষের অধিকার ও মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিতেছে। নাম? নিষ্প্রয়োজন। হলিউডের অ্যাকট্রেসের নাম হইলে বলিতাম। সংগ্রামী, তাহাও আবার ব্ল্যাক। নামে কী হইবে?

সানন্দা পার্বণী ১৯৯৭ (১৪০৪)

বাণী বসু

উপন্যাস পঞ্চক

উমেশচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরী
স্থাপিত-১৮৯৭
হুগলী

ঘুম

বাণী বসু

উপন্যাস পঞ্চক

উমেশচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরী
প্রাপ্ত-১৮২৭
খুলনা

বাড়ির মেয়েদের শাদিতে দহেজ দিতে দিতেই কাবার হয়ে গেল আগরওয়াল পরিবার।

'—লড়কি দুশমন, ভগোয়ানকে পূজা করো যাতে তিনি আমাদের ঘরে আর লড়কি না ভেজেন,' পিতার এই আর্জি কানে নিয়েই কর্মজীবন আরম্ভ করেছিলেন হৃদয়নারায়ণের পিতাজি।

এত দিন পরে সেই প্রার্থনা পূর্ণ হল। লড়কিও নেই। জানানাও নেই। বাস, ফুরিয়ে গেল।

এই আগরওয়ালরা মূলত জয়পুরি বানিয়া। হরিয়ানি নয়। খরক গ্রাম জয়পুর অঞ্চলের অজিতগড়ে তাঁদের ডেরা। গোলাপি বালু মেশানো থাকত এক সময়ে এঁদের গায়ের রঙে। তা সে সব দিন আজকাল তো চলেই গেছে। উত্তর-পশ্চিমের মরুপথ ঘুরে ভারতের পূর্বাঞ্চলে এঁরা রুজির ধান্দায় দীর্ঘদিন বসবাস করছেন। এখন তামার রং ধরেছে এঁদের পুরুষদের গায়ে। মেয়েরা ফর্সা। কিন্তু পাথর ফাটিয়ে শুকনো শীত শুকনো গ্রীষ্মের হাওয়ায় বেরিয়ে আসা ফুলের স্বাস্থ্য যেন আর সে রঙে নেই। মেয়েদের কথা যাক। লড়কি দুশমন।

অজিতগড়ের খরক গ্রামে নদী নেই তাই বলে। নালা আছে একটা। বর্ষার জল পেয়ে সেটা ফুলে ফেঁপে উঠলে খেতি-বাড়ি হয়। ভরসা ওই বৃষ্টিরই জল। খাবার জন্যে মাটির তলার জলই ভরসা। একশো গজের মতো গভীরতার নলকূপে জল ওঠে। সে জল মিষ্টি এবং স্বাস্থ্যকর। অনেক পাথর, নুড়ি, বালুর মধ্যে দিয়ে পরিস্রুত হয়ে আসছে তো। হয় বাজরা, জওয়ার, কিছু ডাল, অতি সামান্য সীমিত সংখ্যার সবজি। এই শুকনো গাঁয়ে বর্ষার নালার জল আর মাটির ভেতরকার বালু-খোঁড়া মিঠা পানির ভরোসায় পোটিয়া পাগড়ি মাথায় বেঁধে লাঙলও হয়তো চালিয়ে ছিলেন এঁরা। সেই চাষবাসের ইতিহাস এঁদের দেহ থেকে মুছে যেতে শুরু করে বানিয়া-বৃত্তি নেবার পরে। আর ও অঞ্চলের সমৃদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র যোধপুরে বসত করার পর একেবারেই মুছে যায়। কেন যোধপুর, কেন মরুর কাছ ঘেঁষা ওই শহর, আরও বিলাসবহুল পিঙ্ক সিটি জয়পুর নয় সে প্রশ্নের উত্তর কি অজিতগড়ি কি যোধপুরি আগরওয়ালরা দিতে পারবেন না। জীবিকার তাড়ায়, শ্যামলতর চারণভূমির সন্ধানে সারা পৃথিবীতেই তো মানুষ ক্রমাগত তার জন্মভূমি ছেড়ে যাচ্ছে। কানানের নিজভূমি, কিংবা এলডোরাডোর স্বপ্ন তো শুধু কোনও একটা জাতির নয়! বিশ্ব জুড়ে এই সাধ, এই চলাচল।

মহাকালের দিগন্তরেখার দিকে চোখ মেলে তাকালে একটি উচ্চাবচ মনুষ্যযাত্রার শিলুয়েৎ দেখা যাবে। এশীয়রা চলেছে উত্তর আমেরিকার দিকে, ইউরোপীয়রা এসেছে এশিয়ার দিকে, মধ্য এশিয়ার আরব পারস্য তুর্কিরা ছড়িয়ে পড়েছে ভারতে, আফ্রিকায়, চিনারা গড়েছে চায়না টাউন সারা দুনিয়ায়। মহাদেশগুলোর অভ্যন্তরে এই চলাচল আরও বিচিত্র আরও দ্রুত। পঞ্জাবি হয়ে যাচ্ছে কলকাত্তাইয়া, বাঙালি হয়ে যাচ্ছে তেলেঙ্গি, তেলেঙ্গানার লোক বসত করছে দিল্লি হরিয়ানায়। পঞ্জাবি কেন পঞ্জাবে তার রুটি পেল না, তাকে কলকাতায় আসতে হল, বাঙালি কেন মহারাষ্ট্রবাসী হওয়াটাই পছন্দ করল, কেরলাইট কেন অসমের চা বাগানে বলা খুব শক্ত। যার চাল যেখানে মাপা আছে।

হৃদয়নারায়ণদের পরিবারের মূল শাখাটি এখনও খরক গাঁও অজিতগড়ে বসবাস করছে। তাঁর দাদাজির ভাইয়ের পরিবার। আজও তাঁরা অজিতগড় অঞ্চলে শস্যের ব্যবসা করেন। প্রতি শাখায় একটি কি দুটি ছেলে আর একগাদা করে মেয়ে। ছেলে কম থাকায় পরিবারগুলো বেশ সংহত আছে। তিন চার পুরুষ ধরে সম্পর্ক রয়েছে। বিয়ে শাদি উপলক্ষে দেখা সাক্ষাৎ হয়। ওঁদের ওখানে এখন বিজলি এসে গেছে, স্কুল হয়েছে, তবু যেন কেমন গাঁওয়ার রয়ে গেছেন সব। এখানে যখন আসবেন, আগরওয়াল ছেলের সঙ্গে কেন অসওয়ালি মেয়ের বিয়ে হবে, জামাই কেন মাহেশ্বরী হল, এ আগরওয়াল গর্গ গোত্রের না সিংঘাল গোত্রের এ সব নিয়ে উরু চাপড়ে উচ্চঃস্বরে এঁরা বেজায় তর্ক করবেন। ওঁদের কঞ্জুসি, গাঁওয়ারপন ভাল লাগে না হৃদয়নারায়ণের। কিন্তু কেমন একটা প্রাণের টানও আছে। তা ছাড়াও লড়কিগুলির শাদি? তাতে সাহায্য করতেই হয়। এগুলো পুরো বংশের দায়।

হোলির পর ওখানে গাঙ্গুরের উৎসব হবে সতের আঠার দিন ধরে। হাতি চলবে উট চলবে সাজগোজ করে। মেয়েরা চল্লিশ গজ ঘাঘরা পরে, নাকে বেসর, কানে ঝুমকো, গলায় হাঁসুলি, হাতে কনুই পর্যন্ত কাচের চুড়ি, পায়ে বাঁকি মল পরে মিছিলে যাবে। হোলির সময় থেকেই তাই কলকাতায়-বসত অজিতগড়িদের মন কেমন করবে দেশের জন্য। আর গাঁওয়ের পরিষ্কার বাতাসে শীতের দিনে ভেসে থাকা বরফের মতো চাঁদের টুকরো? সেই চাঁদনিতে গাঁওয়ের ঘর থেকে লোরি ভেসে আসছে—'এ মনোয়া রে, এ গুড়িয়া রে, নিদিয়া আ যা রে.....'

তা সেইসব গাঙ্গুর আর চাঁদনি, পরিষ্কার বাতাস আর লোরি ছেড়ে হৃদয়নারায়ণের দাদাজি যখন যোধপুরে পাড়ি দেন তখন ধরেই নেওয়া যায় তিনি উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন, দারুণ তাপ খরা আর শীতের সঙ্গে যুদ্ধ করে কোনওমতে টিকে থাকতে তিনি মোটেই রাজি ছিলেন না। হয়তো তাঁর স্নেহময়ী মা অনেক কান্নাকাটি করেছিলেন, রক্ষণশীল পিতা হয়তো অভিশাপও দিয়ে থাকবেন। কিন্তু তাঁকে আটকানো যায়নি।

যোধপুর বাণিজ্যের স্বর্গপুরী। বহুযুগ আগে থেকেই মধ্য এশিয়ার সঙ্গে ভারতবর্ষের বাণিজ্য চলত এই যোধপুর জয়সলমিরের ট্রেড রুট দিয়েই। উটের ক্যারাভ্যান তখন সার বেঁধে আসা-যাওয়া করত থর মরুভূমির এপার ওপার। সেই জমজমাট স্থলবাণিজ্যের দিনগুলি যোধপুরে কখনই একেবারে মুছে যায়নি। হেন

জিনিস নাকি ছিল না যা নিয়ে তাঁর দাদাজি ট্রেডিং করেননি। বাঁধনি কাপড়, জরির নাগরা, উটের লোমের কম্বল, চাঁদির ওপর পিতলের ওপর মীনাকারির জিনিস, হলুদ বেলে পাথরের বাসন....কী নয়?

এখন যেখানে যোধপুর সেন্ট্রাল এরিয়ার টুরিস্ট ব্যুরোর আপিস ওরই কাছাকাছি ছিল দাদাজির ভাড়াবাড়ি। সেই বাড়িতেই জন্মেছেন হৃদয়নারায়ণ। পরে সর্দার মার্কেটের কাছে হাভেলি তৈরি করে উঠে যান তাঁরা। একতলা থেকে তিনতলার ছাদ পর্যন্ত বাইরের দিকে সিঁড়ির সেই বাড়ি যেন তাঁর ছেলেবেলা। একতলার ঘরগুলো বেশিরভাগই ছিল গুদাম। অফিসও। তবে একটা ঘর ছিল যেখানে দারুণ গ্রীষ্মের দিনে তাঁরা শুতেন, যত দুষ্টুমি হত সেইখানেই। তাঁর পিসি বড়ি মুন্নি, তিনি, তাঁর বহেন ছোটি মুন্নি।

এই দুই মুন্নি বড়ি আর ছোটি হৃদয়নারায়ণের জীবনের পয়লা নম্বর দুশমন। এদের জন্যই তিনি সেই প্রিয় জন্মভূমি থেকে উৎখাত হলেন এই ভিজে, গরম ভাপের হাওয়ার নোংরা শহরে যে শহর তাঁর অভ্যেসে এমন ঘুণ ধরিয়ে দিয়েছে যে এখন আর সেই পুরনো জায়গায় তিনি ফিরে যেতেও পারেন না। উপায় থাকলেও না।

বড়ি মুন্নি, ছোটি মুন্নি আর তিনি কালচে কালচে বাজরি রুটি খাচ্ছেন দহি দিয়ে, মনে করবার চেষ্টা করলেই তিনি দেখতে পান। গ্রীষ্মের দিনে মোতিয়া (তরমুজ)-র ফালি তিন জনের হাতে। ওখানে তো তখন ফল কিছুই পাওয়া যেত না মোতিয়া ছাড়া। নারাঙ্গি, আপেল, আঙুর এ সবের স্বাদ পেয়েছেন আরও বড় বয়সে, পিতাজির সঙ্গে কলকাতায় এসে। এখন তো ওই সব মরু অঞ্চলের চেহারা পাল্টে গেছে, ভাল আঙুর হচ্ছে, অন্যান্য ফল, সবজিও কিছু কিছু হচ্ছে। তখন রুটির সঙ্গে সাঙরি কিংবা গুয়ার কি ফালির সবজি মিলল তো পরব মনে হত। সারা বছর বড় বড় জারে আচার শুকোত। যখনই খিদে পাবে ঘিয়ে ডোবানো রুটি আর আচার। কড়াই করতেন দাদিমা। হরা মুঙ্গ কিংবা মোট কি ডাল সঙ্গে। এ ছাড়া ছিল ভইসের দুধ। আর কিছু না। পরের দিন চাবল মিলত। তা সেই বাজরি রুটি, টক দই আর হিঙের আচারের জন্যে এই বয়সেও তিনি দশ মাইল বারো মাইল হেঁটে যেতে রাজি আছেন।

তবে হ্যাঁ, বঙ্গালিদের মতো আক্ষেপ আর স্মৃতিচারণ করে কাল কাটাবার মানুষ হৃদয়নারায়ণ নয়। যোধপুর তাঁর জন্মভূমি, ছেড়ে আসতে হয়েছে। কারবারি লোক যেখানে কারবার ফলাও করতে পারবে সেখানেই জমে যাবে। মুম্বই তো চলো মুম্বই, বাঙ্গালোর তো চলো বাঙ্গালোর, রামজি যে সব জায়গায় কখনও যাননি, সে সব জায়গাতে যদি নাফা হয় তো সেখানেই যাবে, সেখানেই জিন্দগি গুজরে দেবে কারবারি।

—'এ শ্যামলাল, পানি দিয়ে যা।'

কী? পানি মিলল তো? এমন তো নয় যে পানি মিলছে না। না মিললেও কুছ পরোয়া নেই। তাঁদের জনানারা একটার পর একটা পেতলের কলসি পরের পর সাজিয়ে কত দূরের বাঁধ থেকে পানীয় জল আনতে অভ্যস্ত। জাতিগতভাবে এই কষ্টসহিষ্ণুতা, পরিশ্রম করবার ক্ষমতা তো তাঁদের রক্তেই আছে। সুতরাং পানীয়

জলের সহজলভ্যতাটার অভাবটাও কোনও সমস্যা নয়। ধান্ধা এবং নাফার জন্য সব রকম কষ্ট সইতেই তাঁরা রাজি। হৃদয়নারায়ণও এর ব্যতিক্রম নন।

উনি আশি পূর্ণ একাশিতে পড়েছেন। পাঁচ ফুট 'গারা ইঞ্চি খাড়াইয়ের বলিষ্ঠ শরীর। মাজা তামার মতো গায়ের রং। ছোট ছোট সফেদ চুল। ভুরুও পাকা। আঁখের ওপর একটু ঝুলে ঝুলে পড়েছে। গোঁফ দাড়ি এমনিতেই বেশি নয়। কামিয়ে রাখেনও ভাল করে। উনি ধুতি পাঞ্জাবি পরেন। গলায় মোহর লাগানো মোটা সোনার হার আছে। পৈতে পরেন এক গোছা। যত্ন করে মাজেন পৈতে। ওঁদের কালে ওঁদের পিতারা উপনয়নের মতো একটা কিছু পালন করতেন। এখন আর চল নেই। যেমন তাঁর পুত্র জগদীশের পৈতে নেই, হৃদয়নারায়ণের কপালে গোলা সিঁদুরের ফোঁটা। একটু লম্বাটে। উনি এখনও গদিতে থেবড়ে বসতে পারেন রাজনৈতিক নেতাদের মতো। খালি ভাষণটাই দিতে পারেন না। প্রয়োজনের বেশি কথাই বলেন না।

—'এ মিশির বহুকে ডেকে দে'।

কিংবা 'বিলগুলো পেমেন্ট হল? তাগাদা লাগাও।'

কিংবা—'লাডলিকে খত পাঠাও।'

'পিঙ্কিকে পানশও এক টাকা পাঠিয়ে দাও। পোতা নয় ক্লাসে উঠল তো।'

'আগরওয়াল অ্যান্ড সন্স'-এর কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রিটের অফিসে আজ ছুট্টি। কিন্তু কর্মচারীদের উপস্থিতি শতকরা শতভাগ। কেন না, আগরওয়ালজির আজ আশি পূর্ণ হল। আফিসটাও গাঁদা ফুলের মোটা মালা দিয়ে মেট্রো প্যাটার্নে সাজানো হয়েছে। একটা করে হলুদ গাঁদা, একটা করে বাসন্তী গাঁদা। গণেশজি আর বজরংবলীজির পূজা চড়ানো হয়েছে। ঝাঁঝালো সেন্টের গন্ধ-অলা আগরবাতির ধোঁয়ায় অফিসের তিন পার্টিশন করা ঘরখানা ভরে গেছে। এক দফায় তেওয়ারির সামোসা, কচৌরি, হলদিরামের ভুজিয়া, লাড্ডু, এ সব এসে গেছে। ম্যানেজারজি, টাইপিস্টজি, অ্যাকাউন্টস ক্লার্কজি, দারোয়ান, ড্রাইভার কুলি সব্বাই খেয়েছে। দুপুর টাইমের খানার জন্যেও মহারাজ এসেছে, খিচড়ি চাপাচ্ছে। গাজর কি হালোয়া ঘুঁটছে কড়ায়, আলুমটর বানাচ্ছে, দহি পাপড়ি কি চাট বানাচ্ছে।

যদি কেউ মনে করেন হৃদয়নারায়ণের জন্মোৎসব বছর বছরই পালন করা হয় তা হলে তিনি ভুল করবেন। আসল কথা, তাঁদের বিজনেসের একটা বড় শেয়ার তাঁরা বেচে দিচ্ছেন ছাবারিয়াদের কাছে। কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রিটের অফিস কর্মচারী সব হস্তান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। এই উপলক্ষ করে পুরনো কর্মচারীদের একটু খানার বন্দোবস্ত করা, খুশি করে দেওয়া। এঁরা মনিব ভালই ছিলেন, কর্মচারীরা বেশ ক্ষুণ্ণই।

ছাবারিয়ারা কাল থিয়েটার রোডের এক বড় হোটেলে পার্টি দিলেন। সেখানেও হৃদয়নারায়ণজির আশি বছর পূর্তিটাকেই উপলক্ষ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। উনি তাই বলে বেশি কিছু সাজগোজ করেননি। বহু যেমন ফিনফিনে ধুতি আর ধবধবে পাঞ্জাবি বার করে দিয়েছে পরেছেন, গলায় মোটা মোহর লাগানো সোনার হার, মুখ পানে লাল, মুখের চেয়ে তিন চারগুণ ফর্সা পায়ের গোছসুদ্ধু অনেকটা খালি অংশ

পেছন থেকে দেখা যাচ্ছে। হাতে ওঁর রোলেক্সের ঘড়ি, হিরের আংটি, একটি রক্ত প্রবালও আছে, কপালে সনাতন সিন্দুরের টিকা। ছাবারিয়া আরও খানদানি ব্যবসায়ী। ওঁদের মহলের সব নামী ব্যবসায়ী, সরকারি অফসর, জজ, অ্যাডভোকেট, ব্যারিস্টার, যশস্বী ডাক্তার এই ধরনের অতিথি সব। মোবাইল হাতে নিয়ে সিয়েলো, ওপেল, মারুতি এসটিম, মার্সিডিজ থেকে নামছেন এঁরা। পকেটে পেজার চিনচিন করছে। কথা কি বলতে দেয়? জয়পরকাশ শেঠ ডাক্তার সাবের তিনটে পেজার মেসেজ এসে গেল। এমার্জেন্সি অপারেশন। তিনি কুলফির প্লেট নামিয়ে, গোঁফ মুছে কোনওমতে একবার হৃদয়নারায়ণ একবার পরভুদয়াল ছাবারিয়ার অভিমুখে হাত নেড়ে চলে গেলেন। সরকারি অফ্সরলোগ নয়া জমানার কারবারিদের সঙ্গে পান করছেন। ছাবারিয়াজি 'ইয়ে হ্যাঁয় হামারা গ্র্যাণ্ড ওল্ড ম্যান' বলে হৃদয়নারায়ণকে পরিচিত করে দিতে চাইলে তাঁদের উদাস দৃষ্টি হৃদয়নারায়ণকে ভেদ করে চলে যায়। ছাবারিয়া বুঝতে পারেন এঁরা পার্টির মূল কারণকে অভিনন্দিত করবার অবস্থায় এখন নেই।

আগামিকাল হৃদয়নারায়ণের ঘনিষ্ঠদের নিয়ে ঘরোয়া উৎসব। রাত দশটা নাগাদ বাড়ি ফিরে হৃদয়নারায়ণ দেখলেন তাঁর তিসরি বেটি লাডলি আর চৌথি বেটি পিংকি দুজনে দুখান থেকে এসে গেছে। লাডলির সঙ্গে তার পুত্রবধূ, ছোটছেলে। পিংকি এসেছে বরের সঙ্গে। তার কলেজ পড়ুয়া ছেলে মেয়ে, লাডলির বড় ছেলে, মেজ ছেলে এরা আসবে কাল।

বহুর সঙ্গে গল্প জমিয়েছে ওরা। বহোৎ মিঠাই নিয়ে এসেছে দুই বেটি।

'পিতাজি আপনার আশি সাল হল মনে হচ্ছে না। যেন সেই দিন আমার শাদি হল। আপনার ভুরু তখন সব কালা ছিল কিন্তু।'

বাপের মতো চ্যাটালো, মায়ের মতো ভারী হয়েছে লাডলি। তা তো হবেই। চার বেটা বেটির মা, সৌভাগ্যবতী বেটি তাঁর। খুবই হাসিখুশি আহ্লাদি ছিল। আগে বাপের, এখন স্বামীর। সদা সুখী সদাসুহাগন থাক। অনেক মূল্য দিয়ে এই সুহাগ কেনা। তা সত্ত্বেও তো টিকিয়ে রাখা যায় না। যার নসীব যেমন।

ছোট মেয়ে পিংকি তাঁর রাত্রে পান করবার গরম দুধ নিয়ে আসে। বহুই ঠিক করে দেয় রোজ। নিয়ে আসে মিশির। এমনটাই পছন্দ তাঁর। খুব ঘনিষ্ঠ হতে চান না প্রিয়জনদেরও। তা মিশিরের হাত থেকে গ্লাসটা জোর করে নিয়ে পিংকিই এলো আজ।

পিংকির পরনে লাল হলুদ ছাপ শিফনের কাপড়। স্বাস্থ্য ফেটে পড়ছে, রংও। দেখতে দেখতে হৃদয়নারায়ণের বুকটা সুখে গর্বে ভরে যেতে থাকে। এমন স্বাস্থ্য এমন সুখ, এত সার্থকতা স-ব তিনি পয়দা করেছেন। কোথায় ছিল কালা-কালা বালের গোরা-গোরা মুখচন্দ্রের এই আওরত? ছিল শূন্যের সঙ্গে মিশে বিলকুল 'না' হয়ে। তিনি একে পাসপোর্ট ভিসা সব দিলেন তবে না এ সেই অনস্তিত্বর অন্ধকার থেকে জীবনের রোশনি হয়ে নেমে এল। তিনি কি তা হলে এক ধরনের ভগোয়ান নন? দণ্ডমুণ্ডের কর্তা?

রাম! রাম! কী ভাবছেন তিনি! এই সব ঘমণ্ড প্রকাশের কি এই সময়? আশি

বছরের জনম দিনটায়?

পিতার মুখে নানারকম ভাবের আসা-যাওয়ার দিকে পিংকি তাকায় না। তাকালেও দেখতে পায় না। সে যেদিকেই তাকায় নিজের সুখের মুখই দেখে। তার পতি, পতির সোহাগ, তার পুত্র, পুত্রের চমৎকার ভবিষ্যৎ, তার নিজের সুখ, অনেক অনেক সুখের মধ্যে বিশেষ সুখ তার নিজের।

'বাপু, আপনি জামা-কাপড় বদলে বিস্তরায় উঠে পড়ুন, তারপর আমি গ্লাসটা দেব।' সে খুশি আর কর্তব্যবোধের তাড়ায় বলে। এঁদের কাছে দুধই জীবন। এত জায়গায় এত দাওয়াত, কত রকম খানার ব্যবস্থা, কিছু স্পর্শ করেন না। আজও করেননি। ঠিক টাইমে খাওয়া, ঠিক টাইমে ঘুম, ঘুমের আগে এক গ্লাস দুধ। এক গ্লাস জীবন।

লাল্লা লাল্লা লোরি
দুধ কা কটোরি....
লাল্লা লাল্লা লোরি
দুধ কা কটোরি....

দুধের বাটি হাতে এক দুগ্ধশুভ্র স্বপ্নের মধ্যে ভেসে যান হৃদয়নারায়ণ। মেয়েরা, পোতারা গপস্‌প করুক। বহু দেখাশুনা করুক। তাঁর আশি বছরের অভ্যাস এখন তাঁর মুখের কাছে কবোষ্ণ দুধের বাটি ধরেছে। এত চমৎকার নিদ আসে। কবোষ্ণ ঘুম। দুধের বুদবুদ ওঠে চারদিকে। সেগুলি বর্ণালি মেখে হাওয়ায় উড়ে যায়। সফেন দুধ ঢালা উপুড়, ঢালা উপুড় করেন ঘুমে, আরও ফেনা, আরও ফেনা এক গ্লাস দুধের ওপর এক গ্লাস ফেনা। জীবন এবং জীবনের উল্লাস।

২

হৃদয়নারায়ণের একমাত্র পুত্র জগদীশপ্রসাদ কিন্তু নিজেকে খরকিয়া বলেন। জগদীশপ্রসাদ খরকিয়া। হৃদয়নারায়ণ অগ্রবাল। কিন্তু জগদীশপ্রসাদ খরকিয়া। এই নামই ইউনিভার্সিটির খাতায় এনট্রি করা আছে। আজ জগদীশ পঁচপন ছপ্পন বয়সের এক মানুষ, যিনি তাঁর নিজের জন্যে তৈরি ছাঁচে খাপে খাপে বসে গেছেন প্রায় কিন্তু তাঁর একটা বিদ্রোহী তরুণ বয়স ছিল। তরুণের স্বপ্ন ছিল, দ্বন্দ্ব ছিল। তখন ইনি সাম্প্রদায়িক আইডেনটিটির চেয়ে জাতীয় পরিচয়কেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। আগরওয়াল এমনই একটা নাম যা মানুষকে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের বলে মার্কা মেরে দেয়। হিন্দি-স্কুল কিন্তু বঙ্গালি-কলেজে-পড়া জগদীশ 'আগরওয়াল' নামটা নিয়ে কিশোর বয়সে একটু বিব্রত ছিলেন। নিজের পরিচয় দিতেন খরকিয়া, খরক গ্রামের অধিবাসী। আরে বাবা, হতে পারি আমি আগরওয়াল, কিন্তু আমার মুখ্য পরিচয় আমি খরকের লোক। এইভাবে তিনি সহপাঠীদের সম্ভাব্য বক্রোক্তির ভিতই কেটে দেন।

ফাইন্যাল পরীক্ষার ফলাফল দেখতে গিয়ে, পিতাজি ছেলের নাম পেলেন না।

নিশ্চিন্ত হয়ে এসে বসেছেন, এবার ছেলেকে কারবারে ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে, ছেলে আই কম বাই কমের ফর্ম হাতে এসে পরণাম করল। পরণামের কারণ কী ঘটল রে? না, ভাল পাশ করেছি। সেকেন্ড ডিভিশন আছে দিব্যি। পিতাজি যে হঠাৎ নাম দেখতে যাবেন তা তো তার খেয়ালে আসেনি।

—'খরকিয়া নামে দিয়েছি এগজামিন।'

—'সে কী? কেঁও রে?'

—'খরকিয়া তো আছি বাপু, এ তো সচ?'

—'হাঁ জরুর। পরন্তু আমি তো আগরওয়াল লিখি।' গোঁয়ারের মতো গোঁজ হয়ে রইল।

—'বাপ-দাদার নাম নিতে চাস না?'

—'বাপ-দাদা কি খরকিয়া নন?'

যাই বলুন সে ওই এক যুক্তিতে অটল থাকে।

গোঁয়ারের শাদি লাগিয়ে দেওয়াই এখন একমাত্র উপায়।

বি.কম পাশ করতে না করতেই শাদি লাগিয়ে দিলেন। ক'টা দিন মুখ ভার করে রইল, বহুর সঙ্গে মিলল না, মিশল না। তো কতদিন থাকবে এমনি? গোঁও ভাঙল, কারবারেও ঢুকল। তিনটে পাশ দিয়েও তাঁর চেয়ে হুঁশিয়ার হতে পেরেছে কি? বুক বাজিয়ে বল তো বেটা। চলেছে সে বাপের লাইনেই। কোনও নয়া মতলব বার করতে পেরেছে কি?

জগদীশ তাঁর পিতার মতো হাট্টাকাট্টা নয়। নরম থলথলে চর্বি-বহুল শরীর। দেখে বোঝা যাবে না, ফুটবল পিটেছেন একদিন। নিজেই ফুটবল হয়ে বসে আছেন বরং। বেশ আরামপ্রিয়। জগদীশ পনিরের মতো ভ্যাসকা ফর্সা রঙের প্রায় দাড়ি গোঁফহীন পুরুষ। দু'গালে খোবলা খোবলা দাগ আছে। বসন্তের দাগ মনে হয়, কিন্তু তা নয়, ব্রণ। তেলা শরীর তো, বয়ঃসন্ধিতে প্রচুর ব্রণ হত, সেগুলো টিপে টিপে ভেতরের সাদা বের করে ফেলে দেওয়ার অভ্যেস ছিল। এখনকার মায়েরা যেমন সতর্ক, সব বিষয়ে ছেলেদের ওপর খবর্দারি করে, তখন তো তা ছিল না। বেটি হলে তা-ও বা কথা ছিল, বেটা যবে থেকে মাতৃদুগ্ধ ছেড়েছে তবে থেকেই সাবালক। তাকে কিছু বলা-কওয়ার কথা ভাবতেই পারতেন না মায়েরা। সে সময়ই কি ছিল? জগদীশের চুল খুব পাতলা, কিন্তু মাথা ঢাকা। পেকে গেলেও নরম হালকা বলে তেমন প্যাটি প্যাঁট করে চেয়ে থাকে না। সযত্নে সাইড-ব্রাশ করে রাখেন। জগদীশ শীতকালে টাই ছাড়া স্যুট পরেন, গরমে বুশ শার্ট আর ট্রাউজার্স। রাত্রে নাইট স্যুট পরে শুতে যান। কিন্তু পান-জরদা ছাড়া এক মুহূর্ত থাকতে পারেন না। দাগওয়ালা ফর্সা মুখে ঠোঁট জোড়া তাঁর সবসময়েই লাল। এমন পরিচ্ছন্নভাবে লাল যে মনে হয় লিপস্টিক মেখে আছেন। কপালে সিঁদুরের টিকা লাগাতেও তাঁর ভুল হয় না। ভগোয়ানের সামনে পাঁচ মিনিট দশ মিনিট বসে মালা না করেন, অন্তত একটু আরতি কর্পূরের দীপ দিয়ে—এটুকু তিনি করেন। এ সব দিক থেকে তিনি তাঁর পিতারই মতো। ধর্মপ্রাণ, পারিবারিক আচার অভ্যাসের পালক ও ধারক।

জগদীশ খুব অল্প কথার মানুষ। সুদ্ধু উদাসীনতা দেখিয়েই তিনি কারবারের অংশ-বিক্রয়ে পিতাকে বাধ্য করেছেন। জীবনের শেষ দিকে তাঁর একটা জিত হল অর্থাৎ। তবে সে নিয়ে তাঁর কোনও গুমোর বা আত্মপ্রসাদ নেই, পিতার সঙ্গে তিনি প্রতিযোগিতায় নামেননি, তাই বলে।

শ্যামলাল তাঁর খাস নোকর।

—'এ শ্যামলাল, পিকদান সাফা হয়নি।'

—'এ শ্যামলাল, এই প্যাকেটটা মালকিনকে দিয়ে আয়।'

—'এ শ্যামলাল, পিতাজিকে বলে আয় আমি একটু দেখা করব।' এই রকম।

স্ত্রী এবং নিজ পিতার সঙ্গে জগদীশ কেন যেন খুব খোলা দিলে মিশতে পারেন না। পিতার সঙ্গে দূরত্ব অবশ্য স্বাভাবিক, যদিও হৃদয়নারায়ণ নিজেই তাঁর পিতার সঙ্গে অনেক ঘনিষ্ঠ ছিলেন, সুখ দুঃখের ভাগীদারও ছিলেন। তা সে যা-ই হোক, পত্নীর সঙ্গেও জগদীশের সম্পর্কটা যেন নিছক প্রয়োজনের। উপরন্তু, কেমন একটা রাগ-অভিমানের ভাব আছে তাঁর এই নিকটতম দুজনেরই ওপর। আসল সম্পর্কটা যেন শ্বশুর ও পুত্রবধূর। তিনি বাইরের লোক, বাইরেই থাকতে পছন্দ করেন, এমনি। আবার অনেক সময়ে মনে হয় তিনি একটা গোপন অপরাধ-বোধে ভোগেন। একটি কন্যা জন্মে, মারা যাবার পর আর যে সন্তান হয়নি, এটাই কি সেই অপরাধবোধের কারণ? কে জানে? তো কথা বলে নিন। পত্নীর সঙ্গে একটা আলোচনা, বোঝাপড়া করে নিলেই হয়। বলা-কওয়া করবার মানুষই যেন জগদীশ নয়। দুখ বলুন সুখ বলুন সবই নিজের ভেতরে রেখে দেবার অভ্যাস। তবে হুকুম করবার বেলায়, নিজের প্রয়োজনে রূঢ় রুক্ষ হবার আদত তাঁর আছে।

এই যে পিতার জন্মদিন গেল, আশি বছর পূর্ণ হয়েছে বলে কত অভিনন্দন, জগদীশের কোনও উত্তেজনা, উচ্ছ্বাস নেই। অফিসে খানা পিনার বন্দোবস্ত তিনি করেননি, ম্যানেজার করেছে। পরিকল্পনা করে তাঁর কাছে অনুমতি চাইতে এসেছে, তিনি বলেছেন, 'পিতাজিকে পুছুন।'

যা করবার, যার জন্মদিন তাকে পুছব জন্মদিন পালন করা হবে কি না? কত টাকার মালা কেনা হবে, মানপত্রে কী লেখা হবে? ম্যানেজার সে কথা বললে জগদীশ অপ্রতিভ হন কি না বোঝা যায় না, কিন্তু তিনি সম্মতি দিয়ে দেন, টাকা পয়সা যা লাগবে তা-ও দিয়ে দেন।

বাড়িতে যে খানা-পিনা হল তার খরচও জগদীশের, পরিকল্পনা তাঁর পত্নীর। অথচ তাঁদের জীবনে তো উৎসব-আনন্দের সুযোগই কম। একঘেঁয়ে জীবনযাত্রা কি ভাল লাগে? জগদীশের যেন কোনও উৎসব প্রয়োজন নেই। বহেনরা এসেছে, কত আনন্দের বিষয়, আনন্দ যে তাঁর হচ্ছে না তা-ও নয়। কিন্তু ঘনিষ্ঠতায়, উচ্ছ্বাসে এমনই অনভ্যাস যে আনন্দ প্রকাশ করার রাস্তা জানেন না। পিঙ্কির ছোট ছেলের জন্যে এক বাক্স অ্যাসর্টেড চকোলেট কিনে এনেছেন। বাস্।

বাচ্চা ছেলে তো নয়, সে তো হেসেই অস্থির।

—'মামুজি, আপনি চকলেট বহোত পসন্দ্ করেন, না? তো নিন একটা নিয়ে

নিন।'

—'আরে না না, আমার মুখে পান আছে।'

—'আমারও মুখে চুয়িং গাম রয়েছে।'

ভারী নিরুত্তাপ, নিস্পৃহ ধরনের মানুষ। ভাঙের নেশাই কি তাঁকে এমন করেছে? ভাঙের শরবত খেয়ে বুঁদ হয়ে থাকা জগদীশের অভ্যাস। টিভি দেখতেও তিনি খুব ভালবাসেন। অফিস থেকে ফিরে, চান সেরে জামাকাপড় বদলে ভাঙের গ্লাস হাতে নিয়ে তিনি টিভির চ্যানেলগুলো একের পর এক ঘুরিয়ে যান। কী খোঁজেন কে জানে? কখনও দেখা যায় নিউজ দেখছেন, কখনও পুরানো কোনও গান, কখনও ইংরেজি ছবি। ঠিক কিছু নেই। অর্থাৎ বিশেষ কোনও আগ্রহ নেই। কৌতূহল নেই, শুধু সময় কাটানো, জীবনটাও শুধু কাটিয়ে দেওয়া।

জগদীশ কি অন্যরকম কোনও জীবন চেয়েছিলেন? কী করে চাইবেন? সাধারণ মানের ছাত্র, সাধারণ ফুটবল খেলতেন। এ দু'টি বিষয়ে কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগবার কারণই নেই। পড়াশোনাটা চালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন সুদ্ধু ইয়ার-দোস্তের লোভে। তবে কি ওঁর কোনও প্রেমের গল্প আছে? জানা নেই কারও। মনে মনে যদি প্রেমরোগে ভুগে থাকেন, আলাদা কথা। আর কিছু প্রমাণ করবার মতো সাক্ষ্য হাতে নেই। তবে এটা বুঝতে অসুবিধে হয় না, জগদীশের মুশকিলটা প্রধানত হচ্ছে একটা সাংস্কৃতিক বিভ্রান্তি, একটা সাংস্কৃতিক সংকট। যে পরিবেশে বেড়ে উঠেছেন অর্থাৎ বাংলা মুলুক— তার চাল-চলন একরকম, তিনি এদের সঙ্গে মিলেছেন, মিশেছেন, এদের রহন-সহন খানিকটা গ্রহণও করেছেন, আবার ঘরের মধ্যে তাঁর অগ্রবালি সংস্কৃতি, অগ্রবালি মূল্যবোধ রক্তের সঙ্গে দানা বেঁধে আছে। তাকেও অস্বীকার করতে পারেননি। তাঁদের ঘরের আরও অনেক ছেলেই তো এইভাবে বড় হচ্ছে, তাদেরও তা হলে একই সংকটে ভোগা উচিত ছিল। তা কিন্তু হয় না। খুব পোক্ত তাদের বাড়ির বাঁধন, চরিত্রও তাদের সম্ভবত আরও দৃঢ়। জগদীশের চরিত্রের বাঁধুনি খানিকটা নড়বড়ে। জীবনে একবারই, সেই পদবি পাল্টাবার সময়ে যে দৃঢ়তা দেখিয়েছিলেন, তার আর পুনরাবৃত্তি তাঁর জীবনে হয়নি। পিতার কৌশল, চতুরতা, বিচক্ষণতার কাছে তাঁর দুর্বল সংকল্পগুলি হার মেনেছে এবং ভাঙের শরবতের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে তিনি এ দুঃখ ভুলতে চেয়েছেন। তবে ভাঙের অভ্যাসটা তাঁর বেশিদিনের নয়।

জগদীশের জীবনের কেন্দ্রে কোথাও আর একটা ক্ষোভ আছে, প্রশ্ন আছে, যার নিরসন আজও হয়নি। এতদিন ধরে পুষে রেখেছেন প্রশ্নটা যে এখন তাঁর জিজ্ঞাসায়ই একটা শৈথিল্য এসে গেছে। প্রশ্নটা এই ধরনের। এত লোকের সন্তান হচ্ছে, তারা বেঁচে থাকছে, তার পরে আরও হচ্ছে, হয়ে যাচ্ছে, তাঁর বেলাতেই ভগোয়ানের বিধান অন্যরকম হয়ে গেল কেন? খুব গাবলু-গুবলু একটি শিশু জন্মেছিল। তখন তাঁর প্রথম যৌবন। নিজের পৌরুষের একটা চিহ্ন, নিজের মিডিওকার অস্তিত্বের অকিঞ্চিৎকরতার দুঃখ কাটিয়ে ওঠার একটা অবলম্বন পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য, এমনই পাপ হয়তো তাঁর যে শিশুটি মরে গেল। জীবনে আর যা কিছু রয়েছে কিছুই তো তাঁর নিজের করা, নিজের গড়া নয়। কারবার রয়েছে বসে গেছেন।

হাভেলি হয়েছে ভোগ করছেন, শাদি দেওয়া হয়েছে দাম্পত্য পালন করছেন। নিজস্ব অর্জন বলতে জীবনে তাঁর কিছুই নেই। কিন্তু তাঁর বীজ ছিল, নতুন প্রাণ সৃষ্টি করার ক্ষমতা ছিল, সেটাও যখন টিকল না তখন ধরে নিতেই হয় তিনি একরকম নির্বীজ। শিশুর জন্য স্নেহ, বাৎসল্যবোধ এ সব আরও দূরের কথা, তাঁর জীবনের অর্থের সঙ্গে বা অর্থহীনতার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে এই শিশুর জন্ম ও মৃত্যু।

জগদীশ তাই জীবনটাকে, সময়টাকে কাটিয়ে যান। তিনি কাটিয়ে যান বলাটাও ভুল হল। তিনি বসে থাকেন, সময় কেটে যায়, জীবন কেটে যায়।

যতটা সম্ভব কম করে বেঁচে আছেন জগদীশপ্রসাদ খরকিয়া অগ্রবাল। যদিও 'অগ্রবাল হাউজ'-এর মালিকানা পিতার অবর্তমানে তাঁরই এবং পরবর্তী ওয়ারিশান ঠিক করে যাবার শুরু দায়িত্বও তাঁরই।

কে হবে ওয়ারিশ? শ্যামলাল নাকি? নোকর শ্যামলালের বড্ড সাধ সে মালিক হয় এ হাভেলির। দরিদ্রের ঘোড়ারোগ বলা যায় ব্যাপারটাকে, ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন এ অভিধাও দেওয়া যায়। কিন্তু শ্যামলালের বক্তব্যে যুক্তির ঘাটতি নেই। হৃদয়নারায়ণের এক বেটা যদি জগদীশপ্রসাদ তো আর এক বেটা ধরা উচিত শ্যামলালকে। বছর দশেক বয়সে এ হাভেলিতে ফাইফরমাশ খাটতে ঢুকে ছিল সে। তারপর বিশ বছর কেটে গেছে। সে বুঢ়াবাবুরও ছেলের মতো করছে, ছোট মালিকেরও ছেলের মতোই করছে। মালকিনেরও কি সে বেটার মতো নয়? বেটা কী করে? পানি, রোটি, কাপড়া দেয়। শ্যামলাল টিউকল থেকে বিশ বছর ধরে পানীয় জল নিয়ে আসছে। খানা পাকান বহুজি, কিন্তু সে তো খানাটা ধরে দেয়, আক্ষরিক অর্থেই সে রোটি দিয়ে আসছে এঁদের। কাপড় সাফা করার কাজটিও তার। কাপড় ধুয়ে শুকিয়ে ভাঁজ করে ইস্ত্রি করে সে সবাইকার কামরায় আলনায়, আলনায় রেখে আসে। বড়া মালিকের ধোতি পিরান, ছোটা মালিকের পায়জামা পিরান, মালকিনের শাড়ি। তো এটা কাপড়া দেওয়া হল না?

বেটার আর কী কর্তব্য থাকে? বিমার পিতা মাতার সেবা করা। সে আগরওয়াল পিতাপুত্রের সর দাবানো, পা দাবানো এ সব করে না? দাওয়া কিনে আনা, ডগদরসাবের কাছে রিপোর্ট পৌঁছে দেওয়া নিয়ে আসা, তিনি কল-এ এলে তাঁর ব্যাগটা বয়ে নিয়ে আসা যাওয়া এগুলো আর কে করবে? শ্যামলাল ছাড়া?

বড়ি মালকিনের কম সেবাটা করেছে সে? স্ট্রোক হয়ে কতদিন শয্যায় পড়েছিলেন। তখন তাঁকে বাচ্চা-ভুলানোর মতো করে খাওয়ানো, দিনরাত পাহারা দেওয়া সবই শ্যামলালের দায়িত্ব ছিল। যখন উনি একটু ভাল হলেন ডগদরসাব কি বলেননি—শ্যামলালের জন্যেই এতটা সম্ভব হল? বড়ি মালকিন প্রায়ই প্রতিজ্ঞা করতেন আর একটু ভাল হয়ে উঠলেই তিনি বড়া মালিককে বলে তাঁর ভাগের যা টাকাকড়ি আছে সব শ্যামলালকে দিয়ে যাবার উইল করবেন। আর একটু ভাল তিনি হননি। তাই কাজটা করে যেতে পারলেন না। কিন্তু ইচ্ছা প্রকাশ তো করেছিলেন। নৈতিক দিক থেকে বড়ি মালকিনের সম্পত্তির মালিকানা কি তা হলে শ্যামলালের

নয়?

গরিব বেটা সে এঁদের। ঠিক কথা। গরিব বেটার সম্পর্কে বাপ-মার একটা অতিরিক্ত দায়িত্ব থাকে না, বাঃ? এঁদের দুই বেটি আছে। লাডলিজি আর পিঙ্কিজি। সে-ও ঠিক বাত। কিন্তু এঁদের শাদিতে তো প্রচুর দহেজ দিয়েছেন আগরওয়ালরা? জেবরই বা কত? এখনও কিছু হলেই দিচ্ছেন। তাঁদের নিজেদেরও যথেষ্ট আছে। পিংকিজি তো বেশ ধনী ঘরেই পড়েছেন। লাডলিজিও খারাপ নেই। এই হাভেলি নিয়ে ওঁরা করবেনই বা কী? ওঁদের তো নিজস্ব কোঠি আছে। এখানে থাকবেনও না। ওঁদের বেটারা চারদিকে কে কোথায় ছড়িয়ে পড়বে। এমত অবস্থায় এ হাভেলি ওঁরা রাখতেই পারবেন না, বেচে দিবেন। এত দিনের হাভেলি, তিন পুরুষের কত স্মৃতি একে জড়িয়ে, কে না কে খরিদ করবে, কে না কে থাকবে, হয়তো ভেঙে ফেলবে। তার চাইতে শ্যামলাল পেলে হাভেলির মান রাখত। আর কিছু তো সে আশা করছে না, খালি দলিলসুদ্ধ হাভেলিটা। সে কাউকে বেচবে না। নীচতলাটা এখন যেমন গো-ডাউন আছে থাকবে, তার দরুন ভাল ভাড়া পাবে শ্যামলাল, দোতলাটায় সে তার পরিবার নিয়ে বাস করবে, তিনতলাটা মোটামুটি এই ভাবেই রেখে দেবে, তার বেটা, বেটার বহু থাকবে এখন তিনতলায়। আজকালকার লড়কাদের অলগ করে দেওয়াই ভাল। ফুল্ল মনে শ্যামলাল তার আট ন বছরের ছেলের দাম্পত্য-ভবিষ্যতের জন্য এ হাভেলির তিন তলাটা বুক করে রাখে।

শ্যামলালের তালিকায় 'অগ্রবাল হাউজ' একটি হেরিটেজ বিল্ডিং। এর রক্ষণাবেক্ষণ ও চিরায়ণ দরকার। সে এটাকে মিউজিয়াম বানাবে যাতে করে দা গ্রেট হৃদয়নারায়ণ অগ্রবাল, জগদীশপ্রসাদ খরকিয়া, সাবিত্রীলক্ষ্মী খরকিয়া অগ্রবাল—এঁদের স্মৃতি গণমনে জাগরূক থাকে। এই মিউজিয়ামের কিউরেটর হিসেবে সে দোতলাটাকে কোয়ার্টার্স হিসেবে চায়। তার নোলক-পরা মোতিয়া-বউ ঘোমটা দিয়ে জড়পুঁটলি হয়ে এই দোতলায় ঘোরাঘুরি করবে। তার ছেলেপিলেগুলি এই সব দেয়ালে তাদের নিষ্পাপ শিশু-সর্দি মুছবে, এই চৌকা থেকে তার জন্য চাপাটি দাল রান্না করে মোতিয়া ওই খাবার ঘরে সার্ভ করবে। মোতিয়া অবশ্য রান্না করবে এই চৌকার এক কোণে বসে বসে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই সব গ্যাস-উনুনে তাকে রান্না করতে দেওয়ার ঝুঁকি নেওয়া যায় না। শ্যামলালের বুঢ়া বাপ কেশে কেশে সর্দি তুলে ফেলবে খাবার ঘরের কোণটায়, মোতিয়া পরিষ্কার করে নেবে এখন। তার মা...। এই দিবাস্বপ্নে সে নিজেকে সঁপে দেয় অনেক সন্ধ্যার অবসরে। এর চাইতে ভাল ব্যবহার যে এই বাড়ির হয় না, এ সম্পর্কে সে নিশ্চিত।

প্রচণ্ড স্বাতন্ত্র্য ও পৌরুষ শ্যামলালের। নিজ মুলুকে সে এটা যতটা জাহির করতে পারে গম্ভীর গলায় ছেলেপিলেদের বকে, কি মোতিয়াকে ধমকে, এখানে সেটা অবশ্য পারে না। কিন্তু সাজানো গোঁফে আর ঝাঁকানো চুলে, পরিমিত পেশিতে এবং যে কোনও কাজ উপলক্ষে পেশির প্রদর্শনীতে সে জগদীশ খরকিয়ার বিপ্রতীপে। নিজ গুণে সে এ বাড়িতে তার আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে। বিশেষত জগদীশের সে খাস লোক। মেহনতির কাজগুলো শ্যামলালই করে। সারা বছরের মশলাগুঁড়োনো,

বাড়ির যাবতীয় কাপড়চোপড় কাচা, শুকোনো, গাড়ি সাফা, বাড়ি সাফা সবই সে অবলীলায় করে দেয়। করার সময়ে যে তার এই বাড়ি সম্পর্কে উচ্চাকাঙ্ক্ষা কাজ করে তা কিন্তু নয়। জগদীশের রুটিন কর্মপ্রণালীর মধ্যে যেমন তার নিস্পৃহতা প্রকাশ পায়, শ্যামলালের উৎসাহী কাজ-কর্মের মধ্যে দিয়ে তেমন তার জীবনী শক্তি তার স্বাভাবিক স্ফূর্তিই প্রকাশ পায়। উপরন্তু সে খুব আত্মসচেতন। মালিকরা তাকে এঁদের আদত অনুসারে রামু বলে ডাকতে চাইলে, সেই অল্প বয়সেও সে প্রবল আপত্তি জানায়। এমনকী ছোট্ট করে শ্যামু বলে ডাকলেও সে সাড়া দেয় না। তাকে ডাকতে হবে— শ্যাম লা— ল। একটা উদাত্ত মোচড় থাকবে ডাকের মধ্যে, তবেই তার সন্তোষ।

আর একজন সম্ভাব্য ওয়ারিশ আছে 'অগ্রবাল হাউজে'র, সে নোকর মিশির। কদমফুলের মতো মাথাটি। গিঁট-গিঁট শরীর। ও যেন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। পোঁছা পোঁছা নাকচোখমুখ ওর। জগদীশকে সে বল খেলার বয়স থেকে দেখছে, হৃদয়নারায়ণকে দেখেছে পরিণত যৌবনের চেহারায়। বড়ি মালকিন, জগদীশকি মায়ি ছিলেন তার ঈশ্বরী। তাঁর মতন অমন ব্যক্তিত্ব, অমন বিচক্ষণতা, অমন গভীর জ্ঞান সে আর কারও মধ্যে দেখল না, বহু সাবিত্রীকেও সে শাদি হয়ে এ বাড়িতে আসতে দেখেছে। তার নিজের ব্যক্তিগত জীবন মালিকদের জীবনের আড়ালে কবেই চাপা পড়ে গেছে। বিহারশরিফে তার নিজের পরিবার আছে, কিছু ক্ষেতি-জমিও আছে। কিন্তু তার নিজের বিয়ে-শাদি সন্তানাদি হয়ে থাকলেও কবে হয়েছে, কবে বউ মরে গেল, কবে বেটারা বড় হল সে সব যেন তার স্মরণেই নেই । সে অনন্তকাল ধরে অগ্রবাল হাউজের খিদমতগারি করবে। এটা তারই দায়। ফলে খাটো ধুতি আর ফতুয়া-পরা-আধবুড়ো মিশির এ বাড়ির একটা আসবাবের মতো। আবার তাকে এ বাড়ির হাওয়া মোরগও বলা চলে।

মিশির কখনও খোলাখুলি হাসে না। হয়তো সে ঠিক করে নিয়েছিল নোকরদের হাসতে নেই। তবে মিশির খুশি থাকে। এ হাভেলিতে ঢোকবার মুখেই তাকে খুশি-খুশি মুখে এক টিপ খইনি খেয়ে নিতে দেখলে বোঝা যাবে সব ঠিকঠাক চলছে। হন্তদন্ত হয়ে একতলা থেকে আরেক তলায় যাচ্ছে মিশির এমনটা দেখলে বুঝতে হবে একটা বিরূপ হাওয়া উঠেছে। ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে। আবার মেঘ কেটে যাওয়াও অসম্ভব নয়। কিন্তু মিশির যদি কোনওখানে চুপচাপ বসে থাকে, যদি তার নজর কোনও নির্দিষ্ট বস্তুর ওপর বন্দি না থাকে, লক্ষ্যহীন হয়ে যায় তা হলে বুঝতে হবে কিছু গড়বড় হয়েছে। তাই নোকর মিশিরকে এ হাভেলির হাওয়া মোরগ বলা যায়।

শ্যামলালের যদি এ বাড়িতে কোনও অধিকার থেকে থাকে, তবে মিশিরের ডবল অধিকার। শ্যামলাল তো আর এঁদের দুঃখ কষ্টের খোঁজ রাখে না। সে আছে নিজের তালে। যখন বড় বেটি লায়লী মরে গেল, মঝলি বেটি গুজ্জির মওত নিয়ে কোর্টঘর পুলিশ কেস হল, যখন জগদীশের সদ্যোজাত শিশুটি দুম করে মারা গেল, সে সব দুখ, অকাতর পয়সা খরচ— এ সবের কতটুকু দেখেছে, বুঝেছে শ্যামলাল? শ্যামলাল নিজেও বা তখন কতটুকু? তবে হ্যাঁ মিশিরের অধিকার বোধ বলে কোনও জিনিস

নেই। সে তার করণীয় কী তা জানে, কিন্তু তার জোরে 'অগ্রবাল হাউজে'র ওয়ারিশ হওয়ার দাবি? স্বপ্নেও সে ভাবতে পারে না। সম্পত্তি মালিকের থাকবে, পরিশ্রম নোকরের। যে এ বাড়ির দুখ-দর্দ কিছু বোঝেনি, জানেনি এমন সম্পূর্ণ অচেনা লোককেও জগদীশ বাড়ি দিয়ে যেতে পারেন, এ নিয়ে শ্যামলালের মনে নানা প্রতিবাদ ঘনাতে পারে, মিশির কিন্তু ও সব বাঁকা হিসেব বোঝে না। এ হাভেলির ওপর তার যে মমতা নেই এমন কিন্তু নয় ব্যাপারটা। সে তার কাজে-কর্মে কোনও ঢিল দেয় না, কেন? শুধু কর্তব্যবোধে না কি? তা নয়। মনিব-নোকরের সম্পর্ক, হাভেলি-খিদমতগারের সম্পর্কও তার কাছে একটা অমোঘ অনিবার্য সম্পর্ক। বিশেষ করে তার মতো নোকর যে প্রায় তিন পুরুষ ধরে দেখছে এদের। হৃদয়নারায়ণকে দেখেছে তাঁর জওয়ানির সময়, জগদীশকে দেখেছে বচপন-এ, জগদীশের বোনেদের, তাদের সন্তানদেরও দেখছে, জগদীশের আওলাদও তার দেখার কথা। দেখেও ছিল, ছোট্ট, একটা রেশমি বাল-ছাওয়া সর, চারটি ছোট্ট ছোট্ট মখ্‌খনে গড়া হাত-পা, ঘাড়ে একটা ছায়ার মতো বড় জরুল, জন্মদাগ। সেটা তার খুব মনে আছে। অমন চাঁদের টুকরার মতো বেটি জগদীশজির, আহা। নসিব, ছোটা মালিকের নসিব। সেই দুখের পরছাঁই কি মিশিরের বুকে পড়েনি? জরুর পড়েছে। পড়ে রয়েছে। তাকে অধিকার করে রয়েছে মালিকদের এই সব দুখ।

মিশির যদি 'অগ্রবাল হাউজ'-এর পুরনো ইঁদারা হয়, শ্যামলাল তবে জেনারেটর। শ্যামলাল সড়াক-করে-আসা এক ঝাঁক বিজলি বাতি। ঔজ্জ্বল্য, আওয়াজ। মিশির স্বাস্থ্যকর, হজমশক্তিসহায়ক পানীয় জল, নিহিত প্রাণ।

৩

ইদানীং সাবিত্রী বেচারি পাতি বকের মতো হয়ে গিয়েছেন। ননদরা এবার এসে নজর করেছে।

— ভাবী তুমি করছো কী? ডাগদার দেখাও। এত কেন দুবলা হয়ে গেলে?

— কিছু তো হয়নি আমার! তবিয়ত তো ঠিকই আছে। উমর বেড়ে যাচ্ছে তো?

— 'আরে আজকালের সব যা হালচাল, তাতে তোমার উমর তো কিছুই না। আমার বেটার শাসু তো তোমার চেয়ে কত বড়। এমন হয়েছেন কি? না, না, এ ভাল কথা নয়।'

বলে বটে, কিন্তু ননদরা জোর কিছু করে না। ভাইয়া বা পিতাজির কাছেও কিছু বলেও না, ফলে কথাটা চাপাই পড়ে যায়। আসল কথা, তারা নিজের নিজের ধান্ধা নিয়ে ব্যস্ত।

আর সত্যিই, সাবিত্রীর পরিশ্রম করবার ক্ষমতা দেখলে ও সব মনে থাকে না। লাডলি এখন বেটার বউ এসে যাওয়ার পরে আরাম করছে, পিংকির চিরকালই একার সংসারে বাস, সে যা করে নিজের শরীর সাধ্য মতো করে। কিন্তু সাবিত্রী এক মুহূর্তও চুপ থাকেন না। হয় সুপারি কুচোচ্ছেন, নয় লেস বুনছেন, নয় পেতল কি রুপো সাফা

করছেন, সংসারের খর্চ-হিসাব লিখছেন। এই যে ননদরা এসে রয়েছে, তাদের ছেলে মেয়ে বহু, এদের আদরযত্ন এমন চুপচাপ করে যাবেন যে কেউ টের পাবে না। কিন্তু খোঁজ করে দেখো, এরই মধ্যে উনি লাডলির বহুটার বাল বেঁধে দিয়েছেন সুন্দর করে। পিংকির বেটিকে রূপটান তৈরি করে দিয়েছেন তার ফরমায়েশ মতো। এক এক দিন একেক রকম খানা তৈয়ার করে ননদের বেটাদের খুশ রেখেছেন।

এ ছাড়াও সাবিত্রী অনেক সমাজ-সেবা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। এ হ্যাভেলির মধ্যে তাঁকে একটা ফাকাশে ছায়ার মতো ঘুরতে ফিরতে দেখা যায়। কিন্তু বাইরে সেই সাবিত্রীই কত কাজ করছেন, কত কাজ পরিচালনা করছেন। তাঁর অক্লান্ত লেস বোনা আর ট্যাটিং-এর কাজ করা দেখে যদি কারও মনে হয় এত লেস-টেস কী হবে, তো সে এই সব সমিতিতে যাক। দেখবে ওই সব ট্যাটিং-এর ফুল বসিয়ে, লেস দিয়ে দুঃস্থ মেয়েরা কত চমৎকার বেডকভার, টেবল, ম্যাট, টেবল-ক্লথ সব বানাচ্ছে, ক্যান্সি প্রাইস-এ বিক্রি হয়ে যাচ্ছে সে সব, সেই সব টাকা পয়সা মেয়েদের কত কাজে লাগছে।

সাবিত্রীর চুলগুলি কাঁচাপাকা। গালের হাড় উঁচু হয়ে গেছে। কণ্ঠার হাড় উঁচু। কাঠ কাঠ হাত পা। যেন সমস্ত রস তাঁর কে শুষে নিয়েছে। একটি বাচ্চাদের স্কুলেরও সেক্রেটারি তিনি। সেখানে তাঁকে প্রায়ই যেতে হয়। বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলেন না তিনি, স্পর্শ করেন না তাদের। মমির মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলেশহীন মুখে তাদের আসা-যাওয়া খেলাধুলো মারামারি দেখেন শুধু। সন্তানহীনতার জনাই কি তাঁর এ নির্বেদ? সম্ভবত।

বাড়িতে যে সব বাঁধানো ছবি আছে এঁদের, তার থেকে হৃদয়নারায়ণকে পরিষ্কার চেনা যায়। জগদীশকে চিনতে কোনও অসুবিধেই হয় না। কিন্তু সাবিত্রীর ছবির সঙ্গে এখনকার আসল সাবিত্রীর যেন কোনও মিলই নেই। অথচ সেই পুরনো ছবিগুলোই চার দিকে টাঙানো। হৃদয়নারায়ণের ঘরটি তো পিকচার গ্যালারি বললেই হয়, সেখানে ওঁর চোদ্দো পুরুষের বোধহয় ছবি রয়েছে। গ্রুপ ফটো সব। সিঙ্গল ছবি শুধু ওঁর পিতাজির। বেটা বহুর একটি যুগল ছবিও টাঙানো রয়েছে ওঁর ঘরে। জগদীশ একই রকম মোটা-সোটা, মুখ লাল, গোলগাল, পরিবর্তন খালি চুলে। চুলগুলো তখন কালো ছিল। কিন্তু পাশে সাবিত্রীর ছবি দেখলে একেবারেই চেনা যায় না। সলজ্জ মুখের ছবি, অল্প ঘুংঘট দেওয়া, রঙে চমক দিচ্ছে, ফটোতেও সেটা বোঝা যায়। এমন সাদা রং তো ছিল না সাবিত্রীর! সেই গোলাপি-সোনালি বালু মেশানো ছিল তাঁর রঙে। আঁখ দুটো এ রকম কোটরাগত ছিল না। ভাসা ভাসা, একটু ওপর দিকে টান-অলা আঁখ ছিল। নাকটা এখন খাড়া। যেন একটা হাড়ের টুকরো পড়ে আছে স্রেফ, ফটোতে নাকটাকে যথেষ্ট নরম, নমনীয় ঠেকে, গালের হাড় ঢাকা, গলায় কণ্ঠায় কোনও গর্ত কোনও ভাঁজ নেই।

তবে হ্যাঁ ত্রিশ বছর তো কম সময় নয়। ত্রিশ বছরের গার্হস্থ্যে কত কিছুই ক্ষয়ে যায়, সাবিত্রীরও গেছে। দুখ? দুখ কি কম মানুষের জীবনে? শাসু যতদিন ছিলেন তাঁকে বন্দুকের ডগায় রেখেছিলেন। অন্যদের জানতেও দিতেন না। বাইরে থেকে

কেউ বুঝবে না। তখন 'বহুবেটি, বহুবেটি' বলে কত আদর। কিন্তু আড়ালে তাঁর অন্তর্টিপুনি, চোখ রাঙানো আর শাসানো তো অল্পবয়সী বউটিকে ভয়ে কাঁটা করে রেখে দিত। ভয়ের চোটে, স্রেফ ভয়ের চোটেই কত অন্যায় করে ফেলেছেন জীবনে। কারও কাছে মন খুলতে পারেননি। শ্বশুর এত ভালবাসেন, তাঁরও চাহিদাগুলো ছিল কী রকম আঁটসাঁট, এটা হবে ওটা হবে না। এই রকম করে করতে হবে। ওইরকম করে হলে চলবে না। স্নেহের সঙ্গে এই কঠোরতাও সব সময়ে মিশ্রিত ছিল।

তোমাদের দুই বেটি আমার মতো এত বড়টা হয়ে মরে গেছে? মনে বড় দুখ, তিক্ততা, জ্বালা! তো তাদের প্রাপ্য স্নেহ ভালবাসাগুলো আমাকে দাও! দেখো আমি কেমন ফুটে উঠি। হয়, হয়। সেই স্নেহ মাঝে মাঝে যে আসে না তা নয়, হঠাৎ কেমন একটা মোচড় খেয়ে আবার প্রতিপক্ষ হয়ে যায়। তিক্ততা বেরিয়ে আসে তখন। আমি ছোট মেয়ে কূল পাই না তোমাদের মেজাজের।

হয়তো পা দাবাচ্ছেন শাশুড়ির— 'আহ, আহ, বহোৎ আচ্ছা, জিতি রহো', বলছেন থেকে থেকে। হঠাৎ উঠে বসে কুটিল দৃষ্টিতে তাকালেন, হাত নেড়ে বললেন— 'যা যা আপনা কাম কর, আবার নথ নাড়িয়ে নাড়িয়ে গোড় দাবানো হচ্ছে। জানিস লায়লির শাদিতে কত খর্চ হল? ঘাঘরা-কাঁচুলির দামই চার হাজার টাকা। গাঁওয়ার কোথাকার। যা!'

যে দহেজের ফেরে ওঁর বেটি মরে গেল, সেই দহেজের কথা তুলেই সাবিত্রীকে খোঁটা দিতেন উনি। যে রাশি রাশি জেবর বড় মেয়ে লায়লি বেচারির কোনও কাজেই লাগল না, এখন ওর দ্বিতীয় বা তৃতীয় সওতন পরছে, সেই জেবারের কথা তুলে জাঁক করতেন, 'নথের ওজন জানিস? এক একটা কাঞ্চনে যদি চার ভরি করে থাকে তা হলে বিশটা কাঞ্চনে কত হয় বল্? সুতলির মতো হার কী পরেছিস গলায়? লায়লিকে হার দিয়েছিলাম সাতটা, এক একটা সাপের মতো মোটা.....।' তা সেই সাপের মতো মোটা হারগুলোই কি আসলি সাপ হয়ে তোমার মেয়েকে ছোবল দিল। শাসুমা?

তিরিশ বছরে একবার দুবারের বেশি বাপ ঘরে যেতে দিলে না তুমি। কেঁদে-কেঁদে আমার দাদি মরে গেল। বাপ ছিল না। মা আর ভাইয়েরা কী করবে? মেনে গেল। বড়লোকের বাড়ি যে বে দেওয়া হয়েছে, সে মেয়ে আর মরা মেয়ের মধ্যে কোনও তফাত নেই। শুনছ শাসু-মা? ও তোমার লায়লিও যা আমিও তা। মরে গেছি।

এই ধরনের তর্কাতর্কি, কথা বলাবলি নিজের সঙ্গে, দেওয়ালের সঙ্গে করা ওঁর আদত ছিল। কেউ জানত না— মিশির জানত। চৌকায় কিছু একটা নটখটির চিজ বানাচ্ছেন বহুজি, হয়ত দহি বড়া। মিশির শুনতে পায় ফিসফিস করে কথা বলছেন বহুজি।

— দহি, দহি। কত খাট্টা তুই? আমার আঁখের পানির চেয়েও খাট্টা না কি রে? তা আর হতে হচ্ছে না রে দহি। এর চেয়ে খাট্টা চিজ আর একটাই ছিল, সে আমার শাসুর মেজাজ। খবরদার আর খাট্টা হবি না, খবরদার।

— 'চুপ শাসুজি একদম মেজাজ গরম করবেন না। আমার অনেক উমর হল। আপনাকে ধরে ফেলব শিগগিরই। আর বাজে কথা শুনবার উমর আমার নেই কিন্তু।

এই মিরচি দিলাম। টকটক লাল গুঁড়ো। ঝালে ঝাল—মরে যাক। এই ঝাল মরিচ দিলাম সবজিতে— খাবেন না কি? খাবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ আপনার থেকেই তো শিখেছি। আর কে শিখাবে? ছোট্ট লড়কি এসেছিলুম, আপনি তো হাতে ধরে সব শিখালেন। কেন বলেন লড়কি দুশমন? তো এই দুশমনকেই তো দিয়ে যান সব কিছু। যা শিখেছেন.....জেনেছেন...দুখের কথা বলতেও তো এই লড়কিই।'

— ' এখন কোথায় নিয়ে গেছে ওরা আপনাকে? আমি তো চেয়েছি আপনি স্বর্গেই যান। তা শান্তি পেয়েছেন তো? আপনার মতো আরও শাস যাঁরা বেটির যন্ত্রণার শোধ বছর ওপর দিয়ে তোলেন তাঁদের সঙ্গে আপনার দোস্তি হয়ে গেছে তো। আমরাও ইউনিয়ন করব— বহুদের ইউনিয়ন , তাতে আপনার লায়লি, গুড্ডিও থাকবে। দেখুন না তারপর কী হয়। লায়লির শাসু, গুড্ডির শাসুকে শায়েস্তা করে ছাড়ব। আপনাকেও। আপনাকেও।

বাথরুমের মধ্যে একেকদিন কাকে শিয়ালে ঝগড়া লেগে যায়। মালিকরা দুজনেই বেরিয়ে গেছেন। শ্যামলালও বাইরে। একা একা মিশির শোনে বাথরুমের ভেতর অঝোর পানি ঝরছে , চৌবাচ্চাসে পানি তুলে তুলে মাথায় ঢালছেন বহুজি আর কার সঙ্গে ঝগড়া জুড়েছেন।

— আসবি না তো আসবি না। না আসলি তো বয়ে গেল। তং করবি না বলে দিলুম। আমি পাগল হয়ে গেলে তোর কি ভাল লাগবে? পাগল আওরত, রাস্তায় রাস্তায় নাঙ্গা ঘোরে? ভাল?

'.....আচ্ছা আচ্ছা সে দেখা যাবে.....না আমি কারও বেটি হচ্ছি না আর। বেটাও দেখা আছে। বেটাও হব না। তোতা হব, ভালু হব, কিন্তু মানুষ হব না আর।'

বাথরুমের দরজায় কান পাতে মিশির। আসলে সে বুঝতে চাইছে বহুজি পাগলামি করছেন কিনা। সাহসে ভর করে তা হলে বড়া মালিককে বলবে সে কথাটা।

'আমি তো বলছি আমার গলতি হয়েছে। তুই আয়। এসে যা, দেখবি কত ভাল লাগবে। আচ্ছা লোক আছি আমরা। তোকে স্কুলে পড়াব। নাচ শিখবি? নাচ? গানা? গানাও শিখবি? ঠিক আছে কাউকে কুচ্ছু বলতে হবে না। আমিই সব ব্যবস্থা করে দেবো। শুধু একবার এসে যা। কত্ত কাম করি জানিস, কত্ত লোগ আমায় মানে। এসে যা।'

'আরে আমিও তো এখন বড় হয়ে গেছি বুড়ি হয়ে গেছি। কত কিছু বুঝি যা আগে বুঝতুম না। এখন ভয় পাই না। একদম না।'

তারপরেই— হাসির শব্দ। বহুজির গলা দিয়ে এমনি হাসি বেরোতে পারে মিশির কল্পনাও করতে পারে না। যেন উনিশ কুড়ি বছরের এক তরুণী। হেসে হেসে খুন হয়ে যাচ্ছেন বহুজি। তারপর চুমার আওয়াজ। কাকে চুমা দিচ্ছেন বহুজি? নিজেকেই? এ কী পাগলামি! বাথরুমের মধ্যে নিজে নিজেকে চুমা দিচ্ছেন?

কিন্তু স্নান সেরে শাড়ি পরে যখন বেরিয়ে আসবেন বহুজি তখন মুখে হাসি কান্না রাগ অভিমানের লেশমাত্র নেই। একদম প্রতিদিনকার দেখা বহুজি। যিনি উঁচু কথা

বলেন না। ঝগড়া তো দূরের কথা, যাঁর মধ্যে ভাবের প্রকাশ একটু কম। কিন্তু কাজ-কর্মে যাঁর কোনও খুঁত থাকে না।

বেরোচ্ছেন। দু ঘণ্টা তিনঘণ্টা বাথরুমে কাটিয়ে উনি বেরোচ্ছেন। মিশির নিরাপদ দূরত্ব থেকে চোখ দিয়ে আগলায় ওঁকে। কোনও অস্বাভাবিক আচরণ দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে বড়া মালিককে.....। নাঃ, শান্ত পা ফেলে ফেলে উনি ঘরে যাচ্ছেন তিনতলায়। এবার চুল ঝাড়বেন। সিন্দুর পরবেন। তারপর পূজার ঘরে ঢুকবেন। সেখানে উনি কোনও কথা বলবেন না। খালি মালা। খালি মালা করে যাবেন। যেন কত বা বুঢ়টি। যোগিন।

মিশির সাবিত্রীকে যতটা জানে, স্বয়ং ছোটা মালিক জগদীশজি পর্যন্ত ততটা জানেন না। মিশির জানে বহুজির মনের মধ্যে সব সময়ে আক্ষেপ, অভিযোগ, পশ্চাত্তাপ, কষ্ট পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া করছে। অদ্ভুত একটা খণ্ডিত সত্তা তিনি। ওপর থেকে তাঁর যে চেহারা, যা আচরণ দেখা যায় তা আসল বহুজি নন। বা, বলা যায়, সেটা বহুজির একটা সত্তা। সত্তার একটা দিক। কিন্তু ওই চৌকা, পূজা-ঘর, স্নান-ঘরের অন্দরে যে বহুজি প্রকাশ পান, যার খবর মিশির ছাড়া কেউ রাখে না, সেই বহুজিও সত্য। দুটো না মিললে বহুজির পূর্ণ চেহারাটা বোঝা যাবে না। অথচ আশ্চর্য এই, জগদীশজি, হৃদয়নারায়ণজি এঁরা কেউ এই ছুপা বহুজির খবর রাখেন না। লোকের কাছে ওঁর কথা বলবার সময়ে বড়া মালিক বলবেন— 'আমার বহুবেটি? ও তো যেমন শান্ত তেমন কর্মী। আজকাল যে সব ঝগড়াটি কামচোর লড়কিদের দেখি তাদের সঙ্গে আমার বহুর কোনও মিল নেই। ওর মনে কোনও নালিশ নেই, খুব ধর্মপ্রাণ, সব দুখ ও ভগোয়ানের কাছে সমর্পণ করে দিয়েছে। এর চেয়ে বুদ্ধির কাজ আর কী হতে পারে?'

জগদীশজি বলবেন—'আপনাদের সমিতির সেক্রেটারি বানাচ্ছেন সাবিত্রীকে? রাম রাম।'

—'কেন, এ কথা বলছেন কেন জগদীশজি?'

—'উনি আপনাদের মেমোরেন্ডাম পেশ করবেন রাজ্যপালের কাছে? তা হলেই হয়েছে, দুসরী কাউকে চুনে নিন। সাবিত্রী কোনও চ্যালেঞ্জ নিতে জানেন না। দুখ হলে উনি আপনি আপনি দুখ পাবেন, দুসরা কাউকে বলতে জানেন না। এ রকম টেম্পারের লেডি আপনাদের কী কাজে আসবেন?'

তা সত্ত্বেও যখন নারী সমিতি সাবিত্রীর ওপর দাবি ছাড়ে না, কোনও এক দুপুরে সাবিত্রী নিজেই চুপচাপ বার হয়ে ওদের সম্পাদিকাবৃত্তি স্বীকার করে আসেন। ভালই চালান তিনি নারী সমিতি। রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে মেমোরেন্ডাম পেশ করে তাঁর সঙ্গে সে বিষয়ে পাঁচ কথা বলেও আসেন। কাজটা হয়েও যায়।

এতে জগদীশজি আশ্চর্য হয়ে যান, হৃদয়নারায়ণজি আশ্চর্য হয়ে যান, —'বহু? আমাদের বহু? গেল? বলল? করল? আশ্চর্য। সেই আজমিঢ়িয়া ভিতু, চোখ তুলে তাকাতে-না-পারা বালিকা, এখন শিষ্ট-নির্বাক-নির্বিরোধ- দায়িত্বশীল-কর্তব্যপালনরত বহু, এত সব করল?'

মিশির কিন্তু আশ্চর্য হয় না। সে জানে বহুজির মধ্যে একটা ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি আছে যেটা চারদিক শান্ত, স্তব্ধ, নির্জন হয়ে গেলে নিজের ক্রেটারের ঢাকা খুলে দিয়ে নিশ্চিন্তে অগ্ন্যুৎপাত ঘটায়। যার ভেতরে এমন আগুন থাকে সে কি অত সহজে চুপচাপ থেকে যাবার মানুষ?

সত্যি কথা বলতে কী মিশির বহুজিকে নিয়ে একটু ভয়ে ভয়েই থাকে। যদি কোনও দিন চৌকা থেকে বেরিয়ে উনি মিশিরকে বলেন—'এ মিশির আগুন পাকিয়েছি, বেশ তরিবৎ করে আগুন কি সবজি, আগুন কি পরোটা, খেয়ে নে তো রে। জলদি করবি।'

কিংবা হয়তো চানঘর থেকে বেরিয়ে বলবেন—'খানা লাগাসনি। আমি খাব না। তুই আর শ্যামলালও খাবি না। আর শোন, ওই বুড়া দুটোর জন্যও কোনও খানা-টানা রাখিসনি। যদি বেশি তং করে তো দু'জনকেই হাভেলির বার করে দেব। খানার যে টেবিলটা আছে ওটাকে ভেঙে চ্যালা করে রাখ। রোশনাই করব।'

কিংবা, পূজাঘর থেকে বেরিয়ে আসবার সময়ে যদি বহুজি শিউজি, হনুমানজি, লছমিমায়ি এঁদের সব মূরত হাতে করে বাইরে নিয়ে আসেন? হয়তো মিশিরকে বলবেন—'যা, আর পূজা হবে না এ বাড়িতে, এগুলো সব গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আয়। ভাগ, ভাগ, শিগগির, নিজেও গঙ্গাজিতে ডুবে যাস।'

এই ধরনের একটা চূড়ান্ত অগ্ন্যুৎপাত সাবিত্রীজির কাছ থেকে আশঙ্কা করে টেনশনে থাকে মিশির। সে জানে উনি যে চুপচাপ, শান্ত থাকেন সে ওঁর দয়া। কেন যে এত দয়া, কার ওপরে যে দয়া তা সে বোঝে না ভাল। তবে তার মনে হয়—মিশির, মিশিরের ওপর করুণাবশতই তিনি তাঁর আগ্নেয়গিরিকে সামলে-সুমলে রেখেছেন। প্রথম ধাক্কাটা মিশিরকেই সামলাতে হবে তো? কৈফিয়তও তো দিতে হবে তাকেই। অথচ মিশির পরিষ্কার করে কিছু বলতে পারবে না। অত বুদ্ধি, লিখিপড়িদের মতো গুছোবার ক্ষমতা মিশিরের থাকলে তো? গঙ্গাজিতে ডুব দিয়ে মরে গেলেও তো আবার ভেসে উঠে মালিকদের কৈফিয়ত দিতে হবে মিশিরকে? কেন খাবার টেবিল ভাঙল? কেন মূরত নেই? কেন খানা লাগায়নি?

যাক সে সব প্রশ্ন আর নেই। সাবিত্রীকে নিয়ে আর বৃথা বাক্যব্যয় করে লাভ কী? সব প্রশ্নের সব আশঙ্কার শান্তি হয়ে গিয়েছে।

সাবিত্রী মারা গেছেন। ওঁকে সৎকার করতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

আসলে সাবিত্রী সেই জাতীয় মানুষ যাঁরা না থেকে বুঝিয়ে দেন তাঁরা ছিলেন।

হাভেলি-ভর্তি এখন লোকজন। পাড়া প্রতিবেশী সব ভেঙে পড়েছে। ওদিকে এদের বন্ধুজন, ইয়ার, দোস্ত—এরাও খবর পেয়ে চলে এসেছে। এখানে ফোন যাচ্ছে, ওখানে ফোন যাচ্ছে। কেউই প্রায় কোনও উদ্যোগ নিতে পারছেন না। বিশেষ করে হৃদয়নারায়ণজি, তাঁর বেটা জগদীশপরসাদ, নোকর শ্যামলাল আর নোকর মিশির। প্রতি কথাতেই হৃদয়নারায়ণ বলে ফেলতে যাচ্ছেন 'বহুকো পুছো। বহুবেটিকো পুছো।' জগদীশজির কাছে গেলেই তিনিও থতমত খেয়ে যাচ্ছেন। বোঝাই যাচ্ছে পিতার জন্মদিনের মালপত্র বিষয়ে যেমন তিনি পিতার সঙ্গে কথা বলে নেবার সলাহ্

দিয়েছিলেন কর্মচারীদের, পত্নীর শবদাহ সম্পর্কে যা কিছু করণীয়, সে সবও তিনি পত্নীকে পুছে নিতে চান। বড়ই তকলিফকি বাত যে পত্নী কিছু বলছে না, বলার অবস্থায় সে নেই।

৪

এতদিন পরে এ বাড়ির সেই প্রার্থনা পূর্ণ হল। লড়কিও নেই, জনানাও নেই। বাস ফুরিয়ে গেল।

'রামনাম সত্ হ্যায়, রামনাম সত্ হ্যায়' অগ্রবাল হাউসের তিনটে কোল্যাপসিবল গেট ছাড়িয়ে সাবিত্রীর শবযাত্রার আওয়াজটা এবার বোধহয় চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউয়ের সিনাতে গিয়ে পড়ল। এমনিতেই খুব জোর আওয়াজ কেউ তোলেনি। যেটুকু জোর ছিল আহিস্তা আহিস্তা কমজোরি হয়ে যাচ্ছে, ধ্বনির ক্রমক্ষীয়মাণতা থেকে দূরত্বের একটা মোটামুটি আন্দাজ পাওয়া যায়।

গড়ের মতো হাভেলি। উঁচু উঁচু কামরা, মার্বেলের মেঝে। আওয়াজ খুব গিলে নেয়। রসুই মহলে সাবিত্রী লোকজনের সঙ্গে কী খিটির খিটির বকাবকি করছে হৃদয়নারায়ণ টেরই পেতেন না। তিনি কখন উঠলেন, কখন চান শেষ হল, কখন মন্দির থেকে বেরুলেন—এ সব যদিও টের পেত সাবিত্রী। কেমন করে, তা হৃদয়নারায়ণ আগরওয়ালজি জানেন না। সম্ভবত ঘড়ি দেখে। কিন্তু সে কথা সাবিত্রী স্বীকার করত না। এত সময়ানুবর্তী সে হত কী করে জিজ্ঞেস করলে খালি বলত—আওয়াজ।

ঘুম থেকে ওঠার কি কোনও আওয়াজ আছে?

ঘুম একটা স্তব্ধতা। রাত, অন্ধেরা এগুলোও স্তব্ধতারই রকমফের। দু' রকম স্তব্ধতা মিলে কি হররাত একটা কঠিন কিছু তৈয়ার হয়? শক্ত পাথরের মতো? জমাট হাভেলির দিওয়ারের মতো? কিংবা শীতল বরফের চাঁইয়ের মতো? ঘুম ভাঙলে ওই কঠিন জিনিসটা ভাঙার একটা চুরচুর আওয়াজ হয়? যদি তিনি সারারাত নাসিকাগর্জন করে থাকেন, তা হলে ঘুম ভাঙলে সে আওয়াজের বিরতি হবে। কিন্তু সাবিত্রী কোনও আওয়াজ থেমে যাওয়ার কথা তো বলেনি। সে বলত আওয়াজ শুরু হওয়ার কথা।

এখন সকাল হচ্ছে। চারতলার জানলার ধারে দাঁড়িয়ে প্রথম গাড়ির ঝাঁক ছুটে যাচ্ছে দেখতে পেলেন আগরওয়ালজি। হাতে-টানা রিকশা, ঠেলাগাড়িও। ট্রাক চলে যাচ্ছে। ঠেলা-ট্রাকের সময় ফুরিয়ে এল। সাইকেলের রডে বড় বড় দুধের ড্রাম ঝুলিয়ে চলে যাচ্ছে দুধওয়ালা। উল্টো দিকের লোহার দোকানটায় গরম লোহা পিটছে কারিগররা। শুরু করে দিয়েছে এই ভোরেই। এগুলোর নিশ্চয়ই আওয়াজ আছে। শোঁ-ও-ও, হুশহুশ, ঠুনঠুন, ঝনঝন, ঢন্ ঢন্ ঢন্। কিন্তু তিনি তো কই সে সব শব্দ শুনতে পেলেন না। এই পুরনো আমলের বাড়ির চারতলার দূরত্ব অনেকখানি। ষাট ফুটের কাছাকাছি তো হবেই। সুতরাং ওপর থেকে শুধু দৃশ্য পাতা আছে দেখতে পাওয়া যায়। ষাট ফুট দূরবর্তী তাঁর বৃদ্ধ কর্মেন্দ্রিয়গুলির মধ্যে শুধু চোখে দেখার

অংশটা সক্রিয় রয়েছে। কান তত নয়।

অথচ তিনি খুব স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন—'রাম নাম সত্ হ্যায়, রাম নাম সত্ হ্যায়।' ক্ষীণ কিন্তু স্পষ্ট। কাশী মিত্রের ঘাটের শ্মশান পর্যন্ত এই আওয়াজ তিনি শুনতে পাবেন। নিরবচ্ছিন্ন ভাবে রামধ্বনি করবে না এরা। তবু তিনি শুনতে পাবেন। তারপরে এক সময়ে আর শুনতে পাবেন না। তার মানে, তখন চিতা জ্বালানো হয়ে গিয়ে থাকবে, হৃদয়নারায়ণের বছর পঞ্চান্ন বয়সের ছেলে জগদীশ খরকিয়া তার স্ত্রী সাবিত্রীলক্ষ্মী খরকিয়ার মুখে পাটকাঠির পবিত্র আগুন জ্বেলে দিয়ে থাকবেন। গব্য ঘৃতের গন্ধ উঠবে, মন্ত্রের গন্ধ, পাটকাঠি পোড়ার গন্ধ, চিতার কাঠের গন্ধ, কিন্তু কোনও শব্দ নয়। কেউ কাউকে বলবে না—'রোও মৎ বেটে।' তাতে আরও সশব্দ হয়ে উঠবে না কোনও কান্না।

রামনাম বুকের মধ্যে গুরগুর করে উঠছে খালি, টের পান হৃদয়নারায়ণ। রাম রাম রাম, সদ্‌গতি হোক সাবিত্রীর। হে রাম সাবিত্রীকে দয়া করো, হা রাম...সাবিত্রীকে...।

অন্য দিন এই সময়ে সবে স্নান শেষ হয় তাঁর। অন্ধকার থাকতে ঘুম থেকে উঠে ছাদে যান, সূর্য ওঠা পর্যন্ত ছাদেই থাকেন। সূর্যপ্রণাম করার আবাল্য অভ্যাস তাঁর। আজকাল আর হাঁটু গেড়ে বসে সাষ্টাঙ্গ হতে পারেন না। কিন্তু পুব দিকে মুখ করে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকার অনুষ্ঠান এই একাশিতেও করে চলেছেন তিনি। সূর্যপ্রণাম করলে যে দীর্ঘায়ু এবং স্বাস্থ্যবান হওয়া যায় তার জীবন্ত প্রমাণ তিনিই। তবে হ্যাঁ যদি জিজ্ঞেস করো দীর্ঘায়ু নিয়ে একটা মানুষ কী করে, অতিরিক্ত স্বাস্থ্যই বা কী হবে তা হলে হৃদয়নারায়ণ কোনও জবাব দিতে পারবেন না। আমরা তো একটা স্বতঃস্ফূর্ত জিজীবিষায় বাঁচি। রামজি এই দেহের পিঞ্জরে একটা প্রবল প্রাণের বেগ ভরে দিয়েছেন। সেই বেগের বশেই চলে যাচ্ছি, বাঁচবার জন্যে যা-যা করা দরকার, খাদ্যগ্রহণ, দেহমল বর্জন, নিদ্রা, কাম-কাজ, পূজা, বিবাহ, সন্তান উৎপাদন সবই নিজের নিজের জীবনের জন্যে। সন্তানও? হ্যাঁ তাই। সন্তানও নিজের সুখের জন্যে। নানা কর্তব্য, নানা বন্ধন, নানা অনুষ্ঠান নিজের সুখেরই জন্যে। কোনওটা যদি অসুখের কারণ হয়? অশান্তি, অস্বস্তি, দ্বিধাগ্রস্ততা, তারপর ছুঁড়ে ফেলা। ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া।

সূর্যপ্রণামের পরেই তিনি স্নানটা করে নেন। কি শীত কি গ্রীষ্ম সূর্যোদয়ের পরমুহূর্তে ঠাণ্ডা জলে স্নান। ধুতির খুঁটটা গায়ে জড়িয়ে এরপর তিনি মন্দির-এ ঢুকবেন। ছাদেই মন্দির করে নিয়েছেন। অন্য কোথাও যাওয়া আর পোষায় না। মন্দির-এ যেমন বজরংবলী রামজি আছেন, তেমনি রয়েছেন মহাদেও, তাঁর নন্দী। মন্দির প্রদক্ষিণ করে এঁদের সবাইকে ফুল জল দেন। হনুমানচালিশা পাঠ করেন, ধ্যান করেন, মালা করেন, কপালে সিন্দুরের ফোঁটা পরে বেরিয়ে আসেন। নীচের ঘরে এসে দেখেন সাবিত্রী খাবার নিয়ে বসে আছে। এইটাকেই সাবিত্রীবেটির সময়ানুবর্তিতা বলছিলেন তিনি। এটাকেই সাবিত্রী বলত আবাজ।

লোটাভর দুধ, জিলাবি এই বয়সেও সকালে জলযোগের সময়ে খেয়ে থাকেন

তিনি। আগে কচৌরি-ভাজিও চলত। বছর দশেক সে সব বন্ধ করে দিয়েছেন। জীবনের জন্যেই খাদ্য, আবার জীবনের জন্যই খাদ্য-ত্যাগ। গতকালও এর আর একটু পরেই তাঁর দুধ-জিলাবি নিয়ে এইখানে এসে বসেছিল সাবিত্রী। কোনও বৈলক্ষণ্য তো দেখেননি। চেহারাটা সাবিত্রীর বহুদিন ধরেই একটু একটু করে শুকিয়ে যাচ্ছে। এত ধীরে ধীরে ব্যাপারটা হয়েছে যে জগদীশ বা তিনি কেউই ব্যাপারটা খেয়াল করেননি। অথচ খেয়াল করা উচিত ছিল।

এই ঘরে যে বড় পারিবারিক গ্রুপ ফোটোটা বাঁধানো রয়েছে সেটা তাঁর ষাট বছরে তোলা। তখনও জগদীশ কি মায়ি জিন্দা ছিলেন। তিনি স্বভাবতই মোটা, খুবই মোটা। গদার মতো বাহুর ফের ফোটোতেও বোঝা যাচ্ছে। ব্লাউজের তলা দিয়ে থলথলে একরাশ ভুঁড়ি বার হয়ে রয়েছে। হেনা করা চুল। গালের থাক থাক চর্বির মধ্যে দিয়েও প্রখর চোখের দৃষ্টি বোঝা যায়। পাশেই তিনি। তখন একেবারে সোজা, বাদাম কাঠের পাটাতনের মতো। খাটা পেটা ব্যক্তিত্বময় চেহারা। হাতে একটা লাঠি নিয়ে সোজা শিরদাঁড়া সিধা করে বসে আছেন। চৌকো চোয়াল। হাসি একটা আছে, তাকে ঠিক অনাবিল বলা যায় না। হাসিটা তিনি পরে আছেন ফোটোরূপ পারিবারিক দলিলের প্রতি কর্তব্যবশত। জগদীশ তাঁর পাশে। সে তার মায়ের মতো গোল, ফুলো। টাবুশ ভুঁড়ি তার বুশশার্টের পেটের কাছটা টানটান করে দিয়েছে। থাইয়ের চওড়াই প্যান্ট ফেটে বেরোচ্ছে। পেছনে দাঁড়িয়ে তাঁর দুই গিন্নিবান্নি মেয়ে লাডলি আর পিঙ্কি, মাঝখানে তাদের ভাবী। লাডলি আর পিঙ্কি বেশিটাই তাঁর মতো, লম্বাই চওড়াই খুব। চৌকো চোয়াল। এই নিয়ে তাঁদের স্বামী স্ত্রীর খুনসুটি কম হত? জগদীশের মা বলতেন—'আপনার জবরদস্তির খবর সন্তানদের চেহ্‌রা দেখলেই বোঝা যায়। চার-চারটে মেয়েই বিলকুল আপ যৈসী।'

তার উত্তরে তিনি বলতেন—'আরে বাবা, জগদীশ? লড়কা তো বিলকুল আপ যৈসা। এক লড়কা সাত লড়কির সমান। তো বাস, আপনার আমার হিসসা বরাব্বর হয়ে গেল।' মেয়েদের মাঝখানে সাবিত্রী না দুবলি না মোটি। ভারী মিঠি মিঠি চেহরা। মোটি না হলেও মোটা ঘেঁষেই। ওর চেহারায় হাড় বোঝা যেত না। কনুই চিবুক এগুলো পর্যন্ত রমণীয় চর্বির আবরণে কৌণিকতা হারিয়েছিল।

চামড়া আর হাড়ের মাঝখান থেকে চর্বিগুলি ক্রমাগত শুকিয়ে যায়। চামড়া আলগা হতে থাকে, গরম জলে ফেলা নাইলনের কাপড়ের মতো কুঁচকোনো। ইদানীং হাত পায়ের পাতাগুলো কেমন শুকনো শালপাতার মতো হয়ে গিয়েছিল, যেন চেপে ধরলে মড়মড় করে ভেঙে যাবে।

—'আপনি তবিয়ৎ কো খেয়াল রাখো বেটি'—কখনও কখনও তিনি যে বলেননি—তা নয়। সাবিত্রী শুনলে শুধু হাসত তাঁরই মতো, সাবিত্রীর হাসিও কখনও অনাবিল ছিল না। কেমন জোর করা নিষ্প্রাণ হাসি। শুধু ঠোঁট জোড়ার প্রসারণ। তার চোখে ক্লেশ লেগে থাকত। ক্লেশও নয়, কেমন একটা উদাসীনতা, সুদূরতা। দুলহন সাবিত্রীর মুখের হাসিটাও অনাবিল ছিল না ঠিকই, ছিল সংকুচিত, ত্রস্ত, কিন্তু প্রাণহীন নয় কখনওই। হাসির পেছনে হাসির ইচ্ছেটা অন্তত ছিল। ইদানীংকার হাসি একটা

পেশির ক্রিয়ামাত্র। এ নিয়ে জগদীশ বা তিনি কখনও কোনও নালিশ করেননি। তাঁদের ঠাণ্ডাই, মালাই, শরবত, মশালা চায়, পুরী কচৌরি, জিলাবি, গুলাবজামুন, লাড্ডু-লিট্টি, মটর-পনির, আলু চোখা, ডালভাজি, ধুতি পাতলুন কুর্তা, কোট কামিজ চাদর শাল বিস্তরা, দাওয়াই, সুঁই, ডক্টর, নোকর এ সব সংক্রান্ত পরেশানি কক্ষনও হয়নি তো! গেঁহুর মতো রং, থোড়ের মতো হাত পায়ের গড়ন, শাঁখের মতো হাতের পাতা, লুনী নদীর পাড়ের বালুমিশ্রিত মৃত্তিকার মতো মিশ্র-রঙা চুলের এই বহুটিকে তিনি আদর করে বহুবেটি বলেই তো ডাকতেন। অযত্ন অনাদর করেননি তো কোনওদিন! অথচ আজকে বহুদিন পর এই ফোটোগ্রাফ সাক্ষ্য দিচ্ছে এই সাবিত্রীলক্ষ্মী বহু বছরের বিস্মৃতির পর্দার আড়ালে হারিয়ে গেছে। যে রুখাসুখা বহু তাঁদের সেবাযত্ন, ঘরকন্না করে এই বিশাল আসবাবপূর্ণ মানুষ-শূন্য বাড়িটিকে মাথায় করে রেখেছিল সে অন্য সাবিত্রী। তাঁর পছন্দ করে নিয়ে-আসা একলওতা বেটার সেই বহু নয়।

একটা এই সাইজের বাড়ির ভেতর যদি আসল মালিক বলতে থাকে দুটি মরদ, আর একটি জেনানা, দুই মরদের একজন যদি চার বিশ বয়সের দিকে আর একজন তিন বিশ বয়সের দিকে ক্রমাগত এগিয়ে যেতে থাকে, ব্যবসার খুঁটিনাটি যদি এদের দুজনকেই দেখ-ভাল করতে হয়, যদি কোনও নওজোয়ান বাড়িতে না থাকে তা হলে বাড়ির এক লওতি বহুকে কি একটু নিজেকে নিজে দেখতে শুনতে হয় না! শাসু তো চলে গেছে। খবরদারি করতে মাথার ওপর কেউ নেই। কেউ তো তোমাকে বলছে না— 'দুধ পিও না, মালাই খালি খিলাও, খাও মৎ। এ সব পেঁড়া, কুলচা, বরফি, পরোটা, পনির, হালবা সব তোমার জন্যে নয়।

এখন, শুধু খাওয়া-দাওয়া না করার জন্যেই বহুর এই অবস্থা হল কি না, তা-ও হৃদয়নারায়ণ জানেন না। ভেতরে কোন বিমারি বাসা বেঁধে থাকতে পারে। যদি কোনও কষ্ট, ব্যথা-বেদনা, অস্বস্তি হয়ে থাকে সেটা জানাবার দায়িত্ব কি রোগিণীর নয়? তাঁকে না বলুক, জগদীশকেও তো বলবে! তেমনি ভেড়ুয়া তাঁর লড়কা! জরুর ভেড়ুয়া নয়, এমনি এমনিই ভেড়ুয়া। মাথায় দুটো বাঁকানো শিং, গায়ে কোট, পায়ে ক্ষুর, মাথা নিচু করে ঢুঁশো মারতে মারতে সেই যে চলল— আর এদিকও তাকাবে না, ওদিকও তাকাবে না। আরে নজর খোলা রাখ, মাথা সাফ রাখ, দ্যাখ বউয়ের কী হল, কেন সে দিনকে দিন দুবলা হয়ে যাচ্ছে। স্ত্রীলোক তো একটু চুপচাপ, শান্ত প্রকৃতিরই হয়। কবে সে বলবে, তবে তুই দেখবি? তোর নিজের নজর নেই। আরে তোর বহুর হাত-পা কেমন ছিল, কেমন হয়েছে, তোর বহুর মুখের হাসি কেমন বদলাল, সে-কথা তোর চেয়ে বেশি আমি জানব, গিদ্ধর কাঁহিকা?

প্রতি মঙ্গলবার তিনি কালীঘাটে যেমন যান এই আশি-পূর্ণ-একাশিতে পড়া শরীর-স্বাস্থ্য বুঢ়াপা নিয়েও তিনি তাই-ই গিয়েছিলেন।

কালীমায়ি কলকাত্তাবালি কলকাত্তা তথা পশ্চিমবঙ্গের অধিষ্ঠাত্রী জাগ্রত দেবতা। ভিন দেশ থেকে এসে এখানে রুজি-রোজগার ধান্দা-কারবার করতে হলে কালীমায়ীকে খুশ রাখতে হবেই। ফি মঙ্গলবার, ঝড় হোক, জল হোক, আধি-ব্যাধি

হোক তিনি নিষ্ঠাভরে মায়ের পুজো দিয়ে আসছেন। অশুচ্ থাকলে আলাদা কথা। মায়ী এতখানি রক্তজিহ্বা মেলে কালোয় আলো চক্ষুদুটি দিয়ে খুঁজে দেখেন কে কে এমন বেইমান আছে যে কলকাত্তার ধুলোমুঠি সোনামুঠি করছে অথচ মায়িকে তাঁর নজরানা দিতে আলস্য। হৃদয়নারায়ণ বেটা এসেছে কি না, তাঁর পায়ে মাথা লুটিয়েছে কি না, পূজা চড়িয়েছে কি না, তাঁর স্পর্শ করা সিন্দুরের ফোঁটা কপালে পরতে পরতে বিবুল হয়ে যাচ্ছে কি না এ সব মায়ির খেয়াল থাকে খুব। তাই তিনি মায়ের ভক্ত সন্তান, ব্যবসার ফেরে পড়ে যদি মায়ের অপরাপর সন্তান কাউকে ঠকাতে হয় তো হল, মাকে কিন্তু কক্ষনও ঠকান না। নিয়ম করে সওয়া পন্দর টাকার পূজা কি হপ্তায় মায়ের বাঁধা। তো গতকাল রাত নয়টা নাগাদ তিনি ফিরে দেখলেন জগদীশ কেন কে জানে ভাঙ চড়িয়ে বুঁদ হয়ে আছে। ওর সঙ্গী হল কে? না লুচ্চা নোকর শ্যামলালটা। সাড়ে নয় অবধি অপেক্ষা করেও যখন খানা মিলল না, তখন বুঢ়া মিশিরকেই ডেকেছিলেন। —বহু কোথায় গেল? খানা লাগাল না? বুঢ়াটা তো ভাঙ ছাড়াই সন্ধের পর থেকে ভোঁ হয়ে থাকে। আকাশ থেকে পড়ল যেন। আরে! এখনও খানা লাগায়নি? না, কোথায় যাবে? কোথাও যায়নি তো বহু? টুঁড়ে-টুঁড়ে দেখা গেল রসুই ঘরে নেই, শোবার ঘরে নেই, পূজার ঘরে নেই, তবে টয়লেট বন্ধ আছে। ধাক্কা মেরে সাড়া মিলল না। সকলে মিলে দরজা ভেঙে বড় ভয়ংকর দৃশ্য দেখা গেল।

বহুর কোমর থেকে শরীরের ওপরটা টুবু-টুবু চৌবাচ্চার মধ্যে পড়েছে। বাকিটা তখনও চৌবাচ্চার ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। ডাক্তার বললে হার্ট ফেইলিওর। তো হার্টফেল করে জলে পড়েছে, না জলে পড়ে আঁকুবাঁকু করতে করতে হার্টফেল করেছে, ডাক্তারসাব পরিষ্কার করে বলতে পারলেন না। সেটা ঠিক করতে হলে নাকি পোস্ট মর্টেম করতে হবে। রাম! রাম! ডাক্তারসাব তাড়াতাড়ি ডেথ সার্টিফিকেট দিয়ে দিলেন, ভোর হতে না হতে মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থাও হয়ে গেল। ঠারে-ঠোরে সেই রকমই বললেন ডাক্তার।

হৃদ্‌যন্ত্র বিকল হয়ে গেল বহুটার আগে থেকে কিছু জানান না দিয়ে? বহুর পঁয়তাল্লিশ বয়স হয়েছিল বোধহয়। শরীরটা কেমন শুকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কোনও দিন দুর্বলতা, কি হাঁফের কষ্ট, কি অন্য কোনও তকলিফের কথা সে বলেনি। ডাক্তার বললেন হতেই পারে। হার্ট সবচেয়ে পালোয়ান যন্ত্রের একটা মানুষের শরীরে, কিন্তু বিকল হবার হলে হবে। একটা স্ট্রোক হয়ে টাল খেয়ে চৌবাচ্চায় পড়ে গিয়েছিল বহু, অজ্ঞান তাই ডিফেন্স কিছু নিতে পারেনি। জলে খাবি খেয়ে শেষ।

মৃত্যুর অদ্ভুত ধরনটায় কেমন অবাক হয়ে আছেন হৃদয়নারায়ণ। কী অদ্ভুত, অত্যদ্ভুত নিয়তি। নিয়তি না রামজির মার? আবার রামজির মার-ই যদি হবে তো তিনি কি শুধু হাতই দেখেন, মন দেখেন না? জগদীশজি কি মায়ি তো বিছানায় লেটে লেটে বহোৎ সেবা-শুশ্রূষা খেয়ে সুহাগন মারা গেলেন। কত কান্না মেয়েদের, দেখাদেখি ছেলের চোখেও কান্না এসেছিল। তাঁর এতদিনের সুখদুঃখের সাথী, দুজনের মন, মত, চাহত, সব তো একই ছিল, তাই তিনিও গুমসুম হয়ে যান। লাডলি তখন দিল্লি থাকত, এসেছিল সুপার ফাস্ট-এ, পিঙ্কি প্লেনে। ওদের ছেলেমেয়েরা এসে

পৌঁছেছিল পরের দিন। লাড্ডলি এসে না পৌঁছনো তক বডি বরফের ওপর ছিল, সময়টাও অবশ্য শীত। জগদীশের মাকে তিনি কুইন ভিক্টোরিয়া কি আর বলতেন সাধে? তার চলন-ফেরন, বাতচিতের সময় তার হাতের কায়দা, তর্কাতর্কি করে নিজের মতামত বসাবার তরিকা সবই ছিল মহারানির মতো। তাঁদের হাউজ থেকে ম্যানেজার স্বয়ং শাদা ফুলের রীদ বয়ে নিয়ে এসে দিয়ে যায়। কর্মচারীরা দর্শন করার জন্যে ভিড় জমায়। জগদীশ কি মায়িই গেলেন কি ইন্দিরা গান্ধীই গেলেন, এমনই ভাবসাব। মুর্শিদাবাদের গরদ কাপড় পরা সেই দশাসই শবদেহ প্রচুর ফুল-ধূপের মধ্যে রাজকীয় অন্তিম শয্যায় শায়িত, সিঁথিতে চওড়া চিনা সিন্দুর, এখনও চোখ চেয়ে চেয়েই তিনি দেখতে পান। আর এ বেটি গেল? সুহাগন ঠিকই। কিন্তু টয়লেটের মধ্যে চৌবাচ্চার জলে অজ্ঞান অবস্থায় খাবি খেতে খেতে, যখন নোকর-উকর তার স্বামী সব ঘরে মওজুদ, বাস একটা ডাকের ওয়াস্তা, তা সংসারের গৃহিণী সংসারের লছমী বহুর সে সুখ জুটল না। কী অসহায় মৌত! আর কী নিরাভরণ নাঙ্গা শবযাত্রা! ইয়ার-দোস্তদের কিছু জওয়ান লড়কা, সব আজকাল জীন্‌স্ ধরেছে, দু চারটে বুঢ়া। ছুপকে ছুপকে যেন চোরাই মাল পাচার হওয়ার মতো বহু শ্মশানে চলে গেল।

আজ বিকেলে আজমিঢ়ে ওর ভাইয়েদের ঘরে একটা টেলিগ্রাম ভেজে দেবেন। কিষাণ কাঁহিকা, ট্র্যাক্টর কিনে ঘরে টন টন গেঁহু জওয়ার তুলছে, কিন্তু একটা টেলিফোন রাখবে না।

রোদ বেশ পেকে গেছে। '—শ্যামলাল, শ্যামলাল!' ওহ্, শ্যামলাল তো শ্মশানে গেছে। কারও একবার খেয়াল হল না বুঢ়া মানুষটা একা থাকবে কী করে! ভুখ পিয়াসও তার আছে! সব্বাই বাড়ি ফেলে চলে গেল? 'মিশির। মিশির। এ মিশির!' সাড়া মেলে না। সে বুঢ়াটারও শ্মশানে যাবার শখ জাগল না কি? পেটের মধ্যে প্রচণ্ড খিদে পাক দিচ্ছে হৃদয়নারায়ণের হুঁশ হয়। ডাগদারসাব বলে দিয়েছেন পেট খালি রাখবেন না, তিন ঘণ্টা অন্তর কিছু না কিছু খাবেন। সকালবেলা খালি পেটে থাকলে রামজির বাবার সাধ্য নেই, আপনার পেটের ঘা রোখে।

তো সে-কথা তিনি জানলেই হল? নিজেই নিজের দেখ-ভাল তিনি কবে করেছেন? ঘরে একটা সোরাই আছে, তিনি জল খেলেন অনেকটা। শোকে দুঃখে চিন্তায় মানুষের ভুখ-পিয়াস কমে যায়, চলে যায়, এমনটাই তিনি শুনেছেন। কিন্তু প্রমাণ পাননি কখনও। বিশেষত নিজেকে দিয়ে। জগদীশ কি মায়ি যখন শব হয়ে শুয়ে আছেন, বাড়িতে লোক গিজগিজ করতে লেগেছে মাছির মতো, দু-দশ জন তাঁর ইয়ার লোগ কাছে বসে আছে সান্ত্বনাচ্ছলে, বহু তাঁকে কাজের ছল করে ভিন্ন ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। দুধ, হালোয়া তাঁর বরাদ্দের তিনি ঠিকই পেয়ে গিয়েছিলেন। জগদীশও। পেট ভরে নিয়েছিলেন। বহু বলেছিল খেয়ে দেয়ে গিয়ে ওঁদের সঙ্গে বসুন, কিছুক্ষণ পরে আমি চায়, লাড্ডু সব পাঠিয়ে দিচ্ছি। ভরপেট জল খেয়ে হৃদয়নারায়ণ আজ তাঁর আরাম-কেদারায় হেলান দিয়ে শুলেন। আর কী-ই বা করবার আছে?

মিনিট দশেক পরে তিনি একটি কীর্তি করলেন। নিদ এসে গিয়েছিল হয়তো। তারই মধ্যে তিনি জড়ানো গলায় হেঁকে উঠলেন— 'বহু, বহুবেটি, নাস্তা লাও, বহোৎ দের হো চুকা-আ-আ...'

বহু বলে উঠল—'ফ্রিজে সব গোছ করা আছে বাপুজি, দুধ ঠাণ্ডা হবে, তো কোই বাত নেই, পীয়ে লিন। লাড্ডু ভি আছে। এখন তো আর দুধ গরম করতেও পারব না, হালোয়া বানাতেও পারব না। জলের মধ্যে কুলি করতে এখন নাস্তানাবুদ হচ্ছি কি না।'

হৃদয়নারায়ণজি আধা-ঘুমেই উঠলেন, আস্তে ধীরে দোতলায় নামলেন। খাবার ঘরে পেল্লাই ফ্রিজ রয়েছে। খুলে দেখলেন তাঁর রুপোর গেলাসে ভর্তি দুধ, পাশে ঢাকা বাটিতে লাড্ডু, সেগুলি বার করে নিলেন। খাবার টেবিলে রাখলেন। বসলেন, এক চুমুক কনকনে ঠাণ্ডা দুধ পান করার পর তাঁর চমকটা লাগল। এ কী! বহু তো নেই! কে কথা বলল? কে তাঁকে ফ্রিজ খুলে দুধ-লাড্ডু খেতে বলল? কে? কে?

বেলা আড়াইটা নাগাদ হৃদয়নারায়ণের বুড়োটে বিপত্নীক বেটা জগদীশ, তার খাস নোকর লুচ্চা শ্যামলাল, কিছু ভুঁড়িয়াল প্রতিবেশী বন্ধুবান্ধব, তাদের ছেলেরা সব যখন দাহকর্ম সেরে 'অগ্রবাল হাউজ'-এ ফিরে এল, দেখে হৃদয়নারায়ণ চান করে নিয়েছেন। খালি গায়ে বুকের ওপর পৈতের গোছা বেশ চকচক করছে, টাইট ভুঁড়িটার ওপর ধুতির কষি শক্ত করে বাঁধা। একটা টুলের ওপর মিট্টিকা দিয়া জ্বলছে, পাশে শোয়ানো রয়েছে একটা লোহার ছোট কাঠারি। প্লেটে চানা কি ডাল। বড় ভাঁড়ে মুহ্‌মিঠা করবার জন্য বড় বড় বঙ্গালি রাজাভোগ সব রেডি। জগদীশ বুরবক কাঁহিকা, পৃথিবীতে সমাজে সংসারে চারদিকে যা হয়ে চলেছে যা হচ্ছে বা হয়ে গেছে সে সব বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করাই তাঁর আদত। তাঁর মনে কোনও প্রশ্ন জাগেনি। পিতার নির্দেশমতো দিয়ার তাপ হাতে করে মাথায় নিয়ে, চানার ডাল দাঁতে কেটে, রাজাভোগ খেয়ে নিলেন তিনি। কিন্তু বুঢ়া মিশির আর লুচ্চা শ্যামলাল একটু হাঁ মতো হয়ে যায়। বুঢ়াবাবু এ সব কী করেছেন? তারা তো গঙ্গায় নাহা করেই এসেছে। তাই-ই তো যথেষ্ট ছিল। তা বুঢ়াবাবু নিশ্চয় এ সব করেছেন বহুজির অপঘাতের জনা। বুরা নজর না লাগে তাই অতিরিক্ত সাবধানতা। খুব খেয়াল তো বুঢ়াবাবুর? বিপদে-আপদে মাথার ঠিক না রাখলে আর এত্তা বড়া বেওসা এত্তা বড়ি হাভেলি সব বানিয়েছে। চালাচ্ছে।

আসল কথা কিন্তু হৃদয়নারায়ণ তাঁর বঙ্গালি বন্ধু-বান্ধবদের ঘরে অনেক কাল আগে কভি কভি এ সব দেখেছেন, কলেজের বন্ধু, স্কুলের বন্ধু। কিন্তু তাই বলে নিজ হাতে এ সব করবার মতো খেয়ালবান ও উদ্‌ভাবক মানুষই তিনি নন। তা ছাড়াও বহুর মৃত্যু বিনামেঘে বজ্রপাতের মতোই একটা ব্যাপার। শোকের চেয়েও বড় কথা তাঁরা পিতাপুত্র হতভম্ব, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছেন। একজন অতিবৃদ্ধ যদিও-বেশ-সাব্যস্ত-এখনও আর একজন নাতিবৃদ্ধ-কিন্তু-জরদ্গব-গোছের এই দু'জনে ভারী নিশ্চিন্তে নিজেদের রুটিন কাজ করে যাচ্ছিলেন। জীবনযাত্রার অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবার দিকটা নিয়ে কখনও কিছু ভাবেননি, এখন পায়ের তলা

থেকে মাটিটাই সরে যাবার অবস্থা হয়েছে। একটা বেলাতে যে বিশৃঙ্খলার মুখোমুখি হয়েছেন দু'জনে সেটাই পরবর্তী অবস্থা টের পাওয়াবার জন্যে যথেষ্ট। বাড়িতে লোকসমাগম হল এত, কেউ এক গ্লাস জল পর্যন্ত পেল না। শ্যামলাল এমন শোকার্ত চেহারা করে ঘোরাফেরা করতে লাগল যেন বাড়িতে একটা মৃত্যু ঘটে গেলে নোকরদের আর ঘর সাফা করা, পানি ভরা, এ সব কাম করতে নেই, করলে মৃতার প্রতি অসম্মান দেখানো হয়। বুড়া মিশিরের একটু আক্কেল অবশ্য আছে। কিন্তু সাধ্য সীমিত।

—'নহা করে নিন বাপু। তারপরে রসুই ঘরে যান। গ্যাস উনুনের তলাকার তিসরা ড্রয়ারে নারিয়েল ভাঙার ছোট কাটারিটা পাবেন, ওপরের ক্যাবিনেটের ডানদিকে পরপর ডাল আছে। দুসরা ডাব্বায় চানা ডাল পেয়ে যাবেন। পূজার ঘর থেকে বাত্তি নিয়ে জ্বালিয়ে দিন। ওরা সব এসে তাপ নিয়ে, দাল দাঁতে কাটবে, লোহা ছুঁবে। বঙ্গালি লোগ অশুভ কাটাবার জন্য এই রকম করে। আপনার বহুর মওতটা তো অপঘাতই হল কি না... । আর হাঁ, উল্টা দিকের "হরকিষেণ সুইটস্"-এর ছুকরাটাকে ডাকুন, এখন এদিকেই তাকিয়ে আছে—ওকে দিয়ে বঙ্গালি রাজাভোগ আনিয়ে নিন, কিলো পাঁচেক। সব মুহমিঠা করবে।'

এই নির্দেশই উনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন মাত্র। এতে ওঁর বাহাদুরি অল্পই। এবং সে কথা জানিয়ে জগদীশকে নিশ্চিন্ত করার প্রয়াস তিনি সেই রাত্তিরেই করলেন।

'বহু মরে গেলেও আমাদের ছেড়ে যায়নি বেটা।'

জগদীশ এমনিতেই বুঁদ হয়ে থাকেন। আজ বহোৎ খাটাখাটনি গেছে। শরীরটা টিসির টিসির করছে। আজকে তিনি বসে বসেও কেমন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছেন। বাপের কথা প্রথমটায় কানে নিলেন না।

—'শুনতে পাচ্ছ বুদ্ধু, বহু আমাদের ছেড়ে যায়নি।'

এ বার কথাটা তাঁর কানে গেল। কিন্তু তিনি এটাকে পিতার ফিলসফি বলে ধরে নিলেন '—হাঁ হাঁ, জরুর জরুর,' তিনি বাবার দার্শনিকতাকে সমর্থন জানান।

কিন্তু তাঁর বুঁদ ভাব পর মুহূর্তেই কেটে যায়। কেননা ঢং ঢং করে এগারোটা বাজছে। এবং সেই সঙ্গেই দুজনেই শুনতে পান 'রাত গারা বেজে গেল। দুজনে যে যার কামরায় শুয়ে পড়ুন গে। উল্লু ডাকছে শুনতে পাচ্ছেন না?'

বাপ বেটার দিকে তাকাল বিজয়গর্বে। বেটা বাপের দিকে তাকায় বোকার মতো।

—'যাও সো যাও জগদীশ, কাম-কাজ তো তোমার দুখ, তোমার তকলিফ মানবে না। এবার শুয়ে পড়ো গে যাও।' বলে জগদীশ কা বাপ নিজের শয়নঘরের দিকে পা বাড়ান। অনেকটা আশ্বস্ত এবং নিশ্চিন্ত।

কিছুদিনের মধ্যেই চিত্তরঞ্জন অ্যাভেন্যুর 'অগ্রবাল হাউজ' কণ্ঠস্বরে কণ্ঠস্বরে ভরে যায়।

৫

প্রথম প্রথম এই কণ্ঠস্বর শুনতে পেতেন হৃদয়নারায়ণ এবং তাঁর ছেলে বুদ্ধু কাঁহিকা জগদীশ। যখন যার কিছু করার দরকার পড়ত, কিন্তু হদিশ পেত না কোথায়, কীভাবে তখন এই স্বর তারা শুনতে পেত। ধরা যাক জগদীশ তাঁর ব্রাউন জুতোজোড়া পাচ্ছেন না, কিন্তু সে জোড়াই তাঁকে পরতে হবে আজ, গোরুখোঁজা করে খুঁজছেন তিনি। হঠাৎ শুনলেন— 'জুতোর র‍্যাকের পিছনটা দেখেছেন?'

ব্রাউন জুতোজোড়া কী ভাবে যেন র‍্যাকের পেছন দিকে পড়ে গিয়েছিল। জগদীশ তাদের পান।

জল খেতে যাচ্ছেন জগদীশ।

'ওটা কালকের বাসি পানি। শ্যামলালকে টাটকা পানি ভরে দিতে বলুন।' —জগদীশ ডাকেন— 'শ্যামলাল, শ্যামলাল বেটা উল্লু কি পাঠ্ঠা, পানি বদলাসনি কেন?' খেতে বসেছেন। —'চার খানা পরোটা হয়ে গেল, আজ আর থাক।' জগদীশ তৎক্ষণাৎ হাত গুটিয়ে নেন। স্ত্রী বারণ করেছে তিনি আর খাবেন না। বয়সটা ঘাটের কাছে যাচ্ছে। বুঝে সুজে খাওয়া-দাওয়া দরকার। তাঁর তো সব সময়ে খেয়াল থাকে না কি না। সাবিত্রী হুঁশিয়ার আওরত্, মনে করিয়ে দিল, তাই।

আর জগদীশের বাপের তো কথাই নেই।

ঘুম থেকে উঠতে যতটুকু দেরি। তার পরেই নির্দেশনামা চলতে থাকে।

—'টয়লেটে পা টিপে টিপে যান, পিছল হয়েছে। মিশিরকে বলুন জমাদার ডেকে ঘষিয়ে নেবে।'

—'ছাদে যাবার আগে গায়ে একটা তুষ, মাথায় একটা টুপি লাগিয়ে নিন। ঠাণ্ডা পড়েছে।'

—'এ কাপড়টা ধোবির কাছে যাবে, আলমারির পয়লা তাকে কাচানো ধুতি-পিরান পাবেন।'

—'বসুন ঠাণ্ডা হয়ে শ্যামলাল নাস্তা নিয়ে আসছে।'

—'বারিস হচ্ছে, ছাত্তি নিতে ভুলবেন না। মাথায় যেন একফোঁটাও পানি না পড়ে।'

এই রকম হাজারো নির্দেশ, পরামর্শ, সারাদিন, উঠতে বসতে খেতে শুতে।

আগে খানা পাকাত বহু। এখন তার জন্য একটি ব্রাহ্মনী রাখা হয়েছে। সে দই বসায়, ছানা কাটায়, আচার শুখায়, পুরি-হালোয়া-সবজি-উবজি সব বানায়। শ্যামলাল আগেরই মতো ঘর সাফা করে, বর্তন সাফা করে, মশলা গুঁড়ায়, কাপড় কাচা করে, আর বুঢ়া মিশির জুতা পালিশ, কাপড় ইস্ত্রি, পান সাজানো, এই সব হালকা কাজ করে আর বড়া মালিকের দেখাশুনো ভি করে।

এই বুঢ়া মিশিরই একদা তার বড়া ছোটা দুই মালিকের মধ্যে একটি অদ্ভুত সংলাপ শুনে ফেলে।

বড়া মালিক—'ভাঙের শরবত তুমি নিজে বানাতে না পারো তো পিও না। পিনা

বন্ধ করে দাও।'

ছোটা মালিক—'আমি কি এখনও বাচ্চা লড়কা আছি না কি আপনার? কী খাব, কী পিব আপনার ইজাজত লাগবে? আমি তো আর আমাদের সব রিস্তেদার ইয়ার-দোস্তদের মতো উইস্কি ওড়াচ্ছি না? আমার যা হাল—একটা বউ নেই, বালবাচ্চা নেই, কার জন্য কামাচ্ছি নিজেই জানি না, আমার তো বার-রেস্তোরাঁয় গিয়ে উইস্কি পান করারই কথা!'

বড়া মালিক— 'তো পিও। ইয়ার-দোস্ত নিয়ে পিও, তাতেই যদি আনন্দ পাও তাই-ই করো, কিন্তু এ লুচ্চা শ্যামলালের সঙ্গে ভাঙ কি শরবত পিও মৎ। পান করাতে আমি আপত্তি করছি না। ভাঙ এবং শ্যামলালের বানানো ভাঙ শ্যামলালের সঙ্গে বসে পান করা না-মঞ্জুর।'

ছোটা মালিক— 'শ্যামলাল ছোটলোক, নোকর, তাই? তো আপনি পুরানা জমানার লোক আছেন। আমরা নয়া জমানার লোক। ও সব মানি না, রামজি নিজেই তো হনুমানজিকে কত খাতির করতেন। শ্যামলাল কি আমার কম করে? জুত্তা, কাপড়া ঠিক রাখা, বিস্তরা লাগানো। খানার ফরমায়েশ পাকানেওয়ালির কাছে পৌঁছে দেওয়া, দিনরাত বাড়ির খিদমত, আমার খিদমত খাটছে। তো তাকে যদি আমি আমার ভাঙের পরসাদ একটু-আধটু দিই, তাতে কিছু রামায়ণ অশুচ হবে বলে আমার মনে হয় না।'

বড়া মালিক— 'আরে বুরবক কাঁহিকা, বহু আমাকে হররোজ বলে যাচ্ছে শ্যামলাল আপনার বেটার শরবতে কড়া কড়া দাওয়াই মিশিয়ে দিচ্ছে, ওর মতলব ভাল নয়, তাই-ই বলা। নইলে আমার কী?' ছোটা মালিক— 'সাবিত্রী বলছে? সচ?'

—'উঠতে বসতে বলছে। কাল রাতের খানার সময়ে তুমি কাছা লাগাতে ভুলে গেলে, তখন বলল। তোমার মুখ থেকে লংকার আচার-পুরির গ্রাস খসে পড়ে গেল, তখন ভি বলল। কাল সারা রাত বহু আমায় ঘুমাতে দেয়নি।'

মিশির তার পক্ষে যতদূর কান খাড়া করে শোনা সম্ভব, শোনে। কাল রাতে? কাল রাতে বহুজি কোথায়? কাল এঁদের খানার টাইমে সে তো উপস্থিত ছিল। সত্যিই ছোট মালিক কাল সুস্থ ছিলেন না। বড্ডই যেন নেশা হয়ে গিয়েছিল।

ছোটা মালিক তখন বললেন— 'তো, আমাকে বললেই তো পারে, আপনাকে বলা কেন, আপনার নিদ নষ্ট করার কী মানে আছে? কবে আর তার বুদ্ধিসুদ্ধি হবে? সেদিন জুতোজোড়া খুঁজে পাচ্ছিলাম না, সে তো আমাকেই র‍্যাকের পেছনে তলাশ করতে বলল। এটাও...'

বড়া মালিক তখন বললেন— 'তা হলেই বোঝো, সে নিশ্চয় তোমায় বলেছে, তুমি শোনোনি। তখন বেচারি আমাকে বলছে।'

সেই সন্ধেতেই ছোটা মালিক শ্যামলালকে আচ্ছা করে ধমকে বললেন— 'এই উল্লু, নিজেকে বহোৎ চালাক ঠাউরেছিস, না? কী মিশিয়েছিলি আমার শরবতে? ভাবিস কিচ্ছু বুঝি না, না? আমার সামনে বানাতে হয় বানা, আর নয় তো ভাগ্। ভেগে যা। কী নিলি আমাকে কড়া দাওয়া খাইয়ে? তোর ঘর তলাশ করাব আমি। মিশির,

যাও তো, এ উল্লুটা কী কী সরিয়েছে, হিসাব করো তো!' শ্যামলাল এত হকচকিয়ে গিয়েছিল, যে একটা কথাও বলতে পারেনি। মিশির শ্যামলালের ঘর থেকে বান্ডিল-বান্ডিল নোট উদ্ধার করে, এ ছাড়া চাঁদির একটা পিকদান, এটা বড়ি মালকিনের, সে চিনতে পারে সহজেই।

থাপ্পড় খেতে খেতে শ্যামলাল নিজেকে ডিফেন্ড করার নানা কোশিশ করতে থাকে। পিকদানটা না কি মালকিন স্বয়ং তাকে উপহার দিয়েছিলেন, বহুজি জানতেন। আর বাজারের ফেরত টাকা বহুজি কোনও দিন নিতেন না তাই জমিয়ে...

ছোটে মালিক তাকে এক থাবড়া মেরে বলেন— 'তাই জমিয়ে তুই ব্যাঙ্কের স্টেপ্‌ল করা গোছা গোছা নোট পেয়েছিস, বদমাশ কাঁহিকা? এবারের মতো তোকে ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু থানার বড়বাবুকে আমার বলা থাকবে, তোর ওপর নজর রাখবেন, আর আমার যদি কিছু হয় তোকে সঙ্গে সঙ্গে হাজতে পুরবে।'

পরদিনই শ্যামলালের ফটো খিঁচা হল, তাতে বুড়ো আঙুলের ছাপ, দেশ-দেহাতের ঠিকানা, রিস্তেদারদের নাম সব জমা পড়ল পুলিশের খাতায়।

মিশির ভাবল ভাগ্যিস সে বড়া মালিকের মোহর বসানো সোনার হারটা পূজার ঘরের চৌকাঠে পড়ে থাকতে দেখে বড়া মালিককে ফেরত দিয়েছিল। উনি ভাল বকশিস করেছিলেন, কত আচ্ছা আচ্ছা প্রশংসার কথা বলেছিলেন। তাতে মিশিরের ভালই লেগেছিল, কিন্তু হারটা নিতে পারলে আরও ভাল লাগত। নেয়নি বলে এই কাল পর্যন্ত একটা চাপা আফসোস থেকে গিয়েছিল তার হৃদয়ে। আজ সে সভয়ে ভাবল, ভাগ্যিস! এই যে আজ শ্যামলালের এত হেনস্থা হল, বুঢ়া মিশিরের ফটোও তো এঁরা খিঁচে নিতে পারতেন, তার দেশ-দেহাতের হাল সাকিন, তার রিস্তেদারদের ঠিকানা, তার বুড়ো আঙুলের ছাপও তো নিয়ে রাখতে পারতেন। তা এঁদের সে কথা মনেই হল না। কেঁও কি সে পাঁচ ছয় ভরির সোনার হারটা মোহর সুদ্ধ ফেরত দিয়ে দিয়েছে।

পরে শ্যামলাল ওকে বলে, 'মিশিরজি তুমি তো চাচার সমান। কোনওদিন তোমার সামনে বেসহবৎ হয়েছি এ কথা বলতে পারবে? তুমি কেন আমার সঙ্গে এমন বেইমানি করলে?'

'বেইমানি?'—মিশির খিঁচিয়ে ওঠে—'ইমান কাকে বলে জানিস রে ভঁইস চোর? মালিক মালকিনদের নিমক খাচ্ছিস কবে থেকে, কড়া দাওয়া খাইয়ে এত্তা এত্তা চোরি করেছিস আবার বেইমান বলছিস আমাকে?'

শ্যামলাল চট করে নরম হয়ে যায়, বলে— 'ইমানদারি কি বাত ছোড়ো মিশিরজি। বড়লোক কবে ছোটলোকের সঙ্গে ইমানদারি করেছে যে ছোটলোক বড়লোকের সঙ্গে করবে? এই যে আজ দুই মালিক বুঢ়া হয়ে যাচ্ছে, কবে পট করে মরে যায়। তা তোমার মতো বুঢ়া মানুষ কি আমার মতো জওয়ান মানুষ, কারওই কি কোনও ব্যবস্থা এরা করেছে, না করে থাকলে খুদ কা মদত খুদ করো এ তো সাফ কথা!'

এমন হামদর্দ! মিশিরজির কট্টর মর‍্যালিস্ট হৃদয় একটু গলে। সে বলে— 'আমি তোর ব্যাপার-স্যাপার জানতামই না, তার বলব কী? আমি কিছু বলা কওয়া করিনি।'

—'তো হঠাৎ ছোটা মালিক আমার ওপর এত খাপ্পা হয়ে গেল কীসে? কে লাগাল?'

তখন মিশির গম্ভীরভাবে বলে—'কেউ লাগায়নি। বহুজি ওঁদের সাবধান করে দিয়েছেন।'

—'বহুজি যখন জিন্দা ছিলেন। তখন তো কিছু হয়নি?'

—'তুইই কি তখনও?...

— 'আরে থোড়া থোড়া মিশিরজি।'

— 'তা সে যাই হোক, বহুজি তো তখন বলেননি, বলেছেন এখন, কাল রাতে। বড়া মালিককে নিদ যেতে দেননি সারা রাত।'

শ্যামলাল হাঁ— 'মতলব? কী মানে এর?'

—'মতলব এই, মওত কি বাদ ভি বহুজি এই হাভেলিতে বয়ে গেছেন, তীক্ষ্ণ নজর তাঁর চারদিকে। বরং মৃত্যুর পরে আরও বেশি বেশি দেখতে পাচ্ছেন। জুত্তি কোথায় ছাত্তি কোথায় এ-ও যেমন বলে দিচ্ছেন, চোরি, ভাঙ্গের শরবতে কড়া দাওয়া মেশানো এ সব কথাও তেমনি জানতে পাচ্ছেন। বলে দিচ্ছেন।'

— 'ওরে বাপ্ রে!'— শ্যামলাল তৎক্ষণাৎ ভিরমি খায়।

ক্রমে ক্রমে বাড়ির তিন বহাল নোকর-নোকরানি, জমাদার, দুধওয়ালা, ধোবি ড্রাইভার সব্বাইকার মধ্যেই চাউর হয়ে যায় কথাটা। এবং কিছুদিনের মধ্যেই এ ও সে যেখানে সেখানে যখন-তখন শুনতে পেতে থাকে।

খানা পাকানেওয়ালি যমুনা ব্রাহ্মণী তো সোনার নোকরি পেয়েছিল। দুই বুঢ়ার সংসার। কোনও মেয়েলোক নাক গলাতে নেই। কে না জানে ব্যাচেলর কি বিপত্নীকের বাড়ি কাম-কাজের সুবিধা কত। তো যমুনা তো ভাল টাকা মাহিনা পাচ্ছিলই। উপরন্তু তার বাড়ির চাপাটি সবজি, মিঠাই, আচার এ সমস্তর খরচ-খরচা একেবারেই বেঁচে গিয়েছিল। এ বাড়ির চারটি আদমির সঙ্গে সে নিজের ফ্যামিলির সাত জনকে ধরে নিয়েই রাঁধা-বাড়া করত। কাজের শেষে পেট কাপড়ে খানিক, বুকের মাঝখানে খানিক বয়ে নিয়ে যেতে তার কোনও অসুবিধাই ছিল না। সে দিন খুব মন দিয়ে মালাই খাচ্ছিল। দুধটা ভিটাভিট জ্বাল হচ্ছে আর মোটা সর পড়ছে। সর পড়ছে আর যমনা তাকে বাটিতে তুলছে। বাটিতে তুলছে আর শক্কর মেশাচ্ছে, একটু ঠাণ্ডা হতে না হতেই হাতে করে তুলে তুলে খেয়ে নিচ্ছে আবার দুধ ঘুঁটছে।

কে বললে— 'খেতিস খেতিস, এঁটোটা না করে খেতিস। নিজের উচ্ছিষ্ট মালিকদের খাওয়াচ্ছিস, কাজটা কি ভাল হচ্ছে?'

—'এঁটো করে খাব না তো কী করে খাব? কেউ এসে পড়লে? তাড়াতাড়ি করতে হচ্ছে না?'—বলে যমনা বেশ করে বুড়ো আঙুল দিয়ে কটোরি চাঁছছে, সহসা তার খেয়াল হয়, কার কথার জবাব দিল সে? কে বলল? কোথা থেকে?

সে চারপাশে তাকিয়ে রসুই ঘরের বাইরের চৌহদ্দিও ঘুরে এল। কোথায় কে? শ্যামলাল গেছে বাজারে, বুঢ়া মিশির চারতলায় বড়া মালিককে দলাই-মলাইয়ের লোক এসেছে সেইখানে খবরদারি করছে। কে বলল? গলাটা মরদের না জনানার

তা-ও ঠাহর হচ্ছে না তার, কিন্তু বলেছে, কেউ একটা বলল। পড়ি-মরি করে রসুইঘরে ছুটে আসে সে। সাবান দিয়ে হাত ধোয়, দুধের হাতা মেজে নেয়।

যমনা নিজেকে বোঝায় তার মনের ভুল। কিন্তু আরেক দিন কোঁচড়ে চোদ্দোখানা মোটা মোটা পরোটা নিয়েছে, গুনে গুনে, আলু-ভেণ্ডি, বৈগন কি ভর্তা, সব ঠিকঠাক করে গুছিয়ে নিচ্ছে, আওয়াজ উঠল—'নিতিস নিতিস, মালিকদের বলে কয়েই নিতিস, লোকগুলো তো বুরা নয়!

—'বলতে গেলে আবার কেউ দেয়? যদি বা দেয় এত দেয়?' যমনা বলল।

—'সমঝে দ্যাখ নিজেই বলছিস—এত। নিজের মনকে জিজ্ঞেস কর কাজটা ঠিক করছিস কি না।'

—হাঁ হাঁ, আচ্ছা বুরা তুই আমাকে সমঝাবার কে রে?'— বলেই কাঠ হয়ে যায় যমনা। রসুইঘর ফাঁকা। কোথাও কেউ নেই। একগাদা পরোটা-সবজি পলিথিনের প্যাকেটে ভরে সে একা-একা নথ নাড়ছে।

এরপর তার ভিরমি খাওয়া কেউ আটকাতে পারবে?

এই অবস্থাতেই তাকে আবিষ্কার করে মিশির। চোখেমুখে জল দিতে যমনার হুঁশ আসে। কিন্তু সে আর এক মিনিটও দাঁড়ায় না। পরোটা-তরকারির প্যাকেট ফেলে রেখে পগারপার হয়ে যায়। হেঁকে বলে যায়—'দুসরি ব্রাহ্মণী খুঁজে নাও। এই ভূতের বাড়িতে আমি আর আসব না।'

যমনার ভিরমি, পলায়ন, এবং পলিথিনের প্যাকেট এবং তার শেষ বাণী, সব মিলিয়ে মিশিরের ব্যাপার বুঝতে কোনও অসুবিধেই হয় না। দুসরা খানাপাকানেওয়ালি খুঁজে বের করতে হয়, আরও বেশি মাহিনা দিয়ে। উপায় কী?

সততার কোনও তর-তম থাকার কথা নয়। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে এটা থেকেই যায়। যেমন মিশির। সে তুলনামূলকভাবে অন্যদের থেকে সৎ। যা পেটে খেতে পারে খায় বাবা, দেহাতে খেত্তি জমি আছে পোতাদের, মালিকের কাছ থেকে মাঝে মাঝে কিছু চেয়ে চিন্তে পোতাদের পাঠায়। সে তার বুঢ়াকালের কথা ভাবে না। বুঢ়ামালিকের মতো বয়স অবধি সে বাঁচবে না এ বিষয়ে সে নিশ্চিত। এবং বুঢ়া মালিক মারা গেলেও ছোটা মালিক তো থাকবে। মিশিরের জীবনকালটা সুতরাং এই অগ্রবাল হাউজেই কেটে যাবে। তাই যাক। মালিকরা তো লোক খারাপ নয়, খানা পিনা ভাল। কাপড়া ধোতি না চাইতেই দিয়ে দিতেন বহুজি, বড়ি মালকিন। এঁদের কাছে একটু চেয়ে নিতে হয়, মরদ লোকের এ সব খেয়াল আসতে চায় না। বিমারি বুখার হলে দাওয়া বিশ্রাম এ সবও মঞ্জুর। কেন অখুশি হবে মিশির? এমন শহরের আরাম সুখ সুবিধে কি দেহাতে পাবে? ওসব কয়েক দিনই ভাল, বরাবরের জন্য থাকতে গেলে শরীর, মন কোনওটাই টিকবে না। অভ্যাস চলে গেছে।

মিশির চোরি চামারি আর করবে কার জন্যে? কিন্তু একটা দুটো দুর্বলতা আছে মিশিরের। যেমন বুঢ়া মালিক বেরিয়ে গেলে পর তিনতলার কোল্যাপসিবল সে আটকে দেয়। তারপর মালিকের স্নানঘরে আশ মিটিয়ে নাহা করে। বাথটবে ঠাণ্ডা গরম জল মিশিয়ে তাতে গোলাপজল দেয়। তারপর আরামসে শুয়ে থাকে। দামি

চন্দন সাবান, পা ঘষবার পাথর, সব করে-টরে সাফসুতরো হয়ে সে মালিকের পূজার ঘর বা মন্দির-এ গিয়ে ভগবানের পূজা করে, তারপর মালিকের খাটে শুয়ে ঘুমোয় যতক্ষণ না দোতলা থেকে ইলেকট্রিক বেল জানান দিচ্ছে যে খাওয়ার সময় হয়ে গেছে।

—'নোকর যদি মালিকের নাহাঘরের টবে শুয়ে থাকবে তো মালিক-নোকরের নসিব কেন অলগ্ অলগ্ করলেন ভগোয়ান?'

এবংবিধ বাণী শুনতে পায় আকাশ নীল টবের মধ্যে চন্দনের ফেনায় শোভিত মিশির এক কাঠফাটা গ্রীষ্মের দুপুরে। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে পড়ে, আকাশ নীল টার্কিশ তোয়ালে দিয়ে নিজের শুকনো খড়খড়ে গা-হাত মুছে ফেলে, তারপর লম্বা আয়নায় নিজের নাঙ্গা শরীরের প্রতিবিম্ব দেখে সে জিভ কাটে।

সচ, বিলকুল সচ। নীল বড়লোকি তোয়ালে কাঁধে এ তো এক গরিবের শরীর, নোকরের শরীর, না আছে ছিরি না আছে ছাঁদ। এই শরীর আর এই নসিব নিয়ে সে মালিকের টবে চান করেছে? ছিঃ, এটা যে বহুজির না-মুমকিন হবে এতে আর আশ্চর্য কী? মিশির টব বারবার করে ধোয়, চন্দন সাবান শুকিয়ে রাখে, নীল তোয়ালে ভাল করে কেচে ছাদের রোদে শুকিয়ে নেয়। কোল্যাপসিবল গেটের তালা খুলে দিয়ে মালিকের কামরার মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়ে। অন্য নোকর যেমন শ্যামলাল যদি আসতে চায় আসুক, দেখুক, সারা তিনতলাটা ফাঁকা পেয়েও সে কোথায় শুয়েছে, চান তো বহুজিও এসে দেখুন, দেখেই যান না একবার, তাঁদের মিশির কেমন ইমানদার, বিচক্ষণ নোকর।

ভেবেই চমকে উঠল মিশির। আরে বহুজির দেখবার জন্য তো কোল্যাপসিবল খোলবার দরকার নেই। অতি তুচ্ছ জিন্দা শ্যামলাল ওই পথে আসবে। বহুজি এখন বাতাসের কণায় কণায় বিরাজ করছেন। তিনি এই শোবার ঘরেও আছেন, ওই দালানেও আছেন, পূজার ঘরেও আছেন, আবার বাথরুমেও আছেন। শিউরে উঠল মিশির। ছি, ছি, ছি, বহুজি যে বাথরুমেই তার সঙ্গে কথা বললেন। তিনি মিশিরের কীর্তি তো দেখলেনই, মিশিরের অতি কুৎসিত নাঙ্গা বুঢ়াপন, কুৎসিততর গোপন প্রত্যঙ্গ সবই তো দেখে ফেললেন। মিশির আর সইতে পারে না। সে গামছা দিয়ে মুখ ঢেকে বুঢ়া মালিকের ঘরের মেঝেয় কুকুর কুণ্ডলী হয়ে শুয়ে থাকে, যেন বহুজির দৃষ্টি থেকে তার মুখ এবং অন্য প্রত্যঙ্গটিও সে আড়াল করতে চাইছে। বহুজি যে স-ব দেখে ফেলেছেন এই ভয়ে আর শরমে সে মুখ তুলতেই পারে না। মাটির দিকে চোখ রেখে সে চলে কয়দিন।

—'আরে এ বুদ্ধু, মুখের দিকে তাকা,' —বুঢ়া মালিক বকে ওঠেন।

শ্যামলাল বলে—'ও চাচা, মেঝের দিকে চেয়ে চেয়ে নিজের পা নিজে দেখছ কেন? দিমাগ খারাপ হল না কি?' তখন মিশিরের খেয়াল হয়—আরে বহুজি তো শুধু আশেপাশে কড়িকাঠে, জানলা দরজাতেই নেই। তিনি তো মেঝেতেও আছেন। বহুজির শান্ত, শুখা-শুখা চোখ একদিন যা খুব সুন্দর ছিল, তা ওপর নীচ, আশপাশ, পিছন-সামনে সব দিক থেকে মিশিরকে দেখে। মিশির আর বুঢ়া মালিকের স্নানঘরে

যেতে সাহস পায় না, এমনকী পূজাঘরে মালিকের আসনে বসবার সময়েও তাকে কেউ বলে ওঠে—'এক আসনে বসে পূজা করবার নসিব হলে তো তুই মালিক হয়েই জন্মাতে পারতিস।'

—'বুরা মৎ মানিয়ে' বলে মিশির শশব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ে।

শ্যামলালের কেস আলাদা। সে মরিয়া চরিত্রের আদমি। কয়লার ময়লা ধুলেও যায় না গোছের। বহুজির ভয়ের চাইতে পুলিশের ভয় তার অনেক বেশি। এত কিছুর পরেও যে মালিকরা তাকে তাড়িয়ে দেননি, শুধু শাসিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন, উপরন্তু চাঁদির পিকদানিটা যে সে মিছে কথা বলে বাগিয়ে নিতে পেরেছে এতে তার হৃদয় আশ্বস্ত হয়েছে, সে এটাও বুঝেছে যে এই দুই বুঢ়ার তাকে না হলে চলবে না। তাই সে তার জরুর জন্যে কিছু গয়নাগাঁটির তালে থাকে। যে জিনিস রোজ ব্যবহার হয় না, সে জিনিসের খোঁজও চট করে পড়ে না। তা ছাড়া এই দুই বুঢ়া কি হিসেব রেখেছে বহুজির কী কী গয়না ছিল। কেমন ছিল? ভারী ভারী গহনা সব এরা লকারে রেখেছে, কিন্তু হিরের নাকছাবি, কানের হিরের ফুল, প্রতিদিন পরবার সোনার কাঞ্চন? এ সব? এ সব শ্মশানে নিয়ে যাবার সময়ে ছোটে মালিক খুলে আলমারিতে রেখে দিয়েছেন। ব্যাঙ্কের লকারে রেখে আসা সম্ভব, কিন্তু না আসাও সম্ভব। শ্যামলালের বড্ড সাধ যায় যে গোদরেজের আলমারিটি খুলে খুঁজে পেতে সেই জিনিসগুলির চেহারা দেখে।

মিশির দেশোয়ালি ভাইদের সঙ্গে আড্ডা মারতে গেলে সুতরাং সে টিপির টিপির তিনতলায় ওঠে। বহুজির ঘর চাবি লাগিয়ে খোলে সে। ঝাড়পোঁছ করতে থাকে, কেউ যদি এসে যায় দেখবে দায়িত্বশীল নোকর বন্ধ ঘর খুলে সাফা করছে। যেমন ভেবেছিল, পুরো চাবির থলো যেটা বহুজির কোমরে ঝুলত সেটাই বিছানার বালিশের তলায় পেয়ে যায় সে। কড়াক করে চমৎকার আওয়াজ করে আলমারির পাল্লা খুলে যায়। আর একটা চাবি দিয়ে লকার খোলে সে। বাস সামনেই কাঞ্চন, হিরের নাকছাবি, কানের ফুল সব চমকাচ্ছে। নাকছাবিটাই তুলে নেয় সে। বাঃ, চাঁদ কা টুকরা, নাঃ সুরজ কা টুকরা, নাঃ চাঁদ কা, না সুরজ কা...।

—'মোতিয়ার নাকে এ নাকছাবি মানাবে না শ্যামলাল। মাঝখান থেকে পুলিশের ফেরে পড়বি। মালিকদের টের পেতে দেরি হতে পারে। কিন্তু মোতিয়ার নাকে এ গয়না যেদিন উঠবে, সেই দিনই পুলিশ চৌকিতে খবর চলে যাবে।'

বহুজির শান্ত, অনুত্তেজিত গলা নিজের কানে শুনল শ্যামলাল। এত স্বাভাবিক যেন বহুজি তার মাথার ভেতর থেকে, বুকের ভেতর থেকে বলছেন। শ্যামলাল যেন বিচ্ছু ছেড়ে দিচ্ছে হাত থেকে এমনি করে জেবর রেখে দেয়। তারপরে কড়াক করে আলমারি বন্ধ করে দেয়।

৬

এখন সবাই জানে। আশেপাশে, আত্মীয় মহলে রটে গেছে ব্যাপারটা। 'অগ্রবাল হাউজ'-এ দেও আছে। ভূতের বাসা বাড়িটা। বুঢ়াদুটো একা একা থাকে, অনেকেই

করুণাবশত কর্তব্যবশত খোঁজখবর করত। শর্মারা, ছাবরিয়ারা, জালানরা, মাধোগড়িয়ারা, টিবরেওয়ালারা। এদের বাড়ির বড় মালিকরা ফিনফিনে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে গলায় ঝকঝকে সোনার চেন দুলিয়ে, পানে ঠোঁট লাল করে, জর্দা আর আতরের গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে মসমসিয়ে এসে যেতেন, সঙ্গে করে স্ত্রীদেরও আনতেন কেউ কেউ। যেহেতু এ বাড়িতে স্ত্রীলোক নেই, তাই স্ত্রীদের আনার আগ্রহটা ধীরে ধীরে কমে যায়। কিন্তু মালিকরা আসতেনই।

দোতলার বড় বসার ঘর একদিকে সোফা-কৌচ আর একদিকে গদি-তাকিয়া পুরানা স্টাইলের জিনিস দিয়ে সাজানো আছে। বসো যে যেখানে খুশি। নোকররা মিঠাই নিয়ে এসে যাবে—কাজু বরফি, কালাকন্দ, ভুজিয়া নিয়ে এসে যাবে। শরবত, পান সব। দুই বুঢ়া নামবে।

—'আরে ছাবরিয়াজি যে! নমস্তে নমস্তে।'

—'আইয়ে আইয়ে পরভুদয়াল ভাই, ক্যায়সা হো?'

—'রামজি যেমন রেখেছেন। অ্যায়সাই।'

—'কাম-কারবার কেমন চলছে?'

—'চলতি গাড়ি যেমন চলে।'

নিজেরা না আসতে পারলে জওয়ান লড়কাদের পাঠিয়ে দিতেন কেউ কেউ। এটা সেটা পাঠাতেন। দাদাজি, চাচাজির খবরাখবর নিয়ে যেত নয়া জেনারেশনের নওজোয়ানরা।

হৃদয়নারায়ণই একদিন গপ্‌সপ্ করতে করতে কীর্তিটি করলেন। অনেকক্ষণ ধরে উশখুশ করছিলেন, প্রভুদয়াল শেষ পর্যন্ত সেটা লক্ষ করতে বাধ্য হলেন। বললেন—'কী হল, আগরওয়ালজি, মচ্ছড় কামড়াচ্ছে না খটমল? এমন করছেন কেন?'

—'বহু বড্ড গুসসা করছে ভাই, খানার সময় হয়ে গেছে কিনা, আমি বরং যাই।'

—'তা যান। কিন্তু কে গুস্‌সা করছে বললেন?'

জগদীশ চোরা চোখে বাপের দিকে কটমট করে চায়। বাপও সামলে যায়। '...ওই যে, ওই যে মিশির...উল্লু কি পট্ঠা একটা।' প্রভুদয়াল আর কিছু বলেন না। কিন্তু মিশির যে বহু হতে পারে না, এটা বুঝতে কোনও নিউটনীয় বুদ্ধির তো দরকার হয় না! প্রথম প্রথম এঁরা ভাবেন, আগরওয়াল বাপ-ছেলে কোনও মতলববাজ নোকরনির মোহে পড়েছে। স্ত্রীলোকহীন সংসারে ঢুকে এরকম মোহবিস্তার করা তেমন তেমন নোকরনির অসাধ্য কিছু নয়। সঠিক রাস্তায় গোপন তদন্ত চালাতে ছাবরিয়াজির বুদ্ধিমতী পুত্রবধূদ্বয় একদিন শ্বশুরের সঙ্গে এসে যায়।

কুশল বিনিময়ের পর কর্তারা যেই গল্পে মেতে গেছেন, দুই বউ উঠে পড়ে, মিশির দরজার বাইরেই ঘুরঘুর করছিল, এক বউমা কুসুম বলে,

—'চলো তো দেখি তোমাদের চৌকা কেমন রেখেছ।'

মিশির তটস্থ হয়ে তাদের রসুইঘরে নিয়ে আসে।

দেখেশুনে আর এক বউমা নেহা বলে—'তা তোমাদের বহু কোথায়? খানাপাকানেওয়ালি?

—'ও তো সাম হতে না হতেই চলে যায়, এখন তো থাকে না!'

—'ও, তা ঠিকঠাক সব করে তো? জওয়ান লড়কি না কি?'

—'না তো, ও তো বুড়্‌টি। আপনা খেয়ালেই যা করবে করবে। বাস। আর বলবেন না, দু দিন অন্তর নোকরানি পাল্টাতে পাল্টাতে আমরা হয়রান হয়ে গেলাম।'

—'তাই তো। তো আর কেউ জনানা নেই? দেশ-দেহাত থেকে কোনও জনানাকে আননি তোমার মালিক?'

—'কাকে আনবেন, বলুন? মেয়েরা তো নিজের নিজের সংসার নিয়ে ব্যস্ত। খত লেখে, ফোন করে, বাস।'

—'তো বহু কে?' মোক্ষম প্রশ্নটি তাক বুঝে ছোড়ে নেহা।

—'বহু? বহুজি? উনি তো ছোটা মালিকের পত্নী। আমাদের মালকিন।'

—'তা তিনি তো মুর্দা? মরে গেছেন তো?'

—'হাঁ হাঁ জরুর জরুর।'

—'তো বহু-বহু করছেন যে তোমার মালিক?'

খুব আমতা আমতা করে মিশির। —'বহুজিকে বড্ড ভালবাসতেন কিনা। খুব মেনে চলতেন। তাই...।'

বুঢ়াদের বুড্‌ডাপন বলে উড়িয়ে দেওয়া যেত কথাটা। কিন্তু নোকররা? ক'দিন কাজ করে ছেড়ে চলে আসা নোকরানিরা? তারা তো আর কোনও বহুর স্মৃতিতে মজে থাকা বুঢ়া নয়? এই রকম এক নোকরানি বুঢ়িয়া তো ছাবরিয়াজির ছাবরিয়ানিকে স্পষ্টই বলে গেল,

—'আরে বাপ, আপনারা ওই অগরবালদের রিস্তেদার নাকি? তা আপনাদের বাড়িতেও কি আত্মা আছে?

—'আত্মা? কী বলছ?'

—'ও বাড়ি তো ভূতের বাসা। যখন-তখন ভূতে ধমকি দিচ্ছে।'

—'কী রকম ভূত, দেখেছ?'

—'দেখিনি তবে শুনেছি। কখনও চাপা মেঘের গুরগুরুনির মতো আওয়াজ, কখনও পাতলি পাতলি নাজুক নাজুক আওয়াজ।'

'ও বুঢ়িয়া দুধ আরও ঘন কর, ও বুঢ়িয়া চাপাটিতে ভাল করে ঘিউ মাখা, ও বুঢ়িয়া থালিতে যে তোর বাল আটকে আছে...

কৌতূহলে লোকে যেত। ভূত একটা দেখবার শোনবার জিনিস বটে। হাতের কাছে পেলে কে না সাধ মিটিয়ে ভূত দেখতে চায়।

ছাবারিয়ার দুই বহুই একদিন নিজেদের বরেদের সঙ্গে এসেছে। 'আপনার হাভেলি দেখব দাদাজি? পূজা-ঘর?'

—'পূজা-ঘর তো নয় বিটিয়া, মন্দির বানিয়েছি, দেখো, দেখে নাও...ঘুরে ঘুরে দেখো।

ছাদে গিয়ে পূজা ঘর দেখে কুসুম-নেহা। ফুরফুর হাওয়া দিচ্ছে। ভারী স্ফূর্তি তাদের। এত বড় একখানা হ্যাভেলি, শ্বশুর নেই, শাস নেই, পতি নেই, দেবর নেই।

ননদ ভি নেই। বিলকুল খালি, সুনসান। মাথার জর্জেট কাপড়ের ঘুংঘট খুলে দুই বহু ভাল করে হাওয়া খেয়ে নেয়, গড়িয়ে গড়িয়ে হাসে, এ ওকে ধাক্কা মারে, ও একে। তারপর তিনতলায় নামে। সব ঘর খোলা, হৃদয়নারায়ণজির ঘর, পুরানা পালং, আলমারি, আরাম চেয়ার, সোরাই, ছবি, দেয়াল গাঁথা সিন্দুক ভি আছে। সারা ঘরে বুড়ো বুড়ো গন্ধ। জগদীশজির ঘরে গন্ধ তেলের বাস ছাড়ছে, নিচু ইংলিশ খাট, ডবল বেড, দেখে দুই বউ চোখ মটকে পরস্পরের দিকে চেয়ে হাসাহাসি করে। শৌখিন টেবিল, চেয়ার, শো-কেস ভর্তি বই পুতুল এটা ওটা। টেবিলে এক স্ত্রীলোকের ছবি। ধারালো কিন্তু বিষাদাচ্ছন্ন মুখ, হাসি নেই। মাথায় ঘুংঘট, গলায় লম্বা লম্বা হার। ইনিই জগদীশজিকি পত্নী। জগদীশজির ঘর থেকেই ওঁর পত্নীর ঘরে যাওয়া যায়। এ ঘরে গোদরেজের আলমারি দুটা তিনটা, বিরাট ড্রেসিং-টেবিল। সামনের সিটে বসে একটা ড্রয়ার খুলল কুসুম, নেহা পেছনে দাঁড়িয়ে আছে।

ফিসফিস করে কে বলল—'কী ধান্দায় এসেছ? জেবর হাতাতে। না?'

কুসুম পেছন ফিরে বলল, 'এ নেহা, আমায় গালি দিচ্ছিস যে।'

নেহা বলল, 'বাজে বলিস না, নিজে আমাকে জেবর হাতানোর কথা বললি।'

দুজনের কেউই বিশ্বাস করতে চায় না, অন্যজন তাকে বকেনি। হঠাৎ দুজনেরই একসঙ্গে খেয়াল হয় আরে! এ নিশ্চয়ই সেই বহু।

চোখ আতর্কে বড় বড় করে দুটি যুবতী পালিয়ে আসে। বৈঠকখানা ঘরে যখন ঢোকে তখনও তাদের ধুকপুকুনি যায়নি। মুখে ঘাম।

জগদীশ তীক্ষ্ণ চোখে তাকান। চোখাচোখি হয়ে যায়। জগদীশ বুঝতে পারেন যে ওরা শুনেছে, কুসুম-নেহা বুঝতে পারে যে ছোটা আগরওয়ালাজি বুঝেছেন যে তারা শুনেছে।

এরপর আর কারও তেমন তাকত থাকে না যে 'অগ্রবাল হাউজে' যাবে।

আজ ভূত শুধু ফিসফিস করছে, কাল বিকট মুখ নিয়ে দেখা দেবে, তারপর মারধর করতে কতক্ষণ? সেধে সেধে ভূতের মার খেতে কে যাবে? খানাপাকানেবালি ক্রমে আর পাওয়া যায় না। শ্যামলাল দেহাতে গিয়ে আর ফিরল না। কেন ফিরবে? দেহাতে তার মোতিয়া বউ আছে। বাপ মা আছে। গোদ মে বেটা বেটি আছে। কলকাতায় নোকরি-করা শ্যামলালের সেখানে কত খাতির, কত আদর, তা ছাড়াও, শ্যামলাল ধান্দার লোক। এত বড় হাভেলি খোলামেলা পড়ে আছে তবু সে প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও একটাও জিনিস এদিক থেকে ওদিক করতে পারছে না, এ কি কম কষ্ট? আলমারি সামনে, চাবি সামনে, লোকজন কেউ নেই,—খোল তো আলমারি?—'শামলাল তোর ফটো খিঁচা আছে, শ্যামলাল তুই হাজতে গেলে তোর বদনামি হয়ে যাবে, কোথাও নকরি পাবি না আর। পরে তোরই বালবাচ্চা চোট্টা বলে নফরৎ করবে রে!'

আচ্ছা ঠিক আছে আলমারির টাকা আলমারিতে থাকুক, জেবর থাকুক লকারে, শ্যামলাল সে সবে হাত দিতে যাচ্ছে না। পুরানা সব তাম্বার বর্তন, পেতলের ফুলদান এ সব পুরানা জিনিসের দুকানে গিয়ে কিলো দরে বেচে দিলে কত আসে, লুচ্চা

শ্যামলাল মোতিয়াকে ছেড়ে কতদিন শহরে বাস করছে তার অন্য খরচ-খর্চা নেই? তা সে বর্তন নাও দেখি।

—'এ শ্যামলাল তু-তো সাঁপ রে। এইসব বর্তনে আগরওয়ালদের ছাপ মারা আছে জানবি. পুলিশ তোকে দেহাত থেকে কি ঝোপড়পট্টি যেখান থেকে হোক পাকড়িয়ে আনবে রে লুচ্চা। মোতিয়া তোকে আর ঘরে নিবে না। তোর বাপ-মা বলবে চোট্টা লুচ্চা বদমাশ বেটা থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল।'

তো শ্যামলাল কী করবে? তার আর ফেরার কোনও মানে আছে? হাভেলি পাওয়া তো দূরের কথা, হাভেলির একটা সুঁই সে এদিকে-ওদিক করতে পারে না। এক মিশিরেরই যাবার কোনও জায়গা নেই। বুড়া দুটোকে ফেলে যেতেও তার মায়া লাগে। কত নিমক খেয়েছে এদের। বুড়ি মালকিন, বহু এরা কত আদর যত্ন দিয়েছে তাকে! থাক না বহুজির স্বর, নুকসান তো কিছু হচ্ছে না মিশিরের!

৭

হৃদয়নাথের প্রথম প্রথম কদিন একটু আশ্চর্য লেগেছিল। আস্তে আস্তে সয়ে গেল। তিনি একটা জুতসই ব্যাখ্যাও মাথা থেকে বার করলেন ব্যাপারটার।

পরলোক বলে একটা ব্যাপার আছে তো? মৃত্যুর পরে মানুষ কোথায় যায়? সেই পরলোকে, আবার কোথায়। পরলোকে বিভিন্ন কামরা আছে। সদ্য মৃতরা এক কামরায় থাকেন, অনেক দিন মৃতরা আরেক কামরায় থাকেন, যারা পুনর্জন্মের জন্যে তৈয়ার হচ্ছেন তাদের জন্য তিসরা কামরা আছে। কামরায় কামরায় যোগাযোগ আছে। ঠিক যেমন টেলিফোনের ইনটারকম।

একজন ওপরে গেলেই তার পরিবারের সবাই তাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে থাকেন। বেশ একটা জমায়েত হয়। কিন্তু সকলেরই নজর রয়ে যায় এ পৃথিবীতে ফেলে-যাওয়া সংসারটির ওপর। তাঁদের বাড়িতে এখন একটিও জেনানালোক নেই। তাঁদের দুজনেরই বয়স হয়েছে। টনক নড়েছে তাই পরলোকবাসী অগ্রবালবংশীয় জনানালোগের। লাগাম হাতে নিয়ে নিয়েছেন জগদীশ কি মায়ি, তাঁর শাসু অর্থাৎ হৃদয়নারায়ণের মা, তাঁর শাসু অর্থাৎ দাদিমা, তাঁদের সঙ্গে যেহেতু ইহলোকের যোগাযোগ ছিঁড়েছে বেশ কিছু দিন তাই তাঁরা সরাসরি কিছু করতে পারছেন না। কিন্তু বহুর ওপর শাশুড়িগিরি ফলাচ্ছেন ওখানেও। বহু নিজেও কর্তব্যপরায়ণ, সে কি তাঁদের অবহেলা করতে পারে?

পয়লা কার্তিক সযত্নে সবুজ বালবের আকাশ প্রদীপ তুলে দেন তিনি ছাদের ওপর। লম্বা লাঠির আগায় বিজলি দীপ জ্বলতে থাকে। এসো এসো যত গতাসু মানব-মানবীর দল, দেখে যাও তোমাদের মনে রেখেছে হৃদয়নারায়ণ, আকাশ থেকে নামবার সময়ে আবার তোমাদের পথ না ভুল হয়ে যায়। বিশেষ করে ছোট শিশুটির। তাকে চাই তাকেও চাই। তাই সবুজ আলো অগ্রবাল হাউজ-এর ওপর জ্বেলে দিলাম। এসো দেখে যাও আমরা কেমন আছি।

আর্থাৎ কিনা হৃদয়নারায়ণ পুরোপুরি তৈয়ার। তিনি এমন কি অপেক্ষাও করে থাকেন। রাত্রে শোবার আগে মিশ্রির দুধের গ্লাস আনল। সেটা ঢাকা দেওয়া পড়েই রইল তিন পায়ার ওপর। হৃদয়নারায়ণের পরীক্ষা করে দেখবার ইচ্ছা হয়েছে কেউ সেটা খেয়াল করে কি না। তিনি মুখ হাত পা ধুলেন, পাঞ্জাবিটা পাল্টে নিলেন। দুপায়ে ঠোকাঠুকি করে পায়ের যেটুকু ধুলো আছে ঝেড়ে বিছানায় উঠে পড়লেন। চশমা নামিয়ে রেখেছেন পাশের টেবিলে, চোখ দুটো এবার বুজোবেন।

—'দাওয়া খেলেন না? দুধ? ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে যে।'

হৃষ্ট মুখে উঠে বসেন হৃদয়নারায়ণ। এখন যদি এক জোড়া নিরালম্ব হাত এসে তাঁর ওষুধের শিশি খোলে, জল এগিয়ে দেয়, তা হলেও তিনি ভয় পাবেন না। তবে এতটা তিনি আশা করেন না। শরীর ধারণ করতে পারে না আর বহু। কিন্তু স্বর তার ঠিকঠাক আছে। আগে বহু গলা নামিয়ে রাখলেও তার আওয়াজ ছিল ভারী কড়া। হৃদয়নারায়ণ বা জগদীশের সাক্ষাতে এ আওয়াজ বেরোত না। কিন্তু দৈবাৎ হয়তো বহু জানে না তিনি এখনও বেরোয়নি। শ্যামলালকে বলছে—'সবজির বাজারে কি আগ লেগে গেল না কি রে? বইগন পন্দর রূপেয়া বলছিস?'—উঁচু আওয়াজ নয়। কিন্তু কড়া। লুচ্চা শ্যামলালটা ভয় খেত বহুকে। তাঁদের যেন খুব ভয় করে এমন ভাব দেখাত, কিন্তু ভয় করত না। আসল ভয়টা করত বহুকে।

তো সে যা-ই হোক, এখন বহুর আওয়াজ বহোৎ মিঠঠি হয়ে গেছে। আগে যেন বহু মিঠঠি আওয়াজে কথা বললেও তাঁর মনে হত, এটা বহু সত্যি সত্যি করছে না, ভেতরে ভেতরে একটা গুসসা, কি সোজাসুজি নফরৎ নিয়ে কথা বলছে। ওপরটাতে একটা পালিশ চড়িয়েছে। এটা তাঁর কেন মনে হত তিনি বলতে পারবেন না। কেউ কখনও বহুর আন্তরিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করেনি। স্বয়ং পার্বতী পর্যন্ত না। শেষকালটায় পার্বতীর এত সেবা ওই বহু করেছে যে পার্বতী হৃদয়নারায়ণকে থেকে থেকে বলতেন—'এ আমার নিজের বেটির চেয়ে কম কিছু করেনি। বরং বেশি করেছে। লাডলি, পিংকি তো এল, দেখল, একটু কান্নাকাটি করল, চলে গেল, আর বহু? বহু দেখো সারা দিনরাত যখন যা দরকার হচ্ছে করে দিচ্ছে। আমাকে উঠাতে কি শোয়াতে বসাতে শ্যামলাল, কিন্তু এ বহু সব, স-ব কিছু করে দিল আমার। কত বুরা বাত ওকে বলেছি, কত ডেঁটেছি।...

'তো এক কাম কর, ওকে একটা ভারী জেবর দিয়ে দাও—' হৃদয়নারায়ণ পত্নীকে এই পরামর্শ দিয়েছিলেন।

শুয়ে শুয়েই তাঁকে খুব মুখ ঝামটা দিয়ে উঠেছিল পার্বতী।

—'জেবর? জেবর কী হবে? বুড়ঢা হয়েছে, বাতচিত শুনলেই লোকে সমঝে যাবে, জেবর কি বহুর কম নাকি? জেবরের লালচ করবে শ্যামলাল, বহু কোন দুঃখে জেবর-জেবর করতে যাবে।' তার পরে পার্বতী একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন 'আসলি যে আনমোল জেবর তা কি দিতে পারব বহুকে? তা আমাদের সাধ্যের মধ্যে নেই। হে ভগোয়ান, বেচারিকে কেন এমন সাজা দিলে, যা বল করব, খালি বহুটার গোদমে একটা কিছু দাও। একটা কিছু দাও।'

তখন হৃদয়নারায়ণ আস্তে আস্তে সরে যেতেন। আওরত লোকের দুখ প্রকাশের তারিকা এক রকম। মরদের আর এক রকম।

যাই হোক সাবিত্রীর কথা-বার্তা ব্যবহারের আন্তরিকতায় যখন কেউই সন্দেহ প্রকাশ করেনি, তার শাস পর্যন্ত না, তখন এই সব মনে হওয়া হৃদয়নারায়ণের মনের ভুল হতে পারে। হয়তো তিনি শ্বশুর হিসাবে, বাবা হিসেবে বহুটাকে যত্ন করতে পারেননি। হয়তো তিনি তাঁর কর্তব্যচ্যুত হয়েছেন। তাই নিজের ভেতরের পাপবোধ, অপরাধবোধ থেকে তাঁর কানই বিকৃত হয়ে গেছে। বহুর শান্ত লাজুক স্বরের মধ্যে উষ্মা, ঘৃণা তিনি হয়তো আরোপ করতেন।

এখন আবার যতটুকু শুনতে পান, তার চেয়েও বেশি শুনতে চান তিনি। জীবিত অবস্থায় বহু বড় চুপচাপ ছিল, এখন মরে তার শরম কেটেছে কতকটা। তা শুধু সলাহ্ দিয়ে আর কী হবে : তিনি যে ক্রমশই একা হয়ে যাচ্ছেন, একটু গপস্‌প্ করলে ভাল লাগত।

—'বহুবেটি, বহুবেটি, গদ্দিতে যেতে মন লাগছে না, কী করি বলো তো?'

—'আরাম করুন'— বহু তাঁর মনের কথাটিই বলে। মিঠঠি করে বলে।

তিনি আরাম-চেয়ারে হেলান দিয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। ভারী আরামের তন্দ্রা। সিনেমার ছবির মতো সামনে দিয়ে ভেসে যায় যোধপুর সর্দার মার্কেটের সেই হাভেলি, যেখানে বড়িমুন্নি ছোটিমুন্নির সঙ্গে তিনি খেলা করতেন। সওয়া লাখ দহেজ দিয়ে বাড়ি মর্গেজ রেখে শাদি হল। দাদাজি পিতাজিকে বললেন— 'আর তো পারি না লাল। কারবার বঢ়াও। কলকাত্তা চলে যাও। আমার চাচাতো ভাবীজির ভাই তো রয়েছে। সুলুক সন্ধান দেবে। ওখানে সাপ্লাইয়ের চেষ্টা দেখো। পিতাজি সেই থেকে কলকাত্তায় আসছেন। বছর খানেকের মধ্যে বাড়ি ফিরলেন না একবারও। খালি খত ভেজেন আর ব্যাঙ্ক ড্রাফট। বছর দেড়েক পরে সর্দার মার্কেটের বাড়ি ছাড়ানো হলে, পিতাজি তাদের নিতে এলেন। দাদাজি আপত্তি জানিয়েছিলেন। আর একটাও ভাই তো নেই পিতাজির, দাদাজি আর দাদিমাকে একা একা থাকতে হবে। কিন্তু পিতাজি খুব শক্ত ছিলেন। বলেছিলেন—'কারোবার ফলাও করব, গৃহসুখ না হলে পারব না। সমঝে দেখুন একবার এখনও আমার চৌথি বহেনটা রয়েছে, আমার নিজের তিনটি লড়কি, এদেরও তো পার করতে হবে। ইজ্জত দিন।'

এই 'অগ্রবাল হাউজ'-এর দুতলাতেই ভাড়া থাকতেন তাঁরা। তখন অবশ্য কোনও নাম ছিল না এ বাড়ির। এত সুন্দরও ছিল না। ছিল না মাথার ওপর ওই ওঁ তৎ সত্ লেখা মন্দিরের চূড়া, এমন শ্বেতপাথরের নেমপ্লেট। বারান্দা ছিল সরু, লম্বা। ওঁদের বাড়িঅলা ছিলেন খুরানাজি। তো দুই ভায়ের সাত বেটি। পিতাজির কাছেই মর্গেজ রেখেছিলেন ওঁরা বাড়ি। ক্রমশ আর ছাড়াতে পারলেন না। তখন পিতাজি সবে যোধপুর থেকে এসেছেন। কষ্টকে কষ্ট বলে মানেন না। মা-ও তেমনি। পিতাজি যত কামাই-ই করুন ঘর-সংসারের কাজ সব মা আর বোনেরা মিলেই করত। কাপড় কাচা, বাসন সাফা, খানা পাকানো, —একটাও নোকর কি নোকরানি রাখেননি ওঁরা। খানা-পিনাও বহোৎ সাদাসিধা। তা এমনটাই আদত সবার। কারও কিছু খারাপ লাগেনি।

কেউ কোনও নালিশ করেনি। কিন্তু পিতাজি যখন তাঁর চৌথি বহেন, আর নিজের দু বেটির শাদি দিয়ে মারা গেলেন, তখন হৃদয়নারায়ণ সবে আইকম পড়তে শুরু করেছেন। পড়া ছেড়ে কারবারে লাগতে খুব খারাপ লেগেছিল। একটি বোনের শাদি তখনও বাকি। তাঁর নিজেরও শাদি লাগল বলে। চারদিকে বড়া মানুষ বলে নাম। সেই মতোই সামাজিকতা করতে হয়। এই হাভেলিতে তখন মার্বলের নেম-প্লেটটা বসে গেছে। 'অগ্রবাল হাউজ'। ঘিউ রঙের হাভেলি চমকাচ্ছে কেমন। ঘরে ঘরে বাহারি বিজলি বাতি, পাখা, ফার্নিচার, গারাজে দুটো জবর গাড়ি।

পিতাজি বলতেন— 'কারোবার ফলাও করো মেরে লাল। আরও আরও আরও কামাও। স্টক-মার্কিটে পয়সা লাগাও, রেওতিবাবু আচ্ছা এজেন্ট, ওঁকে বলে দিয়েছি। ওঁকে দিয়ে কাজ করাবে কিন্তু হুঁশিয়ার থাকবে লাল। আর ভগোয়ানকে যত পারো পূজা দাও যেন আমাদের ঘরে লড়কি আর না ভেজেন। এতো খাটছি, এতো কামাচ্ছি। সব লড়কিতে খেয়ে নিচ্ছে। সব লড়কিতে নিয়ে যাচ্ছে। আর পারো তো আপনা শাদিতে দহেজ নিও না। শাঁপ লেগে যাচ্ছে। শাঁপ। মেয়েদের ঘরে পর্যন্ত এতগুলো করে লড়কি। মামাবাড়ির "ভাত" মামাবাড়ির মান রাখবার মতো তো দিতে হবে— ওজনদার জেবর, দামি কাঁচুলি ঘাঘরা, রুপেয়া, সবই যাচ্ছে প্রত্যেকটা "ভাতে"। নাজেহাল হয়ে গেলাম লাল।'

ভগোয়ানকে পূজা ঠিকই দিয়েছিলেন হৃদয়নারায়ণ। তবে পিতার অন্য কথাটা আর রাখতে পারলেন কই? নিজের শাদির দহেজের টাকাটা না হলে ছোটি বোনটির শাদি দিতেন কীভাবে?

ঘর আলো করে জগদীশ জন্মাল। প্রথম বেটা। কী আনন্দ। কী আনন্দ। আঁতুর তোলবার সময়ে যে 'জলোয়া' তাইতেই মেয়েদের উৎসব বসিয়ে দিয়েছিলেন হৃদয়নারায়ণজি। মণিরামজির পঞ্জিকা দেখে শুভদিন ঠিক হল। সব সুহাগনদের ঘরে দাওয়াত গেল, জেবর উপহার দিলেন তাদের, বাচ্চালোগদের ভি দামি উপহার। বঙ্গালি কেতায় পার্টি হল। শরবতের টেবিল, চাটের টেবিল আলাদা, কত রকমের রুটি, কত রকমের মিঠাই, কুলফি, সালাডের টেবিলও আলাদা হয়েছিল। তো জগদীশের কোলে পরপর চার মেয়ে এসে গেল। কত ডাকা হল পার্বতীকে। কত পূজা, কত মাদুলি, কিছুতেই কিছু না, ঝটপট ঝটপট করে চার মেয়ে। রাগে অন্ধ হয়ে পার্বতীর ঘরে যাওয়াই বন্ধ করে দিয়েছিলেন তিনি। দীর্ঘদিন স্বামী-স্ত্রীতে বাক্যালাপ পর্যন্ত ছিল না। তাঁর মা-ও কথা বলতেন না বহুর সঙ্গে। এত বড় অমঙ্গল আনে— চার চারটে মেয়ে। ছিয়া ছিয়া। ও বহুর সঙ্গে কে কথা বলবে? তবে কিনা পার্বতী ছিল কুইন ভিক্টোরিয়ার মেজাজের আওরত। তাঁকে খুব একটা কায়দা করতে পারা যায়নি শাস্তি দিয়েও।

'এ তো আপনাদের অগ্রবাল ঘরের আদত। পয়লা লড়কা, পরে সব লড়কি। এতে আমার কী দোষ আছে? কথা বলবেন না। বলবেন না। কিন্তু শাসুমার কী? আপনি এক লড়কা, তারপর সব বেটি না? বাতচিত ওঁর সঙ্গেও করবেন না তা হলে। আপনার পিতাজি কী? তিনিও তো শুনেছি এক লওতা বেটা, ছয় না সাত বহেন

তারপর, তো যান দাদাজি দাদিমাকে স্বর্গসে ডেকে আনুন, বলুন আপনারা অন্তর্ভ্। আপনাদের সাথ কথা করব না।'

যুক্তি অকাট্য। বংশধারাই এই। বহু কী করবে? কাজেই ধীরে ধীরে কথা বলাবলিও আরম্ভ হয়ে যায়। মেয়েদের বিয়ের কথা তুলে কপালে করাঘাত করলে পার্বতী বলত— 'বার করুন আমার সওয়া দুই লাখ টাকার দহেজ। মেয়েদের যখন সতর আঠারা সাল তখন সুদে আসলে কত হবে হিসাব করে দেবেন। তার থেকে শেয়ার খেলে কত বাড়িয়েছেন, সে হিসাবও দিতে ভুলবেন না। বাস তাইতেই আমার চারোঁ লড়কিয়াঁ পার হয়ে যাবে। আমার জেবর সব দিয়ে দেব। মামা ঘর থেকে কুন্দন' হার আসবে, নথ আসবে, শাদির কাপড় আসবে, কেমন না শাদি হয় দেখি।'

একেবারে কোমরে কাপড় গুঁজে রণং দেহি মূর্তিতে দাঁড়াত সে।

—'আমার পিতাজি মনে করেছিলেন বড় মানুষের ঘরে শাদি দিচ্ছি। তা এরা কামাতে পারে না, আবার এমন বেসহবৎ হবে তা তো তিনি সোচতেও পারেননি।' মোক্ষম অস্ত্রটি ছেড়ে তবে থামত পার্বতী।

এই রকম বলতে-কইতে কলজের জোর লাগে। সে জোর পার্বতীর আলবত ছিল। কিন্তু এই জোর তো পার্বতী নিজের মেয়েদের সসুরালে গিয়ে ফলাতে পারেনি। কে-ই বা পারে।

আবার সেই পার্বতী-ই তার বহুকে কত যন্ত্রণা দিল। ওই একই কারণে।

'খবর্দার। বেটি পয়দা করেছিস তো আগুনে মুখ ঘষে দেব। বাড়ির বার করে দেব, তোর বাপ-ঘর চলে যাস।'

দু একবার শুনে ফেলেছিলেন হৃদয়নারায়ণ। তিনি অবশ্য সমর্থন করেননি। কিন্তু দুই বেটির অতর্কিত মৃত্যুতে তিনিও তখন এমনই আতুর যে অন্য কারও অনুভূতি সম্পর্কে তাঁর আর বিবেচনা ছিল না। যে কোনও মূল্যে লড়কিদের আবির্ভাব আটকাতে হবে— এমনটাই ছিল তাঁর, তাঁদের মনোভাব। পর পর দুটি মেয়ে, বড় লায়লি, মঝালি গুড্ডি ওইভাবে তাঁদের বুক খালি করে দিয়ে চলে গেল। বড়টি বড় মিঠি ছিল, খুব শান্ত। মঝালি আবার ছিল শয়তান, অবাঞ্ছিতভাবে এসে ওরা হৃদয়নারায়ণের যত ভালবাসা, যত যত্ন সব কেড়ে নিয়েছিল। জগদীশ তো তেমন করে আপনই হল না কোনও দিন। কিন্তু লায়লি। গুড্ডি। এমনকী এই বহুবেটি?

'বহুবেটি। বহুবেটি। —তোমারও অবসর মিলেছে, আমিও অবসর নিয়ে নিলুম। এসো একটু গপ্‌সপ্ করি।'

—'বলুন, কী বলবেন?'

—'কিছু খাস বাত তো বলব না বহু, একটু গপ্‌সপ্ করি।'

—'বাপুজি, আমি তো জিন্দাকালে আপনার বহুবেটি ছিলাম। গপ্‌সপ্ করার রেওয়াজ তো ছিল না। ঘুংঘট আলগা হত না কখনও আপনার সামনে। আপনি দেখেননি কখনও লেডিজ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সেন্টারে আমি কেমন ঘুংঘট খুলে খাড়া দাঁড়িয়ে মাইক্রোফোনের সামনে স্পিচ দিতাম। দেখলে আপনার মাথা বিলকুল বিগড়ে যেত বাপুজি। আপনি তো এ-ও দেখেননি রাজপাল তাঁর মিসেস কেমন

আমাকে চায়ে ডেকেছেন, আমি তাঁদের এগজিবিশন ওপেন করতে ডেকেছি। কত ঝগড়া করেছি রাজপালের সঙ্গে। তো রাজপাল তো আমার শ্বশুর নয়?'

—'আচ্ছা বহু। মানলাম তখন তোমার সঙ্গে গপ্‌সপ্ করিনি, তোমার কেরামতি কুছু দেখিনি। বাহাদুর জনানা তুমি। খুব বাহাদুর। কিন্তু এখন তো তোমাকে ঘুংঘট চড়াতেও হচ্ছে না, উতারতেও হচ্ছে না, বলো না কিছু?'

—'কী বলি বাপুজি, ইঁহা তো বাপঘর, সসুরাল নেই, সব আত্‌মা আপনা আপনা ধান্দেমে রয়েছে সব। কী ধান্দা? শেয়ার মার্কিট, কি প্রফিট, কি লস এ সব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে সব কুছু কুছু সময়। তারপর বাস চুপচাপ।

—'তো কী করে ওরা বহু? পূজা করে? না কী?'

—'কী যে করে তা তো জানি না বাপু। এদের তো হাত নেই, পা নেই, মুহ্ নেই, সব পাশ দিয়ে চলে যায়, বুঝতে পারি আচ্ছা ও গেল, সে গেল। এখানে তো আইয়ে, বৈঠিয়ে, নমস্তে করা এ সব কুছুই নেই। কে কী করে কুছ্ বোলে না। জিন্দা-টাইমে যা যা সব গলত কাম করেছে সে সব শুধরাতে কোশিশ করে বোধহয়।'

—'তো তুমি, তুমি কী করো বহুবেটি? তোমারও কি হাত পা নেই? মুহ্ নেই?'

হাসির আওয়াজ আসে।

—'হাসছ কেন বহু?'

—'আমার তো জিন্দা-টাইমেও হাত-পা-মুহ্ ছিল না বাপু। ছিল কি? আমার কি দিল বলেই কিছু ছিল? এই যে বাতচিত করছি আপনার সঙ্গে, এই আওয়াজই কি ছিল আমার? আপনিই বলুন না?'

হৃদয়নারায়ণ ভাববার চেষ্টা করেন, পুরনো ছবিগুলো ঝালিয়ে নেবার চেষ্টা করেন।

—কিন্তু বহু, সেই যে তুমি ঘুরে ঘুরে গেরস্থালির কাম করতে, খানা পাকাতে, খেতে দিতে টাইমে টাইমে, সারা কোঠি ঘুরে ঘুরে কে কী কাম করছে, ঠিক মতো করছে কি না দেখে বেড়াতে, তখন তোমার হাত-পা-মুহ্ সবই তো দেখেছি বহু।'

বহু বলে, 'ও তো আসলি হাত পা নয় বাপুজি, ও তো সব যন্তরের হাত পা। গুড়িয়া দেখেন তো। দম দিয়ে ছেড়ে দিন তো ও গুড়িয়া প্যাঁ প্যাঁ করে কাঁদবে, হাত পা ছুড়ে খেলা করবে, দম ফুরিয়ে গেলে আবার প্যাঁচ দিন, আবার করবে।'

—'তা তুমি যদি গুড়িয়াই হও, কে তোমাকে দম দিয়ে দিয়েছিল, কে দম দিত, হররোজ? ভগোয়ান তো! ভগোয়ানের দেওয়া দমেই সব মানুষ কাম করে।'

—'না, না,' বহু অচানক খুব রেগে যায়, 'শুনুন বাপু, ভগোয়ান কাউকে দম দেন না। জান দেন। মানুষ তৈয়ার হয়ে গেলে তার মাথার মধ্যে ছোট্ট একটু খুলা থাকে সেইখানে ফুঁ দিয়ে দেন। বাস জান এসে যায়, তারপর সেই খুলা জায়গাটায় ভগোয়ান ছিপি আটকে দেন। তো মানুষ কী করে বলুন তো? জানটাকে কবজা করে আটকে রাখে তারপরে দম দিয়ে দেয়, আপনি দেখছেন পান চিবাতে চিবাতে আপনার বেটা আপিস যাচ্ছে, ও জান সে করছে না, দম সে করছে, ড্রাইভার গাড়ির স্টিয়ারিং ঘুমাল, ও গুড়িয়া কি তরহ্ ঘুমাল আপনি দেখছেন শ্যামলাল নোকর বহোৎ জোর সে কামরা

সাফা করছে, ওর জান ওর দিল ওই কামে নেই বাপুজি, আপনার বহু খানা পাকাতো, আপনাদের খিলাতো, ঘর কি কাম করতো ও সব যন্তর কা কাম বাপু।'

—'তা সেই যে তোমার শাসুটার সেবা করলে? খাড়ি আছো দিন রাত, যা খেতে চাচ্ছে তৈয়ার করে দিচ্ছো, যা চাইছে হাজির। ও, ও ভি যন্তর কা কাম?'

—'ও ভি, বাপু, বুরা মৎ মানিয়ে ও ভি যন্তর কা কাম, সমঝেছেন?'

—'সমঝে গেছি, বহু, এখন বলো তো তোমার সেই শাসুটার সঙ্গে দেখা হয়েছে কি না।'

—'শাসু আছেন শাসুদের কামরেমে, আমি তো শাসু হইনি বাপু আমি কী করে সেই কামরায় যাব?'

—'তো শাসুটার উপর রাগ-অভিমান এখনও জিইয়ে রেখে দিয়েছ না কি বহু!'

—'আমার শাসু, তাঁর শাসু, তাঁর শাসু...সব্বাই-ই তো এক রকম বাপু, একরকম ভাবে চললেন, আপনারা যেমন চালালেন, আপনাদের গাঁও, আপনাদের কমিউনিটি। আপনাদের সমাজ, ধরম আপনাদের যেমন চালালো চললেন, চালালেন....কেউ তো দুসরা কিছু করলেন না, তো রাগ-অভিমান করব কার উপর! বাপু, আপনি নিজে আপনার মায়ি তাঁরাও কি আমার শাসুকে ডাঁটেননি? কষ্ট দেননি? বলুন....'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকেন হৃদয়নারায়ণ। একদম চুপ। কথাগুলো বহু তো সহিই বলেছে বিনা। সমাজ বলল লড়কিকে পরঘরে দিলে তার সঙ্গে দহেজও দিতে হবে, বাস তাঁরা মেনে গেলেন। সসুরালে চলে গেলে লড়কির উপর তার জনমদাতা বাপ-মার আর কোনও অধিকার খাটছে না, বাস খটিল না, লড়কিটার দুখ তখন সব আপনি-আপনি সমহালতে হবে, সে কার মান রাখবে? বাপ-মায়ের না পতির-পতির বাপ-মায়ের? তো সে তুই বোঝ, তোর সোলা সত্তর ঠারা উনিশ বিশ উমর হয়েছে, এবার বোঝ। তো ও বুঝবার কোশিস করল, বুঝতে পারল না, বাস তখন তো এ দুনিয়ায় তার আর বুঝদার সমঝদার কেউ রইল না, তো সে খুদখুশি করবে না তো কী করবে? সে টের পাচ্ছে তার পতি তার শাসু মিলে সলাহ্ করছে কিছু, শয়তানি সলাহ্। সে কাকে তার ভগোয়ান বলে জানে? বাপুকে। বাপু সব করে দেবে, মা সব রুখবে। তো কেউ বুঝতে চাইল না, তো সে লড়কিকে তার নসিব ছাদসে ঠেলে ফেলে দিল, সে পড়ল। চুরচুর হয়ে গেল।

হৃদয়নারায়ণ এই ভাবে ভাবলেন। এ কী? বহু কি চলে গেল না কি? কার সঙ্গে গপ্ করবেন তিনি! এ কি? এখনও মওতের পরও কি তিনি বহুটাকে গুড়িয়ার মতো দম দিয়ে দিচ্ছেন না কী? এই বহুবেটি, এখন তোর শ্বশুরটা বুড়ডা হয়ে গেছে, তাকে সঙ্গ দেবার কেউ নেই। মরেও তোর আরাম নেই শান্তি নেই বহু, আয় গপ্‌সপ্ কর।

'কী হল, বাপু? কী এত সোচছিলেন?'

নাঃ বহুটা যায়নি। খড়ি আছে। একটু ইতস্তত করে তিনি বললেন 'বহু তোমায় এখনও দম দিচ্ছি না তো? এইসা সোচো মত্ বেটি। দুখ হবে আমার দিল- এ বহোৎ দুখ এসে যাবে।'

ছোট্ট হাসির আওয়াজ হয়। বহু বলে 'না বাপু আপনার দম আর কাম করবে না

আমার উপর। আমি এখন যা করছি, আপনা দিল সে করছি।'

'তা তো হবেই বহু, এখন যে তোমার ভগোয়ানের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। রামজি, কিষেণজি, গণেশজি, হনমানজি....তা ওঁদের পুছলে না কেন তোমার গোদ মে আরেকটা এলো না কেন'

একটু চুপ থাকল বহু। তারপর খুব, খুব লাজুক স্বরে বলল —আপনারা কি ভাবেন মওত হয়ে গেলেই ভগোয়ানকে দেখা যায়? তাঁর সঙ্গে কথা করা যায়? যে লোকটা ধরুন একটা কাতিল, কি একটা ঠগ সে-ও মওত হলেই ভগোয়ানের দেখা পেয়ে যাবে? তা হলে এত এত সন্ত জিন্দগিভর এত ধ্যান ত্যাগ সাধ্না করেন কেন? খুদখুশি করে নিলেই তো পারেন!'

হৃদয়নারায়ণের হৃদয়ে একটা শূন্যতা জাগে। তিনি সত্যিই ভেবে ছিলেন তাঁর আশি সাল হয়ে গেল, এবার যে কোনও দিন মওত হয়ে যাবে, তিনি বাস রামজিকে দেখতে পেয়ে যাবেন আর কচি শিশুর মতো হাত বাড়িয়ে তিনি বলবেন, রামজি, হে ভগোয়ান, আমায় গোদ মে নিয়ে নাও। আমি এই করে ফেলেছি, আমি তাই করে ফেলেছি। মাফি মাঙছি ভগোয়ান।

তো ব্যাপারটা তেমন নয়?

'ভগোয়ানকে অনেক পুন্ না করলে দেখা যায় না বাপু', বহু বলল, 'তবে গোদমে আরেকটা কেন এল না সে আমি জেনে গেছি।'

—'কেন বহু'?

—'বাচ্ছালোগদের সব এখানে বড় কামরায় রাখে। এতনা বড়া কামরা, ওরা তো সব খেলা করে। খিলোনা আছে কত। যা চাইবে তাইই। তা ওদের জনমের টাইম হয়ে আসলে ডেকে আনে, বলে ওই দ্যাখ দুনিয়ায়, সব মা খাড়ি রয়েছে, একটা, দুটা, তিনটা, শও মা, সব খাড়ি রয়েছে তোদের জন্যে। তো একটাকে চুনে নে। বাপু বাচ্চালোগ আমাকে কেউ চুনল না। বলল-'ও গর্ভ খতরনাক গর্ভ আছে, নহি, নহি, উধার নহি যাউঙ্গা।''

—'পূজা দিচ্ছ তো বহু? এ অশুভ্ তো কাটাতে হবে?' হৃদয়নারায়ণ এখন ভুলে গেছেন বহুর মওত হয়ে গিয়েছে, এখন আর তার বাচ্চার দরকার নেই।

—এখানে আর পূজা কেমন করে দিব বাপু? ফুল নাই, গঙ্গাপানি নাই, এলাচদানা, কর্পূর ভি নাই, মিঠাই তো দূরের কথা, একটা দিয়া নাই, মুরত নাই, মালা যে করব সে মালা-ই বা কই? মন-মন যে পূজা-ধ্যান করব তারই বা উপায় কী? আপনি দুধ পিতে গিয়ে বসে থাকবেন, আপনার লড়কা গন্ধা শার্ট পরে অফিস যাবে, শ্যামলাল চোরির ধান্দায় ঘুরবে.....। সবই তো আমাকে দেখে শুনে দিতে হয় কিনা। এ আমার দমের কাম নয়, দিল-এর কাম বাপুজি।'

অনেক ইতস্তত করে শেষে হৃদয়নারায়ণ সেই কথাটি জিজ্ঞেস করে ফেলেন— 'তা বহু, সেই ছোট্ট মুন্নিটার সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার। সেই যে দু'দিন এসে চলে গেল?'

বহু আর কথা বলে না। আর কথা বলে না। বেশ কিছুক্ষণ পর খালি একটা

দীর্ঘশ্বাস শুনতে পাওয়া যায়। বহু চলে গেছে, তার দীর্ঘশ্বাসটুকু ফেলে গেছে, তারার আলো যেমন তারা মরে যাওয়ার অনেক পরে দুনিয়ায় পৌঁছয়, বাজের আওয়াজ যেমন তার ঝিলিকের অনেক পরে আসে তেমন বহুর দীর্ঘশ্বাস হৃদয়নারায়ণের কাছে পৌঁছেছে বহু চলে যাওয়ার পরে। অনেক পরে।

বিদেহী আত্মা তাঁর কৌতূহলের ভার আর সহ্য করতে পারেনি।

৮

কণ্ঠস্বর নিয়ে বাস করা অতএব আগরওয়াল খরকিয়া বা খরকিয়া আগরওয়ালদের বেশ অভ্যেস হয়ে গেছে। সুস্বাগত এ কণ্ঠস্বর। জনানালোগ না থাকলে যে বাড়ির মধ্যে একটা শূন্যতা ঘুরে বেড়ায় সেটা যেন কতকটা পূরণ হয়ে যাচ্ছে।

মা জিন্দা থাকতে জগদীশ অফিস থেকে এলে মা যেখানেই থাকুন বিশাল শরীরের বেড় নিয়ে সামনে আসবেন, তাঁর কাছে চেয়ার টেনে বসবেন নিজের পাল্লু দিয়ে বেটার মুখের ঘাম মুছিয়ে দেবেন। সুখী বিল্লির মতো আদর খাবেন জগদীশ। আড়ালে ঠিন ঠিন কাঙ্কন বাজবে, মিঠি মিঠি একটা বাস হাওয়ায় ভেসে আসবে। কী? না আড়ালে বহু এসে দাঁড়িয়েছে। তারপর মা বলবেন 'নাস্তা নিয়ে এসো বহু, হাঁ করে খাড়ি থাকলেই হবে?'

সব রেডি আছে। ও থালিতে নাসতা নিয়ে এক হাত পুরা ঘুংঘট দিয়ে আসবে। সামনে টেবিলের ওপরে রাখবে। তারপর ও চলে যাবে। এখন জগদীশের মনে হয় সে সময়টা বহু বোধহয় চলে যেতে চাইত না। কেমন অনিচ্ছুক হত তার চলে যাওয়া। তিনি আর কী করতে পারেন? বেশরম হতে পারেন না তো! তা মায়ির আদর আহ্লাদও তাঁর কিছু কম ভাল লাগত না। বাপুর সঙ্গে দূরত্ব ছিল খুব বেশি। মা-ই তো সেটা পুষিয়ে দিতেন। মায়ি কাছে থাকলেই একমাত্র জগদীশের মনে হত তিনি একটা কেউ। একটা স্বতন্ত্র, ভারী আদমি। তাঁর পসন্দ, তাঁর সুবিধা-অসুবিধা মেনে চলবে সংসার। সারা দুনিয়া তাঁর পায়ে লুটিয়ে রয়েছে। সারা দুনিয়ার তিনি এক লওতা বেটা।

মায়ের বেই মওত হয়ে গেল, সাবিত্রী-বহু যেন আরও দূরে চলে গেল। অবশ্য কাছে টানার জন্য কোনও কোশিশ তিনি করেননি। তাঁর কী দরকার? খাও-দাও, কাম করো, সো যাও ব্যাস, এই মতো জীবনই তো ভগোয়ান জগদীশকে দিয়েছেন। বাস, যা দিয়েছেন তাই করছেন। করে চলেছেন। তাঁর যে এই নিয়মে-বাঁধা গতানুগতিক অথচ আলগা জীবন, সেটাকে মেনে নিয়েই তো সাবিত্রী-বহুর বসবাস। সে কারও রুটিন এদিক ওদিক করত না। কোনও জোর জবরদস্তি না, যেটা মায়ের ছিল। মায়ি থাকতে কি আর এত ভাঙের শরবত পিয়েছেন নাকি জগদীশ? তা তিনি যখন শ্যামলালকে নিয়ে ভাঙ খেতে শুরু করলেন হররোজ বহু তো কিছুই বলল না। তার নিজের কাম কাজ নিজের দুনিয়া নিয়ে সে তো বেশ থাকত। নালিশ বলতে কিছু না।

তবে ওই যে বহু ঘুরে বেড়াচ্ছে, নিজে খানা পাকাচ্ছে, দু টাইম খানার সময়ে উপস্থিত থাকছে। হয়তো চুপচাপ, কিন্তু থাকছে, এটাতেও 'অগ্রবাল হাউজ'-এর একটা পূর্ণতা আসত।

তা সে যা-ই হোক, জগদীশ যেমনই হন, যেভাবেই জীবন কাটান, সাবিত্রী নিজের কাজ ঠিক করে যাচ্ছে এই আওয়াজ তার প্রমাণ। ফলে জগদীশ-হৃদয়নারায়ণের গেরস্থালিটা যেটা ভেঙে যাবার সম্ভাবনা ছিল, সেটা টিকে গেল।

এখন আবার একটা নয়া জিনিস হয়েছে। জগদীশের যেন একটা দায়িত্ববোধ, কর্তব্যবোধ জেগেছে। এত দিন এক লাডলা বেটা হয়ে কাটিয়ে দিয়ে, বহুর মওতের পর তিনি যেন উপলব্ধি করছেন—হাভেলিটা তাঁর, পিতাজি তাঁর। হাভেলিটা খালি-খালি, পিতাজি বুড্ঢা হয়ে যাচ্ছেন। তাঁর দেখভাল দরকার। দু-চারবার সাবিত্রীর কণ্ঠ তাঁকে মনে করিয়ে দিয়েছে।

—'শরবত তুলে নিচ্ছেন যে? এর পর তো আর জ্ঞান থাকবে না। বুঢ়া মানুষটার খবর করুন?'

তখন থেকে অফিস করে এসে আগে জগদীশ পিতার কামরায় যান।

বেরোতে যাচ্ছেন;

—'চলে যাচ্ছেন যে। পিতাজির যে বুখার আসলো, ডগদরসাব আসা অব্দি ওয়েট করুন, তিনি কী বলেন শুনে যান?'

সত্যিই, তিনি এতদিন এ সব চিন্তা করেননি। সাবিত্রী আছে, সে যা হয় করবে, মিশির আছে শ্যামলাল আছে, দরকার হলে দাওয়া কিনে আনবে, সর্ পে পানি ঢালবে। সাবিত্রী খিচড়ি বানাবে। খিচড়ি আর দাওয়া খেয়ে বুখার চলে যাবে পিতাজির। কিন্তু এখন তো আর সব কিছুর জন্য একা বুঢ়া মিশিরের ওপর নির্ভর করা ঠিক না। সুতরাং জগদীশ ডাগদারসাবকে কল দেন, তিনি আসলে নিজে নীচে গিয়ে তাঁকে ওপরে নিয়ে আসেন, পরীক্ষার সময়ে উপস্থিত থাকেন, কী করতে হবে না হবে সব বিশদ জেনে নেন, মিশিরকে নির্দেশ দেন, তবে বার হন।

অর্থাৎ জগদীশ এতদিনে তাঁর কর্তব্য-দায়িত্ব এ সব নিজের মধ্যে চিনতে পারছেন।

হৃদয়নারায়ণেরও বেটার সঙ্গে যোগাযোগ কথাবার্তা বেড়েছে। তিনি তো এটা চাইতেনই। কিন্তু পুত্রকন্যাদের মধ্যে একমাত্র এই জগদীশকেই তিনি ভাল করে বুঝতেও পারেননি, কাছে টানতেও পারেননি। কেমন গোঁয়ার তাঁর বেটাটা। তাঁর সব নির্দেশ মেনে নিয়েছে, নিচ্ছে, তবু গোঁয়ার। ওর সঙ্গে বাতচিত করতে গেলেই তাঁর মনে হবে এক দিওয়ার খাড়া আছে দুজনের মধ্যিখানে। তাঁর স্বর যেমন ভাল করে ওর কাছে পৌঁছচ্ছে না, ওর স্বরও তেমনি তিনি শুনতে পাচ্ছেন না ঠিকঠাক, আগে এই যোগাযোগের কাজটা বহু করে দিত। এখন তার স্বর করে দিচ্ছে।

—'বাপুজি, আপনার বেটা কী রকম কালি মুখে ফিরল, দেখেছেন? পুছতাছ করবেন না?'

—'হাঁ হাঁ জরুর বহু, জরুর।'

—'আজ কোনও খাস খবর আছে নাকি রে জগদীশ?'

সন্ধানী-দৃষ্টিতে পুত্রের দিকে চেয়ে তিনি জিগগেস করেন, তা না না না করে জগদীশ অবশেষে বলেন—'আপনি শুনেননি খবর বাপুজি? গভমেন্টের পলিসি বদল হয়ে গেল, ওরা এখন মেশিন পার্টস জাপানসে আনবে, ছাবরিয়াদের প্লান্টটা বসে যাচ্ছে। আমাদের ছোটা ফ্যাকটরি, কী করবো? এখন আর কঁহা মার্কিট ঢুঁড়তে যাবো, বলুন? তো লেবর সব বহোৎ অ্যাজিটেশন করছে, ফ্যাকটরি বন্ধ্ করলে চলবে না, চলবে না.....।'

—'এ তো মুশকিল কি বাত! ছাবরিয়া আর মাধোগড়িয়ারা আমাদের খাস কাস্টমার...'

—'সোব ইনডাস্ট্রি সিক হয়ে যাচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে, বাপুজি, টাইম থাকতে থাকতে মেশিন সব বেচে দেওয়া ভাল, না?'

—'তুমি ছোটা দামাদের সঙ্গে কথা করো একটু, কথা করে নাও।'

—'হ্যাঁ, পিংকির খবরও করা হবে, ওর বেটা তো বিজনেসের দিকে আসতেই চাইছে না পিতাজি, ও ফরেন যেতে চায়...'

এই ভাবে বৈষয়িক কথাবার্তা থেকে পিতা-পুত্র পারিবারিক, সামাজিক তত্ত্ব-তলাশে পৌঁছন। সম্পর্কটা অনেক নিকট, অনেক সিধা হয়ে যায়।

এখন দুজনেই মার্কিটে বইগন, ঘিয়ার দরের খবর রাখছেন। মিশিরকে মেনু বলে দিচ্ছেন। মোটামুটি একটা ছক ধরে চললেও, হঠাৎ এক একটা নতুন কথা ঝিলিক দিয়েও যাচ্ছে মাথায়।

'আরে কিৎনা দিন সরষোঁ কি শাক পাকাসনি মিশির। পালক-পরোঠা এমন কি চিজ একবারে যে তুই বানাতে পারবি না! আজকাল তো ধোসার পাকিট ভি বেরিয়ে গেছে, নিয়ে আয় না। কর, উল্লু, খালি ভিণ্ডি আর আচার, ভিণ্ডি আর আচার।'

শুনলেই বুঝতে পারে মিশির এ সব ওই কণ্ঠস্বরের কাজ। হয়তো কাল রাত কি আজ সুবহ্ বহুজি অচানক ছোটা মালিককে ওই খাবার-চাটগুলোর কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন তাই টনক নড়েছে ছোটা মালিকের। তা নয়তো কোথায় ধোসার মশাল্লার পাকিট বেরিয়েছে, পালক-পরোটা এমন কিছু কঠিন একটা ব্যাপার নয় এতসব খেয়ালে এল কী করে ছোটা মালিকের? বড়া মালিকের? এ সবই বহুজির, আর তাঁর বিদেহী কণ্ঠস্বরের বাহাদুরি। ভালই চলছিল সুতরাং। তো একদিন জগদীশ এসে দেখলেন কোঠি অন্ধকার।

জগদীশ বললেন—'এ মিশির, বাত্তি জ্বলছে না কেন? বুঢ়ামানুষ অন্ধকারে বসে আছেন! কখন থেকে জ্বলছে না? খবর নিয়েছিস? লোড শেড করছে না ট্রান্সফর্মার পুড়ে গেল?'

মিশির অন্ধকারে ছায়ার মতো এগিয়ে আসতে থাকে। হাতে টর্চ। বিজবিজ করে বলে—'অত কিছু একসাথ পুছলে আমি কি জবাব দিতে পারি? ঠাহরুন বাবা, একটু ঠাহরুন। বুঢ়া হয়ে পড়েছে মিশির।'

জগদীশ দেখেন সত্যিই অধৈর্য হয়ে কোনও লাভ নেই। বুঢ়া মিশির তার নিজস্ব শিথিল ছন্দে চিমনিটা খুলে রাখে, মাচিস কাঠি জ্বালায়, বাত্তির পলতে ঠিক নব ঘুরিয়ে

ঠিক করে জ্বালিয়ে দেয়। চিমনি চাপিয়ে দেয়। মৃদু আলোয় পিতা পুত্র পরস্পরকে দেখেন। শুধু দেখেন, বাক্যালাপ কিছু হয় না। মিশির অন্য কামরায় আলো জ্বালতে চলে গেছে।

—'এই বিজলি মন্ত্রী তো আচ্ছা কামই করেছিলেন, পাওয়ার শেডিং বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, ফির কী হল?' —আপনমনেই বলেন জগদীশ।

—'আবার দেখছি ইনভার্টার রাখতে হবে, নাকি একটা পুরোপুরি জেনারেটরই, আরে মিশির খবর করবি তো কী হল?—'

এবারও হৃদয়নারায়ণ কোনও কথা বলেন না। মিশির ভিন কামরায় বাত্তি জ্বালতে চলে গেছে। জগদীশের ঘরে, বহুজির ঘরে, বড়ি মালকিনের ঘরে। হয় সে শুনতে পাচ্ছে না, নয়তো শুনেও জবাব দিচ্ছে না। সে জানে সে যত নিরুপায়, তার এই মালিকদ্বয় তার চেয়েও বেশি নিরুপায়, তার কিছু নেই, কিছু হারাবারও নেই। সে যদি দেহাতে পোতাদের ঘরে চলে যায়, খুব একটা খাতির না করলেও তারা তাকে একেবারে ফেলতে পারবে না। শীতের দিনে পোহাবার মতো রোদটুকু, গরমের দিনে জুড়োবার মতো বাতাসটুকু আর দুটা চাপাটি, একটা দুটো পেঁয়াজ আর পাঁচজনে পেলে সে-ও পেয়ে যাবে। কিছু না হোক মারোয়াড়ি রিলিফ সোসাইটি! কোনও মারোয়াড়ি ভুখা থেকে রাস্তায় পড়ে মরেছে এমন কথা কখনও শোনা যায়নি, তাকেও তার পুণ্যলোভী বেরাদররা শেষ কটা দিন ঠিকই দেখবে। কিন্তু এই দুই বুঢ়া! এদের বিশাল হাভেলি আছে, বিশালতর কারবার, ব্যাংকে অনেক টাকা, লোকের ওপর ছড়ি ঘুরাচ্ছে, কিন্তু এদের দেখবার কেউ নেই। নিজের লোক কেউ নেই। ভাড়া-করা লোকও এরা পাচ্ছে না। মিশিরের মতো নোকরের দয়াই এখন এদের একমাত্র সম্বল।

—'চায় পানি পিয়েছেন?' এবার সোজাসুজি জিজ্ঞেস করেন জগদীশ। মাথাটা শুধু দু দিকে নাড়ান হৃদয়নারায়ণ। তিনি চা পান করেননি।

—'মিশির, এ মিশির? চা-টিফিন দিসনি?'

—'নিলেন না। আপনি চান তো দিচ্ছি।' —দূর থেকে আওয়াজ আসে।

—'কেন? চা নিলেন না কেন? তবিয়ত ঠিক নেই, না কী?' হৃদয়নারায়ণ কিছু না বলে চোখ দুটো আর ডান হাতের তর্জনী কড়িকাঠের দিকে তোলেন।

তাঁর আঙুল অনুসরণ করে জগদীশও দেখেন, চার ব্লেডের কাঠের পাখা থমকে আছে, রাস্তা দিয়ে একটার পর একটা গাড়ি যাচ্ছে তার আলো চমকাচ্ছে সিলিংয়ে। জানলা দিয়ে হাওয়া আসছে, হাঁড়ি সুদ্ধু পুরনো পাখা দুলে উঠছে মাঝে মাঝে। বাস। এতে দেখবার কী আছে। ওপর দিকে আঙুল তুলে মানুষ ভগোয়ানকে বোঝাতে চায়। পিতাজি চা পান করেননি তার কারণ ভগোয়ান? প্রায় হুমড়ি খেয়ে তিনি পিতার সামনে বসে পড়েন। বাত্তির আলোয় এবার পিতার না-কামানো মুখ স্পষ্ট দেখা যায়, স্তিমিত কোটরের মধ্যে জ্বলজ্বলে চক্ষু। গালের হাড়, কণ্ঠার হাড়ের ওপর আলো ছিটকে পড়েছে, তার ভেতরে ভেতরে অন্ধকার।

—'পিতাজি আপনার তবিয়ত ঠিক আছে তো?'

—'তবিয়তের কথা হচ্ছে না বেটা, ধ্যান দিয়ে শোনো।'

এবং তখন জগদীশ শুনতে পান, মেঘ গুরগুর করার মতো ওপরের সিলিং মাঝে মাঝেই গুরগুর করে উঠছে। অনেক মানুষ যেন চাপা গর্জন করছে। মাঝে মাঝে হু-হুংকার, তারপরেই কান্না, যেন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে কার, কাদের।

—'এ কীসের আওয়াজ?'— জগদীশ সভয়ে বলেন।

—'রাম জানে।'

—'মিশির মিশির'— ডাকতে থাকেন জগদীশ।

—'খামোশ। চুপ রহো বেটা। নিজে থেকে শোনে তো শুনুক। ও বুঢ়াকে কিছু শোনাতে যেও না। যেটুকু বা দানাপানি জুটছে, তা-ও যাবে।'

কথাটার সত্যতা অনুভব করে চুপ করে থাকেন জগদীশ। ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায় আওয়াজ। আলো জ্বলে ওঠে। পাখা চলে। চিমনিতে লম্বা কালো দাগ ফেলে বাত্তি নিবে যায়। সমস্তটাই অলীক, মনের ভুল মনে হতে থাকে ওঁদের। জগদীশ উষ্ণ জলে স্নান করে নেন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ট্যালকাম মাখেন বেশ করে, পাতলা কুর্তা আর ধুতি পরে ফ্রেশ হয়ে এসে বসে পিতার সামনে, সারা দিনের কাজ-কর্মের হিসেব দাখিল করেন।

—'টাটার শেয়ার স্টেডি যাচ্ছে....'

—'হুঁ।'

—'লিপটন বেচে রিলায়েন্স কিনলাম।'

—'হুঁ'।

—'মঙ্গলানিরা ভাল দর দিচ্ছে।'

—'হুঁ।'

আবার একটা কী বলতে যাচ্ছিলেন জগদীশ, হৃদয়নারায়ণ প্রায় হুংকার দিয়ে উঠলেন।

জগদীশ চুপ করে গেলেন।

এবং কিছুক্ষণ পর হৃদয়নারায়ণ বলতে শুরু করলেন।

—'কাল ছাবরিয়াজির বাড়ির দাওয়াত, খেয়াল আছে তো?'

—'হুঁ।'

—'পেস্ট কনট্রোলে খবর দিয়েছ?'

—'হুঁ।'

—'নিলামখানায় গিয়েছিলে?'

—'হুঁ।'

হৃদয়নারায়ণ দেখেন জগদীশের কপালে মোটা ভাঁজ পড়েছে। এবার তিনি চুপ করে যান।

ওদিকে মিশির চিমনির বাত্তি নিবিয়ে দিয়ে বিজলি বাত্তি জ্বালিয়ে দেয়। মন্দিরে ভগোয়ানের সামনে আগরবাত্তি জ্বালে, ছাদে দু পাক হাওয়া খেয়ে ধীরে ধীরে দোতলায় নেমে আসে। রুটি পাকায়। শুখা ভিণ্ডি বানায়। দুধ গরম করে, মিঠাই বার করে, খাবার-দাবার তিনতলায় নিয়ে আসে। বড়া মালিকের ঘরে বসে দুই মালিক

খান।

—'মিশির সোরাইতে টাটকা পানি ভরেছিস?'

—'হাঁ জি।'

—'আজ ঘর ঝাড় দিয়েছিলি?'

—'জরুর।'

—'কোনও ফোন বা চিঠ্‌টি আসেনি?'

—'না।'

—'নোকর খোঁজ করেছিলি?'

—'না।'

—'কেন? খুব মজা না? একা একা সব ছটকে পাটকে খাচ্ছিস। কেউ ভাগীদার নেই। শ্যামলাল উল্লুটাকে তুই-ই তাড়িয়েছিস। খানা পাকাবার জন্যে যে নোকরানিগুলো আসে তাদেরও তুই ভয় দেখাস।'

—'একটা তো পেট মিশিরের কেত্তা খাবে? একটা তো মুহ্‌ মিশিরের কেত্তা ভয় দিখাবে?'

—'তো কী বলতে চাস? আমরা কি মাহিনাকড়ি দিই না?'

—'পয়সাই তো সব নয় মালিক।'

মিশিরের সাহস সত্যিই বেড়ে গেছে। এবং নোকরের এই বাড়ন্ত সাহসের মোকাবিলা করতে দুই মালিকের মুখ থেকে কোনও ভর্ৎসনা তো দূরের কথা, মৃদু প্রতিবাদ-বাক্যও বেরোয় না। যেন মিশির একটা উচিত-কথা বলে দুজনকে চুপ করিয়ে দিয়েছে।

একটু পরে অবশ্য মিশিরের মায়াই লাগে। সে বলে— 'ভয় খাওয়ার মতো কাজ করলে ভয় খেতেই হবে। বহুজি তো কারও অনিষ্ট করছেন না। সংসার সামলাবার কেউ নেই, তাঁর দায় এটা, তিনি পালিয়ে পার পাবেন কী করে? তাঁর দায় তাঁকেই সামহালতে হচ্ছে। এর মধ্যে ভয়ের কথা আসে কেন, কই মিশির তো ভয় পাচ্ছে না।'

বাস, যে কথাটা ছুপা-ছুপা ছিল সেটাকে মিশির একবারে হাট করে দিলে। বহুজির আগেকার জগৎ আর বহুজির এখনকার জগতের মধ্যে আর কোনও আব্রু-আড়াল রইল না। বড়ঘরের বহুর যে একটা বুঝ-সমঝ, একটা মর্যাদাবোধ, আত্মসংযম থাকবে তা তিনি সম্পূর্ণই হারিয়ে ফেললেন। যখন-তখন তাঁকে শোনা যায়। এমন নয় যে তিনি কাউকে সাবধান করছেন, কারও হারানো জিনিস খুঁজে দিচ্ছেন, কি কাউকে কিছু স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। বাড়ির বউয়ের এইসব কর্তব্য তিনি যেন থোড়াই কেয়ার করছেন আর। বুঢ়া শ্বশুর সময়মতো খেল কি না খেল তাঁর আর হুঁশ নেই। স্বামী তেতেপুড়ে এল, একটু শান্তির দরকার, তিনি হাত-পা ধুয়ে ঠাণ্ডা হয়ে বসুন, তা না। সারাক্ষণ সময় নেই অসময় নেই হাভেলির মধ্যে দীর্ঘশ্বাসের ঝড় বয়ে যেতে থাকে। সে কী দীর্ঘশ্বাস রে বাপ! টেবিল থেকে কাগজ উড়ে যায়, হিসেবের খাতার শক্ত মলাট খটাস করে খুলে যায়, আলনা থেকে ধুতি

তোয়ালে রুমাল হু-হু করে উড়তে থাকে।

তারপরে কান্না? হৃদয়নারায়ণ শোনেন বহু গুমরে গুমরে কাঁদছে। রাত সাড়ে বারোটা বাজল। তাঁর এক ঘুম হয়ে গেছে। কু স্বপন দেখে জেগে উঠলেন তিনি। স্বপনে বহু লুটিয়ে পুটিয়ে কাঁদছে, তার চুল গড়াচ্ছে, আঁচল গড়াচ্ছে। নাকের হিরে কানের হিরে সে খুলে খুলে ছুড়ে দিয়েছে, লজ্জা, শরম, সম্ভ্রম কিচ্ছুর আর ধার ধারছে না। খালি কেঁদে যাচ্ছে। এই সপনা দেখে জেগে উঠে হৃদয়নারায়ণ দেখলেন আরে এ তো পুরাপুরি সপনা নয়। দেখতে পাচ্ছেন না উঠে কিন্তু বহুর কান্না তিনি শুনতে পাচ্ছেন বেশ। 'রো মৎ বেটি'— তিনি সান্ত্বনা দিতে চাইলেন। তাতে কান্না আরও বেড়ে গেল।

—'কীসের তকলিফ তোমার? এত কান্না করছো কেন?'

—'পানির মধ্যে বিজবিজ করছি, দেখছেন না?'

—'আহা, আমি যে ছিলামই না বহু। তুমি একটু ডাকা করতে পারলে না। হুঁশ যাবার আগেই চট করে দরজাটা খুলে ডাকতে পারতে—শুনতে হো, শুনতে হো— তো বুদ্ধুটা শুনে যেত।'

বহু আর কিছু বলছে না, কিন্তু কান্নাও থামাচ্ছে না। আবার নিদ এসে যায়, হৃদয়নারায়ণ চেতনার অলিগলিতে আবছা কান্নার পেছু নেন। পাশ ফিরে হাত দিয়ে চাপড়াতে থাকেন রোনা মৎ, রোনা মৎ মুন্নি, রো মৎ, রো মৎ গুড্ডি, কোন বাচ্চা বয়সে দাদিমার কাছ থেকে শোনা ঘুমপাড়ানি গানের কলি ভাঁজতে থাকেন— আরে এ মনোয়ারে, এ গুড়িয়ারে, নিদিয়া আ যা আ যা আ যা...

জগদীশের প্রতিক্রিয়া অন্যরকম। তিনি হাউ-হাউ কান্না শোনেন। শোনেন সাবিত্রী মাথা কুটছে, তিনি ভারী বিরক্ত হন।

—'বড্ড তকলিফ আমার ভীষণ কষ্ট, আপনি থাকতে আমার এত কষ্ট হবে? আপনি কিচ্ছু করবেন না?'

—'দেখো সাবিত্রী বহু, আমার তকলিফ তোমার চেয়ে কিছু কম না, চুপ যাও, এখন চুপ যাও তো! মওত হয়ে গেল তবু তুমি জিন্দা-টাইমের কষ্ট ভুলবে না?'

—'ওঃ যতক্ষণ আপনার গেরস্থালি সামহাল দিচ্ছিলুম, ততক্ষণ খুশ ছিলেন, এখন আপনা কষ্টের বাত করছি তাই বড্ড বুরা লাগছে, না?'

—'আচ্ছা-বুরার কথা নয়। যা হয়ে গেছে, যা আর বদল করা যাবে না, তা নিয়ে কষ্ট করার কী ফায়দা?'

সাবিত্রী এবার হতাশের কান্না কাঁদে। জগদীশও হতাশের ঘুম ঘুমোন।

আর মিশির? মিশিরের হয়েছে সবচেয়ে বিপদ। সে রুটি পাকাচ্ছে, রুটির তাওয়া আগুন থেকে উঠে উঠে পড়ছে। ছাঁকনিতে করে দুধ ছাঁকছে, জ্বালি দেবে তো হাত থেকে দুধ-ভর্তি ডেকচি খামোখা পড়ে যায়। সবজি পুড়ে ওঠে। জারে রাখা ভুজিয়াতে স্যাঁতা ধরে যায়। সে সব ফেলে দিয়ে আবার নতুন ভুজিয়া কিনে রাখতে হয়।

সে যতদূর সম্ভব সম্ভ্রমের সঙ্গেই বলে— 'বহুজি, এই বুঢ়া বাদ আর কোই নেই তো এ সংসারে। সব কিছু সমহালতে আমার জান কয়লা হয়ে যাচ্ছে। আপনি কোথায় আমাকে মদত করবেন, তা না'....

—'তোদের মদত করে কোনও ফায়দা নেই রে মিশির। আমার দুখ আমার তকলিফের কথা কি শুনবি?'

—'ছিয়া ছিয়া বহুজি, আপনি আমার মনিবান, মালকিন, বড় ঘরের বহু, আমি সামান্য নোকর, আমাকে কিছু শুনাবেন না, খুব পাপ হয়ে যাবে আমার।' —দু কানে হাত দিয়ে জিভ কাটে মিশির।

ঝন ঝন করে বাসন পড়তে থাকে। ফোঁস ফোঁস আওয়াজ হয়। ঘরের মধ্যে যেন তুফানের আগেকার গুমোট। বহুজি খাপ্পা হয়ে গেছেন। মিশির কোনওমতে কাজ শেষ করে। পোড়া রুটি, ধরা দুধ, গলা সবজি, স্যাঁতা পড়া আচার নিয়ে মালিকদের ঘরে যায়। খেতে বসে দুজনে তুমুল করেন।

—'আমাদের কী পেয়েছিস রে উল্লু? ভিখ-মঙি আমরা? খানা দিয়েছিস পোড়া, ধসা, গলা।'

মিশির হাত উল্টে বলে— 'বহুজি আমাকে ঠিক সে কাম করতে দিলে তো! আপনি কহানি আমি নোকর আমাকে শুনাতে আসছেন। আমি কখনও শুনতে পারি! রাম রাম! তো কোনও কথা বুঝতে চাইবেন না। গুসসা কী? বাপ রে। এই যে দিতে পেরেছি আপনাদের সে নেহাত আমি মিশির বলেই পেরেছি।'

জগদীশ আপসের গলায় বলে— 'আচ্ছা আচ্ছা, এবার চুপ যা উল্লু, বাত শুরু করলেন তো আর থামবার নাম নেই।'

হৃদয়নারায়ণ চুপ করে থাকেন, কেঁও কি তাঁকে শুধু বহু নয়, আরও অনেকে জ্বালাচ্ছে। তিনি সর্বক্ষণই প্রায় কণ্ঠস্বর শুনছেন।

—'বাপুজি আমাকে এরা দহির ছাঁচ দিয়ে পোড়া রুটি খেতে দেয়। দহি দেয় না কখনও।'

—'বাপের ঘরে যখন আসবে তখন দহি খাবে মায়ি। কী করবে একটু সয়ে থাকো।'

—'বাপু, এরা আমাকে বড্ড মারধর করছে, তুমি কেন অত কম দহেজ দিলে?'

—'যা দিয়েছি, বলা-কওয়া করেই তো দিয়েছি বেটি।'

—'এরা তা বলছে না, বলছে তুমি দাওনি। বাপু আমি আর সইতে পারি না। হাত মুচড়ে দিচ্ছে তোমার দামাদ, উঃ।..... শাসু আমাকে আগুনের ছেঁকা দিচ্ছে....বাপু আর কত সয়?... তোমার কাছে চলে যাব বলেছি বলে কামরার মধ্যে বন্ধ রেখে দিয়েছে।'

এরপর হৃদয়নারায়ণ বাতাসে একটা শাঁই শাঁই আবাজ পান। তিনি দেখতে পান না কিছু, কিন্তু বুঝতে পারেন একটি নাজুক শরীর দুলছে, কড়ি কাঠে পাখার সঙ্গে শাড়ির গিঁটঠি বেঁধেছে, ব্লাউজ শায়া পরা একটা শরীর দুলে যাচ্ছে পেণ্ডুলামের মতো, ডাইনে-বাঁয়ে, ডাইনে-বাঁয়ে।

—'আরে লালী, কতদিন হয়ে গেল, এখনও তুই দুলছিস?' মৃত মুখ কোনও সাড়া দেয় না।

হৃদয়নারায়ণের খুবই ডর লাগে। কেন না তিনি আন্দাজ করতে পারছেন আর কী কী দেখবেন।

তাঁর আন্দাজ মিলে যায়। কখন কোন আবাজ আসবে তা অবশ্য তিনি বুঝতে পারেন না। যেমন বড়ি মুন্নির ব্যাপারটা এল একেবারে অতর্কিতে। দারুণ গ্রীষ্মের দিনে তিনি নিজের চমৎকার বাথরুমে আরামসে নাহা করছিলেন। একটা কচিমতো গলা বলল— 'তুমি তো গরমি থেকে বেশ ছুট্টি করে নিলে। আমি যে জ্বলে যাই।'

পরক্ষণেই হু-হু অগ্নিদহনের উচ্ছ্বাস তিনি টের পান। গায়ে যেন হলকাও একটু লাগে।

—'বড়ি মুন্নি বড়ি মুন্নি তুই তো সেই যোধপুরে সর্দার মার্কেটের হাভেলিতে জ্বলে গিয়েছিলি। এখানে কী করে এলি রে? এ তো তাজ্জব কি বাত রে?'

—'আরে হাওয়া, আগুন আর পানি তো স্থান-কাল মানে না রে গুড্ডু। আমাকে তোরা ওই খতরনাক সসুরালে পাঠাতিস কেন? আমি যে কত করে পিতাজিকে বলতাম হর-টাইম ওখানে যাব, তো নয়া নয়া সোনেকা জেবর নিয়ে যেতে হবে, না হলে ওরা আমাকে ভীষণ মারবে। তো পিতাজি কি শুনলেন? তাইতে সসুরাল যাবার কথা ঠিক হতেই আমি ছোটি মুন্নিকে নিয়ে জ্বলে গেলাম।'

—'গেলে গেলে, তো ছোটি মুন্নিকে নিলে কেন?'

—'আরে এক তো ওকে আমি জাদা প্যার করতাম। মওতের পরও ওকে ছেড়ে থাকব এ তো সোচতেও আমার কষ্ট হত। আর দুসরা বাত ওকেও তো সসুরাল যেতে হবে। দহেজ নিয়ে খিচিমিচি লাগবে। গন্ধা বাত সব। ও আবার এক লড়কি পয়দা করবে, তাকে ভি সসুরাল যেতে হবে, আবার দহেজ নিয়ে খিচিমিচি খিচিমিচি.... তাই একসঙ্গেই শেষ করে দিলাম।'

আগুনের হলকা বুঢ়া শরীরে নিয়ে হৃদয়নারায়ণ বাথরুমের বাইরে বেরিয়ে আসেন, একেবারে নাঙ্গা। সারা গায়ে জল। মিশির দেখতে পেয়ে টাওয়েল পরিয়ে দেয়, গা মুছে দেয়, ঘরে নিয়ে গিয়ে জামাকাপড় পরিয়ে দেয়, তিনি তখন মিশিরের হাতে বিলকুল গুড়িয়া যৈসা। মিশির তাঁকে বিছানায় শুইয়ে দিল। পাখা ফুল ফোর্স করে দিল। পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলল,

—'আরাম করুন মালিক, আরাম করুন। গর্মি লেগে যাচ্ছে। মাথার ঠিক থাকছে না কারও। আরাম কিজিয়ে।'

তিনি ঘুমিয়ে গেছেন বুঝে মিশির চলে যেতে তিনি বলেন— 'দেখছ তো বহুবেটি, যা করেছি ঠিক করেছি কি না। যা ভেবেছি ঠিক ভেবেছি কি না।'

বাস। আর যায় কোথায়? 'অগ্রবাল হাউজে'র সিলিং, কামরা, ফটক, ঝরোকা সব কিছি বাচ্চার গলায় ককিয়ে কেঁদে উঠল। আর কিছু না, শুধু কান্না, আর যেন দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এমনি কান্না।

লুনী নদী সাগর অবধি পৌঁছতে পারেনি। সাগর ছেড়ে কোথাও কোনও শস্যশ্যামল পরিণামে পৌঁছনোই তার সম্ভব হয়নি। বেচারি থর মরুভূমির বালুর মধ্যে অর্থাৎ কিনা মৃতদের রাজ্যে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলে। বাচ্চা নদী একটা। তার না হল আমোদ-আহ্লাদ করা, না হল তেমন করে তীরভূমির দুর্গ, প্রাসাদ, গাছপালা এ সবের ছবি বুকে নেওয়া, না হল চুড়ি মলের আওয়াজ করে নাচতে নাচতে ছুটে চলা। মৃতের রাজ্যের শুকনো বালু তাকে শুষে নিল।

তা সেই লুনী নদী যখন খতরনাক মুর্দাদের মুলুকে ঢোকেনি তখনই তার ধারা দুই স্যান্ডস্টোনের পাহাড়ের মাঝখানে বেঁধে দিয়ে তৈয়ার হয়েছে আনাসাগর। সাগর কি একটা নাকি রাজস্থানে? রয়েছে অমর সাগর। গদীসর সরোবর জয়সলমিরে, মান্ডোরের পথে রয়েছে বালসমন্দ হ্রদ, যোধপুর শহরের দশ কিলোমিটার পশ্চিমে কৈলানা, তা ছাড়াও রয়েছে বিরাট জলাশয় প্রতাপসাগর, উদয়পুরের লেক পিছোলা, ফতেহ সাগর, জয়সমন্দ লেক, বিশেষ করে উদয়সাগর তো বিখ্যাত, রাজসমন্দ লেক রয়েছে উদয়পুর-আজমির সড়কে, তেমনি সুন্দর আজমিঢ়ের পাহাড় বেষ্টিত আনাসাগর। কথিত আছে রায়পিথৌরা বা পৃথ্বীরাজের পিতামহ অরনোরাজ বা আনাজি এই সাগর খনন করান। সূর্য ওঠবার সময়েও এই সাগরের সৌন্দর্য দেখবার মতো, কিন্তু সন্ধেবেলায় রামধনু রঙের খেলা হ্রদের জলে একবার দেখলে আর মানুষ ভুলতে পারবে না। অমন যে সৌন্দর্যপ্রিয় বাদশা জাহাঙ্গির তিনিই নাকি আনাসাগরের খুবসুরতি দেখে তার পাড়ে এক বাগিচা গড়ে দ্যান— দৌলতবাগ।

দৌলতবাগের পাথরের পাঁচিলের পাশে যেখানে আনাসাগর পাড়ের সঙ্গে ঘেঁষে ঘেঁষে বিশ্রম্ভালাপ করছে সেইখানে কিছু শ্যাম শষ্পের জটলা। সন্ধে ঘন হলে লেকের জলে রামধনু-ঝিলিমিলি যখন সবে মুছে গেছে, তখন সেই শষ্পের মধ্য থেকে একটি কিশোরী উঠে আসে। গাগরি ভরনে গিয়েছিল না কি? না, লোকের চোখ এড়িয়ে একটু হাত পা ধুয়ে চোখে মুখে পানি দিয়ে এল? হতে পারে, কেন না তার বাল থেকে টস টস করে জল ঝরছে, বিশ গজি বাঁধনি কাপড়ের ঘাঘরা তার পরনে, কাচ বসানো লাল হলুদ কাঁচুলি, বালু-মেশানো মাটি, নাঃ, মাটি মেশানো বালুর মতো গরিবি চুলে সবুজ ফিতের ফুল দিয়ে দুটো বিনুনি করা, নাকে ছোট্ট চাঁদির নোলক, চোখে কষে সুর্মা লাগানো, খুব সেজেছে বেটি, হাতে লাল সবুজ কাচের চুড়ি খুব ঝমঝমাচ্ছে, খুব চকমকাচ্ছে। হলুদ বাদলার কাজ করা ওড়নি দিয়ে সে মাথা ঢাকা দিয়ে নেয়, মস্ত বড় হয়ে গেছে কিনা! তো তারপর পায়ের মল বাজিয়ে আট নম্বর জাতীয় সড়কের দিকে চলতে থাকে। কখনও সে ছুটছে, কখনও তপ্ত পথের অ্যাসফাল্ট পায়ে লাগায় লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে, আবার পথ ঠাণ্ডা হলে চলছে আস্তে-সুস্থে।

আজমিঢ় যোধপুর বাস যাচ্ছে সড়ক দিয়ে। সাড়ে চার ঘণ্টার মতো সময় নেবে পৌঁছতে। যাত্রী বোঝাই বাস একেবারে। মাথায় তিন চার প্যাঁচের আটগজি কাপড়ের বাঁধাকপির মতো বিরাট পাগড়ি, তার তলায় রুখুশুখু বহু রেখার কাটাকুটিতে ভর্তি

মুখ, রোদ্দুরে পুড়ে সব তামাটে রং ধরছে, গায়ে এদের পুরো হাতা মাথা গলানো বোতামহীন জামা, ধুতি হেঁটো করে পরা। দরগা খাজা সাহেবে তীর্থ করেও ফিরছে অনেক মুসলিম ভক্তরা। মাথায় জালির কাজ করা স্কাল-ক্যাপ, পরনে লুঙ্গি, আর সেই একই বোতাম ছাড়া মাথা গলানো জামা। বোরখা ঢাকা যাত্রিণীও আছে, বেসর নাকে ঘাঘরাওয়ালি যাত্রিণীও আছে।

সরু সরু হাত নেড়ে নেড়ে সেই বাস থামায় কিশোরী।

— 'কে রে? স্টপে দাঁড়াতে পারিস না, যেখানে সেখানে বাস থামাচ্ছিস?'

—'পৈসা নেই ভাইয়া, যোধপুর পৌঁছে দাও, বাপের ঘর যাবো।' বাপের ঘরের কথা বললেই যেন বাসের ড্রাইভার-কনডাক্টর সব গলে ক্ষীর হয়ে যাবে।

— 'পৈসা নেই, তো নেব কেন?'

— 'নিয়ে না গেলে বড্ড পরেশানি হবে আমার ড্রাইভারজি, সমস্তটা রাস্তা হেঁটে যেতে হবে।'

— 'সত্যনাশ। একশ আটানব্বুই কিলোমিটার পথ এই নরম দুবলি বালিকা হেটে যাবে? ক্যা মজবুরি ইসকী?'

যাত্রীদের মধ্যে একজন গেরস্তারি লোক পাগ নেড়ে বলল—'আহা ও তো চোরি করেনি বেচারি। জানিয়েই দিচ্ছে পৈসা নেই। ক্যা রে? সসুরাল সে বাপঘর যাচ্ছিস?'

—'সসুরাল না মামাঘর?' — মুখ টিপে হাসে বালিকা। ঠিক উত্তরটা দেবে না, সে-ও রহস্য করতে জানে। শয়তান আছে।

তা মেজরিটি ভোটে পাস হয়ে যায় তার যোধপুর যাওয়া। উঠে সে ওড়নি দিয়ে মুখ মুছে একটা কাপড়ের গাঁঠরির ওপর বসে। গাঁঠরির মালিকের দিকে তাকায় ভিতু-ভিতু অনুনয়ের দৃষ্টিতে। মালিক খুশি হয়ে গোঁফে চাড়া দিয়ে বলে— 'বয়েঠ, বয়েঠ, কুছু হবে না। দুবলি পাতলি লড়কি, কী হবে?'

— 'কা রে? আমাদের দামাদকে বলে-কয়ে এসেছিস তো?' ওর সঙ্গে স্নেহের ইয়ার্কি মারে যাত্রীরা। চলার পথে এই রকম ছোটখাটো ঘটনা ঘটল তো ইয়ার্কি মেরে মন খুশ করে নেবার একটা মওকা মিলে গেল। এখানে তো কেউ কারও জীবনের গভীরে ঢুকতে যাচ্ছে না। একটা ছোট্ট লড়কি একা একা বেসাহারা পৈসা নেই, কিছু নেই, কেন বাপঘর যাচ্ছে অত জানবার তো দরকার পড়ে না।

— 'পালিয়ে যাচ্ছি।' মুখ টিপে হাসে বালিকা। নাকের ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম। লোকে ইয়ার্কি মারছে, ও-ও সমানে তালে তাল দিচ্ছে। শয়তান আছে লড়কিটা।

—'শাস কি বিশ সের আট্টা ডলতে বলেছিল? না কুঁয়াসে বিশ বালটি পানি আনতে বলেছিল?'

— 'জুত্তির ঘা মেরেছিল নাকি রে দামাদ? না বলে চলে যাচ্ছিস? গুসসা খুব? কোথাকার রানি রে তুই? বাপের ঘরে বকা খাবি খুব।'

—'তোর বাবু আবার তোকে ফিরিয়ে দিতে আসবে। তখন শাসু ঘড়িঘড়ি মসলা পিষাবে, কাপড়া কাচা করাবে, খানা পাকানো, পা দাবানো সব তোর ঘাড়ে পড়বে রে মুন্নি, লওট যা।'

মুন্নি কিছু বলে না। গোঁয়ার অশ্বতরর মতো কাপড়ের গাঁঠরি আঁকড়ে বসে থাকে।

— 'কা রে? বাপ ঘরে কে আছে. মা আছে? দাদিমা? দাদা?'

চুপচাপ চেয়ে থাকে সে। লওট যাবার কথায় বোধ হয় তার অভিমান হয়েছে। সে আর কোনও কথার জবাব দেবে না।

—'মায়ের জন্যে মন কেমন করছে না কি রে তোর?'

বাস আর দেখতে হয় না। দামাদ মারেনি, শাসু খাটায়নি, ওসব কিসস্ না। আসলে লড়কিটার মায়ের জন্য মন বহোত দুখাচ্ছে। তার সোনালি চোখের কিনার বেয়ে টপাটপ বড় বড় দানা ঝরে পড়তে থাকে। ঠোঁট একটু একটু ফোলে। অনেক কষ্টে সে চোখের জল সামলায়।

একজন মহিলা বোরখার আড়াল থেকে কর্কশ গলায় বলে ওঠেন 'ছোটিসি লড়কি ও ওর মতো যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে ও-ই জানে। ওকে এতো তং করবার দরকার কী আপনাদের?'

— 'ঠিক, সচ্।' আরও কয়েকজন মহিলা সায় দেন।

পুরুষরা সব চুপ করে যায়। জনান্যদের কথা মেনে যায়, ইয়ার্কি মারা বন্ধ করে।

— 'লড়কির দুখ, আওরতের দুখ এরা কী বুঝবে?'

বোরখাওয়ালি এক ঘুংঘটওয়ালির দিকে চোখের জালির মধ্যে দিয়ে চেয়ে বলেন। বেশ চেঁচিয়েই বলেন। পর্দানশিন বলে গলা কম না। ঘুংঘট নেড়ে ঘুংঘটওয়ালিও সায় দেন।

মরদ লোগ সব মাথা নিচু করে ফেলে। যেন তারাই বা এই মুন্নির প্রহার দেনেআলা বর কি শ্বশুর, লৌটেদেনওয়ালা বাপ দাদা, মুন্নিটার ভাগ্যনিয়ন্তা.....তার অশান্তির কারণ।

যোধপুর বাস-স্ট্যান্ডে বাস এসে দাঁড়ালে, সবাই ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে নেমে যায়। কে কোথায় গেল আর কি কারও খেয়াল থাকে? যতক্ষণ একসঙ্গে যাচ্ছে যেন পরস্পরের দুঃখসুখের কত ভাগীদার, একবার লক্ষ্যে পৌঁছে গেলে কেউ আর কারও না। পানি পাঁড়ের কাছ থেকে আঁজলা ভরে পানি নেয় লড়কিটা। চোঁ-ও-ও করে পান করে। তারপর আর বাস না, টাঙ্গা না, হাঁটাপথ ধরে। কাউকে জিজ্ঞেস করে না, কেনই বা করবে তার বাপ-ঘর যখন। মাঝে মাঝে দম নিতে একটু একটু থামে শুধু। এই করে করেই দুপুর নাগাদ সে পৌঁছে যায় সর্দার মার্কেটের মস্ত হাভেলিতে। তিন তলা হাভেলির জানলা কপাট সব বন্ধ। মুখ উঁচু করে দেখতে পায় সে। তা হয়তো দুপুরবেলায় বন্ধ রাখে সব এরা। সিঁড়িটা গেছে বাইরে থেকে দোতলা হয়ে তিনতলায়। এই বাইরের সিঁড়ি ধরেই একদিন বড়িমুন্নি ছোটিমুন্নি, লাল..... সব কত ওঠানামা করেছে। সেই ঐতিহাসিক সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকে সে ঘাঘরা সামলে সামলে, দু তলায় ঢোকবার মুখে তালা আটকানো, এবার সে তিনতলার দিকে যায়। তিনতলায় ঢোকবার মুখেও তালা আটকানো। আর সে পারে না, তপ্ত সিঁড়ির ওপর বসে পড়ে হাপুস কাঁদতে থাকে।

কাকে খুঁজছে লড়কিটা? কার ভরোসায় এত দূর ছুটে এসেছে? দারোয়ান

রামলগন দুপুরের রুটি গড়ে একটু বাইরে এসেছে, দেখতে পেয়েছে— 'এ লড়কি? এ লড়কি? কা রে? কাকে টুঁড়ছিস?' কিছু বলে না লড়কি। কাঁদতেই থাকে, কাঁদতেই থাকে।

— 'আরে আগরওয়াল সাবরা তো এখানে কেউ থাকে না। ও লোক তো কলকাত্তায় হাভেলি বানিয়েছে রে'।

হাত বাড়িয়ে কলকাত্তার ঠিকানা চায় বালিকা। জানে তো রামলগন ঘন্টা। বানান ভুল, আঁকা বাঁকা অক্ষর, লিখে দেয়, কী করবে। কেমন জেদ দেখো লড়কিটার। কাকে চাই সে বলবে না, কেন এসেছে বলবে না, রামলগন রুটি অফার করলে খাবে না। তক্ষুনি তক্ষুনি সে হেঁটে-হেঁটে স্টেশন রোড ধরেছে। তাজ্জব কি বাত!

টিকিট আর কাটবে কোথা থেকে? এর পায়ের তলা, ওর বগলের তলা দিয়ে গলে যোধপুর-দিল্লি এক্সপ্রেসে উঠে গেছে লড়কিটা। ঘাঘরা গুটিয়ে বেঞ্চির তলায় গিয়ে শুয়ে পড়েছে, এমনি সেয়ানা। এই ভাবেই দিল্লি, তারপর দিল্লি থেকে দিল্লি-শিয়ালদহতে চেপেছে। মাঝের স্টেশনে ওকে নামিয়ে দিয়েছে কান পাকড়ে। ও কাঁদতে কাঁদতে ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটেছে। মুমবাত্তির মতো চিকন, নরম, নাজুক বালিকা এক। শেষে গার্ড সাহেব ওকে দয়া করে নিজের কামরায় তুলে নিয়েছেন। জয় হয়েছে ওর চোখের পানির, ব্যাকুলতার। জয় হয়েছে ওর জেদের আর ছেলেমানুষির। দেহাতের পরিচ্ছন্ন ঘরের বেসাহারা লড়কি এক। তার কেউ নেই। সে কলকাত্তায় তার আপনজনের খোঁজ পেয়েছে। কোথা থেকে পৈসা পাবে?

শেয়ালদায় নেমেছে। তারপরে কী করে সে এই বিশৃঙ্খল গাড়ি ঘোড়ায় উন্মাদ শহরের রাস্তা পেরিয়ে একে পুছে তাকে পুছে অগ্রবাল হাউজ, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেন্যুতে পৌঁছায় সে ও-ই জানে আর ভগোয়ানই জানেন।

সন্ধেবেলায় ছাদে চারপাই নিয়ে শুয়ে আছেন হৃদয়নারায়ণ। এপ্রিলের শুকনো সন্ধে। শুক্লপক্ষের চাঁদ দুধের জোয়ারে ভাসিয়ে দিচ্ছে সব। মোটা সরঅলা ভঁইস কা দুধ। সেই চাঁদের ছটাই পুঞ্জীভূত হচ্ছে যেন, হৃদয়নারায়ণ দেখতে পেলেন তাঁর ইদানীং ছানি-পড়ন্ত চোখ দিয়ে। চাঁদনি জমছে, জমছে, জমছে, আস্তে আস্তে একটা আকার পাচ্ছে। খানিকটা ছায়া-ছায়া, খানিকটা আলো-আলো। ঠুং ঠাং শব্দ হতে তিনি চমকে জিজ্ঞেস করলেন— 'কে? কে?'

— 'আমি'— ছোট্ট আওয়াজ হল।

চাঁদের আলোয় সবুজ ঘাঘরা কালো দেখাচ্ছে, লাল কাঁচুলি কালো দেখাচ্ছে, হলুদ ওড়না স্বচ্ছ, যেন জলের মতো।

— 'কে তুমি।'

— 'আমি মুম। '

উঠে বসেন হৃদয়নারায়ণ।

— 'কে মুম? কীসের মুম? কোত্থেকে এলে?'

প্রথম প্রশ্ন দুটোর উত্তর আসে না। তৃতীয় প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব আসে।

— 'আজমির।'

চমকে উঠলেন হৃদয়নারায়ণ। বহু বেটির বাপ-ঘর।

—'ওদের কেউ হও না কি? রামকুমার ধুধুরিয়া, লগনরাম ধুধুরিয়া...'

একটু হাসির শব্দ এল।

— 'ভারী ভারী নাম সব এ কুমার, সে রাম— উসব আমার খেয়াল নেই।'

—'কেমন করে এলে?'

— 'যেমন আসে সবাই। বাস ট্রেনে, পায়দল।'

— 'কেন এলে?'

— 'কেন আর? কেউ তো ওখানে আর নেই আমার।'

— 'তো এখানেই বা তোমার কে আছে?'

— 'মুলুকের লোক বললে— আছে, আগরওয়ালদের ঘরে যাও। যোধপুরের সর্দার মার্কিটের আগরওয়াল.....'

— 'অমনি তুমি চলে এলে?'

— 'হাঁ।' জিদ্দির মতো বলল লড়কি।

— 'তো তুমি কে?'

— 'আমি মুম। কী বারবার পুছেন। বলেছি তো। আমি মুম।'

যতবারই জিজ্ঞাসা করা যায় সেই একই জবাব দেয় সে। আমি মুম। মুম তো বুঝলাম, কিন্তু কী তোমার পরিচয়, কে তোমাকে পাঠাল, আগরওয়ালদের ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে সর্দার মার্কিটের কোঠিতেই বা গেলে কোন ভরোসায়। আর চিতরঞ্জন অ্যাভেনিউতেই বা এলে কী করতে।— এ সবের কোনও জবাব নেই।

বিব্রত হয়ে হাঁক পাড়েন হৃদয়নারায়ণ— 'মিশির! মিশির! এ মিশির।' মিশিরকে ডেকে পান না হৃদয়নারায়ণ। কে জানে কোথায় বসে বসে ঢুলছে। লড়কিটাই গিয়ে ডেকে আনে।

—'এই বুঢ়াকে ঢুঁড়ছিলেন!'

—'হাঁ। এ মিশির এ লড়কি কোত্থেকে এসে গেল?'

মিশির একটি অদ্ভুত মানুষ। তার কোনও কিছুতেই বিস্ময় নেই। সে হাত উল্টে বলল— 'রাম জানে!'

—'রাম জানে। উল্লু কাঁহিকা, রামজিকে আমি নোকর রেখেছি যে তিনি জানবেন? নজর রাখিস না সদর দরোজায়? যে যেমন খুশি ঢুকে আসছে। আজ নয় এই বাচ্চি এসেছে। যদি চোট্টা আসতো? ডাকু আসতো?'

—'যদি ভালু আসতো! গেণ্ডা আসতো!' মিশির বলল।

—'হাঁথি আসতো। উট আসতো।' —লড়কিটা খিলখিল করে হেসে বলল। ভয় করছে না একদম বুঢ়া মানুষটাকে।

—'তুমি উট দেখেছ?'

—'আমি উট দেখেছি। বালুর মধ্যে সুরজ চিকচিক করে, উট চলে সোয়ারি নিয়ে।'

—'তা মুন্নি তুমি কী চাও?'

—'কী আবার চাইব? খিলাবে তো খাব, পিলাবে তো পিব, পিন্যাবে তো পিনব।' যেন ছন্দে ছন্দে ঘাড় নাড়িয়ে লড়কি বলল।

—'আর যদি না খিলাই। না পিলাই, কাপড়া যদি না দিই? তা হলে কী করবে মুন্নি?'

—'মুন্নি নই। আমি মুম আছি।'

—'মুম বাত্তির মুম?'

—'হাঁ। তাপ দিলে গলে গলে যায়, হিম লাগলে জমে যায় সেই মুম।' কিছু প্রশ্ন যে সে ফাঁকতালে এড়িয়ে গেল হৃদয়নারায়ণ তা লক্ষও করলেন না।

—'কেতনা উমর তোর?'

—'কা জানে? গারা, বারা, তেরা....কা জানে?'

জগদীশ এলে হৃদয়নারায়ণ বলেন— 'এ জগদীশ, অজিব চিড়িয়া এসে গেল রে কোঠিতে। আজমিঢ় থেকে সর্দার মার্কিট যোধপুর হয়ে এসেছে রামলগন দারোয়ানের কাছ থেকে পতা নিয়ে। মুম। বারা কি তেরা সালের এক মুমবাত্তির মুম।'

জগদীশ দেখেন পিতাজি তাঁর ঘরে আরামচেয়ারে বসে আছেন, মহা ফূর্তি। সামনে মেঝের ওপর দু হাত দিয়ে হাঁটু আগলে এক মুন্নি বসে আছে। সবুজ ঘাঘরা, কাচ-বসানো লাল চোলি, হলুদ ওড়না দিয়ে মাথা ঢেকে নিয়েছে। ভারী ভব্য-সভ্য শর্মিলি, নরম, নাজুক এক লড়কি। আর কিছুদূরে বসে মিশির অনর্গল বুরবক কি তরহ্ বকে যাচ্ছে, বকেই যাচ্ছে। কী তার তকলিফ, সে এই বুঢ়া মনিবদের ছেড়ে দেশ-দেহাতে যেতে পারে না, বহুজি বড়ি মালকিন সব কত ভাল ছিলেন, তাঁরা মিশিরকে কত বিশ্বাস করতেন, ঘর-সংসারের কত শ্রী-ছাঁদ ছিল তখন, এখন এই দুই বুঢ়ার সংসারে সে কতটা অসহায়, সে কি তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারে? এত কাজই কি এই বয়সে করার কথা তার? তারও কি ষাট পঁয়ষট্ট হবে না, জরুর হবে। এ উমর-এ আদমি আরাম করে থাকে, তার মতো গাধার খাটনি কে খাটে? ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

জগদীশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন লড়কিটার দিকে.

—'কোথা থেকে আসছিস?'

—'আজমিঢ়, আজমিঢ়, আজমিঢ় সমঝেছেন?' ওড়না মুখে দিয়ে খিলখিলিয়ে সে বলল।

—'আজমিঢ় শহর?'

—'নয় তো কী?'

—'কোন জায়গায়, চুড়ি গাঁও না কি?'

—'সাগর হ্যায় না এক? আনা জি কা সাগর?'

—'তা সাগর থেকেই উঠে এলি না কি?'

আবার হাসছে মুন্নি।

—'উঠে এলামই তো। দেখছেন না, জামাকাপড় সব সপসপ করছে।'

—'তো গলির নাম বল। পতা কেয়া?'

—'আমি ছোট লড়কি। অত কি জানি?'

—'কাম কাজ কী পারিস?' জগদীশ ধরেই নিয়েছেন এ কাজের জন্য এসেছে।

তার জবাব হল— 'বহোৎ প্যাস লেগে গেছে, পানি আছে তোমাদের কোঠিতে?'

জল এনে দেয় মিশির। ঢুক ঢুক করে জলটা খেয়ে নেয় সে, মন্তব্য করে— 'বতাসাও কি দুটো ছিল না? কেমন ঘর তোমাদের? লছমীজি নেই ঘরে?'

জগদীশ আবার বলেন— 'তো কোন গলি, পাতা কেয়া... উসব বল?'

অমনি হৃদয়নারায়ণ ধুয়ো ধরলেন— 'ছোট্ট লড়কি' অত কি জানে?'

মিশিরও প্রতিধ্বনি করে উঠল— 'ওকে আর পতা জিজ্ঞেস করে ঘাবড়াবেন না। ও বলতেই পারবে না।'

কারও একবারও মনে হল না, এই ছোট লড়কিই একা একা আজমির থেকে ঠিকানা নিয়ে যোধপুর গিয়েছিল, যোধপুর থেকে দিল্লি, দিল্লি থেকে কলকাতা এসে এই ঠিকানা ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে বার করেছে।

জগদীশ ভোলবার মানুষ নন। বলেন, 'তো এ কী কাম-কাজ পারবে?' মিশির বললে— 'আরে সাব, গাঁও মুলুকে তো এইসি লড়কির শাদি হয়ে যায়। তখন সসুরালে কেত্তা কাম করতে হয়, পুরা এক একটা ঘর এক এক বহুর ঘাড়ের ওপর! গারা বারা সাল হয়ে গেল তো লড়কি সোর কাম করবে, কেন করবে না?'

মিশির যেন জগদীশজিকে আশ্বস্ত করতে চাইছে, এ লড়কির প্রয়োজনীয়তা সে ঠিকই খুঁজে খুঁজে বার করে নেবে।

হৃদয়নারায়ণ খ্যাঁক করে উঠলেন— 'কেন? তোর কি মওত হয়ে গিয়েছে যে এইটুকু ছোট্ট লড়কি, যে নাকি বহুবেটির বাপের বাড়ির দেশ থেকে এসেছে তাকে দিয়ে ঘরের কাম সব করাব? উল্লু কাঁহিকা, এই মওকায় আরাম করে নিতে চাচ্ছিস, না? যত তনখা তোকে দিচ্ছি, তত তনখার কাম পুরা করে তবে আরাম করবি, বলে দিচ্ছি।'

মিশির কপালে করাঘাত করে—'কা বোলছি, আর কা সমঝাচ্ছেন মালিক। এসেই যখন গেছে তখন এ মুম লড়কি করবে তো কিছু। এক্ষুনি নাই হোক, দু দিন পরে। সুবহ্ না হোক সামকো, দুপরে, কুছু না করে তো বসে থাকতে পারবে না? কা রে? পারবি বসে থাকতে?'

হেসে দেয় মুন্নি। সে যে কী সূত্রে এসেছে, কী তার অবস্থান, কী কাজ করবে, কী পরিচয়ে থাকবে পরিষ্কার হয় না কিছুই। শুধু ষোলো আনার জায়গায় আঠারো আনা ঠিক হয়ে যায় সে থাকবে। তার তেমন কোনও দায় নেই। তাকে তনখা দেবার প্রশ্নই ওঠে না, সে সেসব চায়ও না, খালি তার দু-তিন দফা ঘাঘরা চোলি বড়বাজার থেকে খরিদ হয়ে আসে। এবং বহুজির কামরার মেঝেতে তার শোবার ব্যবস্থা পাকা হয়ে যায়।

কেন? সে তো দুতলায় খাবার ঘরেও মাদুর কাঁথা বিছিয়ে শুয়ে থাকতে পারত।

বাপরে, এত বড় হাভেলির একটা পুরা তলায় সে একা থাকবে? তার বুঝি ভূতের ভয় করবে না? একলা পেয়ে ভূতে যদি কানে আঙুল দিয়ে আঁখ বড় করে, দাঁত বার

করে তাকে ভয় দেখায়?

—'মিশির তো আজকাল দুতলাতেই শুচ্ছে! সে তো পাহারা দিতে পারবে লড়কিটাকে!'

—'ও বুঢ়া নিজেই তো একটা দেও আছে!' মুখে ওড়না চেপে খিলখিলিয়ে ওঠে সে।

—'আমিও তো বুঢ়া, আমার লড়কা জগদীশকেও তো তোর বুড্ঢাই লাগবে রে মুন্নি। আমরাও তো দেও হতে পারি।'

—'না, না আপনি দাদাজি আছেন একটা। বহোৎ প্যার আপনার দিলে। আপনাকে আমার ভয় হয় না। আর ও ছোটা মালিক? উনি তো বিলকুল পাথ্থর যৈসা। হাঁ-ও নেই, না-ও নেই।'

ভাগ্যিস জগদীশ সেখানে নেই।

১৩

ঠিক যেমন জগদীশজি, ঠিক যেমন হৃদয়নারায়ণজি, ঠিক যেমন মিশির, ঠিক তেমন মুম। মুমও এ বাড়ির একটি মানুষ। তবে জগদীশ-হৃদয়নারায়ণ-মিশির মিলে যতটা হয়, মুমবাত্তি তার চেয়েও বেশি, অনেক অনেক বেশি। কেননা সে সব সময়ে বাড়ির ভেতরে থাকে, জগদীশের মতো রোজ সাত-আট ঘণ্টা বাইরে কাটায় না, মিশিরের মতো সে হয় চৌকা, কি ভাণ্ডার, কি বাইরের দুকান-বাজারে আটকে থাকে না, বড়া মালিকের মতো সে পূজাঘর আর বাথরুম আর শয়নঘর, কি বড়জোর ছাদের মধ্যে বিচরণ করে না। সে সারা বাড়িতে ঘুরে বেড়ায় যেমন ইচ্ছে, যখন ইচ্ছে যেখানে ইচ্ছে।

—'বহোৎ গন্ধা হয়ে গেছে তোমাদের গুদাম'— সে নাকে কাপড় দেয়। পেস্ট কনট্রোল আসে, ভাড়া করা কুলি আসে, সব গুদামঘর ফিনাইল দিয়ে, পোকা-মারা দিয়ে পরিষ্কার করে দেয়। এই অ্যাত্তো ইঁদুর, আরশুলা, টিকটিকি, মাকড়, মাকড়ের জাল সব বেরোয়। একটা বাদুড়ভি বেরিয়ে যায়।

'খানার জন্যে তোমাদের আলগ কামরা রয়েছে, টেবিল রয়েছে তো তাতে তো ধুলো পড়ছে? এ কি জয়সলমিরের রেগিস্তানি বালু নাকি? উড়ে উড়ে সব ঢেকে দিচ্ছে যে। এ তো আর বড় ঘরের খানাপিনার ঘর বললে কেউ বিশ্বাস যাবে না। তো অন্ততপক্ষে একবেলা সবাই খাও।' যেন সে বড় ঘরের খানাপিনার ঘর দেখেছে। খানাপিনা দেখেছে।

'এ মিশিরজি ছাদে ঝাড় পড়ছে না কত দিন। দাদাজি বসেন না? আমি স্কিপিং খেলব, গোল্লা নিয়ে খেলব, ছুটব, আমার গুড়িয়াদের হাওয়া খিলাব। নিজে সাফা করতে না পারো লোক দিয়ে করিয়ে নাও।' তো ছাদ সাফা হয়ে যায়। হৃদয়নারায়ণ হুকুম দিয়ে করিয়ে নেন সব।

মিশির বুঢ়া হয়েছে তো। তার হাতের কাম-কাজ তেমন ভাল না। সে একবার

বিস্তরা লাগিয়ে যাবার পর মুমবাত্তি মুন্নি ফির ঝাড়ে, চাদর টান টান করে দেয়। জগদীশের কামরা সে ঝেড়েঝুড়ে এমন সাফা রাখে, যে সন্ধেবেলা—আপিস থেকে ফিরে ঘরে গিয়ে জগদীশজির মেজাজ খুশ হয়ে যায়। বহোৎ খুশ। কামরায় এত সুন্দর গন্ধ তিনি অনেকদিন পাননি।

কিন্তু সবচেয়ে মনোযোগ আর যত্ন তার যে ঘরের প্রতি, সেটি হল বহুজির ঘর। বড় বড় জানলা সে হাট করে খুলে দেয়। খুব ধূপ আসে, আলো আসে, হাওয়া আসে, সব আসবাব ঝেড়ে ঝেড়ে রগড়ে রগড়ে পুঁছে সে তাতে নতুনের জৌলুস নিয়ে আসে, দেখলে মনে হবে কী এই সবে কেউ পালিশ চড়িয়ে গেল। বিস্তরার ঢাকা সে হররোজ পাল্টে পাল্টে দেয়। বহুজির ড্রেসিং টেবলের সামনের ঘোরানো টুলে সেই যে নেহা আর কুসুম ছাবরিয়া বসে একদিন ধমকি খেয়েছিল, তারপর থেকে সেই টুলে আর কেউ বসেনি, সেই আয়নায় আর কেউ মুখ দেখেনি। আয়না ঝাপসা হয়ে গেছে। ড্রয়ার সব বে-গোছ। মুম পরিষ্কার করে সাবান জল দিয়ে। কিছুতেই ঝাপসাভাব যায় না। তখন সে মিশিরকে ডেকে আনে। কাঁদো কাঁদো গলায় বলে—'এ চাচা দেখো না, এ আয়না আমাকে পসন্দ্ করছে না কেন? বহুজি আমার উপর গুস্সা কেন করছেন।'

মিশির অবাক হয়ে যায়।—'তোর ওপর বহুজি গুসসা করবেন?' হঠাৎ মিশিরের মনে পড়ে যায়—তাই তো বহুজির স্বর তো অনেক দিন শোনা যায়নি। অন্তত সে শোনেনি। বড়া মালিক, ছোটা মালিকও শুনছেন বলে বোঝা যায় না, টের পেত তা হলে মিশির। সে বলে—'তোর ওপর গুসসা করবেন কেন বহুজি? তোকে কি দেখেছেন? তা ছাড়া', সে ঢোঁক গেলে, 'শ্যামলাল নোকর বুরা আদমি ছিল, তো তার ওপর গুসসা করে থাকতে পারেন বহুজি। মিশির হয়তো কামচোরি করে কখনও কখনও, তার ওপর বহুজি গুসসা করতে পারেন, কিন্তু তুই পাতলি সি এক লড়কি। তোর ইচ্ছে যাচ্ছে তুই ঝাড়ছিস, খাটছিস তোর তো কোনও দায় নেই রে মুন্নি।'

—'তো আরশি সাফা হচ্ছে না কেন?'

—'ওঃ এই কথা?' খবরের কাগজের টুকরা দিয়ে আয়না সাফা করার তরিকা মিশির দেখিয়ে দেয়। সাফা টাফা করে নিজের প্রতিবিম্ব বহুজির আয়নার বুকে দেখে আনন্দে মোরের মতো নাচতে থাকে মুম। ঘাঘরার প্রান্ত দুদিক থেকে একটু একটু তুলে ধরে, যেন মোরের পেখম। তার সোনালি চুলের ঝুঁটি উড়তে থাকে। মল বাজিয়ে সে নাচে, ছম ছম। ছম ছমা ছ্ ছম। ছুম ছুম ছুম ছুমাছুম।

হৃদয়নারায়ণ অনেকক্ষণ মুমকে দেখতে পাননি। তিনি ঠুকঠুক করে ঘরে ঘরে ঘুরছেন। বহুর ঘরে মুম আসনপিঁড়ি হয়ে বসে আছে। তার নজর বহুর ফটোর দিকে। এ অনেকদিন আগের ফটো। পাতলা নাকে বহুর হিরা চমকাচ্ছে। পাতলা ঠোঁটে লাল টুকটুকে লিপস্টিকে রাঙানো। সোনালি-বাদামি-মাটি মিশ্র রঙের কেশে মোটা বেণী সামনে ঘুরিয়ে রাখা, মাথার ওড়না খুলে দিয়েছে ফটোগ্রাফার। চোখের কাজল, চোখের পাতার ছায়া সব দেখা যাচ্ছে। নরম, খুব নরম গাল তখন। নজরও খুবই কোমল।

তো মুম তদ্গত তন্ময় হয়ে দেখছে। হৃদয়নারায়ণ যে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন

সে খেয়ালই করছে না। মৃদুস্বরে বলছে—'মা মায়ি মায়ি।'

—'সে থাকলে কত যত্ন করতো তোকে।'

মুমকে বহুর কহানি শুনাতে বসে যান হৃদয়নারায়ণ।

'ও তো তোর আজমিঢ়েরই লড়কি রে। তোর মতো এমন বাহাদুর তো ছিল না সে। বহোৎ ডর খেয়ে যেত।'

—'কেন দাদাজি?'

—'আরে গাঁওয়ার লড়কি, ঘাবড়াতো শহর বাজারের ঝমাঝম দেখে। ঘুংঘট নড়তে চাইতো না। নড়াতে দিতও না তার শাস। আর যেই আমি বলব জগদীশ কি মায়ি আজ বহু নিয়ে আপনি একটু গঙ্গাজির হাওয়া খেয়ে আসুন, অমনি ছোট্টি বহু তার ঘুংঘট ফাঁক করে ফিক করে হাসবে।'

—'কেন হাসবে, দাদাজি?'

—'কেন আবার। খুশ্, ঘুমতে যাবার নামে দিল খুশ হয়ে গেছে তাই।'

—'ওই বহুটা আপনাকে প্যার করতো দাদাজি?'

—'বহোত। যে দিন ওদের সাথ্ আমিও ঘুমতে যেতাম, ও আরও বেশি হাসতো।'

—'আর ছোটা মালিক?'

—'ছোটা মালিকের সাথ ঘুমতে যেতে ওর খুব শরম আসতো। যেতে চাইতো না।'

—'কেন?'

—'আরে তোর ছোটা মালিক তো দুলহা ওর। পতি তো। তো তার কাছে খুব শরম দেখাতে হয়।'

—'ও' —মুম মুন্নি খুব বুঝল।

—'কিন্তু জগদীশের সঙ্গে ও হরদোয়ার মুসৌরি নাইনিতাল ঘুমে এল।'

—'এ সব কোন গাঁও দাদাজি?'

—'গাঁও কী রে পাগলি, এ সব ভারী শহর, হরদোয়ার তো তীরথ্। কুম্ভমেলা হয়।'

—'তীরথ মে নমকিন, পেঁড়া, খুব মিলে? না দাদাজি? সাধুলোগ এসে যায়।'

—'তুই কী করে জানলি?'

—'আমি জানি। দরগা খাজা সাহেব আছে আজমিঢ়ে, সব ভকত, আসে, সর পে টোপি। সব মিট্টি মে বসে যায়, পরনাম করে আমি দেখেছি। তো বহুটা তীরথ্ গেল। তারপর?'

—'কত তীরথ্ গেল—কাশী, পুরী, জগন্নাথজির মন্দির, বিন্ধ্যাচল, জলন্ধর, স—ব গেল।'

—'বুড়টি হয়ে গিয়েছিল বহুটা না কি?'

—'নাঃ, বুড়টি হবার আগেই তো চলে গেল রে।'

—'তো দাদাজি যেতে দিলেন কেন, এত যদি দুখ হল আপনার।' অবোধ বালিকা ভেবেছে চলে যাওয়া মানে তীর্থে বেড়াতে যাওয়া। ব্যাখ্যা করেন না হৃদয়নারায়ণ।

কথা ঘুরিয়ে নেন।

—'আরে শুধু তীরথ্ কেন হবে? কত ভাল ভাল পাহাড় আছে, দার্জিলিং পাহাড়, মুসৌরি পাহাড়, কত ঠাণ্ডা সেখানে, হাত বাড়িয়ে মেঘ ধরা যায়, কিৎনা সুন্দর পেড়, লেক...।'

—'লেক কী দাদাজি?'

—'তলাব? দেখিসনি?'

—'হাঁ হাঁ জরুর, আনা সাগর...'

—তো জগদীশজি বহুজিকে আজমিঢ় নিয়ে গেলেন না কেন? যোধপুর নিয়ে গেলেন না কেন?'

—'আজমিঢ় তো ওর বাপঘর। বাপরে, সেখানে গেলে বহু কি আর ফিরত?'—কেন এ কথা বললেন হৃদয়নারায়ণ জানেন না। তাঁরা বহুর খুব দুঃখ শোকের সময়েও তাকে বাপঘর পাঠাননি, সেটা ঠিক। কিন্তু তার পেছনে বধূকে হারাবার দুশ্চিন্তা ছিল কি না আজ এত দিন পরে তিনি আর মনে করতে পারছেন না। তবে ছেলেমানুষ মিছে কান্নাকাটি যদি করে, যদি জেদ করে... কী করতে কী করবে, কী বলতে কী বলবে...জগদীশ কি মায়ির একেবারেই ইচ্ছা ছিল না বহু বাপঘর যায়। অনেক দিন পর, ওর ভাইয়ের শাদি হল তখন পাঠিয়েছিলেন বহুকে, জেবর শাড়ি সব সওগাত দিয়ে। বাস, সারা জিন্দগিতে বহুর ওই একবারই বাপঘর যাওয়া। তারপর বহুর মা মরে গেলে তো ভাইয়েদের আর অত মনেই রইল না। বহু পুরাপুরি তাদেরই হয়ে গেল।

—'বহুজি লিখি পড়ি ছিলেন দাদাজি?'

—'নাঃ। লিখি পড়ি নয়, তো তোর মতো মূরখও নয় কিন্তু। বাংলা বুলি শিখেছিল কত। আংরেজি বুলি, সিল্লাতো সব কী সুন্দর। ওই দ্যাখ ওই তসবির ঝানসী কি রানিজির ও তো বহুই সিলিয়ে সিলিয়ে করেছে।'

—'ঝানসী কি রানি আপনাদের রিস্তেদার না কি?'

—'আরে নেই, নেই, উও তো বহোৎ বাহাদুর জনানা থি: আংরেজের সাথে লড়াই করলেন, জান দিয়ে দিলেন।'

—'বহুজি কার সাথ লড়াই করে জান দিলেন দাদাজি!'

—'আপনা দিল রে মুন্নি। দিল কা দুখ।' বাস, আর বলেন না হৃদয়নারায়ণজি।

—'আপনি কারও সঙ্গে লড়াই করবেন না দাদাজি?'

—'দিল। দিলসে লড়াই সবাইকেই করতে হয় রে মুন্নি।'

—'সবাইকেই জান দিতে হয়?'

—'জান তো লড়াই করলেও দিতে হবে, না করলেও দিতে হবে...' চিন্তিত হয়ে কী যেন ভাবেন হৃদয়নারায়ণ। এত ফিলসফি মুন্নি বুঝতে পারে না, চোখ বড় বড় করে চেয়ে থাকে। চেয়ে থাকতে থাকতে তার চোখ অন্যমনস্ক হয়ে যায়। কী যেন সে ভাবছে, বুঝবার চেষ্টা করছে। হয়তো দিল এবং লড়াইয়ের কথাই, কিংবা হয়তো বহুজি, তাঁর দুখ হৃদয়নারায়ণের দুখ ...এই সব। হৃদয়নারায়ণ তাড়া দিয়ে ওঠেন—

'উঠ্, উঠ্, উঠে পড়, ছোট লড়কি, বৈঠকে বৈঠকে কী সোচছে দেখো, উঠে যা, লুডো আন, সাঁপ লুডো খেলব তুই আর আমি।'

বাস মহা উৎসাহে লুডো আনতে ছোটে মুন্ন। এক পিঠে এমনি লুডো, আর এক পিঠে সাপ লুডো। নিজে লাল নেয়, নিয়ে কুচ কুচ করে দাদাজির ঘুঁটি কাটে সে। খলখল করে হাসে। তার ঘুঁটি কাটতে গেলে ভারী চেল্লায়, লুডোর ছক উল্টে বলে, 'ফির খেলুন দাদাজি, আগেরটা খারিজ।'

অনেক সময়ে ছবির বই দেখাতে হয় মুন্নিটাকে। ভালভাল বয়-গার্ল-এর ছবিঅলা আংরেজি বই নিয়ে আসেন হৃদয়নারায়ণ, কমিক্স্ নিয়ে আসেন। সব কহানি ছবি দেখিয়ে দেখিয়ে বলেন। চুহা আর সিংহের কহানি, শের আর রামভনের কহানি, সোনার আন্ডা দেয় সেই হাঁসের কহানি, কত, কত? এত কহানি হৃদয়নারায়ণ নিজেও জানতেন না, এখন জানলেন।

জগদীশ বলেন—বাপুজি, 'ইকনমিক টাইমস' খানা পড়ে রাখতে বললাম আপনাকে। পড়েননি?'

হাঁ করে চেয়ে থাকেন হৃদয়নারায়ণ, তাঁর কোলে 'অজীব দেশ মে অ্যালিস।' কহানির কিতাব। জীবনে এই প্রথম হৃদয়নারায়ণ জানছেন একটা লড়কি দাওয়া খেয়ে বড় হয়ে যায় এই উঁচা কামরার মতন, আবার ছোটা হয়ে যায়, আবার বড় হয় আবার ছোটা হয়। তাস কি বিবি জিন্দা হয়ে রাজত্ব করছে এমন কল্পনার সঙ্গেও তিনি এই প্রথম পরিচিত হলেন।

এক তাড়া পত্রিকা দিয়ে যান জগদীশ। আড়চোখে কহানির কিতাবটা দেখেন। বুঢ়াপায় তাঁর বাপুজির দিমাগ বাচ্চালোগের মতো হয়ে যাচ্ছে।

মুন্ন কিন্তু লুডো খেলছে। তাস পিটছে; ঘুরে ঘুরে চলে যাচ্ছে। কহানি শুনছে, ছবি দেখছে। দাদাজি দাদাজি করে কত সওয়াল পুছছে। আবার হঠাৎ তাকে আর দেখা যাচ্ছে না, ও কি ছাদে আছে, না মন্দিরে? উঁহু, নেই তো? তবে কি ও চৌকায় গেল? ছোট্ট লড়কি, কৌতূহল হতে পারে ঘরকন্নার।আবার কিছুতে লোভ-লালচ হতে পারে, নাঃ। চৌকাতেও নেই। মুন্ন আসন পিঁড়ি হয়ে বসে আছে বহুজির ফটোর সামনে।

—'কোথায় রে তুই? মুন্ন?'

চমকে পেছন ফিরে তাকায় মুন্ন।

—'ওঃ দাদাজি।'

সে ঝেড়ে ঝুড়ে উঠে পড়ে। চোখে দুষ্টুমি খেলে যায়।

সব খায় মুন্ন। দেশোয়ালি বাজারি রুটি দাও, খাবে, দহি খাবে চেটেপুটে, দক্ষিণী খানা তাকে দাও—উত্তপম, উপমা, কাঞ্জি-বড়া, চা, কফি, চিনির ডেলা দানাদার, সব খাবে, খালি দুধ ছোঁবে না। অথচ তাকে দুধ পিলাতে খুবই আগ্রহী হৃদয়নারায়ণ।

—'দুধ পি লে, নইলে তাকত হবে কী করে?'

তাকত তার দরকার নেই। সে মুখ টিপে হাসে। দাল খেয়েই সে এমন তাকত করবে যে দাদাজি অবাক হয়ে যাবেন।

—'তবে জোশ। দুধ না পিলে তো চেহরায় জোশ আসবে না রে মুন্নি'।

জোশেও তার দরকার নেই। দাল খেয়েই সে এমন জোশ করবে যে দাদাজির তাক লেগে যাবে।

— 'কেন রে? দুধে কি গন্ধ লাগে? পেট গড়বড় হয়? কী?'

—'ও সব কিছু না। দম যেন বন্ধ হয়ে আসে আমার, দুধ বহোৎ খতরনাক চিজ!'

খতরনাক? দুধ খতরনাক? রামজি কত বুদ্ধি করে, দয়া করে, গাই-ভঁইসের বাঁটে দুধ ভরে দিলেন, তার বৎস পাবে আবার মানুষ, মানুষও উদ্বৃত্ত পাবে অনেক অনেক, মানুষের শিশু মাতৃদুগ্ধ ছেড়ে গাইয়ের দুধ পান করবে, রোজ রোজ বেড়ে উঠবে, রোজ রোজ গোরা গোরা হয়ে উঠবে। সেই গোরাপন, সেই তাকত, সেই বাঢ়ত তো সবই দুধের মারফতে রামজিরই দান। হৃদয়নারায়ণ, তাঁর পিতা, তাঁর পিতা, হৃদয়নারায়ণের আওলাদ, তাঁর পোতা .. সব দুধ থেকেই নিত্য সংগ্রহ করে চলেছে জীবনী শক্তি, সংগ্রাম করার সামর্থ্য। সেই দুধ এই লড়কির কাছে খতরনাক?

হৃদয়নারায়ণের ভুরু কুঁচকে যায়। রামজির খেলা বোঝবার আপ্রাণ চেষ্টা করেন তিনি।

মিশিরের সঙ্গে রসুইঘরে বসে প্রথম প্রথম খেত মুন্ন। তারপর একদিন ঝকঝকে জয়পুরি ট্রেতে করে নাস্তা নিয়ে এল মালিকদের। দুধ, হালোয়া, জিলাবি, দুধের মধ্যে খেজুর, খুবানি, ছুয়ারা, সব মিশিয়ে তাকে আরও বেশি করে স্বাস্থ্য পানীয় করে তোলা হয়েছে।

—'এ দুধ তোর আচ্ছা লাগবে রে মুন্ন'— হৃদয়নারায়ণ বলেন— 'মুমবাইকো দুধ লাও রে মিশির।'

চোখদুটো এত বড় বড় করে ছোকরি যেন সেগুলো ভয়ে ঠেলে বেরিয়ে আসছে।

—'দুধ পিলাও মৎ দাদাজি' সে বিস্ফারিত চোখে রুদ্ধকণ্ঠে বলে।

—'আরে তোর মায়ি দুধ পিলায় নি, এতো বড়টা হলি কী করে?'

—'দুধ পিলাও মত মায়ি'—সে কোন অলক্ষ্য জননীর উদ্দেশে তার আর্তি জানায়। মুখ ভয়ে শাদা হয়ে গেছে তার।

—'নেই, নেই, দুধ পিলাব না, দুধ পিলাচ্ছি না, ডরো মৎ বেটা।'

হৃদয়নারায়ণ তাড়াতাড়ি বলেন। তাঁকে যেন কে এক থাবড়া দিয়েছে। ওদিকে গোঁ গোঁ আওয়াজ করে মুন্ন। ছটফট করে মাটিতে পড়ে। দুধের নাম শুনলেই তার ডর লেগে যায়।

তাকে চাপড়াতে থাকেন হৃদয়নারায়ণ। কোলে তুলে নিয়ে গায়ে হাত বুলাতে থাকেন।

জগদীশ ভ্রূকুটি করে বলেন, 'কী দরকার আপনার, পরের ঘরের লড়কি তাকে জোর জবরদস্তি করবার?'

নিজেকে সামলে নিয়ে হৃদয়নারায়ণ আপসের গলায় বলেন—'মিশির, মুমবাইয়ের হালোয়া, কচৌরি সব এখানে নিয়ে আয়।' হালোয়া, জিলাবি, কচৌরি আনে মিশির।

হৃদয়নারায়ণ নিজে হাতে খাইয়ে দেন। আর আপত্তি করে না মুন্ন। কোথায় উবে গেছে তার অসুখ। সে দাদাজির হাত থেকে চাটপুট সব খেয়ে নেয়। সেই থেকে দুপুর, রাতের খানার সময়েও সে মালিকদের সঙ্গে বসে যায়, কখনও হৃদয়নারায়ণের ঘরে, কখনও খাবার টেবিলে। আচার খায় টকাটক। ফুচকা-চাটের জন্য আবদার করে।

হৃদয়নারায়ণের চোখের সামনে সে ঘাঘরা দুলিয়ে, বিনুনি নাচিয়ে, পাঁয়জোরে ছুমছুম আওয়াজ তুলে ঘুরে বেড়ায়, বিলকুল ঘর কা মুন্নি। হাতে তার কিছু না হোক একটা কাঁকড়ি, কি একটা মুলো, একটু বিটনুন। জিভের টকাটক শব্দ, বিলিতি আমড়া দাদাজি একটু চেখেই দেখুন না, দেখুন না আলুমটর কি চাট কেমন বানিয়েছে এরা। রাস্তা দিয়ে যত ফেরিঅলা যাবে সে তিনতলার জানলা দিয়ে ডাকবে। তারাও সব জেনে গেছে—এ কোঠিতে এক লাডলি লড়কি আছে, তারাও এক পা, দু'পা যাবে আর জানলার দিকে মুখ তুলে তুলে তাকাবে।

—'এ চুড়িআলা —ইধর আও'

—'এ আইশকিরিম —ঠহর যাও'

—'কা রে বেলুনিয়া? চ্যাঁক চ্যাঁক চ্যাঁ চ্যাঁ। খাড়া হো যাও ভাই। মুমবাই আসছে। এসে যাচ্ছে।'

এক ছুটে সে ঘর পার হয়ে যায়, লাফ দিয়ে পেরিয়ে যায় চৌকাঠ। সিঁড়ি ভাঙ্গার আওয়াজ শোনা যায়—ছুন ছুন ছুন ছুন। যতগুলো ধাপ ততগুলো আওয়াজ। শেষকালে এত তাড়াতাড়ি পার হয়ে যায় যে আওয়াজ ওঠে—ছুন ছুনা ছুন ছুন ছুনা ছুন ছুন.....।

লম্বা পাকানো মার্বল ছাপ দেওয়া বেলুন, কি একগোছা সোনালি চুড়ি, কি হজমি গুলি, কি ইয়ো-ইয়ো নিয়ে সে লাফাতে লাফাতে উঠে আসে। অবলীলায় একতলা, দোতলা, তিনতলা, চারতলা করে। প্রথম প্রথম পৈসা চায় হৃদয়নারায়ণের কাছে, তারপর হৃদয়নারায়ণ আর পারেন না, ড্রয়ার দেখিয়ে দেন টেবিলের। ড্রয়ার খুলে সে রেজগি গুনে নিয়ে লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে যায়। আরাম চেয়ারে শুয়ে শুয়ে অশীতিপর বৃদ্ধ প্রশ্রয়ের হাসি হাসেন।

—'ও দাদাজি, দাদাজি আপনার শাদি হয়নি?'

—'জরুর। কবেই হয়ে গেছে। কেন তোর আমাকে পসন্দ হচ্ছে, না কি?'

—'আমি তো সেপাই শাদি করব। লড়াইয়ে যাবে, মেট্‌ল কামাবে, উর্দির উপর মেট্‌ল ঝকমক করবে, আপনার মতো বুঢ়াকে শাদি করতে আমার বয়েই গেছে। তো আপনার বিবিজি কই দাদাজি?'

—'আরে আমার বিবি কি আর তোর মতো ছোকরি হবে রে মুন্ন? ও তো বুঢ়ি হয়ে গেল, তার পর মরে গেল।'

—'কেমন করে মরে গেল দাদাজি?'

—'আরে ও তো বহোৎ মোটি ছিল। পানি পিচ্ছিল লোটাভর, পানি পিতে পিতে

ওর স্ট্রোক হয়ে গেল, মতলব, মাথার ভেতর কলকব্জা সব গড়বড় হয়ে গেল তো ও পানি মুহ্মে নিয়ে আর দড়াম সে পড়ে গেল। হাত পা সব অসাড় হয়ে গেল রে।'

সমবেদনা জানায় মুম।

—'তো আপনার বেটা-বেটি নেই?'

—'ওই তো জগদীশ আমাকে বাপু বলে দেখিস না : ও-ই তো আমার এক লওতা বেটা।'

—'আমি সোচছিলাম কি জগদীশজি বহুজির দুলহা আছেন।'

—'ও ভি সচ। এ ভি সচ। তোর বহুজি তো আমারই বেটার বহু। বহুবেটি বলতাম।'

—'আর বেটি?'

—'চার বেটি রে আমার। লায়লি, গুড্ডি, লাডলি, পিংকি।'

—'তো তাঁরা কোথায়?'

—'লাডলি আছে ওড়িশায়, ভুবনেশ্বরে।'

—'আসেন না?'

—'এই তো এসেছিল। বহুবেটির মওতের আগেটায়। আর আসবে কী করে? কত বড় সংসার সামহালতে হয়। বেটা-বেটি বেটার বহু, পতি, দেবর, শাস, শ্বশুর....'

—'আরে পিংকিজি?'

—'ও তো আরও দূর। মুম্বই। কত দিন দেখি না। ও-ও সে টাইমে এসেছিল। আর, বেটা-বেটিকে মডার্ন করবার তালে উঠে-পড়ে লেগেছে, বুঢ়া বাপকে বোধহয় মনেও পড়ে না।'

—'আর লায়লিজি?'

মুখময় বিষাদ ছড়িয়ে যায় হৃদয়নারায়ণের।

—'লায়লিজি। আপনার বড়ি বেটি?'

—'ও তো শাদির পরে মরে গেল।'

—'কেন দাদাজি? ও ভি বুঢ়ি হয়ে গিয়েছিল?'

এমনই নির্বোধ বালিকা, মৃত্যুর যে সবসময় সময়জ্ঞান থাকে না, সে খবরও রাখে না।

—'বুঢ়ি কেন হবে? ও তো সতর আঠার সালের তাজা লড়কি ছিল রে।'

—'তো মরে গেল কেন?'

গালে হাত দিয়ে, বেশ গুছিয়ে বসে জিজ্ঞেস করছে মুম, যেন কহানি শুনতে বসেছে।

—'মনে খুব দুখ হল বেটির, সসুরালে বড্ড কষ্ট দিত, সইতে পারল না, খুদখুশি করে নিল।'

চোখ বড় বড় করে চুপ থাকে মুম। বেশ কিছুক্ষণ পর ছোট্ট গলায় বলে,

—'আর গুড্ডিজি?'

—'ও ভি মরে গেল রে।'

হৃদয়নারায়ণের গলা ভিজে গেছে। তবে তাঁর মুখ ক্রমশ থমথমে হয়ে ওঠে। মুম জিজ্ঞাসা করে 'ও ভি খুদখুশি?'

—'নেই নেই।'—হৃদয়নারায়ণ দৃঢ় কর্কশ গলায় বলেন, 'কভি নেই।'

—'ওরা বলতে চেয়েছিল, প্রমাণ করতে চেয়েছিল, ওটা খুদখুশি, কিন্তু ওরা ওকে মেরে ফেলল। ছাদ সে ঠেলে ফেলে দিল। পেপারে বার হয়েছিল। কত কেস হল, ভকিলজি কত লড়ে গেলেন রে, সাজা দিতে পারলাম না। বেরিয়ে গেল, সবুত ছিল না যথেষ্ট। ওরা প্রমাণ করে দিল লড়কির আমার দিমাগ ঠিক ছিল না। আর ওই লুচ্চা দামাদটা ফির শাদি করল, ফির শাদি করল, অত দহেজ নিল....।

হৃদয়নারায়ণ এখন আর একটি ছোট্ট মেয়েকে বলছেন না। নিজেকে বলছেন।

—'একটা খুদ মরল, আর একটাকে মারল, তাড়াতাড়ি শাদি লাগিয়েছিলাম দুটোর। এ হাভেলি মর্গেজ, কারোবার মর্গেজ রেখে। বড়া খানদানি, একটা দামাদ অফ্সর, আর একটা কারবারি। দেখলে কেউ বলবে না বুরা আদমি আছে।'

মাথায় নরম আঙুলের চলাফেরা টের পান তিনি। মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে মুম।

—'কা রে? সফেদ বাল তুলে দিলি নাকি?'

—'সফেদ বাল তুললে আপনার মাথায় আর কী থাকবে দাদাজি? আমি শুধু আরাম করে দিচ্ছি।'

আরাম করে দিতে থাকে মুম। হৃদয়নারায়ণজি আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়েন। মৃদু একটা সবুজ বাতি জ্বালে ঘুমের ভেতর। উনি দেখেন ঝরনার জল আছড়ে পড়ছে। চারদিকে বড়া বড়া পেড়। দেওদার, অর্জুন, য়ুক্যালিপটাস। বাগিচা রয়েছে, ফুল খিলছে। সুনহেরি হাভেলি সব চারদিকে। দেওয়ালির দীপ জ্বলে উঠছে টপটপ। মাটির দীপ সব। আলো খুব মিঠা হয়। তিনি কড়া নাড়তেই দরজা খুলে লায়লি বেরিয়ে এল। বেনারসের আসলি জরিকাজের সেই যে শাড়ি দিয়েছিলেন তিনি, সেটাই পরেছে সামনে আঁচল করে, মাথায় টিকলি, নাকের হিরের ওপর দীপের আলো পড়েছে। রং ঠিকরোচ্ছে। লছমিজির মূরত আরতি করছে লায়লি। কত সুন্দর করে সাজিয়েছে। রকম রকম মিঠাই তৈয়ার করছে।

—'এ কী রে লালী, তবে যে ওরা বলছিল তুই মরে গিয়েছিস? বেশ সুখে আর আনন্দে রয়েছিস তো রে?'

গুড্ডিটা এই সময়ে বেরিয়ে আসে ভেতর থেকে। নীল সিলকের শাড়ি পরেছে। মিঠি মিঠি হাসছে।

—'আমরা তো ভাল আছি বাপু। সেই যে দুলতে দুলতে দুলতে দুলতে আঁখ বেরিয়ে এল ওর, আর সাততলার ওপর থেকে পড়ে হাড্ডিচুর হয়ে গেল আমার...তারপর থেকে আমরা বেশ ভালই আছি। আপনিও আসুন না আমাদের সঙ্গে।'

বলতে বলতে দুই বোনেই হঠাৎ দুলতে আরম্ভ করে। পেণ্ডুলামের মতো ডাইনে বাঁয়ে, ডাইনে বাঁয়ে। শাড়ি নেই। সুদ্ধু শায়া-ব্লাউজ পরা দুটো ধড়। মুণ্ডু দেখতে পাচ্ছেন না হৃদয়নারায়ণ। দীপাবলির দীপ সব কোথায় গেল? মিঠাইয়ের থালি,

মূরত, গুঁড়ো গুঁড়ো কী সব তাঁর চারপাশে জমতে থাকে। বুঝতে পারেন এগুলো চূর্ণ হাড়। তাঁর মঝলি বেটি গুড়িয়ার যে নাকি সাততলার ছাদ থেকে পড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

১১

—'তোর মায়ির নাম কী রে?'

—'মায়ি মরে গেল।' ঠোঁট ফুলিয়ে জবাব দেয় মুম। মরে গেলেও তো মায়ের একটা নাম থাকে! না সেটাও মরে যায়। কিন্তু এ প্রশ্ন হৃদয়নারায়ণের মনে উঠতে না উঠতেই মিলিয়ে যায়। কেঁও কি মুমের ঠোঁট ফুলছে।

অজিব লড়কি। এই দেখো হাসছে, খেলছে, টকাটক এ-চাট ও-চাট খাচ্ছে, আবার এই দেখবে, ঠোঁট ফুলে ডবল হয়ে গেছে, চোখ ভারী, টসটস করছে।

—'কী হয়েছিল তোর মায়ের?'

—'কে জানে! ছোট লড়কি আমি কি অত জানি? খালি জানি, মা আমার খুব মিঠি ছিল, তার কাঙ্কনের ঠিনি-ঠিনি আওয়াজ আমি এখনও শুনতে পাই। তার বাল, বালের আন্ধেরা, বালের বাস স-ব আমার দিল-এ জমা আছে।'

—'তা বেশ তো, বল দেখি তোর মা কেমন ছিল? লম্বি ঔর ছোটি? নাটি?

—'লড়কি তো সব সময়ে ছোটি, তার মা তো সব সময়ে তাকে খাড়াইয়ে ছাড়িয়ে থাকবে!'

—'তা বেশ, বল তো ও কি গোরি সি ছিল? না কালি?'

—'মা আবার গোরা-কালা এ সব হয় না কি? মায়ের রং আলোর মতন। অন্ধেরা রাতকো চাঁদনিসে যো রং ফুটতা হ্যায় উও।'

বাস বোঝো এবার, শুধু অন্ধেরা রাত বললে বোঝা যেত ওর মা শ্যামাঙ্গী ছিল। শুধু যদি চাঁদনি বলত তো বোঝা যেত মায়ের রং গোরা-গোরাই ছিল বটে। তবে খুব টকটকে ফর্সা নয়। কিন্তু আন্ধেরা রাত, চাঁদনি আবার চাঁদনি থেকে ছুটে-যাওয়া রং, হৃদয়নারায়ণের সবই গুলিয়ে যায়। তিনি সোজা সরল হিসাব বোঝেন বাঁকা তো বাঁকা, কালা তো কালা, গোরা তো গোরা। কিন্তু এ কী রকম গোরাপন যা কালার ভেতর থেকে বেরোয়! এ কী রকম কালাপন যা গোরা দিয়ে ধোয়া থাকে?—হাল ছেড়ে দেন তিনি।

—'সমঝে মে এল আপনার? ও দাদাজি?'

—'নাঃ'—হতাশ হয়ে ঘাড় নাড়েন হৃদয়নারায়ণ।

—'মা হল মা যৈসি, এটুকু আপনি বুঝতে পারেন না দাদাজি? আপনার মা ছিল দাদাজি?'

—'বাঃ, মা থাকবে না? মা নইলে এলাম কী করে এ দুনিয়ায়?'

মুমের বোকামিতে খুব হাসেন হৃদয়নারায়ণ।

—'বলুন তো আপনার মা কেমন?'

—'সফেদ্ কাপড়া সামনে পাল্লু দিয়ে পরা, গোরিসি, মুহ্মে বহোৎ ভাঁজ, রেগিস্তানে বালুর ওপর যেমন পড়ে উঁচা নীচা, উচাঁ নীচা।

মুম হেসে ওঠে।

—'ওতো এক দাদিমা, এক নানিমা, ও তো এক শাসুযৈসি। যে মায়ের গোদমে আপনি খেলা করতেন দাদাজি সেই মায়ের কথা বলুন।'

স্মৃতির অতলে কোথায় পড়ে আছে সেই শিশুচোখ, আর শিশু চক্ষু দিয়ে দেখা মায়ের স্মৃতি। হৃদয়নারায়ণ ডুব গালেন, কিন্তু তুলে আনতে পারেন না। এতখানি ঘুংঘট....নাঃ, নথের আগা....নাঃ, পানে লাল ঠোঁট...নাঃ, বাল তো সবসময়ে বাঁধাই থাকত যোধপুরি জনানাদের, নাহা করবে তো হপ্তায় এক দিন। পানি কোথায়? এই বাংলা মুলুকের মতন না কি? তো মায়ের বেণী এলিয়ে আছে....সবগুলি মিলিয়ে এক মাতৃমূর্তি মানুষী মূর্তি খাড়া করতে কিছুতেই পারেন না তিনি।

মুম বলে, 'কী হল দাদাজি? আপনার মায়ের কথা বললেন না তো। সেই মা যার গোদ মে হাত পা ছুড়ে খেলতেন? বলুন? বলুন?'

হৃদয়নারায়ণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন। ঠোঁট ঝুলে পড়ে, জিভ বেরিয়ে পড়ে, তিনি বোকার মতো উচ্চারণ করেন...'অন্ধেরা রাতকো চাঁদনি...উসসে রং ছুটতা হ্যায়।'

খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে মুমবাত্তি। হাততালি দেয়। তখন হৃদয়নারায়ণের খেয়াল হয়, তিনিও হাসেন, অত জোরে নয়, কেননা তিনি এখনও স্মৃতির আঁধার পাতাল হাতড়াচ্ছেন। হাতড়ে হাতড়ে ফিরছেন।

—'দাদাজি লস্যি খান। দিল ঠাণ্ডা হোবে।'

—' কে বানাল লস্যি?'

—'আপনার সেই মায়ি! আবার কে? এমন দিল ঠাণ্ডা করা চিজ আর কে বানাবে!' —অবাক হয়ে মুমটার দিকে তাকান হৃদয়নারায়ণ। খুব তো! খুব তো বাতচিত শিখেছে? যে ছোটিসি লড়কিটা এসেছিল সেটাই আছে? না বড় হয়ে যাচ্ছে? কারও থেকে শিখে শিখে কথা বলছে না কি লড়কিটা? কী করে বলবে? স্কুল যায় না, একটু আধটু যা পড়তে পারে সে ধর্তব্যের মধ্যে নয়। তা হলে? তা হলে বলতে হয় একেবারে মনের ভেতরের মন, সেই মনের কথা বলছে ও। কিংবা আকাশ থেকে, বাতাস থেকে, কেউ ওকে দিয়ে বলাচ্ছে।

—'মুম নাম তোর কে দিল রে মুন্নি? মুন্নিই তো ঠিক ছিল? তোর মতো এইটুকু এক ফোঁটা লড়কিকে মুন্নি বলে। আবার দুসরা নাম কেন দিতে গেল? কে দিল?'

—'দাদাজি, আপনি তো রোজ ভগোয়ানকে পূজা করেন। তুলসী চড়ান, ফুল চড়ান, মহাদেও ভগোয়ানের নামে কত স্তব করেন, গার্হস্থ্য গীতা পড়েন, হনমান চল্লিশা পড়েন, রামচরিত পড়েন, তো আপনি এইটুকু জানেন না যে নাম ভগোয়ানে দেন! মুন্নি। মুন্নি তো যে কোনও একটা লড়কি। লড়কি হলেই সব বলবে মুন্নি, মুন্নি। মুন্নিটা কি আমার শুভনাম হতে পারে? সব মুন্নির থেকে এই

মুন্নির ফারাকটা ভগোয়ান সমঝিয়ে দিলেন—কী? না এ মুন্নিটা মুম আছে। মুম যৈসা নাজুক, মুম যৈসা কড়া, মুমের মতো গলে গলে যায় তাপ দিলে, আর হিম লাগলে জমে বরফের মতো হয়ে যায়। গলিয়ে দাও রং নেই, পানির মতন, জমিয়ে দাও, সফেদ, লেকেন ওই সফেদির মধ্যেই রং-ছুট পানি আছে।'

—'বাপরে'। হৃদয়নারায়ণ বলে ওঠেন।

—'তা তোর বাপ কে রে মুম? মুমবাত্তি?'

—'কা জানে। মা-ই জানি না, তো বাপ জানব? কোন বেটা-বেটি তার বাপের খবর জানে দাদাজি?'

এ কী বলছে রে বাবা এই এক ফৌটা লড়কি? বুঝে-সমঝে বলছে?

—'দুধ পিবার সময়ে কি বাপ থাকে? খেলা করবার সময়ে কি বাপ থাকে? বেটা-বেটি তৈয়ার হয়ে গেল, এবার হাঁটতে পারবে তবে বাপ সাথমে নিবে, কথা বলতে পারবে তখন বাপ ইয়ার দোস্তকে দিখাবে দেখো, দেখো, আমার বিটিয়া কেমন কথা করছে। ঠিক কি না! বাপ পাথ্থর যৈসা।'

—'তা হলে তোর বাপ এমনি ছিল, আমার বাপ এমনি ছিল না।'

—'ঝুট, ঝুট বলছেন দাদাজি, আপনার বাপু আপনাকে জনম দিয়েছেন? দুধ পিলিয়েছেন? ছোট্টাসে এত্তা বড়া করে দিয়েছেন?'

বাপের ভূমিকার কথা এ মুন্নিকে বোঝানো হৃদয়নারায়ণের কম্মো না। তিনি বলেন 'ঠিক হ্যায়। মা, বাপ কিচ্ছু জিজ্ঞেস করব না। তোর দাদা নেই? '

—'এই তো আপনি আমার দাদাজি।' এক মনোহর লীলাচাপল্যে মুন্নি তাঁর গলা দুই হাতে জড়িয়ে ধরে।

বাস, হৃদয়নারায়ণ আর সব প্রশ্ন, প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর ভুলে যান। তাঁর ভেতরটা গলতে থাকে যেন মুম মুম নয়। তিনিই আসল মুমবাত্তি। নাতনির স্নেহের উত্তাপে গলে গলে যাচ্ছেন, তাঁর আর কোনও জাতি, কুল, মান, অর্থ, কিছু থাকছে না, তাঁর সব বিশেষত্ব হারিয়ে তিনি একজন স্বাদ গন্ধ রং রূপহীন দরবিগলিত ঠাকুরদা মানুষ হয়ে যাচ্ছেন।

ড্রাইভারকে তিনি বলেন 'সামকো গাড়ি বার করো।

কতদিন কত দিন পর বড়া মালিক বেড়াতে যেতে চাইছেন। ড্রাইভার পাট্টু ড্রাইভ করতে খুব ভালবাসে। ছোটা মালিক আপিসে যাবার সময়ে মোড়ে মোড়ে লাল বাত্তি দেখে থামতে থামতে গোঁত্তা খেতে খেতে, এখানে নো এনট্টি, ওখানে নো এনট্টি, সার্জেন্ট ঘুরছে হাতে মোবাইল, অমন ড্রাইভিং নয়। রবিবার ভোরবেলা কি সন্ধেবেলা, আর্ধেক নো এনট্টি তুলে নেওয়া হয়েছে, প্রায় জনহীন, গাড়ি কম, রাস্তা এলিয়ে পড়ে পড়ে সুখ শয়নে গা ওল্টাচ্ছে, পাল্টাচ্ছে, সেই সময়ে বেড়াতে যেতেন বড়া মালিক, বেড়াতে যেতেন বহুজি, বেড়াতে যেতেন বড়ি মালকিন, সে অনেক দিনের কথা। কতদিন হল এ অ্যামবাসাডর বসে গেছে। চলে কই, পাট্টুর হাত নিশপিশ করে। কানের পাশ দিয়ে শাঁ শাঁ বাতাস কাটা সে শুনতে পায় না কতকাল। বড়া মালিক ঘুমতে যাবেন, এ তো খুব ভাল কথা।

পাট্টু অন্য দিনের চেয়েও যত্ন নিয়ে গাড়ি ধোয়, ভিতরের সব ঢাকা ঢাকনা লত্তি থেকে কাচিয়ে আনে। জানলার কাচ পুঁছে পুঁছে একেবারে ডিসটিল্ড্ ওয়াটারের মতো করে ফেলে। রেড রোড ধরে সে যাবে, বেলভেডিয়ার যাবে, ভিক্টোরিয়ায় থামবে যদি বড়া মালিক চান, নয়তো আপার সার্কুলার হয়ে সে বালিগঞ্জ সার্কুলারে ঢুকে পড়বে। শাঁ শাঁ শাঁ শাঁ।

হৃদয়নারায়ণ ফিনফিনে ধুতি পরেন, পায়ের পেছনের ফর্সা গোছ বেরিয়ে থাকে, তামারঙের হাতের ওপর ফিনফিনে পাঞ্জাবির হাতা। হিরে ঝকঝক করছে আংটিতে, একটা প্রবালও আছে। সঙ্গে একটা রুপো বাঁধানো বাঁকা হাতল ছড়ি-ও নেন তিনি।

বা রে বা। মুম তো আজকে দারুণ সেজেছে। কী সুন্দর শাড়ি পরেছে। হালকা হালকা পিংক পিংক শাড়ি তার মধ্যে গাঢ় আলতা রঙের ছোট্ট ছোট্ট ফুল খিলছে, শাড়ি পরেছে মুমটা। হাত ভর্তি লাল সোনালি চুড়িরা। বাজছে ঠিন ঠিন ঠিন ঠিন। গলায় মালা পরেছে পুঁতির। লাল মালা। চুলের বেণী কেমন চমৎকার পড়ে রয়েছে পিঠে। ঠিক এমনটিই তিনি চেয়েছিলেন। বাইরে যাবে। বেড়াতে যাবে, কলকাত্তাওয়ালি সব দেখুক তাঁদের ঘরের মুন্নি তোমাদের ঘরের মুন্নিদের টেক্কা দিয়ে কেমন এইটুকু বয়সেই শাড়ি পরতে শিখে নিয়েছে।

মুমকে নিয়ে গাড়ির পেছনের সিটে আরাম করে হেলে বসেন দাদাজি। মুমবাত্তি তাঁর হাতটি কোলে নিয়ে কখনও চুম দেয়, কেঁও কি তিনি তাকে কত খুশ দিচ্ছেন, আবার কখনও বুড়া হাত ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চিৎকার করে ওঠে 'ওই যে দাদাজি, ওই যে, এত্তা আলো হয়ে রয়েছে এখানে, এ কি হিরে? যত হিরে সব আটকিয়ে দিয়েছে এরা?'

—'দুর পাগলি। ও সব হিরে কেন হবে? ও তো বিজলি বাত্তি। রাতে ক্রিকেট খেলছে সব। হাজার হাজার মানুষ সব দেখতে এসেছে। রাত কে দিন বানিয়ে ফেলেছে তাই।'

—'দাদাজি ওই যে শেরওলা বাড়ি, চোলির পিঠের মতো ফটক ওটা কী?—'

—'ও তো গভার্নর্স হাউজ রে মুন্নি, আর ওগুলো সব শের নয়, ওই দ্যাখ ওদের বলে স্ফিংকস!'

হাইকোর্ট দেখে মুম, খুব ভাল লেগেছে ওর ক্ষুদিরামের স্ট্যাচু, শরৎ বসুর মূর্তি ওর ভাল লাগেনি।

ওকে চুরমুর খাওয়ান হৃদয়নারায়ণ, চুরমুর খেয়ে ওর তেষ্টা পায়, তখন ওকে কোকাকোলা খাওয়াতে যান তিনি। কিন্তু কোকাকোলা খেতে গিয়ে বিষম লেগে যায় মুমবাত্তির। বিরাট ঢেঁকুর ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে খাঁসি।

—'বাপরে, এ কী খাইয়েছেন আমাকে দাদাজি?' সে চার্জ করে হৃদয়নারায়ণকে, অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে তাকে একটা আইসক্রিম খিলাতে পারেন তিনি।

—'এ কুলফি মালাই, এক রকমের কুলফিরে'.....

অনের বুঝ দিয়ে আইসক্রিমটা কোনওমতে খায় সে, তারপর মত দেয়—এ

কুলফি আচ্ছা না। কেমন সাহেব-মেম গন্ধ লাগছে। কী করবেন হৃদয়নারায়ণ। তিনি বোঝেন মুমের ব্যাপারটা। তাঁর নিজেরও কখনও আইসক্রিমের গন্ধ ভাল লাগেনি। বাচ্চালোগ বহোৎ পসন্দ করে তো তাই তিনি আইসক্রিম খাইয়ে লড়কিটাকে খুশ করে দিতে চেয়েছিলেন।

তা সে যা-ই হোক, গাড়ি চড়ে এই ঘুমতে যাওয়া মুন্নির খুব ভাল লেগে যায়।

—'কোথায় যাব মালিক?' পাট্টু জিজ্ঞেস করে।

—' চলো দকসিনেসোয়ার রামকিষণজির মন্দির।'

—'রাম আবার কিষেণ দুই-ই দাদাজি?'

—'হাঁ, দুইই।'

—তবে তো খুব আচ্ছা ঠাকুর আছেন!'

—'আছেনই তো, বাংলা মুলুকে এইসব বড়া বড়া ঠাকুর আছেন, ঠাকুর রামকিষেণ, ঠাকুর রবিন্দর নাথ, ঠাকুর লোকনাথ.....অনেক অনেক আচ্ছা আচ্ছা ঠাকুর, পরনাম করো মুন্নি।'

ভক্তিভরে পরনাম করে মুন্ন, যদি আসছে জনমে ওর একটা বলবার মতো মা, একটা চিনবার মতো বাবা, একটা সত্যিকারের দাদাজি হয়।

—'পরনাম করে কী চাইলি রে মুন?'

—'কুছু চাইতে হয় বুঝি। চাইলেই পাওয়া যায়? দেন রামকিষেণজি!'

—'দেন বইকী!'

—'তা হলে ছুট্টে একবার চেয়ে আসি।' আবার হুড়মুড়িয়ে উঠে যায় মুন্ন, হৃদয়নারায়ণকে বাইরে দাঁড় করিয়ে।

—'কী চাইলি রে?'

বলে না। মুন্ন হাসে। তারপর গম্ভীর হয়ে যায়।

বলতে হবে না, হৃদয়নারায়ণ জানেন ও কী চায়। ও মা চায়। বহুর ফটোর দিকে তাকিয়ে বসে থাকে কতক্ষণ। আহা বহুটা যদি থাকত! কে জানত ভগোয়ান আজমিঢ় থেকে চিত্তরঞ্জনের হাভেলিতে পাঠিয়ে দেবেন এমন এক দিব্য বালিকা, জানলে হয়তো বহুটা বেঁচে থাকত আর কিছু দিন। অমন করে পানিতে খাবি খেয়ে শেষ হয়ে যেত না। সে-ও এক বেটি পেত। এ-ও এক মা পেত। তারপর একদিন বহুর মত নিয়ে জগদীশের মত নিয়ে মুন্ন লড়কিকেই তিনি ঘরের লড়কি করে নিতেন। নে, এই হাভেলি, নে এই মন্দির, সিন্দুক-ভর্তি রুপেয়া, লকার-ভর্তি জেবর, আলমারি-ভর্তি শাড়ি কাপড় সব নে, নিয়ে যা খুশি কর, ফেলে দে, ছড়িয়ে দে, ছিটিয়ে দে। বেসাহারাদের জন্য সোসাইটি গড়, কি শয়তান দামাদ আর শাসুদের সাজা দেবার জন্য অলগ কোর্ট কর.....যা তোর খুশি তাই কর।

কিন্তু বহুও নেই, এই চরম সুখের স্বপ্নও অসম্পূর্ণ, অসমাপ্ত থেকে যায় হৃদয়নারায়ণের বৃদ্ধ জীবনে।

বারিস এসেছে।

হৃদয়নারায়ণের মনে পড়ে পিতাজি মারা যাবার পর তিনি খুব মুষড়ে আছেন। গদ্দিতে বসতে হচ্ছে। তাঁর সমবয়সী বঙ্গালি বন্ধুরা দেখলেই ঠাট্টা-তামাশা করে।

—'ঢুকে গেছ? শুরু করে দিয়েছ?'

—'টেস্ট কবে?'— তিনি মুখ ম্লান করে জিজ্ঞেস করেন।

—'এই তো দোসরা থেকে শুরু হবে।'

—'পাস করে এখানে এসে যেও, খিলাব।'

ওরা দল বেঁধে পিকনিক করছে, সিগারেট পিচ্ছে, পরীক্ষা দিচ্ছে, পাস করছে, আরও পড়ছে, তখনও ওদের সঙ্গ তিনি ছাড়েননি। পিকচার দেখতে খুব ভালবাসতেন তিনি, ওরা এসে ওঁকে নিয়ে যেত।

—'চল চল, ভাল ওয়েস্টার্ন এসেছে, আগরওয়াল তোর গদ্দি থেকে ঘন্টা চারেকের ছুটি করে নে।'

একদিন পিকচার দেখছেন। হঠাৎ মনে হল—এ কী দেখছেন? এ তো বোকা বানাচ্ছে, বোকা বানিয়ে দিচ্ছে সবাইকে। কাম-কাজ ফেলে দিনের বেলায় সপনা দেখাচ্ছে। কোথায় ভিন দেশের তৃণভূমিতে ভিনদেশি মহিষ পোষ মানাচ্ছে সাহেব মানুষ, ক্লাবে ঝমাঝম নাচা-গানা করছে, বন্দুকবাজি করছে, সে চিজ দেখে তিনি তাঁর কারবার, পিতাজির মওত, মায়ের তাঁর ওপর ভরোসা, বহেনদের শাদি এই সব রিয়্যালিটি ভুলে আছেন? তাঁকে ভুলিয়ে বোকা বানিয়ে দিচ্ছে অনেক চালাক লোকেরা, শুধু তাই নয় তাঁর বোকা বনার সুযোগে তারা বেশ দু পয়সা নাফা করে নিচ্ছে।

বাস। সেই থেকে তিনি পিকচার দেখা ছেড়ে দিলেন। সে দিনটা ছিল শিবরাত্রি। শিউজি তাঁর মতি ফিরিয়ে দিলেন। শিউজিকে তিনি বড্ডই ভক্তি করেন সেই থেকে। তাঁর পূজাঘরে বরাবর হনুমানজির সঙ্গে শিউজিও আছেন।

—কর্পূরগৌরং করুণাবতারং সংসারসারং ভুজগেন্দ্রহারং সদাবসন্তং হৃদয়ারবিন্দং... নমোহস্তু তে।

দীপে কর্পূর জ্বালিয়ে প্রতিদিন আরতি করেন তিনি। তিন চারটা আরতি করেন, গণেশজি, হনুমানজি, দুর্গামায়ি, লছমিমায়ি, কিন্তু শিউজি হচ্ছেন তাঁর আপন দেওতা। শিউজির আরতি করার সময়ে একটা অন্যধরনের ভক্তি হয় তাঁর। শিউজি কণ্ঠে বিষধারণ করেছিলেন, কী শক্তি! সাঁপ গলায় জড়িয়ে রেখেছেন যেন বা উড়নি। সংসারে মানুষকে কত বিষ পান করতে হয়, কণ্ঠে সাঁপ ধারণ করতে হয় তার কি ঠিক আছে?

থালিতে এলাচদানা, কাজু বরফি ভোগ দিয়েছে, হাত জোড় করে আঁখ বুজে বসে আছে। চোখদুটো খুব শক্ত করে বন্ধ করে আছে, পাতাগুলো কাঁপছে তাই। হাসি পায় হৃদয়নারায়ণের। কোথা থেকে আসে এই শিশুরা? লড়কা এক রকমের। লড়কি এক

রকমের। একজন বল খেলবে, ডাকুপন করবে, সিসা ফাটাবে, আর একজন নাচবে, গুড়িয়া নিয়ে খেলবে, মিঠি-মিঠি বাত করবে। দু'জনেই ভরে রেখে দেবে হাভেলি। এই যে তাঁদের তিন বুঢ়ার সংসার, এখানে কাম-কাজ ছিল, চিন্তা ভাবনা ছিল, শৃঙ্খলা ছিল কিন্তু প্রাণও ছিল না, আনন্দও ছিল না। কলের মতো যে যার কাম করে যাচ্ছেন, মিশির কামরা সাফা-খানা পকানা-খিদমত খাটা করছে, জগদীশ গদ্দিতে যাচ্ছে, টিভি দেখছে, ভাঙ খাচ্ছে। তিনি পূজা করছেন, ধর্মগ্রন্থ পাঠ করছেন, খাওয়া-শোওয়া করছেন সময়মতো, বাস। এ লড়কিটা কোথা থেকে এসে জুটল। শিউজিই কি একে পাঠালেন তাঁদের কষ্টের কথা মনে করে? নইলে কোন সুদূর আজমিঢ় থেকে সিরেফ লোকের কথা শুনে শুনে এই চিতরঞ্জন অ্যাভেনিউ, কলকাত্তাতে চলে আসে? এখানে বড় হলে লড়কিটা স্কার্ট-ফ্রক পরত, ছোট করে চুল ছাঁটত, মোজা-জুতা পরত, ইস্কুলে যেত, আজমিঢ় থেকে আসার জন্যে ও এখনও ঘাগরা-চোলি পরে, পায়ে মল, সরপে বিনুনি, সরু সরু হাতে কত কাচের চুড়ি, ঝিলমিল ঝমঝম করে, এই ভাল, এই রকমই ভাল লাগে হৃদয়নারায়ণের। খিলখিল হাসি, দেশি বুলি, আলু চাট পাও-ভাজি খাবার জন্যে বায়না, আর এই পূজা-ঘরে জোরসে আঁখ বুজিয়ে বসে থাকা...। নিজের ঘরের লড়কি হলে তার জন্য কত ভাবনা-চিন্তা ছিল, তার শিক্ষা-সহবৎ তার পোশাক-পরিচ্ছদ, ভবিষ্যৎ, শাদি-উদি। এ বেশ হল, যেমন আছে তেমন থাক, পথের ধারে ফুটে-ওঠা জঙ্গলি ফুলগাছের মতো। কোনও দায় তাঁর ঘাড়ে দিচ্ছে না, কিন্তু হাসছে, মিঠি-মিঠি বোলছে, মাথা টিপে দিচ্ছে, পা দাবাচ্ছে, সারাদিন ধরে কাছে কাছে ঘুরে ঘুরে শুধু ওর ছোট দিল-এর খুশ দিয়েই ভরে দিচ্ছে হৃদয়নারায়ণের শূন্য হৃদয়।

শুধু তিনিই বা কেন? জগদীশ? আহা জগদীশটা কি বদনসিব। পয়সা-আলা ঘরের একলওতা বেটা, তার কত আদর, কত খাতির, তৈয়ার কারবার, কোনও ভাবনা-চিন্তা নেই, সময়মতো সব হয়ে যাচ্ছে, তার জন্য এই রকম শূন্য ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করে ছিল কে বলবে? একটা সন্তান, হতে না হতেই মরে গেল..। হৃদয়নারায়ণ খুবই উদাস হয়ে যান। আর একটাও গোদমে এল না বহুটার? কত ডাক্তার দেখানো হল, ঝাড়ফুঁক, পূজা, বেটা, বেটার বহু দু'জনের জন্যেই তো সব করা হল, কারও কোনও গোলমাল নেই, ডাক্তার বললেন—হতে কোনও বাধা তো নেই। যে কোনও দিন হয়ে যাবে। ঘাবড়াবেন না। এ নিয়ে চিন্তা করবেন না। চিন্তা করলে বরং টেনশন হবে, তাতে নুকসান হয়ে যাবে। তো ঠিক আছে আমরা ঘাবড়াচ্ছি না, টেনশন করছি না, বেটা বহুকে নিয়ে কঁহা কঁহা মুলুক ঘুমে আসছে, জগদীশ কি ম্যায়ি কত সেবা করছে বহুর। কী রকম খানা খেলে সে স্ফূর্তিতে থাকবে, তাকে জেবর দাও, শাড়ি দাও যখন-তখন, উল-কাঁটা কিনে দাও। দিবারাত্র বুনছে বহু। কত সোয়েটার হয়ে গেল, কত লেস বুনল, কত ঘুরে ফিরে এল, কত নয়া নয়া খানা বানাল, কিন্তু গোদ খালিই রয়ে গেল। এমনটা হবে কেউ কি ভেবেছিল?

প্রথম বাচ্চাটা মরে যাওয়ার পর বহু তো একেবারে গুম হয়ে যায়। ওই সময়ের কথা যেন আর মনে করতে চান না হৃদয়নারায়ণ। কতই বা উম্র ছিল বহুটার! ষোলা? সতরা? আজমিঢ় থেকে সাদি হয়ে এসেছে। নাকে ইয়া টানা নথ, মেহেন্দি

রাঙানো হাতদুটি। সাত হাত ওড়নার ভেতরে মুখটি লুকিয়ে গেছে। পরনাম করে সব টাকা দিচ্ছে বড়দের। খুব ভয় খেত শাসুকে। শ্বশুরকে। চুড়ি গাঁওয়ে বাড়ি, শহরে মামাঘরে এসে শাদি হল। একেবারেই আনপড়। ভয় খাবে না? লিখি-পড়ি লড়কি নয়, কাঁটা হয়ে থাকবে না? দোষও ছিল জগদীশ কি মায়ির। উঠতে বসতে তাকে শুনাত সে গাঁওয়ার, তার বেটার যোগ্য দুলহনই নয়। ইচ্ছা করলেই শহরের খানদান থেকে অনেক আচ্ছা দুলহন আনতে পারতেন।

এ কী? পূজার আসনে বসে মালা করতে করতে কী সব উল্টা পাল্টা ভাবছেন তিনি?

—'মুম? এ মুম?' তিনি যেন ভয় খেয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন।

—'এই তো, মুম এখানে।'

দীপ থেকে কালি উঠিয়ে নিজের কপালে, লড়কিটার কপালে টিকা দিয়ে দেন তিনি। সারাদিন ঘুরবে ফিরবে, বুরা নজর লাগবে না।

এই লড়কিটাকে তাঁর ভালও লাগে। স্নেহও করেন। কিন্তু পুরানো কথা ও বড্ড মনে করিয়ে দেয়। আশি বছরের জীবনে কত কীই তো ঘটে গিয়েছে। কত দুখ, কত ভুল, আবার জীবনটাকে গোড়ার থেকে শুরু করলে সে সব ভুল হত না, আরও কত সাবধান হতেন...।

—'নে রে মুম, পরসাদ খেয়ে নে।'

হাত পেতে পরসাদ নেয় সে।

বারিসে ভিজতে ভিজতে ছাদ পেরিয়ে নীচে নামতে যান হৃদয়নারায়ণ। মুম নামে না। সে লাফিয়ে লাফিয়ে বৃষ্টিতে ভেজে।

—'ভিজিস না, ভিজিস না।'

কে শোনে কার কথা। তার চুল সেঁটে গেছে, চোখ মুখ নাক ভিজে নরম হয়ে গেছে। ঘাঘরা ভারী। পায়ে এঁটে যাচ্ছে। কিন্তু সে ভিজে ভিজেই মজা পাচ্ছে।

ভিজল মুম। কিন্তু বুখার আসল হৃদয়নারায়ণের। খুব জ্বর। ডগদর সাব আসলেন, দাওয়া দিলেন, মিশির সে সব এনে দিল। মুম খেলে বেড়াচ্ছে। পাপড়ি কা চাট খাচ্ছে।

'এ মুন্নি—বস না গিয়ে, বুঢ়া মালিক যে আঁখ মুদে শুয়ে রয়েছেন। কিছু দরকার হলে?' মিশিরের বকুনি শুনতে পান হৃদয়নারায়ণ।

—'দরকার হলে বেল বাজাবেন। ততক্ষণে গুড়িয়াগুলোর কাপড়-চোপড় একটু পাল্টে দিই। খেতে দিই। ওদের খিদে পেয়েছে।'

—'একটুও যাস না ঘরে, ডাকছেন যে।'

—'ডাকতে দে। ও কামরায় বুখার-বুখার গন্ধ। আমার ভাল লাগে না। আমার নাস্তা এইখানে দিয়ে যা মিশির। আমি এইখানে খাব।'

—'মুম, মুম, এ মুমবাত্তি-ই-' হৃদয়নারায়ণ ডাকেন ধৈর্য হারিয়ে। অনেকবার ডাকের পর সে আসে। পাঁয়জোরের আওয়াজ হয় না। তবু কিশোরীর উপস্থিতির একটা গন্ধ আছে তো! হৃদয়নারায়ণ ঠিক টের পান।

—'কী রে? আসিস না কেন? আমি যদি মরে যেতাম?'

—'খুখার হলে যদি মরে যায় লোকে, তো রোজ রোজ লোক মরত।' মুখ ভার করে বলে মুম।

—'তো এই ঘরে গুড়িয়া নিয়ে খেল না, মেঝেতে বসে।'

—'আমার গুড়িয়ারা এখানে আসতে চাইছে না।'

—'আচ্ছা তো যা।'

এক ছুট্টে চলে যায় মুম।

আস্তে আস্তে হৃদয়নারায়ণ ভাল হয়ে ওঠেন। হাঁটেন। ঘর ছেড়ে বাইরের দালানে যান, মন্দির-এ ওঠেন, আগের মতো পূজা করেন। কিন্তু মুমকে দেখতে পান না। সে হয় চৌকায় কিছু করছে, নয় বহুর ঘরে ড্রেসিং টেবলের সামনে বসে আছে, নয় একা একা সাপ-লুডো খেলছে। আর গুড়িয়া তো আছেই। ঘর ভর্তি গুড়িয়া মুন্নিটার।

মিশির বলে— 'ও বড় হয়ে যাচ্ছে বড়া মালিক। বড় হয়ে যাচ্ছে।'

সত্যিই, সরু সরু হাত তো আর নেই। যখন হাত বাড়িয়ে খানা দেয় সে হৃদয়নারায়ণকে, তিনি দেখেন বাব্বা, এ তো দিব্যি কেলার থোড়ের মতো হাত হয়েছে, লাল সবুজ সোনালি চুড়ি কেমন মানিয়েছে দেখো। বাল? বালও তো আর এইটুকু নেই। লুনী নদীতে বান ডেকেছে, সোনালি বালু, কালি মিট্টি সব নিয়ে নদী চলেছে মুন্নির কোমরের দিকে। চান করে সেই চুল মেলে সে যখন যায় হঠাৎ মনে হয় কে গেল? কোন এক রহস্যময়ী?

রাত অনেক হয়েছে। হৃদয়নারায়ণের সওয়া চার ঘন্টার বরাদ্দ ঘুম হয়ে গেছে। তিনি এ পাশ ও পাশ করছেন। কী এক কৌতূহলে, অস্বস্তিতে। ঘন্টাভর ছটফট করেন, তারপর উঠে পড়েন। জগদীশ কি মায়ির ঘর পেরিয়ে যান। সুনসান ঘর। হাওয়া দিচ্ছে হু-হু করে। খাটের চাদর আধখানা উল্টে গেছে। হৃদয়নারায়ণ শোনেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। কী শোনেন? আওয়াজ, স্বর। যদি শুনতে পাওয়া যায়। তারপর জগদীশের ঘর। জগদীশের ঘরে ঘুমের গন্ধ। আরামের ঘুম। ফিকে নীল রঙের ডোরা কাটা নাইট স্যুট পরে জগদীশ ঘুমাচ্ছে। মৃদু একটা নাক ডাকার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। যাক, ছেলেটা তাঁর মতো অশান্তিতে নেই। অনেক দুখ ওরও। কিন্তু দুখের সঙ্গে একটা সমঝোতা করে নিয়েছে। অন্ততপক্ষে ঘুম বা বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটছে না। আর হবে না-ই বা কেন? তাঁর মতো বুঢ়া নাকি? ও তো বাচ্চা? ছপ্পন সাতান্ন উম্র কি একটা উম্র না কি? এই উম্র ফিরে পেলে আর একটা নয়া জীবন শুরু করতে পারতেন হৃদয়নারায়ণজি। যেমন লায়লি যখন কেঁদে কেঁদে বলত— 'পিতাজি আমাকে নিয়ে চলো, নিয়ে চলো, এখানে আমি আর থাকতে পারছি না...!' তখন তিনি বলতেন— 'আরে নিয়ে এলে তো ফুরিয়েই গেল। তখন আর তো ওরা নিতেই চাইবে না তোকে।'

—'নিয়ে কী হবে? আমি যেতে চাই না বাপু।'

—'তোর যে ওখানে শাদি হয়েছে। ও ঘর তো তোর। ওখানেই গেড়ে বসতে হবে, ওই দামাদ চলে আসবে তোর হাতের মুঠায়, বেটা-বেটি হবে, তারা তোকে মা

বলে ডাকবে।'

—'যে পতি উঠতে বসতে কড়া কথা শুনায়, লাথ মারে, সে লোককে আমার বেটা-বেটি বাপু বলে ডাকবে এ আমি সইতে পারব না পিতাজি, নিয়ে চলো। আচ্ছা তোমার ঘর কি আমার ঘর নয়? ওখানেই তো জনম, তোমরা আনলে বলেই তো এলাম পিতাজি?'

তিনি আমতা-আমতা করতেন। জোর গলায় বলতে পারেননি, পিতৃঘর মেয়ের আপন ঘর। সেটাই তার আশ্রয়। এখন হলে পারতেন। বলতেন —'আয়রে লালি, আয়, চল কত ঘর পড়ে আছে তোর বাপঘরে, যেটা খুশি চুনে নে। যেমন খুশি থাক, কাজ-কাম কর, হাসি খুশি কর, ভুলে যা তোর শাদি হয়েছিল। ওই দামাদটা, ওই শাসুটা তোর কেউ নয়, ওদের ভুলে যা।'

গুড্ডি ভয়ে ভয়ে চুপিচুপি ফোন করত। কখন শাসু মার্কেটিং-এ বেরিয়ে গেছে। সে চুপিচুপি গদ্দিতে তাঁকে ফোন করছে।

—'বাপু বাপু, গুড্ডি বলছি। ওরা খুব খতরনাক লোগ আছে। দাই বলেছিল। এদের রকম-সকম আমার ভাল ঠেকছে না। তুমি বলো মায়ের বিমারি, বলে আমাকে নিয়ে যাও, না হলে কোন দিন কী হয়ে যায়।'

—'কী হবে রে? মারে তোকে? গালি দেয়?'

—'না বাপু। কেমন করে যেন তাকায়, তিরছি করে তাকায়। শাসু আর তোমার দামাদ চোখে চোখে কথা বলে। আমাকে আপন করে না বাপু। আমার ভয়ে গা শিউরোয়। নিয়ে যাও বাপু।'

তিনি ভাবলেন— 'কী বিপদ। এতো উধার-করজ করে অত ভাল শাদি দিলাম, কত দহেজ, বরাতের কত খাতির, সারা বছর ধরে কত মশলাপাতি, হরিয়ানার থেকে আনা মন মন ঘিউ, ডাল, চাবল, আট্টা, সবজি, মিঠাই, শরবত, আচার পাঠানো, চাঁদির থালি, কাঁসার থালি, স্টিলের থালি; বাজার বসিয়ে দিলেন দুই কুটুম্ব-বাড়িতে, মেয়েগুলো মানাতে পারছে না? না বড়টা, না মঝলিটা? জগদীশকী মায়িকে বলতেন 'কী শিখিয়েছ বেটিদের? তোমার মতো কুইন বানিয়েছ না কি?'

সে রাগ করে বলত— 'বেশ তো, বলছে বলছে বলতে দাও, আস্তে আস্তে পোষ মেনে যাবে, আমি যেমন গেছিলাম।'

এ যে পোষ মানা না মানার, মান-অভিমানের ব্যাপার নয়, মরণ-বাঁচন সমস্যা তা তো সত্যিই তিনি বোঝেননি। এখন জগদীশের জওয়ানি তাঁর আসুক না, তিনি শুধরে নেবেন সব।

ধীরে ধীরে বহুর ঘরে ঢোকেন তিনি। জীবনে কখনও ঢোকেননি। এই প্রথম। কোথায় তার খাট, কোথায় তার আলমারির অবস্থান, আর কী কী আসবাব আছে কামরায় কিছুই জানেন না তিনি। ঢুকতেই তাই নিজের ছায়া দেখে চমকে উঠলেন হৃদয়নারায়ণজি। মানুষপ্রমাণ ঝকঝকে আয়না, রাস্তার আলো এসে পড়েছে তাঁর ওপর, আয়নায় একটা বুঢ়া গেরিলার মতো তাঁর প্রতিবিম্ব পড়েছে। ওহ্। বহুটা তাঁকে প্রথম প্রথম খুব ভয় খেত। এই জন্যে? ঝুলে পড়া ভুরু, তলার ঠোঁটটা পুরু, ঝুলে

পড়া, মুখের চামড়ায় এখন নানান জায়গায় থলি। ওহ্। সে তো এখন বুঢ়াপায় হয়েছে। আগে তো ছিল না। অনেক দিন ঘরে আছেন তাই তাঁর রংটা বোধহয় একটু ফ্যাকাশে হয়েছে, কিন্তু দাগ। অনেক ছোট বড় কালো কালো দাগ তাঁর মুখে, গলায়। এই আধো-আঁধারেও দেখতে পাচ্ছেন তিনি। কীসের দাগ? বয়সের? ছাবারিয়ারও তো সত্তর পার হল, সুরানার বয়স হল পঁচাত্তর, এমন দাগ তো নেই? কে জানে রামজি কাকে কোথায় মার্কা মেরে দ্যান। কাউকে দেন জন্ম থেকেই, কাউকে আবার বয়স হবার সঙ্গে সঙ্গে। জগদীশ কি মায়ির মুখ হাত পা সব লাল লাল তিলে ভরে গিয়েছিল। সবাই বলত, যত বেটা থাকবে তত লাল তিল গজাবে। এক জন্মের নয়, আগের জন্মের, তার আগের জন্মের, তার আগের জন্মের। বেটারা মায়ের জন্য তর্পণ পূজা করছে আর মায়ের গায়ে লাল লাল তিল ফুটে উঠছে। খুব সৌভাগ্য, খুবই সুলক্ষণ। পূর্ব-পূর্ব জন্মের বেটাদের গৌরবে জগদীশ কি মায়ির মুখ ইদানীং গর্বে ভরে থাকত।

তিলের কথায় তাঁর হঠাৎ মনে পড়ে গেল। মনে আগেই ছিল। এখন আবার ভাল করে মনে পড়ে গেল—

তিনি মেঝেতে শায়িত মুমকে দেখতে পেলেন এবার। বাব্বা, কত্ত বড়টা হয়ে গেছে। ঘাঘরা পরেছে একটা। বছর অষ্ট বয়সের না? তাই তো, এ ঘরের খাট আলমারি, ড্রেসিং আয়না সবই তো এ মুন্নিটার দখলে। আলমারি-ভর্তি কত শাড়ি, কত ঘাঘরা-চোলি, কত সালোয়ার-কুর্তা। কে-ই বা পরবে? কে-ই বা রাখবে? পরুক, পরে নিক।

হাত এলিয়ে, পা জড়ো করে ঘুমোচ্ছে মুন্নিটা। ঠোঁট ঈষৎ ফাঁক হয়ে আছে। মকাইয়ের কচি দানার মতো দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে। কলার থোড়ের মতো হাত পা। সোনালি-সোনালি গায়ের রং। সারা রাতের বিশ্রামে ঘুমে সেই রং যেন গলা মোমের মতোই নরম টলটল হয়ে রয়েছে। গলায় আবার পুঁতির মালা পরেছে। বেশ দেখাচ্ছে মুন্নিটাকে।

হৃদয়নারায়ণ অনেক কষ্টে উপুড় হয়ে বসেন। অপেক্ষা করেন ধৈর্য ধরে কখন ঘুমের ঘোরে উল্টোবে মুন্নিটা। তিনি ওকে দেখবেন ভাল করে। অনেক দিন ধরে দেখতে চাইছেন। সেই যবে ও জ্যোৎস্নার সন্ধে বেলায় ছাদের ওপর ফুটে উঠল, বলল যোধপুর সর্দার মার্কিট থেকে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসেছে তখন থেকেই তিনি দেখতে চাইছেন, নিঃসন্দেহ হতে চাইছেন। একটা চিহ্ন। ঘাড়ের কাছে চুলের বিনুনিটা তুলে...।

ওই যে, ওই যে উল্টোচ্ছে। যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই তাঁর ফরমায়েশ শুনল মুন্নিটা। কিংবা রামজি, স্বয়ং রামজিই ওকে উল্টে দিলেন। বিনুনিটা বালিশের ওপর রাতের লুনী নদীর মতো পড়ে আছে। ধীরে ধীরে খুব ধীরে, খুব ভয়ে তিনি তাঁর কম্পিত বুড়ো হাতে করে বিনুনিটাকে মাথার দিকে উল্টে দিলেন। কুচোকুচো চুলে ভর্তি ঘাড়ের কাছটা। কুঁকড়ে কুঁকড়ে আছে। কিন্তু ঠিক। ঠিক আছে। গোলমতো একটা জন্মদাগ। জরুল। ছাই-ছাই রঙের চাঁদ একটা। যেন বিষ্ণু ধরেছেন এমনি ভাবে

ছিটকে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। তাঁর আর শক্তি রইল না। কাঁপতে কাঁপতে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

১৩

যত দিন যাচ্ছে ততই যেন শক্তি হারাচ্ছেন হৃদয়নারায়ণ। ছাই রঙের অ্যামবাসাডরটা যখন তাঁকে নিয়ে বেরোয় তখন তিনি দিব্যি সাব্যস্ত। হাওয়া খেয়ে ঘুরে-ফিরে এলেন যেন ঝড়ে ডানা-ভাঙা পাখি। পাটু ধরে ধরে মিশিরের হাতে দিয়ে যায়, মিশির ধরে ধরে তিনতলায় নিয়ে যায়, বাইরের পোশাক বদলে দেয়, বাদামের শরবত তৈরি করে আনে। কিন্তু হৃদয়নারায়ণ যেন ক্রমেই দুবলা হয়ে যাচ্ছেন, ঝুঁকে যাচ্ছেন, ছোট্ট হয়ে যাচ্ছেন। বুঢ়া বয়স, আশি পেরিয়ে গেছেন, এমন তো হবেই। কিন্তু কই, ক' মাস আগেও তো ছিলেন না? সাবিত্রী-বহু মারা গেল, তখনও তিনি চারতলায় উঠে শবযাত্রা দেখেছেন, দাঁড়িয়ে থেকে শ্রাদ্ধ-কর্ম করিয়েছেন। তার পরেও আপিস করেছেন। হঠাৎই যেন তাঁর শক্তি ফুরিয়ে যাচ্ছে।

এমনটা হবেই। ছাবরিয়াজি বলেন—'আরে, তাকত ওই রকম একদিন অচানকই চলে যায়। অনেকে একটু একটু করে বুড্ডা হয়, কেউ কেউ আবার অচানক বুড্ডা হয়ে যায়। যার যেমন নসিব, যার ক্ষেত্রে যে রকম অভিরুচি রামজির। মেনে নিতে হবে।' কিন্তু জগদীশ খরকিয়া, হৃদয়নারায়ণের বোকা ছেলে মানতে পারছেন কই? একটা বউ নেই, বালবাচ্চা নেই, তেমন ইয়ার-দোস্ত নেই, শ্যামলালটা খাস নোকর ছিল সে সুদ্ধু চলে গেল। কে আর আছে তাঁর বাপু ছাড়া? ভাল হোক, মন্দ হোক, বুরবক, গিদধর বলে গাল দিক, তবু তো তাঁর জন্য ঘরে ফেরা, তিনি উৎকণ্ঠ উদ্বিগ্ন হয়ে প্রতীক্ষা করে বসে আছেন, একসঙ্গে খাওয়া একসঙ্গে চা-পান, দু-চারটি বৈষয়িক কথা, বাকি সময় দু'জনে চুপচাপ। তবু তো পাশাপাশি, মুখোমুখি। বাপুই তাঁর সনাতন আত্মীয়, যাঁর সঙ্গে তাঁর রক্তের সম্পর্ক। ওই রক্তের স্রোতেই তিনি সাঁতার দিচ্ছেন। ওই অগ্রবালি রক্তস্রোত জগদীশে এসে ব্যাখ্যাতীত বিষাদে থেমে গেছে। তাই জগদীশ আর হৃদয়নারায়ণের মধ্যে পাক খাচ্ছে ক্ষয়িষ্ণু এক সম্পর্কের আবর্ত। হৃদয়নারায়ণের উৎসমুখ বন্ধ হয়ে গেলে, জগদীশ কী করবেন জানেন না। অবস্থাটা তিনি কল্পনা করতে পারেন না। তাই জগদীশ তাঁর নিস্পৃহতা ঝেড়ে ফেলে ডগদরসাবের কাছে ছোটেন।

—'আশি কি খুব বেশি উম্র হয়ে গেল ডগদরসাব?'

—'না তো, তেমন আর বেশি কি? কত লোকে নব্বই অবধি বাঁচছে। কত জন একশো পার করে দিচ্ছে। মেডিক্যাল সায়েন্স তো আর এক জায়গায় বসে নেই।'

—'তো বাপুজির একটা চেকআপ করে দিন না আচ্ছা করে।'

ডগদরের আর কী?—প্রেশার বেশ লো, হাঁফ ধরছে, কোমরে হাঁটুতে ব্যথা, বাতের ব্যথা, আর্থারাইটিস। না, প্রস্রাবে রক্তে কোথাও অতিরিক্ত চিনি নেই। ই. সি. জি. রিপোর্ট ভাল।

টনিক লিখে দেন ডাক্তার, দাওয়া লিখে দেন। আশ্বস্ত করেন জগদীশকে। খারাপ কিছু নেই তো হৃদয়নারায়ণজির? নিয়ম করে দাওয়া-টনিক সব খাচ্ছেন উনি। জগদীশ নিজে দিচ্ছেন, তিনি না থাকলে মিশির দিচ্ছে। ফল খাচ্ছেন, মুসাম্বি, কমলা, আপেল, আঙুর, খেজুর, চিকু, বাদাম পেস্তার শরবত দুধে মিশিয়ে চমৎকার করে ঘানিয়ে দিচ্ছে মিশির। সাবধানে মালিশ দিয়ে যাচ্ছে মালিশওয়ালা। কিন্তু ফল হচ্ছে না কিছুতেই তেমন।

কেন যে হচ্ছে না তা হৃদয়নারায়ণ জানেন। সঠিক জানেন না, কিন্তু সন্দেহ করেন। তিনি দেখছেন তিনি যত দুবলা, মুম তত পুষ্ট হয়ে উঠছে। তিনি বসে যাচ্ছেন, মুম লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে, তিনি ভাল ভাল খানা খাচ্ছেন, হজম করছে মুমের পাকযন্ত্র। কী এক অলৌকিক মন্ত্রে যেন তাঁর আর মুমের জীবনের মধ্যে একটা বিষম অনুপাতের অংক খাড়া করে দিয়ে গেছে কেউ। তিনি মালিশ নিচ্ছেন, মসৃণ হচ্ছে মুম, তিনি ছোট্ট হয়ে যাচ্ছেন। মুম মাথা ঝাড়া দিচ্ছে, তাঁর গতিবিধি ঘরে বড়জোর তিনতলার মধ্যে সীমাবদ্ধ, মুম ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা বাড়ি, সম্ভবত বাড়ির বাইরেও, সারা দুনিয়ায়। তিনি যত দুর্বল, তত স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, শক্ত হয়ে উঠছে মুম। সেদিন তিনি পূজাঘরে যেতে চাইলেন, অবলীলায় তাঁকে ধরে নিয়ে গেল, নামিয়ে আনল। এটা কি হৃদয়নারায়ণের মনে হওয়া? না সত্যিই এমনটা ঘটছে? কী করে কাউকে বলবেন এ কথা? এটাই তো স্বাভাবিক! তিনি বুড়া হয়েছেন, দিন তাঁর শেষ হয়ে এল, এখন কি আর তাঁর তাকত বাড়বে নাকি? আর ও মুন্নিটা তো জওয়ান হয়ে উঠছে দিন কে দিন। ওরই জন্যে এখন দুনিয়ার হাওয়া, আলো। দুনিয়াদারির মধ্যে যা কিছু রস আছে, নেই নেই করেও যেটুকু মিঠাপন আছে, জোশ আছে, সে সব মুমের মতো জোয়ান লড়কিদের জন্যই। মুমের হাত পা নিটোল এখন, চিকন তার গলা ঘাড়, চুলে যেন নতুন চমক লেগেছে, ঠোঁটে যেন ফুল খিলছে, কচি ভুট্টার মতো দানা দানা দাঁত অল্প বার করে সে যখন হাসে তখন কার সাধ্য আছে সে দিক থেকে আঁখ ফিরায়? আর তিনি? তিনি যেন জিন্দা থাকতেই এক আত্মা হয়ে গেছেন। ছোট্ট, ঝোঁকা, হাত-পাগুলো ক্ষয়াটে, দাঁত সব একের পর এক পড়ে যাচ্ছে, গায়ের চামড়া যেন হাতির মতো খসকা। কে বলবে তিনি একদিন গৌরবর্ণ ছিলেন, কালি হয়ে গেছে মুণ্ড, ধড়।

কিন্তু চেহারায় মুমের জওয়ানির চমকানি এলেও সে মানুষটা তো বদলে যাবে না? যাবে কি? কিন্তু তাই গেছে। ছুন ছুনাৎ ছুন করে মল বাজিয়ে দোতলা-তিনতলা-করা জানলা-দিয়ে-ফেরিঅলা-ডাকা-অল্পে-সন্তুষ্ট, হাসিমুখ মজাদার-মিঠি-মিঠি-বোলের সেই লড়কি এখন সে আর নেই। যেমন তার তাকত বাড়ছে তেমনি বেড়ে যাচ্ছে তার মেজাজ, তার অহংকার। ধরাকে সে সরা জ্ঞান করছে যেন। মিশিরকে হুকুম করছে, খানাপাকানেওয়ালি ব্রাহ্মণী তার জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। হৃদয়নারায়ণ মুমের সুবিধেমতন কখনও বুড্ঢা হয়ে যাচ্ছেন, কখনও কামচোর আদমি হয়ে যাচ্ছেন একটা।

তাঁর লো-প্রেশার, ডগদর আরাম করতে বলেছে, তিনি আরামচেয়ারে শুয়ে-বসে আছেন, কোথা থেকে বড় বড় পা ফেলে ঢুকে আসবে মুম, তার পরনে সালোয়ার

কামিজ, একেবারে লেটেস্ট ফ্যাশনের। চুল তার বিস্রস্ত। নাহা করেছে গোটা চুল ভিজিয়ে।

—'দাদাজি, সরপে বড্ড দর্দ হচ্ছে, একটু টিপে দিন তো!'

সে মেঝেতে বসে দাদাজির কোলে মাথা রাখে। ভঙ্গিটা খুব বাহারি। তার সর গোদ মে নিতে হৃদয়নারায়ণের আচ্ছা লাগে। বালের খুশবু কী! তরুণ শরীরের খুশবু আবার তার চাইতেও বেশি। কিন্তু তিনি ওর মাথা টিপে দেবেন? তাঁরই বলে কে মাথা টিপে দেয় তার নেই ঠিক।

—'কী হল? দিন না। আপনি দাদাজি না? এ হাভেলির মালিক না? ছোটদের দেখ-ভাল কৌন করবে আপনি ছাড়া? উঃ যা গর্মি আপনাদের বাংলা মুলুকে?'

এলেন আজমিঢ় থেকে যেখানে এখন তাপমাত্রা সাতচল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাংলা মুলুকে ওঁর গর্মি লেগে যাচ্ছে।

কী করেন, বাংলা মুলুকের মতো বাজে গর্মি মুলুকে মুমকে তো তিনিই জবরদস্তি করে নিয়ে এসেছেন কিনা, তো তার খেসারত তিনি দেন। দুর্বল শির-ওঠা হাতে তিনি ওর মাথা টিপে দেন।

—'হয়েছে রে? হয়েছে?'

অমনিভাবে শুয়ে শুয়েই মাথা নাড়তে থাকে মুম।

—'না, হয়নি, হয় না, এত তাড়ায় হয় না।'

সর টিপতে টিপতে হৃদয়নারায়ণের নিদ এসে যায়। অনেকক্ষণ বাদে মিশির এসে দেখে, আঁখ মুদে, ঢুলতে ঢুলতে তিনি নিজের গোড় নিজেই দাবিয়ে যাচ্ছেন।

মিশির বলে—'কী হল মালিক, বলবেন তো আপনার দর্দ হচ্ছে।'

সে গোড় দাবাতে বসে যায়। হৃদয়নারায়ণ আর কী করে বলেন এই বৃদ্ধ বয়সে কোথাকার এক আজমিঢ়িয়া লড়কি তাঁকে দিয়ে তার সর দাবিয়ে নিচ্ছিল।

—'এ কী খানা এনেছে আপনার নোকর? এ তো খাওয়াই যায় না!' যা খানা দ্যায় মিশির সবেতেই মুম-এর এমনি বিতৃষ্ণা। মুখ ফিরিয়ে নেয় সে।

মিশির আগে 'চাচা' ছিল, এখন সে 'আপনার নোকর'।

—'এত্তা চাট। এত্তা চাট!' মিশির গজরগজর করে। কিন্তু করলে শুনছেটা কে?

কোথায় গেল সেই সদাহাস্যমুখী, অল্পে-সন্তুষ্ট বিস্মিত বালিকা। এ যেন এক বাঘিনী ঢুকেছে 'অগ্রবাল হাউজ'-এ।

হৃদয়নারায়ণ দেখছেন কেন যেন মুম-এর প্রচণ্ড গুস্সা হয়েছে। সে এক কামরা থেকে আর এক কামরায় ঘুরে বেড়াচ্ছে—থম থম থম পায়ের আওয়াজ করে।

লড়কিলোগের একটা শরম-ভরম থাকবে। চলা-ফিরা ধীর, শান্ত হবে, তবে না?

বললেই মুম—হা হা করে হেসে উঠবে। সে এমন হাসি যে চমকে চমকে উঠবে হাভেলির কামরা সব। হাভেলিটা সুদ্ধ ডর খাচ্ছে। হৃদয়নারায়ণ তো গুটিয়ে একটুকু হয়ে যাচ্ছেন।

অচানক সে ছুড়ে ছুড়ে সব ভেঙে ফেলতে থাকে। হৃদয়নারায়ণের পিতাজির মাতাজির ফটোগ্রাফ, হৃদয়নারায়ণের বেটি-দামাদদের ফটোগ্রাফ।

—'ওরে রাখ রাখ, টুটে যাচ্ছে আমাদের খানদানের সব তসবির, সব পহচান।'

—'কার খানদান? আপনাদের। আমার তো নয়।'

আর একটা ফটোগ্রাফ গুঁড়িয়ে গুঁড়া সিসা চারদিকে ছড়িয়ে যায়।

কাচের ফুলদান, ভাল ভাল সব পোর্সিলেনের পুতুল, টি-সেট, শরবত সেট চুরচুর করে ভেঙে ফেলে।

মিশিরের পায়ে কাচ ফুটে যায়। মিশির খোঁড়াতে খোঁড়াতে বলে—'এ কী? মালিক, এ কে করল? কী করে হল?'

এখন হৃদয়নারায়ণ কি বলতে পারেন এ সব মুম করেছে। তা হলে বলতে হয় কেন করেছে, কীসের এত গুস্‌সা তার। সে অনেক হাঙ্গামা, তার চেয়ে ফাঁকা দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা ভাল।

—'ভেবে নে মিশির, ভাব—আমিই করেছি। আমারই দিমাগ খারাপ হয়ে যাচ্ছে।'

মিশির সাবধানে সব জড়ো করে, ঝাড় দিয়ে দিয়ে, সাবধান তোলে প্লাস্টিকের বেলচা করে, সাবধানে ফেলে দিয়ে আসে।

জগদীশ সন্ধেবেলা এসে দেখেন তিনতলায় বাপুর ঘরের অত সাধের শখের পিকচার-গ্যালারি সব সাফ। কিচ্ছু নেই।

—'কী ব্যাপার?'—মিশিরকে জিজ্ঞেস করেন।

মিশির অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তিরছি চোখে বড়া মালিকের দিকে চায়, তারপর হাত উল্টে বলে—'কা জানে!'

'আলমারি সাফা করছি দাদাজি, সব কাপড়া ঠিকঠাক ভাঁজ করুন আপনি।'

হৃদয়নারায়ণ বসে বসে ভাঁজ করেন ধুতি, চাদর, পিরান, শার্ট, শাড়ি, ঘাগরা...।

'বিস্তরাঁ লাগান দেখি। ওহ্ হল না। চাদর টানুন আরেকটু, টানুন। ওহ্,আপনাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না।'

তিনটে ঘরের বিস্তরাঁ ঝেড়েঝুড়ে, চাদর পাল্টে গুছিয়ে দেবার পরেও গাল খেতে হয় হৃদয়নারায়ণকে, সারাক্ষণ জগদীশ কি ম্যয়ির দোলনা চেয়ারে বসে দোল খেতে খেতে রুষ্ট দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে গাল দিয়ে যায় মুম। হৃদয়নারায়ণ যত না বুড্‌ডা তার চেয়ে বেশি শয়তান, তাঁর আর এমনকী উম্‌র? দেখো গে যাও রাস্তায় কত বুড্‌তা গাড়ি টানছে, ঠেলা টানছে, মাল বইছে। এমন করে বলে সে যে সত্যিই হৃদয়নারায়ণ খুবই অপরাধী বোধ করেন নিজেকে।

এখন মুম-এর ডাক শুনলেই হৃদয়নারায়ণ ঘাবড়ে যান। কী জানি এবার কী করাবে লড়কিটা তাঁকে দিয়ে। প্রতিবাদ করতেও তো কই সাহস পান না। অজগরের চোখের মায়ায় অসাড় হরিণশিশু যেন।

দুপুরবেলা। দুর্গামায়ির পূজা কাছে চলে এল। চিতরঞ্জনের অগ্রবাল হাউজে পাঠ আর পূজা চলবে নবমী পর্যন্ত। রামজির পূজা। তারপর দসেরা। রাবণ খতম হয়ে যাবে। বহু থাকতে একরকম। এখন লছমিহীন এই ঘরে কী করে কী হয়? এক বরষ পার হয়ে গেছে, পূজায় তো কোনও বাধাও নেই। তা হোক, পূজা হোক। বন্দোবস্ত হচ্ছে। মিশির খাটছে খুব। জগদীশও।

রোজের মতো জগদীশ বেরিয়ে গেছেন। মিশির অনেকক্ষণ ধরে কাম-কাজ সেরে দুতলায় নিজের কামরায় শুয়ে গেছে।

দূর থেকে ডাক ভেসে আসে—'দাদাজি। দাদাজি।'

প্রথমটা সাড়া দেন না হৃদয়নারায়ণ। ডাকছে ডাকুক। তিনি এখন ঘুমাচ্ছেন। 'দাদাজি! দাদাজি। শুনে যান। শুনে যান বলছি!' —ডাকটা আরও জোর। তার তীব্রতা, ক্রোধ উপলব্ধি করে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসেন হৃদয়নারায়ণ। 'কোথায়? কোথায় তুই?'

'এই যে, আপনার বহুবেটির কামরায়।'

তাঁর ঘরের পরে জগদীশ কি ম্যয়ির ঘর, তারপর জগদীশ, সবশেষে বহুবেটির ঘর। তো সেইখান থেকে হাঁক পাড়ছে লড়কিটা, তিনি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন।

'দাদাজি! দাদাজি।'

'আমি যে এখন ঝিমাচ্ছি। দুপর হয়েছে, একটু ঝিমিয়ে নিই। বুঢ়াপা এসে গেল রে মুম। আরাম করবার সময়।'

—'আর ঝিমতে হবে না। আরাম করে কাজ নেই, তা হলে রাতে আপনার নিদ হবে না, আসুন। এসে যান বলছি।'

কী করেন! ভয়ে ভয়ে উঠে বসেন হৃদয়নারায়ণ। সহজ হবার জন্য একটু জল পান করেন। তারপর গুটি গুটি চলেন। এ কামরা ও কামরা, সে কামরা পেরিয়ে বহুবেটির কামরায়। এটাই এখন মুম-এর খাস কামরা।

আয়নার সামনে টুলে বসে আছে মুম। দুটো মুম দেখছেন হৃদয়নারায়ণ। একটা মানুষের সামনে আর পেছন তো একসঙ্গে দেখা যায় না। কিন্তু আয়নার দৌলতে তাই-ই দেখছেন হৃদয়নারায়ণ। রাজস্থানি জ্যাকেট পরা ঢাকা পিঠ। জ্যাকেটের আয়নাগুলোয় কত কিছুর ছায়া পড়েছে। বহুর ফটোর ছায়া, আলমারির ছায়া। তাঁর শুকনো গরিলা মুখের ছোট ছোট প্রতিবিম্ব যেন মুমের সারা গায়ে টাটকা ফোড়ার মতো ফুটে রয়েছে। চুলগুলো তার গোছা করে এক দিকে সরানো। উজ্জ্বল স্বাস্থ্যে টগবগ। যেন সবে ফুটে ওঠা গ্ল্যাডিওলাস ফুলের সতেজ ডাঁটির মতো। আর আয়নার মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন জয়পুরি মিনার চুড়ি পরা মসৃণ হাতের, ফুটে-ওঠা বুকের, মুখের তরুণী এক। তরুণী না কিশোরী। কিশোরী না বালিকা ভাল বোঝা যায় না। এমন কি হঠাৎ হঠাৎ শিশু, নেহাত বাচ্চা বলেও ভুল হয়।

—'ডাকছিস কেন?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করেন তিনি।

—'আমি কেমন শিঙার করছি দেখুন' বলতে বলতে চুল ঝাঁকিয়ে পিঠে ফেলে দেয় সে। লুনী নদী বইতে থাকে যথেচ্ছ।

—'দিন। কাঁকইটা দিন। দি—ন।'

হৃদয়নারায়ণ বহুর কাঁকই এগিয়ে দেন।

—'আঁচড়ে দিন।'

—'আমি?'

—'হ্যাঁ, আপনি।'

কাঁকইয়ের দাঁত বসান তিনি নদীর জটিল স্রোতে। আঁচড়াচ্ছেন। আঁচড়াচ্ছেন, আঁচড়াচ্ছেন।

—'আরও জোরে, চেপে চেপে আঁচড়ান, উঃ অত আস্তে কেন? গুদগুদি লাগছে যে।' কিলবিল করে হেসে ওঠে মুম। চুলের গোড়া তুলে বাঁধে। ছায়ার মতো জরুলটা স্পষ্ট দেখা যায়। আড়চোখে তাঁর দিকে কুটিল চাউনিতে চেয়ে দেখে মুম। টঙের ওপর একটা বাঁধন দেয়। ফিতে দাঁতে চেপে ছলনাময়ী নারীর মতো ভাবভঙ্গি করে। তারপর চুলটাকে জড়িয়ে জড়িয়ে বাঁধতে থাকে। শেষ ফণাগুলি ঢুকিয়ে নেবার পর ঘাড় বাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করে,

—'কেমন হয়েছে!'

—'আচ্ছা। বহোত আচ্ছা!'

—'তো কাঁটাগুলো দিন একে একে।'

মুক্তো গাঁথা কাঁটা সব টেবিলের ওপর ছড়ানো। অনুগত ভৃত্যের মতো হৃদয়নারায়ণ একটা একটা করে সেগুলো এগিয়ে দেন। আর সে সেগুলো কবরীতে গাঁথে।

—'কাজললতা দিন দাদাজি। লিপস্টিক দিন। দেখুন তো কোনটা মাখব?'

একগাদা প্রসাধন-দ্রব্যের সামনে শিরশিরে গায়ে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন,

—'আমি কি অত বুঝি?'

—'বুঝবার কোশিস করুন। কিছুই বুঝবেন না, কিছুই জানবেন না, এতে পার পেয়ে যাবেন?'

একটা বেছে নেন হৃদয়নারায়ণ অগত্যা।

ম্যাজেন্টা রঙের সেই অবিমিশ্র ঔজ্জ্বল্যের লিপস্টিক গাঢ় করে লাগায় মুম। তারপর হঠাৎ একটানে লম্বা চেইন টেনে খুলে ফেলে তার চোলি। ভেতরের ছোট্ট জামা খুলে ছুড়ে ফেলে দেয়।

গোলাপি মেশানো সাদা পদ্মের কোরকের মতো স্ফুট হয়ে থাকে তার কিশোরী স্তন। একটানে ঘাঘরার ফিতে ফাঁস খুলে ফেলে সে। পায়ের কাছে জলের বুত্তের মতো পড়ে থাকে ঘাঘরার আবরণী। দাঁড়িয়ে থাকে একেবারে নগ্না। রাজস্থানি ভেনাস। শাদায়, গোলাপে, হলুদে, সোনালিতে, কালোয়, ম্যাজেন্টায় চোখ-ধাঁধানো তরুণী এক।

সভয়ে চোখ বোজেন হৃদয়নারায়ণ। এই, এই-ই কি স্ত্রীলোক? জেনানা? সব বেটি, সব আওরত, সব সবার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে এই ভেনাস, যে এই বৃদ্ধ শরীরকেও শেষবার আকাঙ্ক্ষায় কাঁপাচ্ছে, এমন এক আশ্লেষের আর্তি জাগাচ্ছে তা দিল-এর না শরীরের তিনি বুঝতে পারছেন না, তিনি এর ক্রোড়ে আশ্রয় নিতে চান, জীবন পান করতে চান এর পয়োধর থেকে, তিনি একে ক্রোড়ে নিয়ে দোলাতে চান, লোরি শুনাতে চান, এর গর্ভে সৃষ্টি করতে চান নতুন প্রাণ, নতুন জীবন, নিজেকেও বার বার ফিরে পেতে হলে এই মহাসুন্দরী মহাভয়ংকরী ছাড়া কোনও গতি নেই।

তিনি শুধু অস্ফুটে বলেন, 'শাড়ি পর মুন্নি, শাড়ি পর, বড় হয়ে গিয়েছিস না?'

—'পরব, আপনি পিনাবেন, পরব না কেন?'

অন্ধের মতো বহুর আলমারি হাতড়াতে থাকেন তিনি। শাড়ি ব্লাউজ-সায়ার হ্যাঙার টেনে টেনে বার করেন।

খসখস শব্দ হয় কিছুক্ষণ, তারপর ক্রুদ্ধ চিৎকার করে মুম —'হচ্ছে না, হচ্ছে না, এ চোলি আমার বড় হচ্ছে।'

সালোয়ার কুর্তা বার করেন হৃদয়নারায়ণ।

—'আমি ডুবে যাচ্ছি এতে, দাদাজি ঠিক জামা বার করুন, জলদি।'

আলমারির তাকে তাকে ছোট ছোট ফ্রক গুছিয়ে রাখা আছে গোলাপি তোয়ালে, নীল তোয়ালে মুড়ে। তোয়ালের ঢাকা খুলে তিনি দেখেন কত রং। গোলাপি, আকাশনীল, সোনালি, টুকটুকে লাল, তুষার শাদা, মেঘের মতো ফুলো ফুলো, ফুলের পাপড়ির মতো নরম, লেস দেওয়া, ট্যাটিং-এর ফুল বসানো ফ্রক সব। বহুটা বছরের পর বছর এইসব তৈরি করে রেখেছে। একটার পর একটা পরাতে চেষ্টা করেন তিনি মুমকে। কোনওটাই ঠিক হয় না। জামা-কাপড়ের পাহাড় হয়ে যায় চারদিকে।

তখন সে বলে 'ধাইমারা যে নরম পুরোনো কাপড় দিয়ে বাচ্চাকে জড়িয়ে রাখে, সেই কাপড় আমাকে দিন দেখি দাদাজি, বড্ড শীত লাগছে। আমার গায়ে ফিট করে এমন পোশাক দুনিয়ার কোনও ওস্তাগর, কোনও মা বানায়নি দেখছি।' বলে সে কাঁদে। ঠোঁট ফুলিয়ে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে তারপর চিৎকার করে পাড়া মাথায় করে কাঁদে সে।

জগদীশের পুরনো মাড় না দেওয়া ধুতি খুঁজে পেতে বার করেন হৃদয়নারায়ণ। গোলাপি তোয়ালে বার করেন। সেই কাপড় সারা অঙ্গে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে জড়ায় মুম, যেন একটি সদ্যোজাত শিশু। সেইরকম নির্বোধ নিষ্পাপ হাসি হেসে সে বলে—'অব দুধ পিলাও দাদাজি।'

দুধ? দুধ পান করবে মুম? এত দিন পর সে দুধ পান করতে চাইছে? যে দুধ রামজির দেওয়া জীবনস্বরূপ, অথচ যে দুধকে সে এতদিন বিপজ্জনক বলে প্রত্যাখ্যান করে এসেছে, সেই দুধ? মুন্নিটা তাঁর হাত থেকে দুধ পান করবে? এ কী স্বস্তি? এ কী অবিশ্বাস্য সৌভাগ্য?

বিপুল হর্ষে, উচ্ছ্বাসে হৃদয়নারায়ণ সিঁড়ি ভেঙে দুতলায় নামেন। ফ্রিজের মধ্যে এত বড় কটোরাতে ধবধব টলটল করছে দুধ। তিনি দু হাতে তাকে বার করে টেবিলে রাখেন, তারপরে অনেক কষ্টে, থেমে থেমে সিঁড়ির ধাপে ধাপে রেখে রেখে ওপরে নিয়ে আসেন হাঁফিয়ে হাঁফিয়ে। কটোরাটি বহুর ঘরের সুন্দর মেঝের মাঝখানে নিচু হয়ে রাখতে তাঁর প্রাণ বেরিয়ে যায়। কিন্তু তিনি গ্রাহ্য করেন না। বলেন, 'পি লে মুন্নি, পি লে রে!' যেন এ লড়কি এ মুম-মুন্নি তাঁর হাত থেকে দুধ পান করলেই তাঁর মোক্ষ লাভ হবে।

হেসে মুম বলে 'কেমন করে দুধ পিতে হয়, আমি যে জানিই না দাদাজি, দেখিয়ে দিন না।'

দুধের কটোরা মুখে তুলতে যান হৃদয়নারায়ণ, তাঁর হাতদুটি রামজি অসাড় করে

দেন। কটোরার ওপর উপুড় হয়ে পড়েন তিনি। মুম শক্ত করে তাঁর ঘাড় চেপে ধরে। দুধ ঢুকে যেতে থাকে তাঁর চোখে, মুখে, নাকের ছিদ্রে। খাবি খেতে খেতে হৃদয়নারায়ণ অনুনয় করেন—'মুঝে এইসা দুধ মৎ পিলাও মুন্নি। মৎ পিলাও।'

মুম বলে—'আমার জিন্দগির প্রথম দুধ যে আমি এমনি ভাবেই পান করেছিলাম দাদাজি। কটোরা-ভর দুধ আর নাদান হাত পা মুখের এক ছোটিসি বাচ্চি। আপনার হুকুমে আমার দাদিমা সেই দুধ একা এনেছিলেন এই কামরায় বয়ে, আর আমার মা তখন সত্র বছরের ভিতু বোকা লড়কি এক, কন্যাজন্মের গ্লানিতে অপরাধ বোধে কাঁপতে কাঁপতে আমাকে, তার পহেলি বাচ্চাকে এইভাবে দুধের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে মেরেছিল। এই আপনাদের ঘরের অবাঞ্ছিত লড়কিদের দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার সহজ তরিকা।'

'দাদাজি লাখ লাখ টাকার দহেজ, বাড়ি মর্গেজ, সম্পত্তি বিক্রয়, তারও পরে লড়কির মওত্, খুদখুশি, কাতিল এ সবে জেরবার আপনারা এই ফয়সলা বার করেছিলেন। দেখুন দেখুন এই এত বড়টা আমি হতে পারতাম। এমনি পাপড়ি চাট ভেলপুরি খেয়ে বিলিতি আমড়া চেখে, কুলফি মালাই চেটে, আপনার হাত ধরে, মায়ের গোদমে, পিতাজির গোদমে চড়ে, আপনাদের সেবা করে, ঘরকন্না করে, খেলে, কত কিছু শিখে, এমনি সুন্দর এক জওয়ানিতে পৌঁছতে পারতাম। এমনিভাবে....এমনিভাবে....এমনিভাবে।'

হৃদয়নারায়ণ দুধের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে তিনটে হিক্কা তুলে নিথর হয়ে গেলেন। তাঁর পাশে পড়ে রইল একটি নরম ধুতি যা দিয়ে সদ্যোজাত শিশুকে জড়াতে হয়, রইল একটি গোলাপি ফুলো-ফুলো তোয়ালে যা তাঁর বহুবেটি তার নিজহাতে নিহত সন্তানটির স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে দিয়েছিল, যার আচ্ছাদনে তিনি স্বয়ং সেই মৃত শিশুটির মুখ দেখেছিলেন আর রইল রাশি রাশি ফ্রক যা প্রতি বছর বহু তার মৃত সন্তানের জন্য তৈরি করত, তৈরি করে যেত, তৈরি করে যেত....

জগদীশ আজ বৈদজির কাছ থেকে এক নতুন রকমের মৃত সঞ্জীবনী সুধার বোতল নিয়ে বাড়ি ফিরছেন। বৈদজি বলেছেন এ টনিক অব্যর্থ। তিনি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে শুনলেন বুঢ়া মিশির আপনমনেই গজর গজর করছে।

'ঠাণ্ডা মেশিন সে কটোরাভর দুধ নিয়ে যায়...এ কেমন বিল্লি? বিল্লি না বিল্লির ভূত? এই ভূতের বাড়িতে থাকাই দায় হয়ে উঠেছে দেখা যাচ্ছে।'

জগদীশ স্বভাবতই নোকরের গজগজানিতে কান দিলেন না। নিজের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে ফরমায়েশ করলেন—'ঠাণ্ডাই আন, চায় পানি লাগবে না।'

জগদীশের মোটা শরীর, গরম খুব। এখন তিনি জামাকাপড় ছাড়বেন, বেশ করে নাহা করবেন, তারপর ফ্যান ছেড়ে দিয়ে আরাম করে বসে টিভিটা চালিয়ে দেবেন, আর শরবতে চুমুক দেবেন। কাঁধে তোয়ালে নিয়ে নাহা করতে যাবেন অচানক যে কী দেখলেন, বোধহয় সরু দুধের ধারা, কী যে শুঁকলেন, বোধহয় মৃত্যুর গন্ধ, জগদীশ পাশে সাবিত্রী বহুর ঘরে ঢুকে এলেন। দেখলেন তিনি দৃশ্যটা। খোলা আলমারি,

মেঝেতে ফ্রকের স্তূপ, একটি বড় দুধের বাটিতে মুখ থুবড়ে আছে শিশুটি। না! ও তো তাঁরই পিতাজি!

সাবিত্রী বহুর ফটো তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে ঈষৎ ঘুংঘট ফাঁক করে। কোনও দিন যে প্রশ্নের জবাব সে দেয়নি, সে প্রশ্নের জবাব আজ এতদিন পরে তিনি পেয়ে যান। তাঁর আত্মবিশ্বাস, কর্মৈষণা, তাঁর বাঁচবার ইচ্ছা, ঈশ্বরভক্তি সবকিছুর উৎসমুখে পাথর চাপিয়ে রেখেছিল এই প্রশ্ন— অমন সুন্দর, স্বাস্থ্যবান শিশুটিকে রেখে হৃষ্ট হৃদয়ে তিনি যোধপুরে সওদা করতে গেলেন। ইতিমধ্যে কী এমন ঘটল যে শিশুটি মারা গেল? এ কি তাঁর বীজেরই অক্ষমতা? দীর্ঘদিনের প্রশ্ন আর যন্ত্রণার উত্তরের সামনে তিনি স্থাণু হয়ে থাকেন। এখন নতুন করে জন্ম নেবার উপায় যেমন তাঁর শিশুর নেই, তেমন তাঁরও আর নেই। তিনি, তাঁর খানদান, স-ব মারা গেছে।

শারদীয় আনন্দবাজার ১৯৯৮ (১৪০৫)